তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৪৫ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩০। খৃঃ ১৯২৪। সম্বৎ ১৯৮০। কলিগতাব্দ ৫০২৪।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

একবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮৪৫ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৪।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ংশ কল্প

থম ভাগ

৪১ শক

কাকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও শিত।

সাল ১৩২৬। খৃঃ ১৯২০। সম্বৎ । কলিগতাব্দ ৫০২০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব "

নববর্ষের অভিবাদন।

এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমিতে, এই অগণিত জনগণধারিণী পৃথিবীতে এবং অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া পরিধাবিত এই ব্রহ্মচক্রে, যেখানে যে সকল মহাত্মাগণ অতীত কালে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধন্য করিয়াছেন, বর্ত্তমানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে পবিত্র করিবেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভগবৎসূর্য্য হইতে নিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ। তাঁহাদের সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে আহ্বান করিয়া এবং প্রণতিসহকারে অভিবাদন করিয়া নববর্ষের কার্য্যে নবোৎসাহে প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান আমাদের শুভকার্য্যের সহায় হউন '

নববর্ষে প্রার্থনা।

(শ্রীমতী মনীষা দেবী)

আজ এই শুভ নববর্ষের প্রথম দিনে, হে পরমেশ্বর আমরা সত্যসুন্দর তোমার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি। আজ আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছি—তুমি এসো,—তোমাকে আমরা প্রীতিভক্তির পুষ্পপত্রের দ্বারা পূজা করিব। তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের প্রতি প্রেম, করুণা, নিত্য অজস্র বিতরণ করিতেছ—তোমার প্রেম, তোমার করুণা যেন কখনও না ভুলি। হে দেব, হে নাথ! আমরা যেন তোমারই ছায়ায় দাঁড়াইয়া তোমারই মত সমগ্র বিশ্বে আপনাকে বিলাইতে শিখি। হে স্বপ্রকাশ তুমি তোমার প্রেমময় মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে জ্ঞানময়, তোমার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত কর। আমাদের কথায়, আমাদের ভাষায় তুমি আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। হে অমৃতময় পূর্ণপুরুষ; তোমার নাম-গানে পাপী তরিয়া যায়, তোমার সংস্পর্শে মৃত ব্যক্তিও সঞ্জীবিত হয়। হে সর্ব্ব-শক্তিমান, আমাদের এমন শক্তি দাও, যেন তোমার নামগানে কখনও অবহেলা ও আলস্য না আসে। প্রভু, ভগবান, তুমি আমাদের চিরসঙ্গী হইয়া থাক। প্রতি বৎসর, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতিক্ষণে তোমারই নাম লইয়া যেন তোমার সহবাসজনিত সুখ অনুভব করি। হে নাথ, তোমার সেই আনন্দময় অমৃতনিকেতনের পথ যেন পরিত্যাগ না করি, এই আশীর্ব্বাদ দাও। তোম- চরণে আমাদের ভক্তিপুষ্প উপহার দিতে- -পর্ণ প্রণাম গ্রহণ ক-

শান্তি-

নববর্ষ।

দেবগিরি—ঝাঁপতাল।

নববর্ষ ফিরে এল অভিনব সাজে
আজিকে হৃদয় তন্ত্রী নব সুরে বাজে
কত লোক যায় আসে কত শোকানন্দে
পুরাতন যায় চলে রেখে যায় গন্ধে
তিমির রজনী যায় ছায়া তার ফেলে
আজি তব নামে সকলে নয়ন মেলে।

সুর, কথা ও স্বরলিপি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

```
    ২         ৩           ০        ১          ২         ৩
II { পা মা । গা -া রা । ন্‌া রা । সা -া সা I ন্‌া সা । রা -া গা ।
     ন  ব    ব  ০  র্ষ    ফি  রে    এ  ০  ল    অ  ভি    ন  ০  ব

  ০         ১          ২         ৩           ০         ১          ২
। রা -পা । মা -গা I গা গা । পা -া ধা । না র্সা । পা -া পা I মা পা ।
  সা  ০     জে  ০     আ  জি    কে  ০  হৃ    দ  য়    ত  ০  ন্ত্রী   ন  ব

  ৩          ০            ১
। গা -া সা । রগা -মপা । মা -গা -া } II
  সু  ০  রে    বা০  ০০     জে  ০  ০

    ২          ৩           ০             ১            ২          ৩
II { পা গা । পা -া ধা । পধা -নর্সা । র্সা র্সা -া । র্সা র্সা । না ধা -না ।
     ক  ত    লো  ০  ক    যায়  ০০     আ  সে  ০     ক  ত    শো  কা  ০

  ০             ১                   ২          ৩           ০          ১
। পধা -নর্সা । ধা -পা -া } I { র্সা না । ধা -া না । পধা না । পা -া পা I
  ন০  ০০       ন্দে  ০  ০       পু  রা    ত  ০  ন    যায়  ০    চ  ০  লে

  ২          ৩             ০           ১                ২          ৩
I মা পা । গা -া -সা । ন্‌সা -রগা । রা -া -া } II { সা সা । মা -গা মা ।
  রে  খে    যায়  ০  ০    গ০  ০০     ন্ধে  ০  ০       তি  মি    র  ০  র

  ০         ১            ২            ৩           ০         ১
। পা গা । পা -া -া I ধনা র্সরা । র্সা -া পা । গা সা । রা -া -া } I
  জ  নী    যায়  ০  ০    ছা০  ০০     য়া  ০  তার   ফে  ০    লে  ০  ০

  ২         ৩           ০        ১          ২         ৩
I পা -া I গা -া মা । পা -া । ধা -া পা I মা পা । গা -া সা ।
  আ  ০    জি  ০  ত    ব  ০    না  ০  মে    স  ক    লে  ০  ন

  ০        ১
। রা -া । গা -া রা } II II
  য়ন  ০    মে  ০  লে
```

উদ্বোধন।

জর্ম্মনির শ্রেষ্ঠতম কবি মৃত্যুকালেও "আলো—আরও আলো" বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের জ্ঞানালোক পাইবার গভীর পিপাসা প্রকাশ করে গেছেন। এই জ্ঞানপিপাসা প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু আমরা সংসারের সুখ, ভোগবিলাস কিছু বেশী ভালবাসি, তাই স্বার্থ, কুসংস্কার প্রভৃতি রকম-বেরকমের পাষাণ-পাথর দিয়ে হৃদয়ের কবাট বন্ধ করে রেখেছি—হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে ভয় পাই, পাছে সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু হায়! আমরা জানিনে যে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিতে পারলে সুখের মাত্রা কত গুণ বেড়ে যাবে। আমরা তো প্রত্যেকেই মায়ের ছেলে বটে। সকালবেলা প্রথমেই যদি মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখি, তাঁর পায়ে প্রণাম করে যদি কাজ করতে আরম্ভ করি, তাহলে প্রাণের ভিতর কি আনন্দ আসে, কি অনুপম সুখ হয়। আমরা সংসারের নানারকম প্রলোভনে ডুবে গিয়ে ভুলে গেছি যে আমাদের জননী হৃদয়-কবাটের বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বার্থের মোহে হৃদয়ের অন্ধকারকে ভালবেসে বাহিরে জননীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি! খোলো—খোলো—সরিয়ে ফেল পাথরের বাধা—জননীকে ভিতরে আসতে দাও, তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে ধন্য কর। তাঁর মুখের জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যাক। প্রভাতে পাখীদের গানের মতো হৃদয় থেকে নতুন নতুন গান উঠতে থাকুক। এমন গান উঠুক যে, সেই গান গেয়ে তোমারও যেমন তৃপ্তি হবে, সেই গান শুনে অন্যদেরও তেমনি প্রাণমন ভরে উঠবে। পাষাণের বাঁধ সরিয়ে ফেলে মায়ের চরণে মা—মা—বলে আছড়িয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমাদের মা যে করুণার ধারা—ক্ষমা চাহিলেই ক্ষমা পাবে—আর তাঁর সেই অরূপ রূপের জ্যোতিতে প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে মঙ্গলের পথে চালিয়ে দাও।—এই উপাসনাক্ষেত্র জননীর অধিষ্ঠান। এখানে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে নাও—না দেখে গৃহে শূন্যহস্তে ফিরে যেও না—ফিরে যেও না। এসো, প্রাণ খুলে মন খুলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হয়ে জননীর পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ঈশ্বরকে না জানার ফল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বরকে জানলে অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন জেনে তাঁর মঙ্গলভাবের উপর নির্ভর করে থাকলে কি রকম নির্ভয় হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়, সে কথা আমি গেল বারে বলে' এসেছি। এবারে ঈশ্বরকে না জানার ফল কি, সেই বিষয়ে দু'চার কথা বলতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বরকে না জানার মানে এই যে, ঈশ্বর আছেন বলে' বিশ্বাস না করা অথবা আছেন কিনা সন্দেহ করা। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস থাকবে না, তার আত্মা আছে বলেও বিশ্বাস থাকতে পারে না, কাজেই পরলোক আছে বলেও তারা বিশ্বাস করতে পারে না। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, এই রকম এ-নেই, ও-নেই বলবার জন্য, নেই নেই স্পষ্ট করে না বল্লেও থাকা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের জন্যও, সংক্ষেপে এই মতকে নাস্তিকমত বলে। যারা এই মত ধরে' থাকে, তাদের নাস্তিক বলে।

একজন নাস্তিকের বিষয় বেশ ভেবে দেখা যাক। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আত্মাতে বিশ্বাস করে না, পরলোকে বিশ্বাস করে না। ভেবে দেখ, সে বেচারী নির্ভর করে কার উপর? তার মতো কি দুর্ভাগ্য আর কেউ আছে? এ রকম লোকের বিষয় ভাবলেতো আমার খুবই কষ্ট হয়, দুঃখে চোখে জল আসে। তার কাছে এই প্রকৃতির শক্তিগুলো অন্ধ শক্তি—দয়ামায়াহীন হয়ে তাকে যেন ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত। এই বিশাল বিরাট প্রকৃতির কাছে সে কতটুকুই বা মানুষ! সে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? আর লড়াই করে জিততে পারে না বলেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। সকলেই দেখেছে যে সমুদ্র বল, পুকুর বল, জলাশয় মাত্রেই মধ্যে মধ্যে ফেনার মতো বুদবুদ ওঠে, আবার এক আধ মিনিট থেকে আপনিই সেগুলি ফেটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য এই সব বুদবুদ আসবারও কারণ আছে, যাবারও কারণ আছে। কিন্তু সচরাচর লোকেরা সে কারণের কথা ভাবে না। লোকেরা ভাবে যে বুদবুদগুলো অমনি এসেছিল, আর অমনি চলে গেল। সেই রকম নাস্তি-

কেরাও মনে করে যে, কতকগুলো অন্ধশক্তির বলে সে এই সংসারে এসে পড়েছে, সজ্ঞান জীবের আকারে দুচারদিন সংসারে খেলা করবে, আবার কিছুদিন পরে সেই সব অন্ধশক্তির বলেই মৃত্যুর কবলে পড়বে। এই যে সংসারে জীবনমৃত্যুর লড়াই চলছে, দিনরাত মারামারি কাটাকাটি চলছে, মানুষ যে তার ভিতর কেন এল, কোত্থেকে এল, কে তাকে পাঠালে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। সত্যি সত্যি কেমন করে' যে সে জন্মগ্রহণ করে' জীবনীশক্তি পেয়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ শক্তি ভিতরে থেকে সেই জীবনীশক্তিকে ঠিকঠাক রেখে তাকে বাড়বার পথে চালিয়ে বেড়াচ্ছে, সে কথা নাস্তিক বলতে পারে না। নাস্তিক এ কথা বলতে পারে না যে দুদিন পরে সে কোথায় বা যাবে—মরে' গেলেই কি শেষ হয়ে গেল, না অন্য কোন ভাল লোকে গিয়ে ভাল ভাব নিয়ে নতুন জীবন লাভ করবে? ভেবে দেখ, তার প্রাণের ভিতরে কত বড় একটা অন্ধকার চেপে বসে' আছে। সে যে বেঁচে আছে, সুখে আছে, সেইটাই তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়—সমস্যার বিষয়। তার ভিতরে যে জ্ঞান, যে ভালবাসা, যে ভক্তি এসে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই সব জ্ঞান, প্রীতিভক্তি কোথা থেকে এল, কি উদ্দেশ্য নিয়েই বা তারা এল, এ সমস্ত প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর সে দিতে পারে না। যা কিছু সে দেখে শোনে, সে সমস্তেরই ভিতর সে কেবল মৃত্যুরই ছায়া দেখে; সংসারের প্রেমভক্তিজ্ঞান, এ সমস্ত যে জীবনকে সজীব করবার জন্য, উন্নত করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা সে মনে করতে পারে না, কেননা তার কাছে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য বা ফল মৃত্যুর বাহিরে আর কিছুই নয়। এই রকম ভাবতে ভাবতে ধর্ম্মজ্ঞান বল্লে আমরা যা বুঝি, সেটা আর নাস্তিকের মনে ঠাঁই পায় না। তার কাছে যখন এই শরীর, এই সংসার কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র, মৃত্যুর পর যখন তার মতে কোন কিছুই থাকে না, তখন ধর্ম্মজ্ঞানের ভিত্তি, ন্যায় অন্যায়ের ভাবগুলোও তার কাছে যে কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র। তখন সেই ভুয়ো জিনিস—ন্যায়ের স্বত্ব বজায় রাখবার জন্য সে দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি হতে পারে না—একটা স্বপ্নকে বজায় রাখবার জন্য তার কি এত মাথাব্যথা পড়ে' গেল?

নাস্তিক বল আর সংশয়বাদী বল, সে যদি ঠিক নিজের যুক্তির উপর মতের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তাহলে তার সুখশান্তি থাকতে পারে না। তার আত্মীয়স্বজন রোগশয্যায় পড়ে' যন্ত্রণায় ছট-ফট করতে থাকলে একজন আস্তিকের মতো ভগবানের হাতে সমস্ত সঁপে দিয়ে শান্তিলাভ করতে পারে না। ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও তার আত্মীয় যে ভগবানের ভালবাসা হারাতে পারে না, এ কথা সে বুঝতেই পারে না, কাজেই আস্তিকের মতো সে নির্ভয় হতে পারে না, আর উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে বাস করে। তার মনের উপর অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার বড় বড় পাথর চাপানো থাকে: সে পাথর ভেদ করে' তার হৃদয়ে শান্তি সান্ত্বনার কথা ঢুকিয়ে দেওয়া বড় শক্ত।

ভগবানের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, নাস্তিক লোক মানুষের উপরেই কি এতটুকু নির্ভর করতে পারে? কি করে' নির্ভর করবে? তার কাছে মানুষ বলে' তো সত্যি সত্যি কোন কিছু নেই। মানুষ—এ সমস্তই তো তার কাছে আসলে জড় পদার্থ—শূন্য পদার্থ। যার জন্য মানুষ মানুষ, সেইটাই নাস্তিক স্বীকার করবে না। জড়পদার্থ কিম্বা ফাঁকা জিনিসের উপর কেউ কথনও নির্ভর করতে পারে না, আর নির্ভর করলেও সে নির্ভর বেশী দিন দাঁড়াতে পারে না। নাস্তিক বা সংশয়-বাদী বলেন কি না যে, মানুষের আত্মা নেই, আর থাকলেও তা জানা যায় না—মানুষ কেবল চোখ কান হাত পা এই সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে যে অনুভব পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অনুভবের সমষ্টি বা একত্র জড়ো করা বা সংগ্রহ করা মাত্র। কাজেই যে নাস্তিক নিজের যুক্তির ঠিক ভিতরকার কথা তলিয়ে দেখবে, সে ঐ ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সংগ্রহের উপর নির্ভর পুরো বজায় রাখতে পারে না। শোকের অবস্থায় সে কারো কাছে সহানুভূতি আশা করতে পারে না; মনের ভালবাসা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারে না—জড় ইন্দ্রিয় তো প্রেমের সহানুভূতির আদান-প্রদান করতে পারে না। নাস্তিক স্ত্রীপুত্রের ভালবাসা বল, বাপমায়ের স্নেহ-প্রেমই

বল, কিছুই মনের সঙ্গে নিতে পারে না—তার মতে স্ত্রীপুত্র-বাপমা সবই যে বলতে গেলে জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভব মাত্র। সচেতন মানুষ অচেতন জড় বস্তুর কাছে কোন কিছুরই আদানপ্রদান করতেও পারে না, করবার প্রত্যাশাও রাখতে পারে না।

নাস্তিক মতটা ঠিকভাবে ধরলে মানুষের যে শান্তি থাকতে পারে না, নাস্তিকের জীবন যে অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, একথা আমাদের দেশের লোক তো ছেলে বুড়ো সকলেই জানে, আর সকলেই স্বীকার করে। মহাভারতের কথা কে না জানে? সেই মহাভারতের ভিতর ভগবদগীতা নামে এক বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশ ঢোকানো আছে। সেই গীতাতে অল্পকথায় নাস্তিকের দুর্দ্দশার কথা খুব স্পষ্টভাষায় বলা আছে—"মূর্খ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কিছুমাত্র সুখ নাই। * নাস্তিক মতটা এ যুগে আমাদের দেশের চেয়ে বিলাতেই বেশী প্রচার হয়েছিল। বিলাতে ডেবিড হিউম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত আমরা যাকে সচরাচর নাস্তিক মত বলে' বুঝি, সেইমত প্রচার করবার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনিও নাস্তিক মতের পরিণাম বিচার করে' শেষকালে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে বল্লেন—"মানুষের বুদ্ধির অমিল আর অসম্পূর্ণতার বিষয়ে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমি যুক্তি, বিশ্বাস কোন কিছুই মানতে চাইনে, সবই ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আমি কোথায় আছি—কে-ই বা আমি? আমি কি করে'ই বা এলুম, আর আমার শেষই বা কি হবে? কারই বা দয়া চাইব, আর কারই বা শাস্তি ভয় করব? কারাই বা আমাকে ঘিরে আছে? কার উপরেই বা আমার আর আমার উপরেই বা কার প্রভাব পড়ছে? এই সব প্রশ্নে আমি আকুল হয়ে পড়ছি; আমার বোধ হচ্ছে যেন অন্ধকার আমাকে গিলে ফেলতে আসছে; আমার হাত পা যেন শিথিল হয়ে আসছে।" † নাস্তিক মত ঠিক ধরতে গেলে কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়তে হয়, তা উপরের কথা থেকে কেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এখন বেশ ভাল করে' বোঝা যাচ্ছে যে, নাস্তিক যদি বলে যে, মানুষ মাত্রই আত্মাহীন কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি তাহলে সে নিজেও একজন আত্মাহীন ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি হয়ে পড়ে। হাত-পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো তো সব জড় পদার্থ। হাত-পাগুলো কেটে ফেলে দিলে তারা কিছুই জানতে পারে না। সে গুলোর অনুভবগুলোও কাজেই জড়পদার্থেরই অনুভব। এই রকম তর্কের ফলে দাঁড়ায় এই যে, জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবগুলো আছে, কিন্তু সেই অনুভবগুলো জানবার বোঝবার লোক কেউ নেই। অনুভব আছে, অনুভব বোঝবার লোক নেই—একথা শুনে তোমরা খুব হাসবে—হাসবারই যে কথা। এখন অনুভব করবার লোক থাক আর নাই থাক, নাস্তিকদের যুক্তি ঠিক বলে' ধরলে আর কিছু হোক আর নাই হোক, পৃথিবীতে ভাল বলে' সাধু বলে' যা কিছু আছে, সবেরই গোড়া কেটে দেওয়া হয়; কর্ত্তব্য বলে' কোন কিছু থাকতে পারে না, ভক্তিপ্রীতি কথার কথা হয়ে' পড়ে, ভাল কাজের উপর ঝোঁক চলে' যায়।

কোন্ মত ধরে' চল্লে মানুষের ভাল হয়, সেইটাকে মাপদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লা করলে, না বলে' উপায় নেই যে, আস্তিক ও নাস্তিক মতের প্রভেদ—আলো ও অন্ধকারে প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ। দেখা যায় বটে যে, অনেক আস্তিক লোক অর্থাৎ যারা বলে যে তারা ঈশ্বরে, আত্মাতে ও পরলোকে বিশ্বাস করে এমন অনেক লোক অসৎ কাজে অন্যায় কাজে ডুবে আছে; আবার অনেক নাস্তিক লোক আস্তিকের উপযুক্ত ভাল কাজ থেকে একটুও নড়েচড়ে নি। এ সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে এই যে, ঐ আস্তিক লোক মুখে বলে বটে যে সে ঈশ্বর প্রভৃতিতে খুব বিশ্বাস করে, কিন্তু তার কাজেই পরিচয় পাওয়া যায় সে সে সত্যিসত্যি ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না। আর যে নাস্তিক ভাল কাজ করে, সে আসলে কাজেতে আস্তিকেরই পথ ধরে' চলেছে। ঠিক যে নাস্তিক, তার তো কোন কাজই থাকতে পারে না,

---

* অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গী. ৪. ৪৪

† Treatise on Human Nature Book I, Part IV, Sect. 7.

কেন না, সে তো কতকগুলো জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমষ্টি বা সংগ্রহ মাত্র; কাজেই সে নিজে কোন কাজেরই কর্ত্তা হতে পারে না। আর, যদি বা সে কর্ত্তা হতে পারে বলে স্বীকার করাও যায়, তবুও তার পক্ষে উচুদরের ভাল নিঃস্বার্থপর কাজ করা সম্ভব নয়—এর একটু আভাস আগেই দিয়ে এসেছি। জড়বস্তু ছাড়া যখন কেউ কিছু নয়, তখন সেই জড়বস্তুর জন্য সে নিজের স্বার্থ ছাড়তে যাবে কেন? সে কেন সেই সব জড়বস্তুর ক্ষতি করে'ও নিজের ভোগবিলাস সাধন করবে না? নাস্তিকদের যুক্তির ফলে এই রকম সর্ব্বনাশকর মতে এসে পড়তে হয় বলে' অজ্ঞেয়বাদীদের একজন নেতা বলেছেন যে 'আস্তিক মত ভুল হলেও সেই অনুসারে কাজ করলে জগতের ভালই হয়'। *

এতক্ষণে এটা বোধ হয় বোঝা গেল যে, আস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে ভালই হয়, আর নাস্তিক মত ধরে' কাজকর্ম্ম করলে খারাপই হওয়া সম্ভব। এও দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন এক ভাবে ঈশ্বরে, আত্মাতে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। নাস্তিক লোক জগতে ক'টা? নাস্তিকের সংখ্যা হয়তো আঙ্গুলে গোনা যেতে পারে। এখন, নিজের যদি ভাল চাও, পরিবারের যদি ভাল চাও, সমাজের, দেশের যদি ভাল চাও, তবে এসো, আমরা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, যে নাস্তিক মতের এমন ভয়ানক কুফল, সেই মতের প্রভাব থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করুন, তাঁর প্রেমের বর্ম্ম দিয়ে আমাদের সর্ব্বদা ঢেকে রাখুন।

গান।

(রাগিণী—কাফি-সিন্ধু)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ওগো তোমায় বিনা কাটবে যেদিন
ব্যর্থ সেদিন জানি
তোমার সনেই যোগে আমার
পূর্ণ জীবনখানি!

যেদিন আমি মোহের ঘোরে
আঁধার ঘরে রইবো পড়ে
রাখবো তোমায় দূরে দূরে
এসো বজ্র হানি!
তোমায় বিনা গেহ আমার
দগ্ধ মরু শূন্য আঁধার
সেই আঁধারে কেমন করে
রইবো বল প্রিয় আমার!
তাইতো সকল পরাণ আমার
থুয়েছি ঐ পায়ে তোমার
বেদন-কাঁদন নীরবে সহি
পরাণ-প্রিয় মানি!!

* At least this is a good working hypothesis—J. S. Mill,

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, সাংখ্যমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞানানুসারে আত্মা অমর ও অবিনাশী হওয়ায় "ভীষ্মদ্রোণাদিকে আমি বধ করিব" তোমার এই ধারণাটাই মিথ্যা। কারণ, আত্মা মরে না, মারেও না। মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্ত্র বদলায় সেইরূপ আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র; কিন্তু সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে। ভাল; "আমি বধ করিব" এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধ কেন করিব এইরূপ যদি বলো, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রত প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত না হওয়াই ক্ষাত্রধর্ম্ম; এবং যখন এই সাংখ্যমার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ? 'আমি মারিব', 'সে মরিবে' এই নিছক কর্ম্মদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধর্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে তুমি আপন প্রবাহপতিত কার্য্য কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গানুসারে এই উপদেশ হইল। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় থাকিয়া যায় যে, উপস্থিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ না করিয়া একেবারে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কি ভালো নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়া তাহার পর বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে এইরূপ মন্বাদি স্মৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, যখনই হউক সন্ন্যাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা হইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই উপনিষদেও "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" এইরূপ বচন আছে (জা. ৪)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় সেই গতিই প্রাপ্ত হয়।

> দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
> পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

"হে পুরুষব্যাঘ্র! সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে দুইজন গমন করেন; এক যোগযুক্ত সন্ন্যাসী, আর এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হইয়া মরে", এইরূপ মহাভারতে (উদ্যো. ৩২. ৬৫) উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থাৎ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও এই অর্থের এক শ্লোক আছে—

> যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি।
> ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ॥

"স্বর্গেচ্ছু ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও ছাড়াইয়া যায়";—অর্থাৎ শুধু তপস্বী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগযজ্ঞদীক্ষিতেরাও যে গতি প্রাপ্ত হয়, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতি লাভ করে, (কৌটি. ১০. ৩. ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং ৯৮-১০০ দেখ)। যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্‌ঘাটিত হয়; যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে পৃথিবীর রাজ্য পাওয়া যায়" (২.৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য্যই এই। অতএব, সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা যুদ্ধ কর, ফল একই; ইহাও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু যাই বল না কেন, যুদ্ধ করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পরে ভগবান্ কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগেরই—অর্থাৎ কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহার বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই কর্ম্মযোগতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব (গী. ২. ৪৯)। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ইহা স্থির করা শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্ব্বাচনকারী বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না। এই জন্য সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করা আবশ্যক, (গী. ২. ৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে, অনেক লোক স্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য সুখ লাভ করিবার জন্যই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য কর্ম্মের বৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি—আজ এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্ব্বদাই পরিবর্তনশীল ও চঞ্চল হইয়া থাকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই-সব লোকেরা, স্বর্গসুখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুখ লাভ করিতে পারে না। তাই, কর্ম্মযোগমার্গের রহস্য অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্ম্মের এই কাম্য উদ্যোগ ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে শিখো; কর্ম্ম করিবার অধিকার তোমার আছে; কর্ম্মের ফল পাওয়া কি না পাওয়া—ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নহে (২.৪৭); ফলদাতা পরমেশ্বর এইরূপ মনে করিয়া, কর্ম্মের ফল পাওয়া যাক্ কি না-যাক্ দুই সমান, এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের পাপ-পুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না; অতএব এই সমবুদ্ধিকেই আশ্রয় কর; এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ না লাগে এইরূপ কর্ম্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম্ম করিয়াও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে, মোক্ষের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসই করিতে হইবে এরূপ নহে;—ইত্যাদি (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়, (২. ৫৩), তখন অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন যে, "স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা আমাকে বলো"। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে এইরূপ বলিয়াছেন। সার কথা, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য "কর্ম্মত্যাগ" ও "কর্ম্মসাধন" (যোগ) এই দুই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে;

এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে ইহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ-মার্গানুসারে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই কর্ম্মযোগের স্বল্পাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যন্ত লইয়া চলিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাক্ পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগমার্গেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় সম করিলেই হইল; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কেন তবে বলিতেছ? ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে, "যুদ্ধ কেন করিবে? বুদ্ধিকে সম রাখিয়া উদাসীন হইয়া কেন বসিয়া থাকিবে না," এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় না। বুদ্ধিকে সম রাখিলাও কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারা যায় না এরূপ নহে। তারপর, সমবুদ্ধি পুরুষের সাংখ্যমার্গানুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান এক্ষণে এইরূপ দিতেছেন যে, পূর্ব্বে তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি সত্য; কিন্তু ইহাও মনে রেখো যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবে; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্মকে ছাড়িতে পারে না, তখন ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম্ম কর; কর্ম্ম না করিলে তোমার খাওয়া পর্য্যন্ত চলিবে না (৩.৩-৮) পরমেশ্বরই কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য নহে। ব্রহ্মদেব যখন জগৎ ও প্রজা সৃষ্টি করিলেন সেই সময়ে তিনি 'যজ্ঞে'রও সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কর্ম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য ও কর্ম্ম দুই-ই একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য যজ্ঞ করা, এই কারণে এই কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হইয়াছে তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না; এবং লোকদিগের নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না যে, কর্ম্ম করিবে না। কারণ, কর্ম্ম হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না বলিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না করিলেও সেই কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা আবশ্যক (গী. ২. ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং আমিও করিতেছি। তাছাড়া ইহাও মনে রেখো যে, লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ নিজের আচরণের দ্বারা লোকদিগকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী পুরুষদিগের অন্যতম মুখ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউক না কেন, প্রকৃতির ব্যবহার তাহা হইতে অপসারিত হয় না; অতএব কর্ম্মত্যাগ করা ত দূরের কথা, কর্ত্তব্য বলিয়া স্বধর্ম্মানুসারে আবশ্যক হইলে কর্ম্ম করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর (৩. ৩০-৩৫); তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন দেখিয়া মনুষ্যের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অর্জ্জুন যখন এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি বিকার বলপূর্ব্বক মনকে ভ্রষ্ট করে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি সমতাপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না; অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিষ্কাম-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করিয়া "আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর" (৩.৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার, ভক্তিমার্গ বিষয়ক তত্ত্বেরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে।

তথাপি এই বিচার-আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নূতন রচিত—এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয়; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে এই কর্ম্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের ত্রেতাযুগবাহী পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আদিতে কিংবা যুগারম্ভে আমিই এই কর্ম্মযোগমার্গ বিবস্বানকে, বিবস্বান মনুকে

এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে ইহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঐ যোগই (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি এক্ষণে তোমাকে পুনর্ব্বার বলিলাম; তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে তুমি কি করিয়া আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়, সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্ম্মের স্থাপনা করাতেই আমার অনেক অবতারের প্রয়োজন; এবং এইরূপ এ লোক-সংগ্রহকারক কর্ম্ম আমি করিলেও আমার তাহাতে আসক্তি না থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ করে না। এইপ্রকারে কর্ম্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ত্ব জানিয়াই জনকাদিও পূর্ব্বে কর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়া তুমিও সেইরূপই কর্ম্ম কর, ভগবান অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার এইরূপ উপদেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, "যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না" তাহাই পুনর্ব্বার বলিয়া যজ্ঞের বিস্তৃত ব্যাপক ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হইয়াছে যে, কেবল তিল-তণ্ডুল দগ্ধ করা কিংবা পশু বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ সত্য, কিন্তু এই দ্রব্যময় যজ্ঞ হালকা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দগ্ধ করা কিংবা 'ন মম' বলিয়া, ব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দেওয়া উচ্চ পৈঠার যজ্ঞ, সে উচ্চদরের যজ্ঞের জন্য ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অর্জ্জুনকে এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। তাই, যজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে, তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ এই দুইই বন্ধন হয় না। শেষে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূত আপনাতে বা ভগবানে আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্ত্তায় অর্শে না। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের লয় হয়; কর্ম্ম স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং কর্ম্মযোগকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সার কথা, কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, তাহার কারণসমূহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথা বলিয়া তাহার পর, কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এইরূপ বারংবার বলায়, এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠমার্গ কোন্‌টি তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক। কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান বলিলে, ইহার মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে মিশ্রিতভাবে আমাকে না বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টী, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে যদি বলো, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার সুবিধা হয়"। ইহার উত্তরে ভগবান স্পষ্টরূপে ইহা বলিয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিলেন যে, দুই মার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষপ্রদ হইলেও, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেরই মহত্ত্ব অধিক—"কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"—(৫. ২)। এই সিদ্ধান্তেরই দ্রঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ আরও এইরূপ বলেন যে, সন্ন্যাস বা সাংখ্যনিষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাও যে লাভ হয় শুধু তাহা নহে; কর্ম্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গের কর্ম্ম করিয়াও ব্রহ্মলাভ না হইয়া যায় না। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি—যে, সাংখ্য ও যোগ ইহারা ভিন্ন? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আঘ্রাণ করা ইত্যাদি শত শত কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শান্তি ও মোক্ষলাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম কর এইরূপও বলেন না, আর কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতির খেলা; এবং বন্ধন মনের ধর্ম্ম এই কারণে সমবুদ্ধি কিংবা 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধা হয় না; অধিক কি, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী—ইহাদের সম্বন্ধে যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া আপনার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই—ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে, এইরূপ এই অধ্যায়ের শেষ কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়া চলিয়াছে; এবং এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক

সমবুদ্ধি প্রাপ্তির উপায়টি কথিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, সংসারের প্রাপ্য কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তাহার পর, ভগবান আত্মস্বাতন্ত্র্যের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে; তাহা না করিলে তাহার দোষ অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার পরে, এই অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, তাহার পাতঞ্জল দৃষ্টিতে, মুখ্যরূপে এই অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। তথাপি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেও কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না; সেই কারণে পরে সেই ব্যক্তির বৃত্তি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" কিংবা "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্ব্বভূতে সম হওয়া চাই, এইরূপ আত্মৈক্যজ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এই সাম্যবুদ্ধিরূপ যোগ এক জন্মে সাধ্য না হইলে পুনর্ব্বার অন্য জন্মেও একেবারে আরম্ভ হইতেই সুরু করিতে হইবে—এবং পুনর্ব্বার সেই দশাই হইবে—এবং এই প্রকার যদি চক্র ক্রমাগতই চলিতে থাকে, তবে এই মার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদ্‌গতি লাভ করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার থাকিয়া গিয়া, অন্য জন্মে তাহা অপেক্ষা অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শেষে সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ-সুসাধ্য হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশা না ছাড়িয়া) কর্ম্ম করা, তপশ্চর্য্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা—এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগমার্গের আচরণ কর।

তান্ত্রিক বর্ণপরিচয়।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

শাস্ত্রে বর্ণের উপাদান বাগ্দেবতার চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থাচতুষ্টয় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারিনামে অভিহিত হইয়াছে। কাদিমততন্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—প্রথমত আত্মার ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ আত্মপ্রণোদিত মনের আঘাতের দ্বারা মূলাধার চক্রে পরানামক উত্তম নাদ উৎপন্ন হয়। অনন্তর উহা বায়ুর দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে নীত হইয়া স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিজৃম্ভিত হয়, অর্থাৎ আত্মবিস্তার করে। এবং পশ্যন্তী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে মন্দ মন্দ গতিতে ঊর্দ্ধদিকে যাইয়া অনাহত চক্রে বুদ্ধি তত্ত্বের সহিত যুক্ত হয়। তখন উহা মধ্যমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তথা হইতে ঊর্দ্ধগতিতে কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে গমন করিয়া "বৈখরী" নামে অভিহিত হয়। অনন্তর কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথা হইতে ক্রমে স্থানের গুণনিবন্ধন কণ্ঠ্যাদি সংজ্ঞাযুক্ত অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণাবলীরূপে অভিব্যক্ত হয়। *

শরীরের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ মেরুদণ্ড অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সুষুম্না নামক নাড়ী অবস্থিত, তন্মধ্যে বজ্রানাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রিনী নাড়ী এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থান করিতেছে। গুহ্য দ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে কন্দমূল নামক স্থান। উহা মেরুদণ্ডের অধঃসীমা। কন্দ এবং সুষুম্না এতদুভয়ের সংযোগস্থলে চতুর্দ্দল মূলাধার চক্র বর্ত্তমান। লিঙ্গমূলের সমদেশে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান চক্র অবস্থিত। উহার ঊর্দ্ধে নাভিমূলের সমদেশে দশদল মণিপূর নামক চক্র অবস্থিত। তদূর্দ্ধে হৃদয়ে দ্বাদশ দল অনাহত চক্র, তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশে ষোড়শদল বিশুদ্ধ চক্র, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞা নামক চক্র অবস্থিত। প্রদর্শিত ছয়টি চক্রের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই চারিটি চক্রের সহিত বর্ণনিষ্পত্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ মূলাধার চক্র হইতে বর্ণপ্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতম ব্যাপার আরব্ধ হয়, অনন্তর সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত বায়ুর প্রেরণানুসারে ক্রমে প্রদর্শিত অবস্থাচতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, পরে মুখমধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণভাব ঘটিয়া থাকে। চক্রের বিস্তৃত বিবরণ ষট্‌চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

* স্বাত্মেচ্ছাশক্তিঘাতেন প্রাণবায়ুস্বরূপতঃ।
মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদ উত্তমঃ॥
সএব চোর্দ্ধতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠানবিজৃম্ভিতঃ।
পশ্যন্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি তথৈবোর্দ্ধং শনৈঃ শনৈঃ॥
অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্ব সমেতো মধ্যমাভিধঃ।
তথা তয়োর্দ্ধগতো বিশুদ্ধে কণ্ঠদেশতঃ॥
বৈখর্য্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠ-শীর্ষতাল্বোষ্ঠদন্তগঃ।
জিহ্বামূলাগ্রপৃষ্ঠস্থস্তথানাসাগ্রতঃ ক্রমাৎ॥
কণ্ঠতাল্বোষ্ঠকণ্ঠস্থঃ কণ্ঠোষ্ঠদ্বয়তস্তথা
সমুৎপন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাদাদিক্ষকাবধি॥
কালীচরণকৃত ষট্‌চক্রটীকা ২২ শ্লোক।

মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরির গ্রন্থেও বৈখরী প্রভৃতি সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতং" ১. ১৪৪। বাক্যপদীয়ের টীকাকার "পুণ্যরাজ" মহাভারতের প্রমাণের দ্বারা বৈখরী প্রভৃতির উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। বৈখরী অবস্থাই মানবদিগের ব্যবহারোপযোগী; অতএব বৈয়াকরণের গ্রন্থে প্রথমতঃ বৈখরীই পঠিত হইয়াছে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রয়োগকর্ত্তার অর্থাৎ যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার প্রাণবায়ুর ব্যাপার-নিবন্ধন বৈখরী বাক্ প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠপ্রভৃতি স্থানে বায়ু বিবৃত হইলে অর্থাৎ তত্তৎস্থানে আঘাত করিলে "বৈখরী" বর্ণরূপ ধারণ করে। কেবল বুদ্ধিকল্পিত বর্ণাকারের অনুপাতিনী বাক্ প্রাণবৃত্তিকে অর্থাৎ স্থানবিশেষে বায়ুর আঘাতকে অতিক্রম করিয়া (অপেক্ষা না করিয়া) মধ্যমা অবস্থায় প্রবৃত্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা পশ্যন্তী। এই অবস্থায় কার্য্যকারণের বিভাগ অর্থাৎ উপাদান হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্রতা বিবেচিত হয় না, এবং পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেরও অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই আবার অন্তরে (মূলাধার চক্রে) স্বরূপজ্যোতীরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী পরারূপে অবিনশ্বরভাবে অবস্থান করে। উহা আগন্তুক মলের সহিত নিরন্তর মিশ্রিত হইয়াও চন্দ্রের অন্ত্যকলার ন্যায় অর্থাৎ অবিনশ্বর অমাকলার ন্যায় * অত্যন্ত অভিভূত হয় না। উহার স্বরূপ দৃষ্ট হইলে পুরুষের অধিকার নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। † ষোড়শকল পুরুষে অবস্থিত পরা বাক্ অমৃত কলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। *

পুণ্যরাজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাগ্‌দেবতা নিজের একচতুর্থাংশের দ্বারা মানবদিগের নিকট প্রত্যবভাসমান হন, অর্থাৎ একমাত্র বৈখরীই বর্ণাকারে অভিব্যক্ত হইয়া লোকব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে ("সৈষা ত্রয়ী বাক্ চৈতন্যগ্রন্থিবিবর্ত্তবদনাখ্যেয়পরিমাণা তুরীয়েণ ভাগেন মনুষ্যেষু প্রত্যবভাসতে")। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ আত্মা কোনও একটি বিষয় বুদ্ধিস্থ করিয়া তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে মনকে নিযুক্ত করে, অনন্তর মন কায়স্থিত অগ্নিকে আঘাত করে, আহত অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে, অগ্নিপরিচালিত বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণসময়ে মন্দ্র ধ্বনি উৎপাদন করে। অতএব প্রাণপ্রভৃতি

---

* চন্দ্রের ষোড়শ কলা; তন্মধ্যে পঞ্চদশ কলা ক্রিয়াশীল, ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে; এবং ইহাদের ক্রিয়া হইতেই প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অমানাম্নী ষোড়শকলা নিত্যা, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উহাই জগতের আধার শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

† "স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী বাক্ প্রয়োক্তৄণাং প্রাণবৃত্তি-নিবন্ধিনী॥
কেবলবুদ্ধ্যুপাদানক্রমরূপানুপাতিনী।
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে॥
অবিভাগাত্তু পশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ সৈষা বাগনপায়িনী॥
সৈষা সঙ্কীর্য্যমানাপি নিত্যমাগন্তুকৈর্ম্মলৈঃ
অন্ত্যা কলেব সোমস্য নাত্যন্তমভিভূয়তে
তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ত্ততে
পুরুষে ষোড়শকলে তামাহুরমৃতাং কলাং।
অশ্বমেধপর্ব্ব।

* ষোড়শকল পুরুষের বিবরণ ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, হে সৌম্য! পুরুষ ষোড়শকল (অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ মনে শক্তিসঞ্চার করে, অন্নসারোপচিতা মনের সেই শক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত, তাহাই পুরুষের কলা অর্থাৎ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মনেতে অবস্থিত ষোড়শভাগে বিভক্ত অন্নোপচিত শক্তিযুক্ত জীববিশিষ্ট পুরুষও ষোড়শকল বলিয়া কথিত হইয়াছে।) তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আহার করিওনা, কেবল জল পান কর, জল পান করিলে অনাহার নিবন্ধন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন এবং পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কি বলিব, তাহা আদেশ করুন। পিতা বলিলেন—তুমি ঋক্ যজু ও সাম বল। তখন শ্বেতকেতু বলিলেন পিতঃ! আমার কিছুই মনে পড়ে না। পিতা বলিলেন বাছা! যেমন প্রজ্জলিত বৃহদগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং অধিক দহন করিতে পারে না, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলার মধ্যে পঞ্চদশ কলা অনাহারে বিনষ্ট হইয়া একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট আছে; সুতরাং তদ্দ্বারা তুমি বেদ স্মরণ করিতে পারিতেছ না; অতএব আহার কর অনন্তর তিনি আহারান্তে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলে পিতা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাই বলিতে সমর্থ হইলেন। তখন পিতা পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে বিপুল অগ্নির খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট একটি অঙ্গার তৃণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে যেমন অনেক বস্তু দগ্ধ করিতে পারে, তেমনই তোমার একটিমাত্র অবশিষ্টকলা অন্নের দ্বারা উপচিত হওয়ায় এখন তদ্দ্বারা বেদ অনুভব করিতে পারিতেছ। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

বায়ুই শব্দের উৎপাদন করিয়া থাকে। যেহেতু পরিশ্রান্ত ব্যক্তি কোনও বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা করিলে সে বাহ্য বায়ু উদরস্থ করে, সেই বায়ু নাভি দেশে যাইয়া প্রাণাপানের গ্রন্থিস্থানে অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়। অনন্তর মনের সহিত মিলিত হয়, তৎপর মনোভিহত দেহস্থ অগ্নির দ্বারা আহত হইয়া দ্রুতগতিতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বেগের তারতম্যানুসারে মন্দ-মধ্যম-তীব্রভেদে ভিন্নধ্বনি উৎপাদন করিয়া মুখচ্ছিদ্রে উপস্থিত হইয়া নানা-জাতীয় শব্দ অভিব্যক্ত করে।

(অশ্বমেধপর্ব্ব ২য় অধ্যায় টীকা)

প্রপঞ্চসারেও মূলাধারসমুৎপন্ন পরা বাক্ হইতেই ক্রমে বর্ণাভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রাণীদিগের মুখমধ্যে বৈখরীর অবস্থান কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বর্ণগুলি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ঘট্টিত (আঘাত প্রাপ্ত) হইয়া মুখগহ্বরে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। * এই সম্বন্ধে প্রপঞ্চসারের টীকাকার সুগৃহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য আরও কিছু নিগূঢ় তত্ত্বের খবর দিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—জগতের মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তির আধারস্বরূপ চিদাত্মাই মূলাধার পদবাচ্য। সেই চিদাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও মলদ্বার ও লিঙ্গ এতদুভয়ের মধ্যস্থলে তাঁহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া সেই স্থানও মূলাধার নামে কথিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রথম আবির্ভূত হয় যে চিদাভাস মায়া-শক্তি, তাহা জগতের উদ্ভাবন করে; অতএব ভাবনামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই পরাখ্য অর্থাৎ পরানামক বাক্, উহা চৈতন্যাবভাসবিশিষ্টতা-নিবন্ধন প্রকাশিকা মায়াশক্তির নিষ্পন্দাবস্থা। পশ্যন্তী প্রভৃতি সম্পন্দাবস্থা। তাহাদের মধ্যে সামান্য স্পন্দস্বভাব শব্দের প্রকাশরূপিণী অর্থাৎ প্রকাশকারিণী বিন্দুতত্ত্বাত্মিকা অর্থাৎ ওঁকার ঘটক বিন্দুর পরিণাম বৈখরী অবস্থা। উহা দেহাভ্যন্তরে মূলাধার চক্র হইতে ক্রমে কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে অভি-ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা বাকের সামান্যাবস্থা। এই সামান্য শব্দ হইতেই বিশেষ শব্দের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পবন কর্ত্তৃক শব্দের প্রেরণা কথিত হইয়াছে; পবনশব্দে সমস্ত প্রেরকবর্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত মন অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী, এই পঞ্চপদী অর্থাৎ পঞ্চাবস্থাপন্ন বাকের অভিপ্রায়ে মূলাধার হইতে উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই মতে সূক্ষ্মা এবং পরা দুইটি অবস্থা। ইহা দ্বারা সপ্তপদী বাক্ অর্থাৎ বাক্‌নিষ্পত্তির সাতটি অবস্থাও সূচিত হইয়াছে। এই সপ্তাবস্থা গণনায় প্রথমাবস্থা শূন্যা, দ্বিতীয় সংবিৎ, তৃতীয় সূক্ষ্মা, চতুর্থ পরা, পঞ্চম পশ্যন্তী, ষষ্ঠ মধ্যমা, সপ্তম বৈখরী। তন্মধ্যে অনুৎপন্ন নিষ্পন্দাবস্থা শূন্যা, উৎপত্তির ইচ্ছাযুক্তাবস্থা সংবিৎ, উৎপত্ত্যবস্থা সূক্ষ্মা। অন্যান্য অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। *

ব্যাকরণশাস্ত্রে বর্ণের যে উদাত্তাদি স্বরবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ণাভিব্যঞ্জক বায়ুর গতি-বিশেষই তাহার কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে। যথা—বায়ু উর্দ্ধগতির তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগে গত হইয়া "উদাত্ত" স্বর উৎপাদন করে। নীচভাগে গত হইয়া "অনুদাত্ত" স্বর এবং বক্রগতির দ্বারা "স্বরিত" স্বর অর্থাৎ উদাত্তানুদাত্ত মিশ্রস্বর উৎপাদন করে। † সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণসম্বন্ধে যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বেরই আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

---

* মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবন-প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥ ২।৪৩
সমীরিতাঃ সমীরেণ সুষুম্নারন্ধ্র নির্গতাঃ
ব্যক্তিং প্রয়ান্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানঘট্টিতাঃ ॥ ৩।৫৭।

* মূলং জগন্মূলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তিঃ; তস্যা আধারভূতশ্চিদাত্মা মূলাধারঃ সর্ব্বগতস্যাপি তস্যাভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ গুদমেঢ্রমধ্যোঽপি মূলাধারঃ, তস্মাৎ প্রথমমুদিতশ্চৈতন্যাভাসঃ ভাবশ্চ যঃ জগদ্ভাবয়তীতি মায়াশক্তিভাবঃ। স পরাখ্যশ্চৈব তদবভাসবিশিষ্টতয়া প্রকাশিকা মায়া নিষ্পন্দা পরা বাগিত্যর্থঃ। সম্পন্দাবস্থাঃ পশ্যন্ত্যাদ্যাঃ তত্র সামান্যস্পন্দপ্রকাশরূপিণীং বিন্দুতত্ত্বাত্মিকামধ্যাত্মমূলাধারাদিকণ্ঠান্তমভিব্যজ্যমানাং শব্দসামান্যাত্মিকাং বৈখরীমাহ বক্ত্রইতি .... সামান্যশব্দাদ্ বিশেষশব্দনিষ্পত্তিমাহ তস্মাদিতি। তস্মাদ্ বৈখর্য্যাত্মকভাবাদিত্যর্থঃ। পবনশব্দেন প্রেরকবর্গঃ সর্ব্বোঽপ্যুক্তঃ। অথবা সূক্ষ্মা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি পঞ্চপদীং বাচমভিপ্রেত্যাহ মূলাধারাদিতি। সপ্তপদ্যপি বাগনেনৈব সূচিতা। শূন্য-সংবিৎ সূক্ষ্মাদীনি সপ্তপদানি। তত্রানুৎপন্না নিষ্পন্দা শূন্যা বাক্। উৎপিৎসুঃ সংবিৎ। উৎপন্নাবস্থা সূক্ষ্মা। মূলাধারাৎ প্রথম মুদিতেতি বিভাগঃ ॥

† উচ্চৈরুদ্ধমার্গগো বায়ুরুদাত্তং কুরুতে স্বরং
নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ ॥
(প্রপঞ্চসার। ৩।৬।)

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল—প্রভাত।

সেবা। ভাই, এবার আমাদের কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে। আজ দীনের সহায় ধর্ম্মের প্রতিনিধি, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা আমাদের গুরুদেব, ধনদাস রায়ের ষড়যন্ত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

১ম। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। ধনদাস রায়কে উচিত শিক্ষা দিব।

সেবা। আমাদের কাজ সেরূপ নয়। আমরা ক্রোধ করব না। প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাবে না। মনে কর দাদাঠাকুরের আদেশ। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু জগতের কল্যাণ। আমরা হাইকোর্টে আপীল করব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও। ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিনিধি বৃটিশ রাজ্যে কথনো নির্দ্দোষ ব্যক্তির সাজা হয় না।

২য়। আমরা অর্থ কোথায় পাব?

সেবা। সে জন্য চিন্তা নাই। এ গ্রামের অনেকেই দাদাঠাকুরের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'তে আজ আর কুণ্ঠিত নয়। যে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন মাত্র ভিক্ষা করে' আনে, সেও তার আধমুষ্টি দিয়ে দাদাঠাকুরের সাহায্য করবে। কোনো চিন্তা নাই, শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে আনতে পারব। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কর। দাদাঠাকুর উপস্থিত না থাকায় যেন তাঁর কার্য্যের কোনো ব্যাঘাত না হয়। কেবল মুখে দাদাঠাকুরের উপর ভক্তি করলে হবে না। তাঁর উপদিষ্ট কার্য্য কর, তবেই প্রকৃত ভক্তি দেখানো হবে।

সকলে। আমরা অবশ্য তাঁর কাজ করব।

সেবা। বল সকলে জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। তবে যাও ভাই, মনে রেখো আমাদের প্রচারের বিষয়, সার্ব্বভৌমিক প্রেম করুণা মৈত্রী। উদ্দেশ্য বিশ্বের কল্যাণ। যাও, তোমাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ, মাথার উপরে ভগবান। যাও সেবকগণ, অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বল আবার জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ। (সকলের প্রস্থান)

সেবা। কি মহাব্রত, তুমি যে গেলে না?

মহা। আমি আর এখানে থাকব না।

সেবা। কেন?

মহা। থেকে কি হবে?

সেবা। চাও কি?

মহা। চাই ধর্ম্মার্জ্জন।

সেবা। তার পক্ষে এ উত্তম স্থান।

মহা। আমার বিশ্বাস—না।

সেবা। কেন?

মহা। এও কি একটা আশ্রম? আর এ রকম কথনো গুরু হয়!

সেবা। কেন হবে না?

মহা। প্রথমতঃ দ্যাখো, এখানে একখানি ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত নেই।

সেবা। গুরুদেব বলেন, ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, একখানি ঠাকুরঘর করে নিতে পারো। তাতে তো তাঁর কোনো নিষেধ নেই। গুরুদেব বলেন সকলের জন্যে সমান ব্যবস্থা নয়। তিনি সব ধর্ম্মেরই সার সত্য মানেন।

মহা। আরো দ্যাখো, উনি ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। আমরা বামুনের ছেলে, কায়স্থ কি কখন গুরু হোতে পারে?

সেবা। কেবল কি যজ্ঞোপবীত না থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় না? যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহা। ওঁর স্ত্রী আছে। উনি সংসারী মানুষ।

সেবা। গৃহত্যাগী হয়ে ভস্ম মাখলেই বুঝি খুব ধার্ম্মিক হয় তোমার বিশ্বাস? দ্যাখো উনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। গুরুদেব আদর্শ-গৃহস্থ।

মহা। কথনো দেখলাম না মালা জপ করতে, একটা আসন করতে, সন্ধ্যাপূজাও তো করে না। এ আবার কেমন ধর্ম্ম?

সেবা। ওঁর ভিতরে সাধনভজন যে সব সহজ হয়ে গেছে। বাইরে তাঁকে নানা কাজ করতে দেখছো, কিন্তু জেনো ভিতরে তাঁর সাধন চলছে।

মহা। উনি অনেক সময়ে ক্রোধ করেন।

সেবা। সেটা ক্রোধ নয়, তেজ। ক্রোধও যা তেজও তা। একটার গতি ঊর্দ্ধদিকে, আর একটার গতি নিম্নদিকে। গুরুদেব যে ভীম-কান্ত-গুণশালী।

মহা। আচ্ছা লোকটা যে একটু পাগলাটে ধরনের ভাই, সেটা অস্বীকার করবার যো নেই। আমার যেন ওটা একটু কেমন কেমন লাগে।

সেবা। তা বুঝেছি; প্রদীপের তলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আঁধার। আমরা বড়ই হতভাগ্য, কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে পারলুম না। মহাব্রত, এই আকাশের দিকে চাও দেখি, কি দেখছ?

মহা। দেখছি, বেশ উজ্জল, সূর্য্যালোকিত আকাশ।

সেবা। আর কি দেখছো?

মহা। বিরাট মহিমাময়, প্রশান্ত।

সেবা। আচ্ছা, এই আকাশে যখন ঝড় উঠে তখন দেখেছো? যখন এর মাঝে কৃষ্ণমেঘমালা দৈত্যসৈন্যের মত গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে তখন দেখেছো?

মহা। দেখেছি।

সেবা। তবে জেনে রাখো, গুরুদেবের চরিত্রও এই আকাশেরি মত। এতে গর্জ্জন আছে, বর্ষণ আছে, আবার প্রশান্ত ভাব আছে।

মহা। এ এক রহস্য!

সেবা। হাঁ রহস্যই বটে। এ বোঝা বড়ই কঠিন। লোকশ্রেষ্ঠগণের চরিত্র বোঝা সহজ নয়। এ চিনির পাহাড়ের মত; পিপ্‌ড়ে একটু খুঁটে নিয়ে মনে করে খুব নিয়েছি। দাদাঠাকুরকে অত অল্পে বোঝা যায় না। আমি দেখেছি যখন তিনি কোনো অনুতাপী ব্যথিতকে সান্ত্বনা দান করেন, তখন তাঁর আকৃতি সরল শান্ত। যখন ভগবৎকথা বলেন তখন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। যখন কারেও শাসন করেন তখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজোময় খরতর মূর্ত্তি। আর যখন ছেলেদের সঙ্গে মেশেন, তখন তাঁকে যেমন দেখি, এমন আর কোনো সময়ে দেখি না। সে ভাব কি যে মধুর, তা বল্‌তে পারি না; কেবল অনুভব করতে পারি। তখন তিনি আধা পাগল, আধা বালক। আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মহা। আচ্ছা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সেবা। সর্ব্বজীবের কল্যাণ, অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপ্রচার, আদর্শ-গৃহস্থ-চরিত্র প্রদর্শন।

মহা। এখন বুঝলাম। একখানি মেঘ কেটে গেল।

সেবা। চল এখন, অনেক কাজ আছে।

মহা। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ধনদাস রায়ের বাটী।—কাল অপরাহ্ন।

(ধনদাস রুগ্নশয্যায় শায়িত)

ধন। উঃ জ্বলে' গেল! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল! ছাই হয়ে গেল! আমায় কে আগুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছে! উঃ জ্বলে' গেল!

তর্ক। কবিরাজ মশাই, এ কি ব্যাধি?

কবি। বুঝ্‌তে পারছিনে।

ধন। কুলভূষণ কোথায়? এখনো একবার আমার কাছে এলনা। আমার যে শেষ হয়ে' আস্‌চে!

কবি। তাকে ডাক্‌তে পাঠানো হয়েছে।

ধন। বড় ভয় করে; তোমরা আমার কাছে এস। আরো কাছে এস। আমার বড় ভয়,—বড় ভয়! আমি কি মরব? না না আমার মর্‌তে ভয় করে। উঃ ঐ যেন কারা আস্‌চে। উঃ কি ভীষণ চেহারা! আমায় তারা ডাক্‌চে। ঐ অন্ধকারের ভিতরে যেতে বল্‌ছে। আমি যাবোনা, যাবোনা। ধর, ধর, আমায় ধর!

কবি। এ কি ব্যাধি কিছুই যে বুঝ্‌তে পারিনে!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানি।

কবি। কে তুমি?

পাগ। আমি পাগ্‌লী—

কবি। এখানে কেন এসেছ?

পাগ। বল্‌তে।

কবি। কি বল্‌তে?

পাগ। রোগের কথা।

তর্ক। আঃ যা বেটী, এখানে গোল করিস্‌নে। একে আস্‌তে দিলে কে?

কবি। তাড়াবেন না। দেখি ব্যাপারটা কি?

পাগ। তাড়িয়ে দেবে? তা দিও; আমি তো তাড়া খেয়েই ফিরি। ওতে আর আমার কি হবে? তবে বল্‌ব, তবে বল্‌ব? কি হয়েছে বল্‌ব?

কবি। বল।

পাগ। বিষ, বিষ, এ বিষের জ্বালা।

কবি। সে কি, বিষ কি?

(কবিরাজের কাণে কাণে পাগলিনী কহিল)

কবি। এ বলে কি!

পাগ। হাঁ সত্যকথা (সাশ্চর্য্যে) মিছে বলিনি। কি কল্লুম? বলে' ফেল্লুম? কাঁদ্‌তে হবে। এর জন্যে আমায় কাঁদ্‌তে হবে। কি কর্‌লুম! কি কর্‌লুম!

কবি। এই—দরোজা বন্ধ কর। পাগলীকে যেতে দিওনা। তুমি এ সব কথা কি করে' জান্‌লে?

পাগ। কি করে' জান্‌লুম্? তবে শোনো। তবে বলেই ফেলি। যখন একটা বলেছি—সব বল্‌ব। সব বল্‌ব। বলে' শেষে খুব কাঁদ্‌ব। তবে শোনো। ওরা যেদিন রেতের বেলায় জঙ্গলে বসে' পরামর্শ করছিল, তখন আমি সব শুনেছি।

(কবিরাজের কাণে কাণে আবার কহিল)

কবি। (চমকিত হইয়া) উঃ! কি ভয়ানক! হ'তেও পারে। আমি অবিশ্বাস করিনে। তুমি কে?

পাগ। আমি কে? আমি কে? আমায় তোমরা

চিন্‌বে না। (ধনদাসকে দেখাইয়া) ঐ বুড়োর কাছে জিজ্ঞেস কর।

কবি। তুমিই বল।

পাগ। আমি পাগ্‌লী পোড়াকপালী। কুলভূষণের মা! ওঃ——— !

কবি। কি আশ্চর্য্য!

(ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণির প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কে! (গমনোদ্যত)

পাগ। ওকি যাচ্ছ কেন? যেওনা দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওঃ চিন্‌তে পেরেছ তুমি? যেওনা দাঁড়াও। ওরা তোমায় চেনেনা, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। তবে বল্‌ব নাকি?

ধর্ম্ম। মশাই, আপনারা শীঘ্র এটাকে তাড়িয়ে দিন।

পাগ। তাড়াবে? তাড়াবে? তাড়াতে হবে না। নিজেই যাবো, তবে যাবার আগে সব বলে' যাবো। তবে তোমরা শোনো—

ধর্ম্ম। আঃ! মশাই, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন কি? এটাকে তাড়িয়ে দিন; রোগীর ঘরে এ রকম গণ্ডগোল হওয়া তো ঠিক নয়। (ভয়ে কম্পন)

পাগ। কাঁপ্‌ছ? ভয়ে কাঁপ্‌ছ? মুখ শুকিয়ে গেছে! তা কাঁপো। তবে বল্‌ব? তবে বলি। তোমরা শোনো, আমি এই—

ধর্ম্ম। এই পাগ্‌লী (গলাটিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল; পাগ্‌লী ছুরিকা বাহির করিল। ধর্ম্মধ্বজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।)

পাগ। আমায় মারবে? তবে এই দেখেছ? মারো—মারো এখন। ওকি পেছনে হটে যাচ্ছ যে? দাঁড়াও ওখানে—পালাতে চাইবে তো এই ছুরি বসিয়ে দেব। তোমরা শোনো, এই ধর্ম্মধ্বজ এখানে এসে আবার ব্রাহ্মণ সেজেছে! ও নমঃশূদ্র। ও যাত্রার দলে থাকৃত। ও-ই তো আমার—

(ধর্ম্মধ্বজ পলায়নোদ্যত)

সকলে। এই ধর্ ধর্।

(দারোগা ও কয়েক জন কনেষ্টবলের প্রবেশ)

দারোগা। আর যেতে হবে না বাপু। ধর এই অলঙ্কার পর। (কনষ্টেবলের প্রতি) এই হাতকড়ি পরাও। কিহে বাপু ধর্ম্মধ্বজ, অনেক রকম ভেল্কীবাজী করে' এত দিন ঠকিয়ে এসেছ। তোমার পেচনে পেছনে ঘুরতে ঘুরতে হয়রাণ হয়েছি। এইবার জালে পড়েছো। মশাইরা একে চেনেন না? ইনি জাতে নমঃশূদ্র, পাকা বদমায়েস্, কাশী থেকে এসে এখানে ধর্ম্মধ্বজ সেজে বেড়াচ্ছেন।

তর্ক। আশ্চর্য্য!

দারোগা। আশ্চর্য্য অনেক আছে। আপনারা এই পাগ্‌লীর কাছে সব শুনুন। আমরা এর জন্যেই সব জান্‌তে পেরেছি। রাসবিহারী আর কুলভূষণ কোথায়?

তর্ক। তাদের পাওয়া যাচ্ছেনা।

দারোগা। হাঁ, তা এখন পাওয়া যাবে কেন? এক দিন এই ব্যাটার মত জালে পড়বেই।

তর্ক। তাদের কি অপরাধ?

দারোগা। বেশি কিছু নয়। পরে শুন্‌বেন।

তর্ক। সর্ব্বনাশ! সব জেনেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

দারোগা। আমরা এই রকমেই সব জানি মশাই। এটাকে নিয়ে চল। (পাগলিনীর প্রতি) পাগ্‌লী তুইও আয়।

(দারোগা প্রভৃতির প্রস্থান)

কবি। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! যাক্ এখন রোগীকে একটু ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বিষের চিকিৎসা কর্‌তে হবে।

(রোগীকে লইয়া অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন। স্থান—রাস্তা।

(চেলীর কাপড় পরিহিত, কৃত্রিম টোপর মাথায় দিয়া বরবেশী অর্দ্ধোন্মত্ত ধনদাস রায়ের প্রবেশ, পশ্চাৎ ছেলের দলের প্রবেশ)।

ধন। দ্যাখ্‌তো, দ্যাখ্‌তো, আমায় কেমন মানিয়েছে! দ্যাখ্‌তো।

১ম। বেশ মানিয়েছে। খুব মানিয়েছে!

ধন। আমায় মেয়ে দেবে না তো?

২য়। পাগ্‌লা তোর ঝুলিতে কিরে?

ধন। টাকা—টাকা; টাকার থলে। সঙ্গে রাখি। না হলে' নিয়ে যাবে। সব পুষ্যিপুত্তুরে নিয়ে যাবে।

৩য়। যমের বাড়ী যাবি?

ধন। কোথায়? তা যাবো, তা যাবো। আমি যে ছেলেমানুষ, একলা কি করে' যাবো?

৩য়। তোর থলেটা দে।

ধন। উঁহুঁ তা দেব না।

৩য়। কেড়ে নেব। আয়তো দেখি সবাই, ওর থলে' কেড়ে নেব।

ধন। ও বাবারে, আমার টাকার থলে নিলেরে। ও বাবারে। (পলায়ন, সকলের পশ্চাদ্ধাবন)

(দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম। বল কি?

২য়। হাঁ।

১ম। তুমি শুনলে কি করে?

২য়। আমি লোকের কাছে শুনেছি! আর ওকে আমি আগেও দেখেছি।

১ম। এ গ্রামে এল কি করে?

২য়। এখন তো পাগল হয়েছে।

১ম। যাই হোক লোকটাকে দেখলে দুঃখ হয়; একদিন তো বড়লোক ছিল।

২য়। দুঃখ! অমন পাষণ্ডকে দেখে আবার দুঃখ! ওর এ অবস্থা হয়েছে, বেশ হয়েছে। ওর এমন সাজা হবে না তো আর কার হবে? লোকটা যেমন কৃপণ তেমনি অত্যাচারী। এমন মানুষ দাদাঠাকুর, তাঁকে চক্রান্ত করে' সর্ব্বস্বান্ত করেছে। একটা পুষ্যিপুত্তুর রেখেছে—সেটা নাকি নমঃশূদ্রের ছেলে। সর্ব্বনাশ! ঐ ব্যাটার বাড়ীতে কত কায়েত বামুন খেয়েছে। সকলের জাত গ্যাছে। ওকে সবাই এখন একঘরে করে' রেখেছে। ওর শালা আর গুণের পুষ্যিপুত্তুর মিলে ওকে মারবার চেষ্টা করেছে—বহুকষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গ্যাছে।

১ম। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

২য়। হাঁ, আর দুশ্চিন্তায় এখন পাগল হয়েছে। বেশ হয়েছে। ঐ দ্যাখো ও এদিকে আসচে।

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। হায়, হায়! আমার টাকার থলে! ওগো আমার সর্ব্বনাশ করেছে! আমার থলে নিয়ে গেছে। আমার সব গেছে। (ভদ্রলোক দুইজনের নিকটে গিয়া) মশাই একটা পয়সা দিন্‌না মশাই।

১ম। এই—এই—যা, যা ব্যাটা। পাগ্‌লামী কর্‌তে আর যায়গা পাস্‌নি!

ধন। দাওনা একটা পয়সা। (হাত ধারণ)

২য়। তবু আবার! যা ব্যাটা (ধাক্কা দিয়া)

ধন। ও বাবারে গেছি। (পলায়ন)

১ম। চল এটাকে দেখ্‌লেও পাপ আছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ। কাল—অপরাহ্ণ।

ন্যায়রত্ন। বল কি? তুমি তো আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলে! এতো ভারী আশ্চর্য্য!

তর্করত্ন। তুমি কেবল একা "আশ্চর্য্য" হওনি' দেশশুদ্ধ "আশ্চর্য্য" হয়েছে। প্রথম আশ্চর্য্য এই যে কুল-ভূষণ আর রাসবিহারী এমন ভয়ানক মানুষ! দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে এই ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণি একটা আশ্চর্য্য রকমের জোচ্চোর।

ন্যায়। আশ্চর্য্য!

তর্ক। রোসো, "আশ্চর্য্য" গুলি এখনো শেষ হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য গুলি এখনো বাকী আছে।

ন্যায়। কি আশ্চর্য্য! আরো কিছু বাকী আছে নাকি?

তর্ক। হাঁ আরো কিছু। আরো আশ্চর্য্য এই যে তোমরা এই লোকগুলিকে এতদিনে চিন্‌লে না। আমরা সবাই আশ্চর্য্য-রকম গাধা বনে' গেছি।

ন্যায়। দ্যাখো ওটা আমি বরাবরই জানতাম।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! জেনে শুনেও এই ধনদাস রায় আর ধর্ম্মধ্বজের তোষামোদ করেছ! এঃ, দেখছি সেই "আশ্চর্য্য" গুলি অচিন্ত্য রকম আবিষ্কৃত হচ্চে।

ন্যায়। মশাই সংসারে থাক্‌লে ও সব করতে হয়।

তর্ক। এ আরো আশ্চর্য্য! সংসারটাকে তুমি যত খারাপ বলে' ভাবছো ন্যায়রত্ন, সে তত খারাপ নাও হতে পারে।

(নিধিরামের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে প্রস্থানোদ্যোগ)

ন্যায়। ওহে নিধিরাম, নিধিরাম, বলি যাচ্ছ কোথায়? ইস্ কথাই কইছ না যে মোটে! কলিকাল! ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণ দেখে একেবারে প্রণামটা না করেই চলে যাচ্ছ যে!

নিধি। কৈ, ব্রাহ্মণ কোথায়?

ন্যায়। এই যে আমরা কি তবে জড়পদার্থ নাকি? এ সব বুঝি দাদাঠাকুরের কাছে শিখেছ। এই যে পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র গলায় দেখতে পাচ্ছ। স-শরীরে জল-জ্যান্ত দু' দুটো ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কি অন্ধ নাকি?

নিধি। এখনো তোমরা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কর? তোমরা জড়পদার্থের চেয়েও নিকৃষ্ট। জড়পদার্থ কি তোষামোদ করে? জড়পদার্থ কি ষাট্ বছরের বুড়োর বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে? তোমার মত ব্রাহ্মণের চেয়ে জড়পদার্থ অনেক ভালো। যজ্ঞসূত্র তোমায় উপহাস করছে। তোমার গলায় ওটা শোভা পায় না। তোমাকে প্রণাম করব? তুমি চণ্ডালের অধম। আমি অন্ধ না তুমি অন্ধ?

ন্যায়। নিধিরাম, মুখ সামলে কথা কয়ো। যত সব ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। ব্যাটা ছোট লোকের ছেলে, একটু ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে, তাই আর অহঙ্কারে চোখে দেখেন না!

নিধি। ঠাকুর নিজেকে সাম্‌লাও। হাঁ আমরা ছোটলোকই সত্য। তাই বলি হুঁসিয়ার! ছোট-লোকের স্বভাব জানতো? নেমকহারাম, যে দাদাঠাকুর সকলের কত উপকার করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করে' তাঁকে জেলে পাঠিয়েছো, তাঁকে পথের ভিখারী করেছ। তোমরা আবার ব্রাহ্মণ? তোমাদের আবার প্রণাম করব! তোমরা তো ধনদাস রায়ের বাড়ী খেয়েছ, ধনদাস রায় তো নমঃশূদ্রের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর রেখে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। তোমাদের প্রণাম করা তো দূরের কথা তোমাদের স্পর্শ করলে পাপ আছে। যত সব বদমায়েস—

ন্যায়। (আস্ফালন করিয়া) তবে রে ব্যাটা এত বড় কথা!

নিধি। (অগ্রসর হইয়া) কি রে ব্যাটা কি বল্লি? (লাঠি উঠাইল)।

ন্যায়। ওরে বাবারে গেছি, গেছি। কে আছো রক্ষা কর। ব্রহ্মহত্যা হোল, ব্রহ্মহত্যা হোল।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। একি—কিসের গোলমাল হচ্ছে?

ন্যায়। এই-এই-এই-এই

তর্ক। বাঃ ন্যায়রত্ন তুমি যে কেবল টিকিই নাড়ছ। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে না? ওহে বাপু শোনো (সেবাব্রতের প্রতি) এই ন্যায়রত্ন মশাই নিধিরামকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

ন্যায়। কি, কি কি কি! আমি গালাগাল দিচ্ছিলাম?

তর্ক। তা বৈকি?

সেবা। নিধিরাম, চ'টো না। স্থির হও। আজ সবাইকে এক শুভসংবাদ দিতে এসেছি।

নিধি। কি সম্বাদ?

সেবা। দাদাঠাকুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আস্‌চেন।

তর্ক। তাই নাকি? তাই নাকি? ঈশ্বর তুমি আছো—ধন্য সুবিচার! কবে তিনি আসবেন?

সেবা। কাল।

তর্ক। সুসম্বাদ! সুসম্বাদ! যাও সেবাব্রত এ কথা রাষ্ট্র করে দাও। চল চল হে ন্যায়রত্ন চল এখন।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা।

(শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

ভারতসম্রাট্ অশোক সাম্রাজ্যলাভের পূর্ব্বে পিতার আদেশে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভালবাসিতেন না বলিয়া তদানীন্তন ভারতরাজধানী পাটনা মহানগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত উজ্জয়িনী নগরীর শাসনভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। অশোক উজ্জয়িনীসংক্রান্ত রাজকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি শ্রেষ্ঠী উপাধিধারী একজন গুজরাটী বণিকের দেবীনাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী পরমা সুন্দরী গুণবতী সুশীলা মহিলা ছিলেন। দেবী রাজবংশসম্ভূতা না হইলেও তাঁহার রূপে গুণে ও শীলতায় আকৃষ্ট হইয়া ভাবী সম্রাট অশোক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে তথায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার এই বিবাহবার্ত্তা তিনি পাটলীপুত্রনগরে তাঁহার পিতাকে না জানাইয়া দেবীর সহিত মহাসুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার মহেন্দ্র নামক এক পুত্র ও সংঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। ইহার কিছুদিন পরে যখন তিনি ভারতের সম্রাট্ হইয়া পাটনায় আগমন করিলেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ তিনি ঐ পুত্র ও কন্যাটিকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগকে পাটনায় আনাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে রাজধানী পাটনায় আনাইয়া উত্তমরূপে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি শিক্ষাদানপ্রভাবে তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক সুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

সম্রাট্ অশোক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা অভ্যাস করাইয়াছিলেন। সংঘমিত্রার স্বভাব এতই বিনয়নম্র ছিল ও তাঁহার ব্যবহার এতই সরল ছিল যে, তিনি সম্রাট্‌কন্যা হইলেও মঠের ভিক্ষুণী উপাধিধারিণী সামান্যবেশা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন ও দীনদরিদ্র বলিয়া সকলের নিকটে প্রতীয়মান হইতেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই সমভাবাপন্ন ছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। অহঙ্কার কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চুরাশী হাজার বিহার (অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমন্বিত উদ্যানমধ্যবর্ত্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক একটি বিহারে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেন।

বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদিগের জন্যও এই প্রকার অনেক বিহার ছিল। তাঁহাদের অন্নবস্ত্র ব্যয়ভার সম্রাট নিজেই বহন করিতেন। রোমরাজ্যে যেমন ধর্ম্ম-গুরু পোপের প্রাধান্য শ্রুত হইয়া থাকে, সম্রাট অশোকের সময়ে সেই সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী-দের প্রাধান্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং ইঁহাদের নেতার চরণে প্রণত হইতেন ও তাঁহার আদেশ বৌদ্ধগাথার ন্যায় শিরোধার্য্য করিতেন। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী-দিগকেও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুষ্টিসাধনার্থ দশ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। যেদিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশী হাজার বিহারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, সেইদিন আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন, যে, "অদ্য হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য মধ্যে প্রতিযোজন অন্তর স্থানে 'মহাদান মহোৎসব' হইবে। এই উৎ-সব উপলক্ষে তাঁহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল স্থান পুষ্পমাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হইবে। এবং যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহাকে তদনুসারে এই চুরাশী হাজার বিহারের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে ভিক্ষা দিতে হইবে। রজনীতে দীপাবলী দ্বারা রাজ্যের সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে হইবে। সুমধুর গীতবাদ্য দ্বারা সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎ-পাদন করিতে হইবে। এই এক সপ্তাহ কাল সকলকেই সংযত ও অবহিতচিত্তে পবিত্রভাবে, পবিত্রবেশে ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময় অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে হইবে। সপ্তম দিবসে সম্রাট স্বয়ং পাত্রমিত্র মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজরাজো-চিত শোভাযাত্রার সহিত রাজধানীর প্রধান রাজ-মার্গে বহির্গত হইবেন। ঐ দিবসের সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদিগকে বিশেষরূপে ভিক্ষা দিতে হইবে। ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে 'মহাদান মহোৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইবে।" সম্রাটের এই আদেশ-বাণী শুনিয়া সকলেই আদেশোচিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্রাট নিজে ভিক্ষু ভিক্ষুনীদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য যেমন ব্যয় করিতেন, গৃহস্থ প্রজাবর্গকেও তদ্রূপ ব্যয় করাই-তেন। যথাসময়ে সম্রাটের প্রাসাদ, প্রজাবর্গের গৃহসমূহ, রাজপথে রাজকার্য্যালয়সমূহ সুসজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী পুরীকেও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিল। প্রধান প্রধান বিহারের প্রধান প্রধান ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ পাটনা রাজধানীতে মহা-সম্মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ নিজ নিজ দলসহ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলে রাজধানীর লোকসকল তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল এবং তাঁহা-দিগকে ভিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে লাগিল। তাঁহা-দের উপদেশ বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইতে লাগিল।

এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিবসে সম্রাট অনির্ব্বচনীয় মহাশোভা যাত্রাসহ রাজধানীর প্রধান রাজপথে বহির্গত হইলেন। প্রজাবর্গ মহাহর্ষের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইল। যেখানে মহাদানমহোৎসব উপলক্ষে মহামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া সুসজ্জিত হইয়াছিল, সম্রা-টের শোভাযাত্রা সেই দিকেই চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মহামণ্ডপ মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপ-বিষ্ট হইলেন। সম্রাটের প্রধান প্রধান সামন্তরাজ মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সভা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এমন সময়ে মহা-মনীষী মৌদ্গলীর পুত্র তিষ্য নামক প্রধানতম মহা-বিদ্বান্ "মহাস্থবির" ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট স্বয়ং সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। রাজসভাস্থ সকলেই উত্থিত হইল। সম্রাট তিষ্যের চরণ-কমলোপরি রাজমুকুট-সুশোভিত মস্তক অর্পণ করি-লেন। তিষ্যের পদধূলি লইয়া তিষ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তিষ্যকে বসাইলেন। এবং সিংহাসনের নিম্নে অন্য একটি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন তথায় সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যোপার্জ্জন অনু-সারে যাহার যেমন পদ তিনি তদনুসারে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্রাটের প্রতি মহাপ্রসন্ন হইয়া সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সম্রাট সেই দিন অলৌকিক দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিব্য শক্তির সাহায্যে তিনি বিভিন্নস্থানস্থিত চুরাশী হাজার ধর্ম্মভবন মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিতে পাইলেন।

তখন সম্রাট সঙ্ঘকে অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসেবকগণের মধ্যে কাহার দান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ"? সঙ্ঘ উত্তর করিল, "হে সম্রাট্, ভগবান বুদ্ধ-দেবের লীলাকালেও আপনার মত দানশীল কেহই ছিলেন না"। সম্রাট ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইপ্রকার দান করিয়া কোন ব্যক্তি কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত সেবক হইতে পারে"? সংঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি পুত্র বা কন্যাকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক। হে সম্রাট্, আপনার মত পরম দাতা যে, এই ধর্ম্মের পরম হিতৈষী, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" তৎকালে সেই মহামণ্ডপ মধ্যে সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক মহেন্দ্রের উত্তম স্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সদা আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য মহাস্থবির তিষ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবী সম্রাট্পুত্রের মায়া মমতা ত্যাগ করিলেন। অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্কা যুবতী সংঘমিত্রাও সেখানে বসিয়াছিলেন। সম্রাট পুত্র ও কন্যায় প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা আছে কি? আদর্শ বৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ ভিক্ষুধর্ম্মকে অতিশয় পবিত্র ব্রত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহাব্রত গ্রহণ করিতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? পিতার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "পিতৃ-দেব, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা দুইজন এই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্রতম ধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ করিলাম"। সভাস্থ সকল লোক সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটের এইপ্রকার অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহা বিস্ময়জনক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া "সম্রাটের জয় হউক, সম্রাট চিরজীবী হউন," এই কথায় মহাহর্ষ কোলাহলে দিগন্ত পূরিত করিল। সম্রাটের উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেই সম্রাটকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল।

সম্রাট কৃতাঞ্জলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যকে বলিলেন, "হে ভগবন, আপনি আমার পুত্র মহেন্দ্রের শিক্ষাদাতা গুরু হউন"। তিষ্য সম্মত হইলেন। তিনি মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাস্থবির মহাদেবকে আদেশ করিলেন। সম্রাট-কুমারী সংঘমিত্রাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহাভিক্ষুনী ধর্ম্মপালী আদিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী আদিষ্ট হইলেন। ইহার পর ইতিহাস-বিখ্যাত "মহাদান" আরব্ধ হইল। সম্রাট সকলকে প্রভূত প্রণামী দিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার যেমন পদ, তাঁহাকে তদনুসারে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন। এইরূপে "মহাদান মহোৎসব" বিধি সম্পন্ন হইল। ইহার পর সভাভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে সংঘমিত্রা মহাভিক্ষুণী ধর্ম্মপালীর নিকটে উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মের সাধারণ পাঠ্য অন্যান্য বহু গ্রন্থই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভিক্ষুণী আয়ুঃপালী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এই ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সাধনাপদ্ধতিগুলি শিখাইতে লাগিলেন। ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশের নাম "উপসম্পদা"। মহেন্দ্র পিতৃ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া "উপসম্পদা মন্দিরে" দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তথায় তিন বৎসর কাল তিষ্যের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া "অর্হৎ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এত অল্প কালের মধ্যে এই উপাধি লাভ করা বড়ই প্রশংসার কথা। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংঘমিত্রা ইহা অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যে এই উপাধিটি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে স্ত্রীলোক ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-

সাধনায় উত্তম রূপে শিক্ষা পাইলে পুরুষ অপেক্ষা অনেক উন্নত হইতে পারে। ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ও ভক্তি যত দৃঢ় হয়, পুরুষের তদ্রূপ হয় না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের যত আগ্রহ দৃষ্ট হয়, পুরুষের তত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোক ধার্ম্মিকের জাতি। এ হেন স্ত্রীজাতি যদি ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সংঘমিত্রা এই উপাধি লাভ করিয়া সকলের মহানন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাড়া।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

এবার আমি খোঁজ পেয়েছি গো
তুমি আস্‌বে ওগো আসবে
তোমার দেখা রোজ চেয়েছি গো
এবে সামনে আমার হাস্‌বে;
ছুটে ছুটে তোমার তরে
আবেগ ভরে,
পাইনি দেখা এক নিমেষের
আঁখির জলে ভেসে—
এবার তুমি চিরজীবন থাক্‌বে ওগো
আমার কাছে এসে;
আজ, হৃদয়পুরে সাড়া দেছে
আস্‌বে তুমি আস্‌বে
আমায় তুমি আপন করে
এবার ভালো বাসবে।
বাতাস যেন বিভোর হয়ে
আনচে বয়ে
তোমার দেশের সব ভুলানো
আবেশভরা মায়া,
মেঘের কোলে, পাতায় পাতায় দেখচি শুধু
তোমার যেন ছায়া;
আজ, হৃদয়বীণার কোন্ তারেতে গো
করলে তুমি স্পর্শ?
গাহিছে সে আজ তার ভারেতে গো
ছড়িয়ে শুধু হর্ষ।

বিশ্ব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

যিনি নিত্যবস্তুর অভাববোধের উদ্রেক করাইয়া দেন এবং যিনি তাহা পূরণ করেন, অবস্থাবিশেষে এই দুই জনই মনুষ্যজাতির কল্যাণকারী। মানুষ অনেক দিনের মানুষ; এত বড় পুরাতন জগদ্‌ভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নগুলি বাহিরে পড়িয়া আছে, সে গুলি এখনো মাল-কোঠায় আনিয়া সঞ্চিত করিতে পারে নাই, এ একটা অকর্ম্মণ্যতারই লজ্জাজনক নিদর্শন। কতদূর পর্য্যন্ত এখানে তাহার দাবিদাওয়া, মানুষ এখনো তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাই বাহিরে এত বড় বিপুল ভাণ্ডার থাকিতেও দৈন্যের কারাগারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। এমন একদিন ছিল যখন এই জগৎটা কেবল একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় বলিয়া বোধ হইত; ইহার মধ্যে যে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, মানবহৃদয়ে তাহার তরঙ্গ পঁহুছিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। তারপর বিস্ময়সঞ্জাত ভাবরাশি ক্রমে ক্রমে একটি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় মাধুরীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল;—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"

প্রথমতঃ মানুষ কেবল তাহার নিদ্রাপ্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সহজ ব্যাপারগুলিকেই কায়ক্লেশে সম্পন্ন করিয়া একটা মূঢ় আনন্দে পরিতৃপ্ত ছিল; ক্রমে নূতনতর অভাব বোধের সঙ্গে জীবনটাকে সুখ-দুঃখ-বেদনাময় করিবার বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি হইল।

সেই আদিকালে সুখ দুঃখ উপভোগের মধ্যে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিল না। জীবনে কোনো প্রকার ব্যস্ততা অথবা মন্থরতা ছিল না। অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ রহিয়াছে, একথা তখনকার লোকের কাছে আদৌ ভাবিবার বিষয় হয় নাই। সেকালে এই সূর্য্যের দিকে চাহিয়া শিশু মানব নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিত। তারপর একদিন কোনো এক লোহিত-রাগরঞ্জিত মহা প্রত্যূষে একজন বলিয়া উঠিলেন;—"সবিতুর্ব্বরেণ্যং" আর সকলে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হইয়া মূক-হৃদয়ের সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

এই নিত্যকার সুখ দুঃখ, আলো ছায়া, দিবা রাত্রিগুলি যে কেবল ভৃত্যের মত আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেই এখানে আসে নাই, তাহা মানবহৃদয় ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকলের প্রয়োজনের ঘর ছাড়া অন্য এক জায়গায় দিব্য মহিমার আসন পাতা রহিয়াছে; যখন সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই ইহাদের বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব বিকশিত হইয়া উঠে। এ সকল যতই কেন অনেক দিনের হৌক না তবু পুরাতন অথবা একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ ভিতর হইতে ইহার উপর নব নব বর্ণের মাধুরী ফলাইয়া চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। এ শক্তিটা মানুষের নিজের অন্তরের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল দিব্যানুভূতি যখন অসহ পরিপূর্ণতার ভারে বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ক্রমে খড়ি পাতিয়া দেখিলে ইহাকেই বলা যায় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ম্মতলে একটা প্রকাশ-ব্যাকুলতা প্রতি নিয়তই আঁকু-পাকু করিতেছে। গাছ, পাতা, লতা, ফুল ইত্যাদিকে বাহিরে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি এ গুলি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে। কুসুম গন্ধ, বর্ণ এবং পাপড়ীর মধ্যেই তাহার সমগ্র মাধুরী টুকুকে নিঃশেষে রাখিয়া দেয় নাই। এরূপ হইলে তাড়াতাড়ি কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে ফুটিয়া উঠিয়া, মধ্যাহ্নেই জগতের হৃদয় হইতে বিদায় লইত। এ ভাবে ফুলকে দেখিলে তাহাকে নিতান্ত ছোট করিয়াই দেখা হয়। এইটুকু ছাড়া ফুলের আর একটি মহান্ সার্থকতা, চরম পরিণতি আছে। সেইটুকু ধরা পড়ে মানব হৃদয়ে। বাহিরে সে প্রভাতের আলোর সম-বয়সী হইলেও ভিতরে তাহার অনন্ত জীবন, অফুরন্ত মাধুরী ও বিচিত্র উদ্দেশ্য।

অনেক সময়ে দেখা যায় এখানে যাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসিদ্ধি মাত্রই উদ্দেশ্য তাহার মূল্য বড় কম; তদপেক্ষা যাহা বাহিরের জগতের পক্ষে নিতান্তই আগন্তুক তাহাই পরে হৃদয়-রাজ্যে চির বসতি লাভ করে। এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের মধ্যে অতীন্দ্রিয় মাধুরীটুকুকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখে একমাত্র সাহিত্যে। এক কথায় সাহিত্য উচ্চতম উদ্দেশ্য, মহান্ লক্ষ্য, অপরিমেয় সুখ, এবং প্রচুর দুঃখ দিয়া মানব জীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জীবনধারণের পক্ষে যে আপিসে যাতায়াত, আহার, নিদ্রা প্রভৃতিই প্রচুর নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে এই সাহিত্য।

বহিঃপ্রকৃতি যতই বড় হৌক্ না কেন মানুষের হৃদয়ের তুলনায় সে অনেক ছোট। মানবহৃদয় যে প্রকৃতি হইতে কেবল গ্রহণ করে তাহা নহে। সে যতটুকু নেয় তাহার শতগুণ দেয়। এই আদান প্রদানে প্রকৃতিই জিতিয়া যায়। কিন্তু এত সে দেয়, তবু ইহাকে বাজে খরচ, অথবা অমিতব্যায়িতা বলা যায় না কারণ এর গোলাবাড়ীতে যাহা সঞ্চিত আছে তাহা অফুরন্ত। তবে এ নেওয়া দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই একটা ভাল-মন্দ, ইতর-বিশেষ আছে। অনেক সময়ে গ্রহণ করে ভালো, দেয় মন্দ।

এই জমা-খরচের হিসাব রাখে সাহিত্যে। কাহারো নেমকহারামী করিবার সাধ্য নাই। বহু পুরাতন কালের আদান-প্রদান-সম্বন্ধীয় নিকাশ তলব করিলেও তাহা এই খাতা হইতেই খতাইয়া দেখানো যায়।

আমরা নিতান্ত ভিক্ষুকের মত এই বিশ্ব-নগরে আসিয়া একটি সরাইখানার সঙ্কীর্ণ-কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। অগ্রদূত সাহিত্য আসিয়া আমাদিগকে রাজবাড়ীর দরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে। কিন্তু খবর দেওয়া পর্য্যন্তই সাহিত্যের কাজ। সেখানে যে দ্বারবান আছে এখন তাহার সঙ্গে রফা করিয়া সেই রাজাধিরাজের চরণসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থম্মন্য হইব। সেখানেই আমরা "মহতো-মহীয়ান্"। এইরূপেই সাহিত্যে ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি।

বারাণসী-কথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি ডফারিন ব্রিজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখান হইতে বারাণসীর মোহন সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ-মন শীতল হয়। ব্রিজের

উপর আসিয়া আমার মনে ভক্ত কবি হেমচন্দ্রের কাশী-স্তোত্র মনে পড়িল—

'জয় জয় কাশী অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
বেণী সুসজ্জিত অসি বরুণায়।
পদতলে শোভে সুরধুনী-ধার,
কটিদেশে কোটি সোপানের হার।
নবদিবাকর কিরণমালা,
মন্দির মুকুট দেউলে ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী,
জয় বিশ্বেশ্বর-পুরী বারাণসী ॥'

ব্রিজের অপর পারে 'কাশী' ষ্টেশন। এখানে গাড়ী থামিল। আমি এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের ফটক দিয়া বাহিরে আসিয়া আমরা দুই জন একখানি এক্কাতে আরোহণ করিলাম। পূজার সময় এক্কার ভাড়া একটু চড়িয়াছিল। এক্কাযানের দণ্ডটীকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিলাম, নতুবা এক্কার 'বিকট আন্দোলনে' মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। এক্কাখানি দ্রুতবেগে রাস্তার ধূলিরাশি উড়াইতে উড়াইতে ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু দোকান, দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা দেখিতে পাইতাম। পূজার বাজারে বহু লোক-সমাগম দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় 'গোধূলির' গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া পৌঁছা গেল। এখানে নামিয়া কুলির মাথায় মোট দিয়া ত্রিপুরাভৈরবীর গলিতে আমার আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদির পর আমি একটী প্রৌঢ়া রমণীর সহিত মীরঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর আত্মীয়টির সহিত কাশীসম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়।

কাশী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ দিয়া বরুণা ও অসি নামক দুইটী নদী প্রবাহিত হইয়া উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এইজন্য এই পুণ্যস্থানকে 'বারাণসী' কহে।

এই পুণ্য নগরীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে আমরা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে দেখিতে পাই। সেই সময় কাশী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। রামায়ণযুগেও যে কাশী অত্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল ইহার সবিশেষ প্রমাণ আছে। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে কাশী প্রদেশে অনার্য্য জাতিরা (দ্রাবিড় ও কোল) বাস করিত। ১৪০০-১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আর্য্যজাতিরা উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফাহিয়ানের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কাশীরাজ্য ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও ইহার প্রধান নগরী বারাণসী দেড় ক্রোশ দীর্ঘ, অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ৭ম খৃষ্টাব্দে হিউএন্‌ৎ-সাঙ্‌ সারনাথে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়া যান। উড়িষ্যার 'মাদলাপঞ্জীতে' দেখা যায় যে, রাজা যযাতি কেশরী বারাণসীর মন্দিরের আদর্শে ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৫ই অক্টোবর, ১৯১৩ রবিবার। অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঙ্গা-স্নান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বর মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সংকীর্ণ গলি। গলিতে প্রবেশ করিয়াই দেখি পুষ্পমাল্যবিক্রেতা, মিষ্টান্নবিক্রেতারা যাত্রীকে অতি সমাদরে 'আইয়ে বাবুজী, আইয়ে মা-জী' বলিয়া ডাকিতেছে। আমি কিছু মিষ্টান্ন ও ফুল খরিদ করিলাম। মন্দিরের বহির্দ্বারে দেখি ডান দিক একখানি শ্বেত প্রস্তর-ফলকে লেখা রহিয়াছে—'Gentlemen not beloning to the Hindu Religion are requested not to enter the temple.' এই নিষেধবাক্যটী আমার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইল না। সামান্য একখানি প্রস্তরফলকে এই নিষেধবাক্যটী লিখিয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়া যে কি লাভ আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের তোরণ অতিক্রম করিয়া আমি মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম শত শত নরনারী বিশ্বেশ্বরকে দেখিবার আকুলতায় আনন্দের কোলাহলে এবং ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে 'হর-হর ব্যোম্ ব্যোম্' ধ্বনিতে মন্দিরাভ্যন্তর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যস্থানে বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ। * মনপ্রাণ ভাবে ভরিয়া গেল।

'তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়ং
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ং।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং ॥

বিশ্বেশ্বর দর্শনশেষে অপর পথ দিয়া বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের দিকে চলিলাম। পূজার সময় অন্নপূর্ণা মন্দিরে অত্যন্ত ভিড় হয়। এখানে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দায় ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে তান-লয়-সংযোগে চণ্ডী-পাঠ করিতেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মুখোচ্চারিত চণ্ডীর প্রতিশ্লোক যেন কত গম্ভীর ও প্রাণের ভিতর কি এক ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত।

---

* চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌ৎ-সাঙ্‌ এখানে শত হস্ত উচ্চ তাম্রমণ্ডিত বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে ১১৯৩ সালে কাশীর রাজা রাঠোর জয়চাঁদ যবন সেনাপতি কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন, বোধ হয় তখন মুসলমান সৈন্য এই প্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

কাশী অন্নপূর্ণার নগরী, এখানে কেহই অভুক্ত অবস্থায় থাকে না—

'জগৎজননী অন্নদা আপনি,
যেখানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি।'

এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে পুণার মহারাষ্ট্র নৃপতি * কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে নাটোরের রাণী ভবানী মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। মন্দিরের উপরিভাগে একটী গুম্বজ ও একটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের একাংশে সপ্তাশ্বযোজিত রথের উপর সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আমরা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের গলি দিয়া জ্ঞানবাপী দর্শনে যাই। কথিত আছে রুদ্ররূপী মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া এই কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দুর বিশ্বাস, এই কুণ্ডের জল পান করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কালাপাহাড় কাশীর মন্দির ধ্বংস করিবার সময় পাণ্ডাগণ বিশ্বেশ্বরকে এই কুণ্ডে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জনমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের উপরিভাগে একটী ছাদ আছে। গোয়ালিয়র-রাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী রাণী বৈজাবাই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা চল্লিশটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত। একটী পাণ্ডা ঠাকুর সমাগত যাত্রীকে কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া দিতেছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ একটী পয়সা গ্রহণ করিতেছিলেন। জ্ঞানবাপী কুণ্ডের মুক্তপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সাতফুট্ উচ্চ বৃহৎ বৃষভ-মূর্ত্তি দেখিলাম। নেপালের রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ঔরংজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে মসজিদ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে আদি বিশ্বেশ্বর-মন্দির ছিল। কথিত আছে যে, ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেব এই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। †

মসজিদের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আমি প্রত্যহ প্রাতে মুগ্ধনেত্রে পুরাতন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতাম। সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সেই অংশ দেখিয়া কত কথা মনে আসিত। এই ভগ্নস্তূপ হইতে হিন্দুর স্থাপত্য শিল্পোৎকর্ষের একটা চরম নিদর্শন পাওয়া

* রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের মতে উহা জনৈক মহারাষ্ট্র বিষ্ণু মহাদেও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† জেনারেল কনিংহামের মতে জাহাঙ্গীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কানিংহাম চখের নিকটবর্ত্তী আদি বিশ্বেশ্বর মন্দিরের কথাই বলিয়া থাকিবেন। ঔরংজেব কাশীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সম্প্রতি একটা আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার মূলে একখানি ১৬৫৩ বা ৫৪ খৃষ্টাব্দে পারসীতে লিখিত 'ফারমান'। চট্টগ্রামের উকিল Holy city (Benares) রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু রজনীরঞ্জন সেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজ চক্ষে কাশী-পুলিশের সিটি ইনস্পেকটর খান্ বাহাদুর শেখ মহম্মদ তোয়াবের নিকট মূল দলিলখানি দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে এই ফারমানখানি মঙ্গলগৌরী মহল্লার জনৈক পাণ্ডার নিকট হইতে খান্ বাহাদুর প্রাপ্ত হন। লেফটানাণ্ট কর্ণেল ডাঃ জি, সি, কাইলটের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'Let Abul Hasan worthy of favour and countenance trust to our royal bounty and let him know that, since in accordance with our innate kindness of disposition and natural benevolence the whole of our untiring energy and all our upright intentions are engaged in promoting the public welfare and bettering the condition of all classes high and low, therefore in accordance with our holy Law we have decided that the ancient temples shall not be overthrown but that new ones shall not be built. In these days of our justice, information has reached our noble and most holy court that certain persons actuated by rancour and spite have harassed the Hindu resident in the town of Benares and a few other places in that neighbourhood, and also certain Brahmins, keepers of the Temples, in whose charge those ancient temples are, and that they further desire to remove these Brahmins from these ancient office (and this intention of theirs causes distress to that community) therefore our Royal Command is that after the arrival of our lustrous order you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere or disturb the Brahmins and the other Hindu resident in those places, so that they may as before remain in their occupation and continue with peace of mind to offer up prayers for the continuance of our God-given Empire that is destined to last to all time. Consider this as an urgent matter. Dated 15th of Jumada 'S-Saniya A. H. 1064 (A. D. 165' or 4.)

উপরোক্ত ফারমানের মূল ভাবার্থ জানিবার জন্য আমি শ্রদ্ধাস্পদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রফেসর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন—'ঔরংজীব হুকুম দিয়া কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ভগ্ন করান, একথা তাঁহার সরকারী ফারসী ইতিহাসে লিখিত আছে। সেন মহাশয় যে ফার্ম্মান উল্লেখ করিয়াছেন তাহা Journal of the Asiatic Society of Bengalএ তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত হয়, এবং তাহার একখানি বড় ফটো আমার নিকট আছে। সেখানিতে কাশীর কয়েকজন পূজারীকে রক্ষা করিবার হুকুম দেওয়া হয়; উহার তারিখ বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথম বৎসর, যখন তাঁহার পুত্র মুহম্মদ সুলতান, পরাজিত সুজাকে মুঙ্গেরের দিকে পশ্চাদ্ধাবন করেন।'

যায়। মনে হয় যেন কোন দেবশিল্পী এই মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। হিন্দুর স্থাপত্যসৌন্দর্য্যের গৌরব-স্মৃতির মহিমা মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। এত সুন্দর, এত সুগঠিত মন্দির সম্রাট্ ঔরংজেব কেন ভাঙিয়াছিলেন? প্রজার বেদান্তমূলক ধর্ম্মকে ঔরংজেবের মত ধর্ম্মবিশ্বাসী কেন যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহাও একটা সমস্যার বিষয়। আজিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিধর্ম্মী বলিয়া—ভারতসম্রাট্ শুধু প্রজার স্কন্ধে 'জিজিয়া' কর স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রজার ধর্ম্ম, প্রজার পূজার মন্দির, প্রজার দেবতাকে নষ্ট করিতে—ভাঙিতে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এত করিয়াও কিন্তু তিনি হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের এক কণিকাও বিলোপ করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"করমালা" তালুকে পীড়া।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ডাক্তার ভিতরে বিছানায় বসিয়াই ছিলেন। ইনি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু ব্যবহারে খুব সৎ ও সুশীল। তিনি খুব আস্থা ও যত্নের সহিত ঔষধোপচার করিতেছিলেন, তথাপি ওঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। খুব ঘাম ছুটিতেছিল এবং মুখও ছায়ের মত রক্তহীন দেখাইতেছিল। এক্ষণে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মুখের কাছে কাণ না আনিলে ওঁর মুখের কথা শুনা যায় না। বলিতেছিলেন কি?—সমস্ত দিন কেবলি বলিতেছেন;—"তুমি ঘাব্‌ড়িয়ে যেওনা, ভয় পেয়োনা, মনোযোগ দিয়ে বোতলের উপরকার অক্ষরগুলা ভাল করে' পড়ে তবে আমাকে ঔষধ দিতে থাক। ঘাব্‌ড়িয়ে গেলে ভুল করে আর কোন ঔষধ দেবে"—ইত্যাদি কথা আমাকে সাহস দিয়া দিনের মধ্যে কতবার বলিতেন। শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; সেইজন্য আমার ধড়ে যেন প্রাণ ছিল না। কিন্তু ওঁর সাহসের কথা শুনিয়া আমি যেন নূতন প্রাণ পাইতাম; কিন্তু এখন কথা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমি একেবারেই সাহস হারাইলাম। ধরণী ও আকাশ ছাড়া আমার কাছে যেন আর কিছুই নাই। সেই দয়াময় পরমেশ্বর এখন কোথায়? আজ পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর উপরেই। তিনি ছাড়া এ সময়ে আমার আর কেহ নাই, এ কি তিনি জানেন না? ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, আমি আপন মনে কাঁদিতেছিলাম এবং সেই আবেশভরেই উঠিয়া একবার নাড়ী দেখিলাম। নিকটে ডাক্তার ও কেরাণী বসিয়া ছিলেন। "আমি ভিতর থেকে এখনি আস্‌চি" এই কথা তাঁদের বলিয়া যে দেবালয়ে আমরা নামিয়াছিলাম, সেই মহাদেবেরই মন্দিরের ভিতর দেবতার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি তিনটা। ভিতরে এক বৃদ্ধা পূজারিণী শুইয়াছিল, আমি তাকে বাহিরে যাইতে বলিলাম। কিন্তু সেখানকার দীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমার তা' ভালই মনে হইল। কারণ এই সময় আমার যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে দেবতা ও আমি—আমরা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যেন কেহ না থাকে; একটি দীপও না থাকিলে ভাল হয় মনে হইতেছিল। পারিতাম যদি নিবাইয়া দিতাম, কিন্তু হাত দিতে সাহস হইল না। ও কথা মনে করিলেও অশুভ হয় এইরূপ মনে করিয়া আমি দেবতার সম্মুখে পাগলের মত বসিয়া রহিলাম। মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না বলিয়া দেবতার সম্মুখে মাথা রাখিয়া আস্তে আস্তে—কিন্তু খুব মন খুলিয়া কাঁদিলাম। খুব কাঁদিবার পর, মন একটু হাল্কা হইলে যা মনে হইতেছিল তাই বলিতে লাগিলাম, প্রার্থনা করিলাম এবং সর্ব্বপ্রকারে দীনতার ভাব মনে আসা সত্ত্বেও আক্রোশের সহিত বলিলাম; "আমরা দীন, সঙ্কটে তোমার দ্বারে এসে পড়েছি; তোমার যাহা ভাল মনে হয় সেই ভাবে আমাদের উদ্ধার কর; তুমি অন্তর্যামী সবাই বলে; আমার উপর তোমার যদি দয়া না হয় তাহলে বাহিরে যে একটা বড় কুয়ো আছে সে নিশ্চয়ই দয়া করে তার উদরের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করবে," এইরূপ কত কথাই বকর বকর করিয়া বকিয়া গেলাম। সব রকমে শ্রান্ত হইয়া পড়িবার দরুণ, কি অন্য কারণে, তা কে জানে—এইরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা সত্ত্বেও, কয়েক সেকেণ্ড-কাল সেইখানেই আমার চোখ্ বুজিয়া আসিল। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কোথাও একটা উচু পাহাড়ের উপর দেবালয় আছে আমি যেন সেইখানে গিয়াছি। দেবালয়ের নীচেই কৃষ্ণানদীর প্রবাহ-পথ; তারই ধারে স্থানে স্থানে বট-পিপলের বৃক্ষ;—তাহা বেশ মজবুত করিয়া বাঁধানো; এবং মাঝে মাঝে বড় ঘাট। এইরূপ এক উচ্চ ঘাটের নিকটস্থ বাঁধান বটবৃক্ষের উপরে দুই হাতে ঠেস্ দিয়া নীচের মজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। সেই দিন কোন একটা বিশেষ বড় পরব ছিল। হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও পুরুষ কৃষ্ণানদীতে স্নান করিতেছিল। আমি যে উচ্চ ও বিস্তৃত বটবৃক্ষকে দুই

হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই বড় গাছটা যেন পড়িয়া যাইবে এইভাবে সম্মুখের দিকে ঝুইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার দরুন গাছের বাঁধানো বেদীর মাটী কাটিয়া যাইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম্ এবং দুই হাতে সেই বটবৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব চীৎকার করিয়া নীচের ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম,—ওগো! তোমরা দেখ এই গাছটা পড়ে যাচ্চে, কেহ নীচের থেকে ওকে হাত দিয়ে ধর, আটকাও; যদি পড়েত হাজার লোকের প্রাণ যাবে"—এইরূপ বলিয়া, আমার যতটা শক্তি ছিল, সেই শক্তি ব্যয় করিয়া গাছটাকে আমার দিকে টানিতে লাগিলাম। আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম, আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ইতিমধ্যে নীচের লোকেরা নদী হইতে তিরেপারে দৌড়িয়া আসিয়া হাজার হাজার লোক সেই বট বৃক্ষকে হাত দিয়া আট্‌কাইল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ঐ বৃক্ষ আর বেশী না ঝুঁকিয়া, দৃঢ়ভাবে সেইখানেই রহিল। গাছটা আর নীচে পড়িয়া যাইবে না, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, নীচের লোকেরা হাত ছাড়িয়া দিল এবং আমারও আনন্দ হইল। গাছটাকে তখনও জাপটিয়া ধরিয়া আছি এমন সময় আমাদের শিরেস্তাদার আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি ভীত হইয়া একেবারে উঠিয়া পড়িলাম এবং তখনি সেই ভাবেই রোগীর শয্যার পাশে আসিলাম সত্য; কিন্তু আমাকে কেন ডাকা হইয়াছে, অবস্থাটা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি পাগলের মতো চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ডাক্তার আমাকে বলিলেন, "একটু নীচু হও, উনি তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করেন মনে হয়।" আমি তখনই নীচু হইয়া "ওঁর" মুখের কাছে আমার কাণ রাখিলাম। তখন ক্ষীণ স্বরে আস্তে আস্তে উনি বলিলেন—"আমাকে বসিয়ে দেও। আমার বমি আসচে।" এই কথা শুনিয়া আমি ও ডাক্তার দুজনে মিলিয়া ওঁকে আস্তে আস্তে বসাইয়া দিলাম। তখন খুব জোরে বমি হইয়া গেল। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, ঘাড় নেতিয়া পড়িল। বালিস উঁচু করিয়া ও তাহাতে আস্তে আস্তে ঠেস দিয়া রাখিয়া, ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন। সন্ধ্যাকাল হইতে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটিতেছিল, এক্ষণে তাহা বন্ধ হইল, কিন্তু হাত-পা-ঠাণ্ডা সেই রকমই ছিল; তাই ডাক্তার আমাকে বলিলেন, আমি যা দেব বলে রাত্রি থেকে ভাবচি সেই ঔষধের এক মাত্রা এখন দেও।" আমি তুলসীর রসে হেমগর্ভের ঔষধটা ঘসিয়া তাহাই দুই তিন আঙ্গুল পরিমাণ চাটিতে দিলাম। নাড়ী অস্থির ভাবে চলিতেছিল, যেরূপ হওয়া উচিত তাহা ছিল না; সেই অবস্থায়, রোগের জোর আরও বেশী হইল। এই সময়েই উনি ভরসা হারাইলেন এবং আমাকে বলিলেন—"এখন আমার অবস্থা ভাল নয়। কোথায় পুণা আর কোথায় আমি। তুমি নিতান্তই একলা!" এইরূপ বলিবার পর, আবেগে ওঁর বুক ভরিয়া উঠিল,—ও উনি বলিলেন:—"ভয় নাই, ঈশ্বর তোমাকে দেখবেন; বাড়ীতে তার করে' দুর্গাকে ডাকিয়ে আনো।" আমি আবার হেমগর্ভের-মাত্রা চাটাতে দিলাম এবং ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছিলেন সেই ঔষধ খাওয়াইয়া তারপর কাঞ্জি পান করাইলাম এবং খুব ভরসা দিয়া বলিলাম—"ডাক্তার আমাকে বলেচেন, রাত্রের চেয়ে এখন ভাল আছেন, ভরসা ছেড়ো না। বাড়ীতে তার করেছি; বিশ্রামজী ও ননদ সকালে শীঘ্রই আসচেন।" তখন সকাল ৫টা; ডাক্তার ও আমি দুজনে পাশে থাকিয়া নাড়ী ধরিয়া বসিয়াছিলাম। আমি নামমাত্র হাত ধরিয়া ছিলাম, কিন্তু আমার মন সেখানে না থাকায়, নাড়ীর চলাচল কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বরং নাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া আমি ওঁর মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইলাম; তখন, ডাক্তার "ভয় কোরো না"—হাতের ইসারায় আমাকে বলিলেন। ৫।৭ মিনিটের পর—এখন নাড়ী নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ আমার মনে হইল এবং হয়তো বা একবার ফুকরিয়া কাঁদিয়াও উঠিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে ডাক্তার ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন:—"ভয় নাই, কেঁদো না, আমি মিথ্যা বলচিনে। ঘুম না হলেই খারাপ। এই দেখ, ঘুম এসেছে, এবং হাত-পাও একটু গরম হয়ে আসছে।" তাঁর এই কথা শেষ না হইতে হইতেই আমি ওঁর নিত্যকার নাক-ডাকার শব্দ শুনিতে পাইলাম, তখন আমার মন স্থির হইল। তারপর প্রায় ২০ মিনিট বেশ ঘুম হইয়াছিল। রাত্রি হইতে যে সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে যেন জর আসিবার মতো গরম হইয়া উঠিল। নাড়ীর টোকা অধিক জোরে ও দ্রুত পড়িতে লাগিল। তখনও ঘুমাইতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় পাকা এক ঘণ্টা নিদ্রা হইবার পর, প্রায় ৭টার সময় বিশ্রামজীর গাড়ী আসিল। তাঁকে ও ননদকে দেখিয়া আমার ভরসা হইল। ডাক্তার বিশ্রামজী শয্যার নিকট আসিবামাত্র, তিনি জাতিতে মরাঠা, গোয়ালা হইলেও আমি তাঁর পা ধরিলাম ও পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিলাম—"এখন পর্য্যন্ত এই ডাক্তার দয়া করে' ওঁকে কোন রকম করে' বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন উনি আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্চেন; এখন আপনি ওঁকে রক্ষা করুন। আপনার রূপ ধরে দেবতাই আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন, এই রকম আমার বোধ হচ্চে।" বিশ্রামজী নিকটে গিয়া নাড়ী দেখিলেন। সেই সময় আধা ঘুমন্ত অবস্থা ছিল; তাই ডাক্তারকে লইয়া বিশ্রামজী একটু বাহিরে গেলেন এবং এখন পর্য্যন্ত কি কি ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে তাহার তদন্ত করিতে লাগিলেন। ননদ শয্যার নিকট বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, উনি চোখ মেলিয়া উপরে চাহিলেন। ননদ ও বিশ্রামজীকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"তোমরা এসেছ? দেখ আমার কি অবস্থা!" এবং মনের মধ্যে একটা আবেগ আসিবামাত্র দুর্ব্বলতার দরুণ ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্রামজী, একটু পাখার বাতাস দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন;—"আমি এসেছি, আর কোন ভয় নাই; যা কিছু সঙ্কট সে কাল ছিল। এখন সেটা কেটে গেছে।" এই কথা বলিয়া তিনি নিজের ব্যাগ হইতে বোতল বাহির করিয়া একটা গেলাসে ঔষধ ঢালিলেন এবং তাহাতে একটু জল দিয়া তাহা পান করিবার জন্য সম্মুখে ধরিলেন। তখন উনি আস্তে আস্তে বলিলেন:—"আমাকে বসিয়ে দেও।" আমরা দুজনে ধরিয়া ওঁকে বসাইয়া দিলাম। উনি ডাক্তারের হাত হইতে গ্লাস আপন হাতে লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন:—"পান করব কি?" ডাক্তার বলিলেন "হুঁ"; তারপর ঠোঁটের কাছে আনিয়া, কি

জানি, কি একটা ওঁর মনে হইল। গেলাসটা শয্যার বাহিরে রাখিয়া একেবারে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। "এরূপ কেন করিলেন"? জিজ্ঞাসা করায়, একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"আমাকে তোমরা কেউ এ রকম ঠাট্টা কোরো না; আমার যা নিয়ম তা রাখো; এ-ছাড়া আমাকে আর যে ঔষধ দেবে তা আমি খাব।" এই কথায়, ডাঃ বিশ্রামজী অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, "নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমি এ ঔষধ ব্যবহার করিনে। আপনার স্বভাব আমার জানা আছে। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ও থেকে-থেকে মূর্চ্ছা হচ্চে—এর প্রতীকারের জন্য ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা খাওয়া দরকার এবং পুণায় যাওয়া পর্য্যন্ত আমার এই কথাটা শুনতে হবে; সেখানে গেলে এর বদলে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করব।" এই কথা শুনিয়া, শুধু 'রাম রাম' বলিয়া, নীরবে ও অতি কষ্টে ঔষধটা খাইলেন। এইরূপ সেইদিন ঐ খানেই কাটাইয়া, তারপরই দিন করমালা হইতে আমরা বাহির হইয়া গরুর গাড়ী করিয়া জেউরের ষ্টেশানে আসিলাম। ওঁকে গরুর গাড়ীতেই নরম গদি পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং গাড়ীতে একটুও ঝাঁকানি না লাগে, এইজন্য গাড়ী আস্তে আস্তে চালানো হইতেছিল। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিশ্রামজী, আমি, ননদ প্রভৃতি আমরা হাঁটিয়া চলিতেছিলাম, প্রতি বিশ মিনিট কিংবা অর্দ্ধ ঘণ্টায় ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিতেছিলেন। এইরূপ প্রায় ১১টার সময় আমরা ষ্টেশানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আড্ডা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সেকণ্ড ক্লাসের কামরা রিজার্ভ করিয়া রাত্রি দশটার সময় পুণায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বোম্বায়ে চিরঞ্জীব-বাবা-ভাউজী স্কুলে পড়িত, তাকে পূর্ব্বদিনে তার করা হইয়াছিল। তদনুসারে সে ও প্রিন্সিপ্যাল বামন-আবাজী-মোড়ক জেউরের ষ্টেশানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনুসারেই পুণা হইতে কীর্ত্তনে ও অন্যান্য ব্যক্তি জেউরায় আসিয়াছিলেন; আমাদের পুণায় পৌঁছিবার ২ দিন আগে পীড়ার খবর সহরময় রাষ্ট্র হয়, সেই জন্য সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন ছিল। আজ রাত্রে পুণার ষ্টেশনে ডাণ পাল্কী লইয়া আসিবে, এইরূপ বাড়ীতে তার করিয়াছিলাম। সেই অনুসারে আমাদের বাড়ীর লোক পাল্কী লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সেই সময় অন্য বন্ধুবর্গও ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র পাল্কী আনিয়া গাড়ীর কাম্‌রার গায়ে লাগান হইল এবং যাতে ঝাঁকানি না লাগে—ওঁকে আস্তে আস্তে উঠাইয়া পাল্কীতে রাখা গেল এবং কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কী আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করা হইল। এই পীড়ায় এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মনে একটু আনন্দ বা একটু দুঃখের আবেগ আসিলে তখনই মূর্চ্ছা যাইতেন। সেইজন্যই কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে অনেক দিন পর্য্যন্ত ওঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয় এইরূপ ডাঃ বিশ্রামজী আদেশ করিয়াছিলেন। এই পীড়া ভাল করিয়া সারিতে এবং তাহার পর কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ওঁর প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল।

১৭ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

আদিপর্ব্ব।

গতানুশোচনা। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়।

দৈব। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। (অনুক্রমণিকাধ্যায়-২৮।

পাপ নহে। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। (ঐ ৩১।

ধর্ম্ম। লোকান্তরগতজনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু।

অর্থ ও স্ত্রী। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগপূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। (পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়-৬৫।

দক্ষিণা। যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। (পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়-৮১।

মিথ্যা। মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়। (পৌলম পর্ব্বাধ্যায়-১০১।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। (ঐ ১০৩।

অহিংসা। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। (ঐ ১১৪।

পুত্র। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সন্ততিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সন্ততি লাভ করিতে পারে না। (ঐ ১১৮।

আত্মশ্লাঘা। অকারণে আত্মশ্লাঘা অতিশয় অন্যায়। (আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়-১৭১।

মাতৃক্রোধ। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। (আস্তীক পর্ব্বাধ্যায় ১৭৯।

অধর্ম। বিপদকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, কারণ অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। (ঐ ১৮০।

হিতসাধন। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। (ঐ ১৮২।

দৈব। যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। (ঐ ১৮৩।

রাজা। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। (ঐ ১৯৩।

রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করেন

রাজা। রাজদণ্ড ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয় এবং ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়।

(ঐ ১৯৪।

ক্রোধ। ক্রোধ সংযমী তপস্বীগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন লোকদিগের সঙ্গতি লাভ হয় না।

ক্ষমা। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বীগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্ব্বত্রই মঙ্গল। (ঐ ১৯৫।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পুজনীয় সন্দেহ নাই। (ঐ ২৩৭।

স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে বাস। নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়-৩১৭।

আত্মাবমাননা। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না।

মিথ্যা। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চোরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়। (ঐ ৩২১।

পাপ। লোকে পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন।

আত্মার পরিতোষ। পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহেন যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন।

মিথ্যা। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপ প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না। (ঐ ৩২১।

ভার্য্যা। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা।

ভার্য্যা। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্ম-কার্য্যে পিতার স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ, এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন।

ভার্য্যা। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে, কারণ রতি প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।

স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র।

(ঐ ৩২২-৩।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থপরিচয়।

মাধবী—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। যতীশ লাইব্রেরী চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র মহাশয় লিখিত ভূমিকা-সহ। বিভূতি বাবু ভূমিকায় বলিতেছেন "কিরূপে একটি মুমুক্ষু জীবাত্মা আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ব্যথা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি মানবজীবনের চিরন্তন আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া পরমারাধ্য বাঞ্ছিত দেবতার অন্বেষণ করিয়া লয়, "মাধবীর" বিভিন্ন স্তবক-পরম্পরায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।" এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রায় অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর লাগিল—সদ্যস্ফুট "মাধবী" ফুলের মতই সেগুলি মনোহর —গন্ধ মধুর।

কবিতাগুলি পড়িলে "আলো ও ছায়া"র কবির কথাই মনে পড়ে। শিশুর মতন সরলতা ও আন্তরিকতা এই কবিতাগুলিকে আরো সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। আমরা এই কবির পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তবু কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বলমণি-বিশেষ।

ধ্যানালোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের একখানি চিত্র আছে। এই ভক্ত-কবির 'ধ্যানালোকে' প্রবেশ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম। কবিতা-গুলি বেশ্ গাম্ভীর্য্য ও ভাবপূর্ণ। প্রত্যেক কবিতাতেই কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মনও খুব উদার ও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ। "আহ্বান" শীর্ষক কবিতায় কবি অসঙ্কোচে সকলকে আহবান করিয়া বলিতেছেন—

"কে মহৎ শত ধন্য পূজ্য গরীয়ান্
কে নগণ্য অতি তুচ্ছ ধূলির সমান
তিলেক চিন্তিতে আজি নাহি অবসর—
এস মোর মুক্ত-বক্ষে বিশ্ব-চরাচর!

"স্বদেশের প্রতি" কবিতাটি বেশ গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক :—
"স্তব্ধ কেন দশদিক্,—শান্ত কেন সিন্ধুর গর্জ্জন,
এতো নহে শান্তিছায়া—আসে পুনঃ ঘনায়ে মরণ!"

জন্মভূমির প্রতি কবির কি প্রগাঢ় ভালবাসা :—
"তবু মা জগতে সব জন হতে তোমা
গোপন মরমে ভালো যে বেসেছি ওমা!
সকল হৃদয় বাহিরি গানের ছলে
লুটাতে চাহে মা, তোমারি চরণতলে," ইত্যাদি।

"জপমালা" "নবতীর্থ" "মাল্যদান" "প্রার্থনা" "সম্ভোগ" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা বেশ ভাল লাগিল।

"সাধনাকুঞ্জের" কবির সাধনা সার্থক হউক।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আমরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এই শোক-সন্তপ্ত পিতার দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। কবিতাগুলি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মস্থলোত্থিত কাতর উচ্ছ্বাস—সুখপাঠ্য ও সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত। কতকগুলি কবিতা বেশ কবিত্বপূর্ণ। মোটের উপর এরূপ বিশুদ্ধ-ভাবের কবিতাপুস্তক আমরা অনেকদিন দেখি নাই।

সাহিত্যকল্পলতা ও সুকথামঞ্জুষা—গয়াকাহিনী, নচিকেতা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপরি-উক্ত পুস্তক দুই-

খানি আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যকল্পলতা নামক পুস্তকখানি গদ্য ও পদ্য এই দুইভাগে বিভক্ত। সুরুধামধুরার দুই চারিটী পদ্য থাকিলেও গদ্যের ভাগই অধিক। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম যে, গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালের গতানুগতিকতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণে বরেণ্য হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের পূত জীবনকথা অতি সরল ভাষায়, গল্পচ্ছলে লিখিয়া দেশের ছোট ছোট বালকবালিকাদের সম্মুখে উজ্জ্বল, পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ পুস্তকের দ্বারা বালকদের হৃদয় শৈশব অবধি গঠিত হইলে পরিণামে সুফল হইবে।

পুস্তক দুইখানির প্রথমখানি আট আনা আর দ্বিতীয়খানি চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প্রকাশক শ্রীকালীপ্রসন্ন নাথ; রিপণ লাইব্রেরী, পটুয়াখালি ঢাকা। সম্ভবতঃ প্রকাশকের এই ঠিকানায় পুস্তক দুইখানি প্রাপ্তব্য।

সংবাদ।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানকর পদ লাভ করিলেন।

শোক-সংবাদ।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৮ দিন মাত্র ভুগিয়া রমণীকুলের গৌরব ৺কৃষ্ণভাবিনী দাস গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ ডি, এন, দাসের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ইনি ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তথাপি দেশীয় সমাজ ও দেশীয় ভাষার উপর ইঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ ইনি কয়েকখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজ-সেবা ও ইঁহার জীবনের ব্রত-স্বরূপই ছিল। নিজে কষ্টকর জীবন যাপন করিয়াও যাহাদের জীবন অন্ধকারে আবৃত, যাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবার কেহ নাই,—সেই সকল পতিত, নিরাশ্রয় রমণীমণ্ডলীকে মাতার ন্যায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার অসামান্য উদ্যম বিশেষ প্রসংশার যোগ্য। এমন একজন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীর মৃত্যুতে সমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা যে সহজে পূর্ণ হইবে তাহার আশা খুব অল্প। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান এই পরদুঃখকাতরা রমণীকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি; ভগবান তাঁহাদের উপর শান্তিবারি বর্ষিত করুন।

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গত ১৩ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় "বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার মত কর্ম্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক বাঙ্গালীর মধ্যে খুব অল্প দেখা যায়। ইনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সাহিত্যপ্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং আমরণ সেই ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। পিতৃশোক-সন্তপ্ত তাঁহার একমাত্র সন্তান সতীশ চন্দ্রকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আশা করি তিনি তাঁহার পিতৃগৌরব রক্ষা করিবেন।

ভ্রম-সংশোধন।

অগ্রহায়ণের সংখ্যায় তান্ত্রিক বর্ণবিবরণ প্রবন্ধে কতকগুলি ভুল হইয়াছে।

২০৬ পৃষ্ঠায় ৩য় প্যারার ২য় লাইনে "লকার স্বীকৃত হইয়াছে" এমত হইবে, নকার নহে। ইহারই ৪র্থ লাইনে দুইটি লকারের মধ্যে, ৫ম লকার, এবং অপরটি শব্দ অধিক হইয়াছে। সংস্কৃতাংশে বামকেশ্বরতন্ত্র, রামকেশ্বর নহে। ২০৭ পৃঃ সংস্কৃতাংশে "বিজয়তু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সারদা বঃ" এইরূপ হইবে। ২০৮ পৃঃ ৩য় লাইন "হব্যবহা ও কব্যবহা" এমত হইবে। ২৪ লাইনে "ও পঞ্চাবয়ব সংস্কৃষ্ট" এমত হইবে।
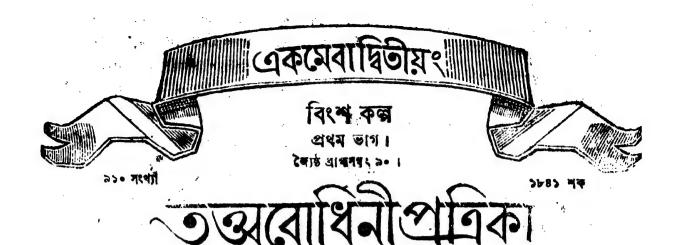
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অনন্ত ও অমৃতের উপলব্ধি।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একটী বৎসর এসেছিল, একটী বৎসর চলে গেল। আর একটী নূতন বৎসরের অভ্যুদয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। নববর্ষের আশাভরসা উৎসাহের অরুণ কিরণ আমাদের নয়নকে মুগ্ধ করে ফেলছে।

এই যে একটী বৎসর এল আর চলে গেল,—কোথায় গেল? এক একটী মুহূর্ত্ত আসছে আর যাচ্ছে—কোথায় যাচ্ছে? বৎসরের পর বৎসর এসেছে আর চলে গেছে—এমন লক্ষকোটী বৎসর এসেছে আর চলে গেছে—কোথায় গেছে? আমরা বলি বটে, এই সকল অতীত মুহূর্ত্ত, অতীত বৎসর অনন্ত কালসাগরে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এই কথার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করতে পারি কিনা সন্দেহ। যে কালের সাগরে কোটী কোটী বৎসর অনায়াসে প্রবেশ করছে, তার কাছে আমাদের এক বৎসর, ১০০ বৎসর, ২০০ বৎসর, ১০০০ বৎসর, ১০০০০ বৎসরই বা কতটুকু? একটী পরমাণুরও সমান নয়। অনন্ত কালের কাছে আমাদের জীবন এত ক্ষুদ্র যে, কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে সে ক্ষুদ্রতা বোঝাবার উপায় নেই। একদিকে কালের সাগরে লক্ষকোটী বৎসর অনায়াসে প্রবেশ করছে, অপরদিকে সেই অনন্ত কালসাগরের কুক্ষি হতে লক্ষকোটী বৎসর উৎপন্ন হচ্ছে, কালের অতীত হয়ে কালের কাল মহাকাল সেই অনন্ত পুরুষের মধ্যে আপনাকে না ডুবিয়ে দিলে সে তত্ত্ব আমরা ঠিক বুঝতেই পারব না।

সেই কালের কাল মহাকাল অনন্ত পুরুষকে জেনে তাঁতে ডুবতে হবে। তাঁকে জানবার জন্য আমাদের দূরে যেতে হবে না। কেবল এক মনে আমাদের অন্তরের দিকে আত্মার প্রতি দৃষ্টি করলেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব, জানতে পারব। সীমার মাঝে অসীম পুরুষকে দেখবার ক্ষমতা, কালের মধ্যে মহাকালকে জানবার ক্ষমতা, মৃত্যুর মাঝে অমৃতস্বরূপকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা করুণাময় পরমেশ্বর নিজেই আমাদের আত্মার অন্তরে মুদ্রিত করে রেখে দিয়েছেন। এই ক্ষমতা যে আমাদের অন্তরে আছে, সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। আমরা যে চোখ দিয়ে দেখতে পাই, আমাদের কানে যে শোনবার ক্ষমতা আছে, সে কথা কি কাউকে বলে দিতে হয়? সেই রকম আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে পারি আর না পারি, প্রাণের ভিতরে এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তির বলে সীমার ভিতর থেকেই অসীমের ভাব, মৃত্যুর ভিতর থেকেই অমৃতের আভাস আমাদের আত্মার অন্তরে জেগে ওঠে। এই ভাব, এই ক্ষমতা আমাদের অন্তরে আছে বলেই জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। একই সীমার ভিতর চিরকাল বদ্ধ থাকতে বাধ্য হোলে উন্নতির নামগন্ধও থাকতে পারত না। মৃত্যুর

* আদিব্রাহ্মসমাজে চৈত্র সংক্রান্তির উপাসনা উপলক্ষে বিবৃত।

অতীত কোন কিছুর আভাস অন্তরে চিরনিহিত না থাকলে মানুষের প্রাণে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা, অমৃতস্বরূপকে জানবার কথা, এ সব কোন কিছু উঠতেই পারত না।

সেই অনন্তপুরুষ আমাদের অন্তরে সীমার মধ্যে তাঁর অসীমভাব বোঝবার ক্ষমতা দিয়েই নিরস্ত হননি; যাতে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সহজে অসীমভাব বুঝতে পারি সেই কারণে এই আকাশে তাঁর অনন্তত্বের ছাপও দিয়ে রেখেছেন। ভেবে দেখলে, এই আকাশ কি, তা আমরা কেউই বলতে পারিনে। এই আকাশের সীমাও আমরা নির্দ্দেশ করতে পারিনে। কিন্তু আমরা এই আকাশকে ভাগ-ভাগ করে দেখতে পারি বলে, আর সেই রকম ভাগ-ভাগ করে দেখবার সময় যতই এগোতে থাকি ততই এগিয়ে যাবার অবসর পাই বলে, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে এই আকাশের কোথাও একটা অভাব খুঁজে পাইনে বলে, সীমার ভিতরে অসীমের আভাস পাই। সেই সঙ্গেই এটাও বুঝতে পারি যে, এই আকাশের সীমা আমরা ধরতে না পারলেও, আকাশের অতীত এমন এক পূর্ণপুরুষ আছেন, যাঁর চোখে আকাশের সীমা লুকিয়ে থাকতে পারে না; যিনি সমস্ত আকাশে এবং আকাশ ছেড়েও যদি কিছু থাকে তবে তাতেও ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেই অনন্ত পুরুষ যে কি ভাবে আকাশে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, কি রকম অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, প্রকৃতিতে সমস্ত আকাশে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি হতে তার সামান্যমাত্র আভাস পাই। এই রকমে এই ছোট স্থানের সীমার ভিতর দিয়েও সেই অনন্ত পুরুষের মহান বিরাট ভাব আমাদের প্রাণের ভিতর জেগে ওঠে। এইখানেই আমরা বলতে গেলে বিন্দুর ভিতর দিয়ে সিন্ধুর উপলব্ধি করতে পারি।

যেমন এই আকাশের বা স্থানের সীমার মধ্যে অনন্ত পুরুষের অসীম ভাব বুঝতে পারি, তেমনি কালেরও সীমার ভিতর দিয়ে সেই মহাকালের অনন্ত ভাব জানতে পারি। এই কালকে যে আমরা সীমাবদ্ধ ভাবে ভাগ-ভাগ করে দেখতে বাধ্য, প্রকৃতি সূর্য্যচন্দ্রের নিয়মিতভাবে উদয়াস্তের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেটা যেন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবার সেই সীমার ভিতর দিয়েই আমরা সেই মহাকালকে উপলব্ধি করতে পারি। এই রকম উদয়াস্ত কতদিন গিয়েছে, আমরা তা কি ভেবে উঠতে পারি? অতীতের দিকে দৃষ্টি করে যতই কেন পিছিয়ে যাই না, তার তো কোন কিনারাই পাইনে। যে সময় আমাদের পৃথিবী জন্মগ্রহণ করে নি, সে সময়েও সূর্য্য কত কোটী কোটী বৎসর অন্য কোন সূর্য্যের চারধারে ঘুরে নিজের উদয়াস্ত ঠিক করেছিল, সে কথা ভাবতে গেলেও বুদ্ধি কল্পনা সমস্তই হার মানে। আবার সামনের দিকে এগিয়ে কালের বিস্তৃতি যতই ভাবতে থাকি, কোথাও তো তার সীমা খুঁজেই পাইনে। এ কথা তো মনেই করতে পারিনে যে যে কালের ধ্বংস হয়েছে—কাল আর নেই। এই রকমে কালের সীমার ভিতর দিয়েই আমরা মহাকালের মাঝে অসীম ভাবের আভাস পাই। আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি যে, সেই মহাকালের অতীত এমন এক পূর্ণপুরুষ আছেন, যাঁর দৃষ্টির কাছে কালের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই উন্মুক্ত হয়ে আছে।

এই আকাশের ভিতর দিয়ে, এই কালের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত পুরুষকে দেখা দূর করে দেখা। তাঁকে আসলে দেখতে গেলে আত্মার ভিতর দিয়েই দেখতে হবে। আত্মার ভিতরে তাঁকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঋষিরা সেই অনন্তদেবকে পরমাত্মা এবং আত্মার আত্মা বলেছেন, আর আত্মাকে পরমাত্মার হিরণ্ময় কোষ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন বলে উল্লেখ করেছেন।

যেমন আমরা আকাশ বা কাল আসলে কি জিনিস তা বলতে পারি নে, অথচ বুঝি জানি যে আকাশও আছে, কালও আছে; তেমনি আত্মা যে আসলে কি জিনিস তা বলতে না পারলেও বুঝি জানি যে আত্মা আছে। আত্মার স্বরূপ হোল "আমি" বলে নিজেকে জানা। আমরা বেশ জানি যে, আমাদের ভিতরে আমি বলে একটা জিনিস আছে, যেটা শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অথচ শরীরকে অবলম্বন করে অনেক কাজ কর্ম্ম করে। এই শরীরের ভিতর আত্মা যে কখন্ এল, আর কখন্ যে এই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে; সূক্ষ্মতম পরমাণুর

বিষয় আলোচনা করবার সময় আত্মা তার ভিতর অনুপ্রবেশ করে, কিম্বা সুদূরতম নক্ষত্রের বিষয় আলোচনা কালে সে পর্য্যন্ত আত্মা নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেয়, এ সমস্ত কিছুই ঠিক করে আমরা বলতে পারি নে। কিন্তু এইটুকু জানি যে আত্মা আছে, আত্মা দেখে, শোনে এবং সেই সঙ্গে সে জানে বোঝে যে, সে-ই দেখছে, শুনছে।

আমাদের আত্মা যে সীমাবদ্ধ, ঐ যে আত্মা নিজের পূর্ব্বাপর জানতে পারে না, তা থেকেই তো বেশ বোঝা যায়। তা ছাড়া আমরা একের বেশী চিন্তাও একই সময়ে করতে পারি নে, একের বেশী জ্ঞানও একই সময়ে অর্জ্জন করতে পারি নে। একটার পর একটা ধোরে ধাপে ধাপে আত্মাকে উঠতে হয়। আমার ছাড়া আমার মতো কত লক্ষ কোটী আত্মা জগতে বিচরণ করছে—প্রত্যেকের একটা না একটা বিশেষত্ব আছেই। এই খানেই তো আমাদের আত্মার সীমার ভাব বুঝতে পারছি, অথচ ঠিক কোথায় তার সীমা তা ধরবার কোন উপায় নেই।

আত্মা সীমাবদ্ধ হলেও সীমার ভিতর দিয়েই সেই অসীম অনন্ত পুরুষকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। ঐ যে আত্মা ধাপে ধাপে জ্ঞানের পথে ইচ্ছার পথে চিন্তার পথে উঠতে থাকে, তার তো কোনই সীমা পাওয়া যায় না। হঠাৎ কোন জ্ঞানের ভিতর ঢুকতে চাইলে সে বাধা পেতে পারে বটে, কিন্তু ধাপে ধাপে চলে গেলে তার কাছে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অনন্ত কর্ম্মের রাজ্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আছে। এইখানেই সে সীমার ভিতর দিয়েই অসীমের উপলব্ধি করতে পারে। এই অসীমের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে যে এই অনন্ত জ্ঞানের পশ্চাতে অনন্ত কর্ম্মের পশ্চাতে এক জ্ঞানময় ইচ্ছাময় পূর্ণ পুরুষ আছেন, যাঁ থেকে এই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের স্রোত অবিরল ধারে নেমে আসছে।

আত্মা সেই পরমাত্মাকে নিজের জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছার ভিতরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে বলার চেয়ে আত্মা পরমাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে, ছুঁয়ে থাকে বলাই বেশী ঠিক। পরমাত্মাকে স্পর্শ করবার শক্তি তিনি নিজেই আত্মাতে দিয়ে রেখেছেন। আত্মা নিজেই জানতে পারে যে, সে পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী। আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের সঙ্গে একই ধর্ম্ম একই গুণবিশিষ্ট, সূর্য্যের একটী রশ্মি যেমন সূর্য্যের সঙ্গে আসলে সমধর্ম্মী, আত্মাও সেই রকম পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী। আত্মা কেমন করে পরমাত্মার সঙ্গে সমধর্ম্মী হোল, তা সে জানে না ; কিন্তু সে প্রকৃতিতে যে অনন্ত পুরুষের বিরাট জ্ঞান, বিরাট ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেখতে পায়, সে বুঝতে পারে যে তার নিজের ভিতরে যে জ্ঞান, যে ইচ্ছাশক্তি আছে, সেই জ্ঞান, সেই ইচ্ছাশক্তি ঐ বিরাট জ্ঞান, ঐ বিরাট ইচ্ছাশক্তিরই অনুরূপ, একই ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট। তাই সে চেষ্টা করলে পরমাত্মাকে জেনেশুনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে।

আত্মা পরমাত্মাকে যেমন অনন্তপুরুষ বলে উপলব্ধি করে, তেমনি তাঁকে অমৃতস্বরূপ বলেও জানতে পারে। মৃত্যু যার আছে, ধ্বংশ যার আছে, বিনাশ যার আছে, তারই তো সীমা রইল। কিন্তু অনন্ত পুরুষ যখন অনন্তস্বরূপ, তখন তাঁর সীমা কোথায়, মৃত্যু কোথায় ? আত্মা সেই পরমাত্মাকে কেবল জ্ঞানে অমৃতস্বরূপ জেনে ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু নিজের অন্তরে সেটা উপলব্ধি করতে চায়, আর উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা নিজে অমরণ-ধর্ম্মা বলেই সেই অমৃতস্বরূপের সহবাস উপভোগের শক্তি ধারণ করে। যাতে আমরা প্রকৃতি থেকে অনন্তভাব সহজে বুঝতে পারি, সেই জন্য যেমন অনন্তস্বরূপে পরমেশ্বর আকাশে কালে তাঁর অনন্তভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন, তেমনি তাঁর অমৃতভাবও প্রকৃতি থেকে সহজে উপলব্ধি করতে পারব বলে প্রকৃতির শক্তি ও বস্তু সকলকে আমাদের ধ্বংস করবার শক্তির অতীত করে দিয়ে প্রকৃতিতে তাঁর অমৃতভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন শক্তির ধ্বংস বিনাশ বা মৃত্যু নেই—তাদের আকার পরিবর্ত্তন হোতে পারে। উত্তাপ থেকে তড়িত হোতে পারে, তড়িৎ থেকে উত্তাপ হোতে পারে, কিন্তু তড়িত বা উত্তাপ, কোন শক্তিরই একটী বিন্দুও নষ্ট হোতে পারে না। সেই রকম একটী পরমাণুকেও ধ্বংস করবার শক্তি আমাদের নেই।

একটী পরমাণুও ধ্বংস করতে পারলে সমস্ত ধ্বংস করবার ক্ষমতা আমাদের থাকত। যখন একটী পরমাণুর, একটী শক্তিরও মৃত্যু বা ধ্বংস হোতে পারে না, তখন যে আত্মা ইচ্ছার বলে বিশ্বজগত পরিচালনের ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে, যে আত্মা ইচ্ছার বলে অমৃত পুরুষের সহবাস লাভ করতে পারে, সে আত্মারও যে সত্যি সত্যি মৃত্যু নেই, ধ্বংস বা বিনাশ নেই, সে কথা আর দুবার করে বলতে হবে না।

মৃত্যুই যদি নেই, তবে ভগবানের কাছে মৃত্যু হোতে অমৃতস্বরূপে নিয়ে যাবার প্রার্থনা কেন? আমরা মৃত্যু কাকে বলি? একটুখানি ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, পরিবর্ত্তন হচ্ছে বলে না জেনে পরিবর্ত্তনকেই আমরা মৃত্যু বলি। একটা গাছের মৃত্যু হোল যখন বলি, তার অর্থ এই যে, সেই গাছটা যে ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, যে ভাবে হেলে দুলে ধরিত্রীর বুক থেকে আহার সংগ্রহ করছিল, মৃত্যুর পরে আর সে ভাবে কোনই কাজ করে না; তাছাড়া তার শরীরের আকারে প্রকারেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে অথচ আমাদের মনে হয় যে, সে এই পরিবর্ত্তনের কথা জানে না জানতে পারে না। কিন্তু তার তো একেবারে বিনাশ হয়নি। এই পরিবর্ত্তন বা মৃত্যুর মধ্যেও এমন একটী অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ দেখা যায়, যার বলে সেই মৃত গাছের ধ্বংসাবশেষ থেকেও অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করে, নূতন নূতন প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই রকম আমাদের শরীরেরও তার নিজের অজ্ঞাতেই প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু বা বদল হচ্ছে, কিন্তু তার ভিতর অবিনাশী আত্মা আত্মহারা হয় না—সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমি একজন আছি, এই জেনে স্থির হয়ে বসে থাকে। আত্মারও যে একেবারে পরিবর্ত্তন হয় না, সে কথা বলি কি করে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে আত্মা জ্ঞান অর্জ্জন করছে, প্রেমে বর্দ্ধিত হচ্ছে, তাকে পরিবর্ত্তন বলব না তো কি বলব? কিন্তু এখানে পার্থক্য এই যে, আত্মা জানতে পারে যে তার এই বদল হচ্ছে, ঐ বদল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারে যে, তার সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুবসত্য কেন্দ্র হয়ে বসে আছেন। গীতা ঠিকই বলেছেন যে দেহী বা আত্মা অবিনাশী হলেও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন নূতন জ্ঞানোজ্জ্বল, প্রেমোজ্জ্বল, ধর্ম্মোজ্জ্বল শরীর পরিগ্রহ করে।

কিন্তু আত্মার প্রাণের কথা এই যে, এইটুকু পরিবর্ত্তনও বা তার হবে কেন? তাই সে অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত প্রেমের অধিকারী হয়ে অমৃতস্বরূপকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমরা দেখি যে মানব জন্ম অবধিই মৃত্যুকে অতিক্রম করে' অমৃতত্বলাভের জন্য তৎপর। এই ভাব থেকেই সে শৈশব অবস্থায় নানাবিধ ভীষণ ভীষণ জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই আত্মরক্ষার চেষ্টা থেকেই সে বুঝতে পারল যে তার অমৃতত্বলাভ করবার পক্ষে অজ্ঞানই গুরুতর বাধা। তখন আবার মানুষ সেই অজ্ঞানের বাধা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য সচেষ্ট হোল। জ্ঞানের পথে এগোতে এগোতে প্রকৃতির উপর যথেষ্ট আধিপত্য বজায় করলেও সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান তাকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য দিলেও তাকে অমর করতে পারে না, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না, কেননা এ জ্ঞানের কারবারই হোল মৃত্যুকে নিয়ে। প্রতিপদে মৃত্যুকে দেখে দেখে যখন সে মৃত্যুর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, মৃত্যুর সঙ্গে খেলার উপর তার প্রাণের একটা ঘৃণা এল, তখনই সে দেখতে পেল যে, এই শত মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতপুরুষ শান্তিজল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তখনই সেই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠল। তার প্রাণের ভিতর একটা গভীর-গম্ভীর প্রশ্ন ফুটে উঠল—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং—যাতে আমি অমর না হই, তা নিয়ে কি করব? তার প্রাণের ভিতর একটা পাগলের কান্না এসে জুটল; সে নিজের মনে বলতে লাগল—চুলোয় যাক আমার ঘরবাড়ী, চুলোয় যাক আমার টাকা কড়ি; থাক পড়ে' আমার স্ত্রীপুত্র, থাক পড়ে' আমার বাপ মা ভাইবোন বন্ধুপরিজন; আমি এ সমস্ত নিয়ে মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে থাকতে চাইনে—আমি চাই আমার সেই জীবনবল্লভ প্রাণনাথকে, যাঁর সহবাসে আমি মৃত্যুকে

অতিক্রম করতে পারব, মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এই রকম করে' মানুষ ক্রমেই, যিনি সকল মঙ্গলের নিদান, সমস্ত উন্নতির মূল, সেই অমৃতপুরুষের সহবাসলাভের জন্য এগিয়ে গিয়ে উন্নতির শিখরে উঠতে থাকে। উপনিষদের সময়ে এই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য প্রার্থনার ভাব ভারতবাসীর মনে খুবই সজাগ হয়ে উঠেছিল, তাই সে সময়ে ভারতের যে উন্নতি হয়েছিল তার তুলনা কোথায়? এই প্রার্থনার ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেও আর এক আকারে সমুদয় ভারতভূমিকে ছেয়ে ফেলেছিল, তাই সে সময়েও ভারতের যে কি অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল, তা শিক্ষিত ভারতবাসীকে বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন দেখিনে। এই দুই যুগে ভারতের মনীষিগণ যে সকল আশ্চর্য্য সত্যতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, আজও সমগ্র জগত অবনতমস্তকে সেগুলি গ্রহণ করে কৃতার্থ হচ্ছে।

গত বৎসর দুঃখ শোক, মহামারী, অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষ, মহাসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যা আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ কেঁদে উঠে বলেছিল, এই মৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসারকে আমি চাইনে—চাই সেই অমৃতপুরুষকে, যাঁকে পেলে মৃত্যু আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। জগতের প্রাণ সেই অমৃতপুরুষকে চেয়েছিল বলেই ন্যায়ের ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার উপায় হোল, শান্তিস্থাপনের সূচনা হোল। জগতের প্রাণের অন্তরে অন্তরে অমৃতপুরুষকে পাবার প্রার্থনা জেগে উঠেছিল বলেই কোথায় রুষিয়া, আর কোথায় আমেরিকা, যে সুরাপান মানুষকে ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেই সুরারাক্ষসীকে এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাসিত করে দিল!

চারদিকে চোখ কান খুলে চল্লে বেশ বোঝা যাবে যে, এই দরিদ্রতম ভারতেরও অধিবাসীদের প্রাণের ভিতর থেকে সেই অমৃতপুরুষকে পাবার জন্য এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠবার কারণেই

আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে দুর্ভিক্ষ মহামারীর ভিতর থেকেও ভারতবাসী মঙ্গলের পথে উন্নতিরই পথে দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে। দারিদ্র্য দূর করবার উপায়, মহামারীর প্রতিবিধানের পথ সেই অনন্তমঙ্গল পরমেশ্বরই আমাদিগকে দেখিয়ে দেবেন। নববর্ষের মুখে তিনিই আমাদিগকে অভয় দিচ্ছেন—আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনি মাভৈঃ মাভৈঃ বলে আমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করবার জন্য ভারতবর্ষে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখ চেয়ে, তিনি একদিকে পিতার মূর্ত্তিতে আমাদের বর্ম্মদুর্গ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করছেন, আর একদিকে তিনি মায়ের মূর্ত্তিতে আমাদের কোলে নিয়ে সমস্ত আঘাতে শান্তিজল ছিটিয়ে কঠিন ব্যথাও দূর করে দিচ্ছেন।

এস এই বৎসরের শেষে, নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁকে হৃদয়ে রেখে পুরাতনের দুঃখশোক সমস্ত দূর করে' দিয়ে নববর্ষের নূতন আশাভরসা নূতন জ্ঞান প্রেম অবলম্বন করে নিজেকে উন্নতির পথে অমৃতলাভের পথে পরিচালিত করে দিই। মৃত্যুরও বিভীষিকাতে আমাদের ভয়ের কারণ নেই—সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মা অমৃতভাণ্ড নিয়ে আমাদের অন্তরেই সর্ব্বদা জাগ্রত হয়ে আছেন।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

আদিপর্ব্ব।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

আত্মদৃষ্টি। কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান বোধ করে; কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখ-শ্রী নিরীক্ষণ করে তখন আপনার ও অন্যের রূপপ্রভেদ জানিতে পারে।

বাচালতা। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে।

মূর্খ। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ মাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পণ্ডিত। হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন।

সুজন ও দুর্জ্জন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়।

সাধু ও অসাধু। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে।

সাধু ও অসাধু। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে, কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না।

(সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়—৩২৮।৯।

সত্য। শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্রোৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যই পরব্রহ্ম; সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। (ঐ ৩৩০।

কাম। কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কাম। যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

অনিষ্ট না করা। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করে তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।

গুরু। সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ, ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়। (ঐ ৩৪৭।

কর্ম্মফল। আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। (ঐ ৩৫৪।

ক্ষমা। যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত।

ক্রোধ। সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলেন।

ক্ষমা। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়।

উপেক্ষা। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন।

ক্রোধ। যিনি ক্রোধাবেশ সম্বরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রোধ। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধী ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। (ঐ ৩৫৫।

তোষামোদ। যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ-প্রত্যাশায় ধনীগণের উপাসনা করে বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম।

(সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৫৬।

অধর্ম্ম। অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। যদিও অনুষ্ঠান-কর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তথাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

(ঐ ৩৫৭।

পরনিন্দা। যে সকল লোকেরা আচারব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না আর যে স্থানে বাস করিলে, আচারব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে সেইস্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প।

(ঐ ৩৫৬।

মিথ্যা। সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়। (ঐ ৩৬৮।

মিথ্যা। রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল; মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন। (ঐ ৩৬৮।

দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে

আশা। পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (ঐ ৩৮০।

কাম। ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। (ঐ ৩৮০।

ক্রোধ। অক্রোধন ক্রোধ-পরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্ষমাবান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মানুষ অমানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান মূর্খ হইতে প্রধান। যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু আক্রোষ্টা ক্রোধানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। (সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৮৫।

বাক্য-বাণ। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।

বাক্য-বাণ। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত।

অর্থগ্রহণ। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য।

বাক্য-বাণ। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে।

ধর্ম্ম-লক্ষণ। জীবের প্রতি দয়া মৈত্রী দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না।

যাচ্ঞা। পূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ। (ঐ ৩৮৬।

পাপ। সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপ।

পাপ। পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়।

অতিহর্ষ। বহুধনের অধিপতি হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে।

দৈব। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, অতএব দৈবই বলবান্ এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষণ্ণ বা সুখে উল্লসিত হইবে না। (ঐ ৩৮৮।৯।

ধর্ম্ম-সাধন। তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটী স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।

মান ও অপমান। মানে হর্ষপ্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও না।

অহঙ্কার। অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (ঐ ৩৯৫।

যাচ্ঞা। বরং অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচ্ঞাজনিত লঘুতাস্বীকার করা অনুচিত। (সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৩৯৯।

স্ত্রী। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (ঐ ৪৮১।

ত্যাগ। যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয় তাহা অবশ্যই করিবে। যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম পরিত্যাগ করিলে যদি জনপদ রক্ষা হয় তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয় তাহাও বিধেয়। (ঐ ৪৯৫।

কর্ম্মফল। যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। (ঐ ৫০৩।

দৈব। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। (ঐ ৫২৩।

দৈব। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। (ঐ ৫৩৩।

বন্ধুতা। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়।

বন্ধুতা। যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যস্থাপন করা উচিত। (ঐ ৫৬৩।

রাজার দম্ভ। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দম্ভ বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। (সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৬১১।

রাজার কর্ত্তব্য। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা (রাজার পক্ষে) অতীব কর্ত্তব্য, কারণ অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। (ঐ ৬১১।

শত্রু। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। (ঐ ৬১২।

বশীকরণ। ভীতব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের নিকট বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থ দান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে।

শত্রু। পুত্র সখা ভ্রাতা পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে।

গুরুর শাসন। যদি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে।

ক্রোধ। কোপাক্রান্ত হইয়া কখনও অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না।

শত্রু। শাস্ত্র বাক্য ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। (ঐ ৬১৭।৮।

পরোপজীবী। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে। (ঐ ৬২৭।

জ্ঞাতি। যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরম সুখে কালযাপন করে। (ঐ ৬৫৫।

অঙ্গীকার। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। (ঐ ৬৭২।

ধর্ম্ম। যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে। (হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায় ৬৭২।

কৃতজ্ঞতা। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ পুরুষ। ঐ ৬৭৯।

অর্থ। অর্থপ্রাপ্তি নরকভোগের প্রধান কারণ।

অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক। যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। (বকবধ পর্ব্বাধ্যায় ৬৮০।১।

অর্থ। আপদ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা কি ধন যাহা দ্বারা হউক আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান হইবে। (ঐ ৬৮৯।

লোক। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না। (চৈত্ররথ পর্ব্বাধ্যায় ৭৬৪।

দৈব। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য।

অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়। স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। (বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায় ৮২১।২।

দৈব। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ। পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। (বিদুরাগমন পর্ব্বাধ্যায় ৮২৭।

কীর্ত্তি। কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান হও।

কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল।

কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবনধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা। (ঐ ৮৩৬।

শরণাগত। শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য। (ঐ ৮৮৩।

বুদ্ধিমান। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন, বিপদকালে কদাচ ব্যথিত হন না। (খাণ্ডবদহন পর্ব্বাধ্যায় ৯৩৯।

ভবিষ্যৎপ্রতীক্ষা। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়। (খাণ্ডবদহনপর্ব্বাধ্যায় ৯৪৫।

স্ত্রী। স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিক-বিনাশক বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই। (ঐ ৯৪১।

নীতি। অজীর্ণ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই। (চৈত্ররথ পর্ব্বাধ্যায় ৭৬৩।

ক্রমশঃ।

"আনন্দ-সন্ধ্যা নামে"

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

(বাহার)

আজি আনন্দ-সন্ধ্যা নামে
পবন মুখর কর,—গানে!
এস মুখে লয়ে কম-কান্তি
এস অন্তরে লয়ে সুখ-শান্তি
এই তারা-ভরা আকাশে গানটি
ভরি লও তব প্রাণে!

আজি ফুটে ওঠ সন্ধ্যার ফুলে—
দাঁড়াও রে অকূলের কূলে!
দূরে যাক্ মোহ, দূরে যাক্ ভয়
দূরে যাক ক্ষোভ, সব সংশয়
সুরে সুরে আজি, ভরুক হৃদয়
ছেয়ে যাক্ তানে তানে॥

পুরাতন ও নূতন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

পুরাতন বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্ত কাল-সাগরে একটী বুদ্‌বুদ্ বিলীন হইল। পুরাতন বৎসর তাহার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি লইয়া বিশ্রামের আশায় অনন্তের ক্রোড়ে ডুবিয়া গিয়াছে, আর নবীন প্রভাতের উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষার সুবর্ণ-রেখারঞ্জিত নববর্ষ পূর্ব্বাশার দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিয়া আমাদের নয়নসম্মুখে সমুদিত হইতেছে। এই প্রকার কালচক্র অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতেছে। এই কালবিঘূর্ণনে আমরা প্রতিদিন নিজেকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উষার অস্ফুট অরুণ-আলোক আমাদিগকে নূতন সৃষ্টির আভাস প্রদান করে; কুসুমে কুসুমে সৌন্দর্য্যের নূতন বিকাশ দেখিতে পাই। দেখি—সমস্ত দিনের পর পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নূতন কুসুম—নববর্ণে, নব গন্ধে তাহার বিকাশ। প্রকৃতির মধ্যে এই নবীনতা এই সজীবতা রহিয়াছে বলিয়া আমাদের জীবন রমণীয় হইয়াছে। এই সজীবতা না থাকিলে আমাদের বদ্ধ জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিত। প্রতিদিন আমরা যেমন নিজেকে নূতন করিয়া অনুভব করি, বৎসরান্তে সেইরূপ আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সহিত মিলিত হইয়া একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। শুধু আপনাকে লইয়াই মানুষের চলে না—পাঁচজনকে লইয়া যে মানবসমাজ মানবজাতি গঠিত হইয়াছে। তাই সমাজের জীবন, জাতির জীবন রক্ষা করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে আমাদের একত্র হইয়া মিলিত জীবনকে অনুভব করিয়া লইতে হয়। আজ এই নববর্ষের প্রথম দিবসে আমাদের জীবনের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিকে মিলাইয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন হইল আমাদের জীবনের আহ্নিক গতি, আর আমাদের সামাজিক জীবনই হইল আমাদের জীবনের বার্ষিক গতি। আজ নূতন বৎসরের প্রথম অভ্যুদয় দিবসে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়ভাবেই পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইব।

জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য, জীবনের গতি-শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলে আলস্য ও জড়তাকে পরিহার পূর্ব্বক পুরাতনকে বিদায় দেওয়া আবশ্যক হয়। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। পুরাতন যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরবর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের প্রাণের উপর দুর্ব্বহ পাষাণভার চাপাইয়া রাখে, তাহা হইলে তো আমাদের জীবন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিবে, আমাদের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিবে, আমরা ক্রমে ক্রমে জড়ে পরিণত হইব।

বর্ত্তমান যুগে এক নূতন শক্তি, নূতন প্রেরণা আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবনের নবতর অভিব্যক্তির অভিমুখে আমরা ধাবিত হইতেছি। নির্জ্জীব পুরাতনকে লইয়া সে কর্ম্মের জগতে তো চলা যাইবে না। তাই পুরাতনের সহিত নূতনের যোগের কেন্দ্র স্থির রাখিয়া পুরাতনের নির্ম্মোক নির্ম্মমহৃদয়ে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনের সঙ্গে আমাদিগের চলিতে হইবে। জানি, ইহাতে হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে, প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইবে; তবু তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতে হইবে—সে যে মৃত, প্রাণহীন; সে যে শুধু ভারবন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে মোহের বন্ধন আছে, মুক্তির অমৃত নাই। তাই পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নহে, সমগ্র জাতিরও জীবনে পুরাতনের নির্ম্মোক এই ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া নূতন মন্ত্রের নবশক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। হইতে পারে, পুরাতন আমার অতি প্রিয় ছিল; হইতে পারে, পুরাতনের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস আছে। কিন্তু সমস্ত পুরাতনটা যে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, তাহা তো আমরা দেখিতেছি না। পুরাতনের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস থাকিলেও তাহাকে লইয়া আমাদের জীবনযাত্রা আর চলিতে পারে না। আবশ্যক মনে কর, সেই সকল ভাল জিনিস পুরাতন হইতে সরাইয়া লইয়া নূতনের সঙ্গে গাঁথিয়া লও। কিন্তু যে সমস্ত পুরাতন প্রথা, সামাজিক বন্ধন অতীতকালের প্রয়োজন সাধন করিলেও বর্ত্তমানে উন্নতির প্রতিবন্ধক মিলনের প্রতিবন্ধক অভ্র-

ভেদী প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে, আজ সেই অনিষ্টকর প্রথা ও বন্ধনসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দিন আসিয়াছে। নির্ম্মমহৃদয়ে সেই প্রথাজীর্ণ বন্ধনশীর্ণ পুরাতনকে বিসর্জ্জন না করিলে নূতন জীবনীশক্তির প্রসন্নতা আমরা লাভ করিতে পারিব না। যুগযুগান্তর হইতে বন্ধনের উপর বন্ধন স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসে আমাদের ধর্ম্মজীবন ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; ক্রিয়াকর্ম্ম সকল অর্থহীন শ্রদ্ধাহীন শব্দাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমাদের জীবনপ্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিক্ নানাপ্রকার জঞ্জাল আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই আজ অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, অভাব, দৈন্য, হাহাকার চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের সমাজের রক্ত শোষণ করিয়া লইতেছে। মহাদেব যেমন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আমরাও আজ সেইরূপ পুরাতনের মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাই আমাদের ক্রন্দন সার হইয়াছে, আমাদের অভাব দূর হইতেছে না; জীবনসংগ্রামে আমরা জয়লাভের উপযুক্ত বল পাইতেছি না। অমৃতের পুত্র হইয়া মৃত্যুকে আমরা চিরসহায় করিয়া লইতেছি, তাই জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত যে সরসতা যে নবীনতার প্রয়োজন, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি; সমস্ত কল্যাণের মধ্যে আমরা কেবল অমঙ্গলেরই পরিচয় খুঁজিতেছি, মৃত্যুরই বিভীষিকা দেখিতেছি।

ওদিকে পৃথিবীর সমস্ত জাতি মৃত্যুর অগ্নি-পরীক্ষার ফলে নবজীবনের অমৃতরস পান করিয়া বিদ্বেষ-যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিয়া মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চলিয়াছে; আমেরিকা সুরারাক্ষসীকে জাতীয় কল্যাণের পরম অন্তরায় জানিয়া চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে; সমগ্র জগত নবভাবে সংগঠিত হইবার পথে চলিয়াছে। এই নবজাগরণের তরঙ্গ ভারতবর্ষকেও আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের আর আলস্য করিবার অবসর নাই। নূতন প্রাণশক্তিকে লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতে হইবে। নববর্ষ নূতন যুগের উপযোগী জ্ঞানধর্ম্মের ধারা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—আমাদের সকলের একতার বলে বলীয়ান হইয়া নববর্ষকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হইবে। জগতের সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্রে ভারতেরও কার্য্য আছে। সেই কর্ম্মের অধিকার আমাদিগকে আপনার বলে অধিকার করিতে হইবে। বাণিজ্য, জড়বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির উন্নতি সাধনের ফলে পাশ্চাত্য দেশ বস্তুতন্ত্রকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলিতেছে। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রকে অধ্যাত্মতন্ত্রের অধীন করিয়া আনা, উভয় তন্ত্রের যথাযুক্ত সম্মিলন সাধন করাই আমাদের মুখ্য কার্য্য; ইহারই জন্য আজও ভারতবর্ষ জাগিয়া আছে। এ ভার আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর দেখি না। ভারতের রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, সার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বরেণ্য মনীষীগণ উভয়তন্ত্রের যোগধারা বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইলেই বিশ্বে কল্যাণের কল্পতরু প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বগগনে সূর্য্যোদয়ের আভাস আমরা ঊষার প্রথম অরুণ-আলোকেই পাইয়া থাকি। আমাদেরও সম্মুখে যে নূতন জীবন সমুপস্থিত, আজ তাহার আভাস আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি। নবযুগের নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সেই নূতন মন্ত্র প্রভাতসমীরে চালিত হইয়া দিকে দিকে ভারতবাসীকে নবজাগরণের সংবাদ প্রদান করিতেছে। আজ তাই ভারতের মনীষীবৃন্দ জাতীয় জীবনের কলঙ্কমোচনে অগ্রসর; যুগযুগান্তরের সঞ্চিত দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই নূতন মন্ত্র হইতেছে এই যে, ঈশ্বরকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া সত্যকে অবলম্বন কর। সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের বলে জগতে অসাধ্য সাধিত হয়, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আমাদিগকে নববর্ষে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা মিথ্যা, যে সকল প্রথা, ধর্ম্মবিশ্বাস সত্যের মুখোস পরিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতে এবং আমাদের উন্নতির পথে বাধাপ্রদানে উদ্যত হয়, সেই সকল বাধা ও ভয় হইতে আমা-

দের অন্তঃকরণকে মুক্তি দিতে হইবে। সত্য রক্ষার জন্য ভারতবাসী যে জাতিনির্ব্বিশেষে আত্ম-বলি দিতে অগ্রসর হইতেছে, সর্ববপ্রকার নির্য্যাতন ও ভ্রূকুটীকে তুচ্ছ করিয়া অধ্যাত্মশক্তির অনুপম বলের পরিচয় দিতেছে—ইহাই তো আমাদের নব-জীবনের সূত্রপাত; এই শক্তিকেই জীবনব্যাপী কঠোর সাধনের দ্বারা প্রাণের ভিতর সঞ্চিত রাখিতে হইবে। অগ্নিদাহ্য পদার্থের ন্যায় অতী-তের সকল তুচ্ছ বাধাবিঘ্ন নবজীবনের তেজে ভস্মী-ভূত হইয়া যাউক।

এই উন্নত মন্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে সাধন করিলে চলিবে না, আমাদের সকলের মিলিত-ভাবেও ইহার সাধন করিতে হইবে। সুদূর অতীতের ঋষিগণ ভারতের শ্যামল শান্ত তপোবন হইতে মিলিতভাবে ঐ মহামন্ত্র সাধনের জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চলো, এক সঙ্গে কথা কও, তোমরা পরস্পরের মন জান। মিলিতভাবে সাধনা করিলে মন্ত্রশক্তি শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রেরণা আনয়ন করিবে। মিলিত সাধনা হইতেই আমরা সহজে ভূমা পরমেশ্বরের সংস্পর্শ লাভ করিব।

হে ভারতের দেবতা, আমাদের অন্তরে তোমার নাম চিরকাল ধ্বনিত হউক। সত্যের সাধন সার্থক হউক। হে কল্যাণময় পরমেশ্বর, তোমার বরপ্রদ দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সহায়রূপে প্রেরণ কর। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমি তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার বলে আমাদিগকে বলী-য়ান কর। এই দরিদ্র ভারতভূমি হইতে দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিয়া সুভিক্ষ প্রেরণ কর। দৈন্য দৌর্ব্বল্য দূর হউক। তোমার জয়-গান চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হউক।

সম্রাট্ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা।

(শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

তিনি যে মঠে বাস করিতেন, তথায় অনেক ভিক্ষুণী বাস করিতেন। সকলেই অধ্যয়ন ও ধর্ম্মকর্ম্মা-মুষ্ঠানে রত থাকিতেন। ধর্ম্মরত ছাত্র ও ছাত্রীগণ যথায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাত্রিদিন অধ্যয়ন করেন, তাহার নামই মঠ। প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠের ব্যয় সম্রাট স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন। ছাত্রমঠের ও ছাত্রীমঠের ব্যয়ও বড় কম ছিল না। এক একটি মঠে দশ হাজার ছাত্র ও ছাত্রী থাকিতেন। তাঁহা-দের অশন-বসন-ব্যয়ভার সম্রাট স্বয়ং বহন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে অশন বসন-ব্যয় ভাবনা করিতে হইত না বলিয়া তাঁহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে পড়িতে পারিতেন। সংঘ-মিত্রা যে মঠে থাকিতেন, সেই মঠে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য ধার্ম্মিক গৃহস্থ নরনারীগণ দলে দলে আগমন করিতেন। সংঘমিত্রার যশ সর্ব্বত্র প্রচা-রিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সম্রাট-কন্যা হইয়া ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করায় অনেক ধনীকুলের ললনাগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শোকদুঃখপূর্ণ নানা চিন্তাগ্রস্ত গৃহস্থজীবন যাপন করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বনকেই মহাশ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দলে দলে ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগি-লেন। শিক্ষিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা নারীর দ্বারাই নারীকুলের কল্যাণ সাধিত হওয়াই উচিত। নারীর শিক্ষার জন্যই নারীকেই শিক্ষিত হইতে হয়। বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে এই নীতিই প্রচলিত ছিল। অধুনা কালধর্ম্ম অনুসারে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই সময়ে মহাস্থবির তিষ্যের আদেশে সিংহল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র, সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। সিংহলে যাইবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃদেবীর চরণ দর্শনার্থ উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশাগিরি বা চৈত্যগিরি নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান বর্ত্তমান ভিলসার নিকটবর্ত্তী। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া মাতৃদেবীর চরণকমলে প্রণাম করি-লেন। দেবী পুত্র ও কন্যার বৌদ্ধ পরিব্রাজ-

বেষ্টিত হরিদ্রাবর্ণ বেশ ও কমনীয় সৌম্য তেজঃপুঞ্জময় আকৃতি অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাট্ কি তোমাদিগকে রাজভোগে বঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন?" তাঁহারা বলিলেন, "না, মা, পিতা আমাদের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের অভিরুচি জানিতে চাহিয়াছিলেন। পরে আমরাই তাঁহার অনুমতি লইয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে এই ধর্ম্ম ও এইরূপ বেশ অবলম্বন করিয়াছি। তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে এই ধর্ম্ম ও এই বেশ গ্রহণ করান নাই"। দেবী এই কথা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া দেবী বিষাদের পরিবর্ত্তে আনন্দই অনুভব করিয়াছিলেন। অনেক দিনের পর দেবী পুত্র-কন্যার মুখাবলোকন করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। পাছে কোলাহলপূর্ণ নগরীতে থাকিলে তাঁহাদের শান্তি-ব্যাঘাত হয়, এইজন্য তিনি তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত নগরীর প্রান্তভাগস্থ চৈত্যবিহার নামক প্রকাণ্ড মঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় যে কয়েক দিন ছিলেন, দেবী সেই কয়েক দিন গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহুদিন রাজোচিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই বলিয়া দেবী পুত্র-কন্যাকে ও অন্যান্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকেও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহারা সংযমনিয়মাপেক্ষী হইয়া প্রথমতঃ ঐ সকল উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীর আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা যে কয়েক দিন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, সেই কয়েক দিন নগরীর নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য সেই মঠে আসিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

তাঁহারা উজ্জয়িনীতে একমাসের অধিককাল বাস করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলে পৌঁছিলেন। সেই দিন সিংহলের রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য চারি হাজার অনুচরের সহিত মৃগয়া করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজার অনুচরগণ একটু দূরে আসিতেছিল, এই সুযোগে মহেন্দ্র রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—"ওহে তিষ্য, কোথায় যাইতেছ"? এইরূপ রাজার নাম ধরিয়া ডাকাতে রাজা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং মহেন্দ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়া মহা ঔৎসুক্যের সহিত মহেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কারণ, তিনি সিংহলের সম্রাট্; তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে, এমন লোক কে আছে? তাঁহার পিতা মাতা ছাড়া সিংহলে আর কেহই ছিল না। হরিদ্রাবর্ণবেশধারী একজন অপরিচিত যুবক—একটি সামান্য লোক তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, এ লোকটা কে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাকে এইরূপ চিন্তান্বিত দেখিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, আপনার বিস্ময়ের বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি ভারতের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আগমন করিয়াছি। আমার সঙ্গে আমার ভগিনী ও বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আসিয়াছেন।

রাজা এই কথা শুনিয়া আপাততঃ স্থির হইলেন। তাঁহার বিস্ময়-ঔৎসুক্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ উপশান্ত হইল। সেই সময়ে রাজার ও মহেন্দ্রের সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হইল। রাজা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কে? মহেন্দ্র বলিলেন, ইঁহারা আমার সেই সহচরগণ। ইঁহারা আপনার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন। রাজার ঔৎসুক্য উপশান্ত না হইয়া এক্ষণে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তিনি পুনরায় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ভারতবর্ষে এই প্রকার বেশধারী লোক কতগুলি আছেন?" মহেন্দ্র বলিলেন, "এই প্রকার বেশধারী লোকে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে বৌদ্ধের সংখ্যার সীমা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা হইতে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। কারণ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির আধি-ব্যাধি ও মৃত্যুভাবনায় লোক আর জর্জ্জরিত হইতে যাইতেছে না। সেইজন্য সকলেই ইন্দ্রিয়-

সংযম পূর্ব্বক ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, বা সাংসারিক বাসনার ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। ভারতের লোক ইচ্ছা করিয়া নিজের চরণে নিজে কুঠারাঘাত করিতে আর ইচ্ছুক হইতেছে না। তাহারা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইবার ভয়ে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমী হইতে চাহিতেছে না। তাহারা ভগবান বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে।” রাজা মহেন্দ্রের এই সকল কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজার হৃদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তিভাব উদিত হইল। তিনি মহেন্দ্রকে দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষ ও সিংহলের মহোপকারক বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মহেন্দ্রের চরণকমলে প্রণত হইলেন। তখন মহেন্দ্র বলিলেন, “আমরা মহাস্থবির তিষ্য ও সম্রাট অশোকের আদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ এখানে আসিয়াছি এখানে আসিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় ইহা একটা মহাসুলক্ষণ, এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। ইহাতে ভবিষ্যতে কার্য্যসিদ্ধিই সূচিত হইতেছে।”

মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা ভারতসম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা, এবং তাঁহারা সকলেই ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া সিংহলরাজ তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থ তাঁহাদিগকে মহাসমাদর পূর্ব্বক নিজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় কোলাহলে তাঁহাদের শান্তিভঙ্গ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সিংহলরাজ একটি নির্জ্জন সুন্দর উদ্যান মধ্যে তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সিংহলের নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ও তাঁহাদের অমূল্য উপদেশবাণী শুনিবার জন্য দলে দলে তথায় আগমন করিতে লাগিল। সংঘমিত্রার সুমধুর ধর্ম্মোপদেশবাণী শুনিয়া নারীগণ মুগ্ধ হইয়া গেল। সংঘমিত্রা একে রূপবতী সম্রাটকন্যা, তাহাতে আবার তিনি সুশীলা সরলহৃদয়া। ইন্দ্রিয়সংযমাদি ব্রত অবলম্বন করায় তাঁহার স্বাস্থ্য কমনীয়তা উজ্জ্বলতা স্নিগ্ধতা পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সুতরাং সেই উদ্যানটি অপর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া সিংহলরাজ একটি বৃহত্তর উদ্যান তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা তথায় বাস করিয়া অতি উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার প্রভাবে সিংহলের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সিংহলের নরনারীগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী ব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা সেই সকল বিহারে বাস করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সৎকার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন।

সিংহলরাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সখীগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজ্যের অন্যান্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও নশ্বর পার্থিব সুখভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষুনীব্রত অবলম্বন করিলেন। সংঘমিত্রা সিংহলে এই ভিক্ষুনীসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তাহার পুষ্টি সাধনার্থ রাত্রিদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সিংহল ভিক্ষু ভিক্ষুনীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। ক্ষণিক পার্থিব সুখভোগলালসায় মত্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে লাগিল। মানবজীবনের সার্থকতা ও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। সিংহলাধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারার্থ অক্লান্তভাবে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনুকুল্যে ইহার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল।

একদা রাজা ও তাঁহার কন্যা অনুলা সংঘমিত্রার নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিলেন, অয়ি পূজ্যতমে ধর্ম্মনেত্রি যে পবিত্রতম ত্রিভুবনবিশ্রুত বোধিবৃক্ষের স্নিগ্ধঘন পল্লবের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ভগবান বুদ্ধদেব কোটি কোটি সূর্য্যের

প্রকাশ অপেক্ষা উজ্জলতম দিব্যজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রভাবে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের ভারতের গয়াধামের সেই পবিত্রতম মঙ্গলময় মহাপূজ্য বোধিবৃক্ষের একটি মাত্র শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনাইলে সিংহলের মহা-কল্যাণ সাধিত হইবে। সিংহল ধন্য ও পবিত্র হইবে। ঐ শাখা সিংহলে আসিলে উহা বিধি-পূর্ব্বক একটি পবিত্র স্থানে মহা সমারোহের সহিত রোপিত হইবে। হে ভক্ত-বৎসলে ধর্ম্মনেত্রি, আপনার কৃপায় ইহা অনায়াসেই সুসাধিত হইতে পারে। এই মহাসৎকার্য্যটি সুসম্পন্ন হইলে আপনার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অদ্ভুতকর্ম্মা সর্ব্বমিত্রা সংঘমিত্রা এইরূপে সিংহলরাজ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া গয়া হইতে স্বয়ং এই পবিত্র বৃক্ষশাখা আনয়ন করিলে একটি পুণ্যতিথিতে মহাসমারোহের সহিত যথাবিধি উহা সিংহলের একটি পবিত্র স্থানে রোপিত হইল।

সংঘমিত্রার অসীম অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও মহতী চেষ্টায় সিংহলের মহিলাকুলের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা-দীক্ষা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি সম্রাটনন্দিনী হইয়া সামান্য ভিক্ষুনীবেশ ধারণ করিয়া ভীষণ সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া বিদেশে গিয়া বিদেশীয় রাজার রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে স্ত্রীলোকের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ভারত ছাড়া এরূপ স্ত্রীলোক কুত্রাপি জন্মে নাই। ভারতবর্ষ ছাড়া ঈদৃশী অদ্ভুত শক্তিশালিনী অসাধারণ ত্যাগশীলা মহিলা কুত্রাপি উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস—যে কোন যুগের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেও সংঘমিত্রার ন্যায় একটি মহিলার নাম দৃষ্ট হইবে না ও পৃথিবীর সমগ্র দেশে অতি উত্তমরূপে ভ্রমণ করিলেও এইরূপ মহিলার ন্যায় কোন জাতীয়া কোন একটি মহিলার নাম কদাপি শ্রুত হইবে না। ভারতের ন্যায় মহা-বিস্তৃত দেশের মহাশক্তিসম্পন্ন সম্রাটের কন্যা হইয়া তিনি যে প্রকার ত্যাগশীলতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সচ্চরিত্রতা অকুতোভয়তা অদ্ভুত অধ্যবসায়শীলতা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একবার চিন্তা করিলেও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, ভারতই এই প্রকার পুত্রকন্যা প্রসব করিতে পারে।

তাশ খেলা।

(কুড়ানো গান)

(রামদাস)

বৃথা ভবে খেলতে এলি তাশ—
ও তোর মন্ত্রী করলে সর্ব্বনাশ ;
টেক্কার উপর নয় ভুরুপ করে—
ও তুই এমনি বেহুঁস ;
দশ দিলি ঘুস
গোলাম না মেরে ;
হাতে কাগজ পেয়ে অবশ হোয়ে
ডাকলিনে ইস্তক পঞ্চাশ ;
ছক্কালোভে পাঞ্জা দাও ছেড়ে ;
ও তোর দোসরা খেলা টেক্কা মেরে
কাগজ লয় কেড়ে ;
হাতের বত্রিশ কাগজ ফুরিয়ে গেল
রইল ভবের মায়ারাশ।

য়াণাডের-স্মৃতি কথা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ হোদ "মিশন্‌"-গৃহে চা-পানের ব্যাপার ও তাহা লইয়া ঘোঁট।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

১৮৯০ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে, সন্ধ্যাকালে সেণ্টমেরির কন্‌ভেণ্টে কোন এক উৎসব ছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে মিশনরী লোকেরা শ-দেড়শো ভদ্র-লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদনুসারেই কয়েক জন মহিলাকেও নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। আমরা স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া একশো জন ছিলাম। কেহ কেহ প্রবন্ধ পাঠ করিল, কেহ বা মুখে বক্তৃতা করিল। এই কাজ শেষ হইলে, জেনানা-মিশনের সিষ্টারেরা, নিজের হাতে চা আনিয়া নিমন্ত্রিত মণ্ডলীকে দিলেন। কেহ কেহ, এই সব মিশনরী-মহিলাপ্রদত্ত চায়ের পেয়ালা উঁহাদের মান রক্ষা করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া তার পর নীচে রাখিয়া দিল ; আবার কেহ কেহ পেয়ালা হাতে লইয়া চা পান করিল। আমরা যে দশ বারো জন স্ত্রীলোক ছিলাম আমাদের কাছে যখন চা আনা হইল, তখন উহা লইতে আমরা সকলেই অস্বীকার করিলাম।

যাক্। এই উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলে, আমরা বাড়ী আসিলাম। তার দুই তিন দিন পরেই পুণার গোপাল বিনায়ক যোশীর খাকরে এই কনভেন্টের সমস্ত বৃত্তান্ত ছাপা হইল, এবং শেষে পত্রপ্রেরকের স্বকীয় নিত্যকার স্বভাবানুসারে আসল ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিয়া, তিনি অনেক কুৎসিৎ টীকা-টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন যে, "এই রাওসাহেব ও রায় বাহাদুর সংমাজ-সংস্কারকেরা, প্রত্যক্ষ বাহাদের হাতে-বানানো ও সাদা-রং মেম্‌দিগের টুকটুকে হাতের চা পান করিয়া মুখে তৃপ্তিসূচক চুক্ চুক্ শব্দ করিতে করিতে এবং উদ্গার উঠাইতে উঠাইতে বাড়ী চলিয়া গেলেন—এই ব্যাপার আমাদের পুণার সনাতন ধর্ম্মাভিমানী ও ব্রাহ্মণবৃন্দের ভাল লাগিবে কি? এই রাওসাহেব ও রাওবাহাদুর এঁরা বড় বড় রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, ইঁহাদের বাড়ী গিয়া বৎসরে ৫।১০ বার করিয়া যারা অন্নধ্বংস করে ও দক্ষিণা পায় সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা তাঁদের নাম কেন প্রকাশ করিবে? চুপ্ করিয়াই থাকিবে। গোপালরাও যোশীর মতো কোন নির্দ্ধন মনুষ্য আমেরিকা হইতে কিংবা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল কি অমনি লোকে তার পশ্চাতে লাগিল। তার এক পংক্তিতে বসা দূরে থাক্ সে কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। তাকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উদ্ধার করিতেও কেহ স্বীকার পায় না। ওঁকে দূর হইতে জল পান করিতে দিলে কিংবা ওঁর সঙ্গে কথা কহিলেও অধর্ম্ম হয় এইরূপ বলিতে যারা প্রস্তুত আমাদের সেই ভিক্ষুকমণ্ডলী স্তাবক ও খোসামুদে; তাই আজকাল সংস্কারের দল ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, প্রভৃতি অনেক কথাই লিখিয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই আমাদের বাড়ী একটা ভোজের নিমন্ত্রণ হয়। ৪০।৫০ জন আহার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাহার মধ্যে ডাক্তার বিশ্রামজী ঘোলে, রাওবাহাদুর নারায়ণ-ভাউ-দান্তেকর ও রায় বাহাদুর গণপত-রাও-মানকর, ইঁহারাই ব্রাহ্মণেতর ছিলেন। এই দিন গোপালরাও জোশীও আসিয়াছিলেন। তিনি তার পরদিনই আবার "পুণা-বৈভব" নামক সংবাদপত্রে আমাদের বাড়ীর ভোজের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কে কোন পংক্তিতে বসিয়াছিল এবং পংক্তিগুলি কি ভাবে সাজানো হইয়াছিল তাহার একটা সুস্পষ্ট নক্‌সাও দিয়াছিলেন। গোপালরাও স্বভাবতই উদ্যোগী পুরুষ হওয়ায়, আর কোন কাজ হাতে ছিল না বলিয়া, এই প্রকার কাজ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। এই সব বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি খুব খেলিত। স্বভাবত এই সব বিষয়ে ঘোঁট করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন; এতেই তাঁর সন্তোষ ও আমোদ হইত, এই টুকুই বা তাঁর লাভ। নচেৎ সনাতন ধর্ম্মই বা কি, সমাজসংস্করই বা কি, তাঁর কাছে দুই-ই সমান। কারণ স্বভাবত তিনি না-হিন্দু-না-মুসলমান ছিলেন। সে যাক্।

ইহা ছাপা হইলে পর পুণার ভিক্ষু-ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ-মণ্ডলীর মধ্যে যে রকম ঘোঁট চলিতে লাগিল, তাহাতে পুণার প্রসিদ্ধ বংশের শ্রীবলবন্ত-রামচন্দ্র নাতু এই কাজে অগ্রণী হইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট নালিস করিলেন। কিন্তু "পুণা-বৈভবে" লেখা বাহির হইবার পর এই মণ্ডলীর নিকট যখন কোন অস্বীকার-বাচক উত্তর আসিল না, তখন এই ভিক্ষুক ও গৃহস্থ মণ্ডলী একটা সভা ডাকা স্থির করিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে এই সম্বন্ধে কোন অস্বীকার-বাচক প্রবন্ধ ছাপা হইবে বলিয়া দুই সপ্তাহ কাল তাঁহারা অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু সেরূপ কিছু না হওয়ায় উক্ত মণ্ডলী, অমুক দিন সভা করিয়া পাঁচহৌদ মিশন-গৃহে যাহারা চা পান করিয়াছিলেন সেই ৫২ জন লোককে বহিষ্কৃত করিতে হইবে প্রভৃতি কথা লিখিয়া হস্ত-পত্র বিলি করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে সভা আহ্বান করিলেন এবং ৫২ ব্যক্তির মধ্যে ৪২ জনকে বহিষ্কৃত করিলেন। বাকী দশ জন উক্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিজে নিজে পত্র লিখিয়া বলিলেন—"আমরা পেয়ালা হাতে লইয়াছিলাম সত্য কিন্তু চা পান করি নাই"। এবং এইরূপ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া রেহাই পাইলেন।

কিছু দিন পরে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অভিযোগকারীর কথা মনে করিয়া, আপন-তরফ্ হইতে, বিচারপতির কাজে এক শাস্ত্রী বাবাকে পুণায় পাঠাইলেন। সেই শাস্ত্রী, পুণায় আসিলে পর অভিযুক্ত (চা-পানের জন্য) ব্যক্তি-গণকে নোটিস্ দিলেন এবং তাহাতে আদেশ করিলেন, "তোমাদের যা বক্তব্য তাহা বলিবে"।

এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী উপরি-উক্ত মণ্ডলীর তরফ হইতে কৈফিয়ৎ লইয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। সেই তদন্তের কাজে বাল-গঙ্গাধর-টিলক ও রঘুনাথ-দাজী-নগরকর চা-পানকারীদের পক্ষের উকীল ছিলেন। অভিযোগকারীদের তরফে পুণার অন্য পক্ষের অভিমানী প্রসিদ্ধ উকীল নারায়ণ-বাবুজী কানিটকর ছিলেন। এইরূপ এই চা-পান-ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ হইল। সহরে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ এইরূপ দুই দল উৎপন্ন হইল। ইহার দরুণ, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিক আমার শ্বশুরবাড়ীর ও বাপের বাড়ীর মেয়েরা একেবারে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। এইরূপ হইবার পর, একদিন আমার ননদ "ওঁকে" জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এই দশ জন যেরূপ পত্র লিখেছেন, তুমিও কেন সেইরূপ লেখো না? তুমিও ত পেয়ালা হাতে নিয়েই তার পর নীচে রেখে দিয়েছিলে। এই সত্য

কথা লিখতে কি বাধা আছে? দোষ না করেও লোকের অপবাদ কেন নেবে?" তখন, উনি বলিলেন—"তুমি কি ক্ষেপেছ? এরকম কখন' কি করা যেতে পারে? আমি যখন তাদেরই মধ্যে একজন, তখন আমার না করলেও আমার করার তুল্যই হয়েছে। চা পান করায় কিংবা না করায় কোন পাপ পুণ্য আছে বলে' আমি মনে করিনে। কিন্তু যারা আমারই মতন একই কাজে ব্যাপৃত, তাদের একলা ফেলে চলে যেতে আমি ভাল বাসি নে। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে এত হ্যাঙ্গামা কেন!" এই কথায় ননদ বলিলেন:—তোমার ত কিছু মনে হয় না। কিন্তু আমরা যে সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়ব। কাল শ্রাদ্ধেতেও ব্রাহ্মণ পাওয়া যে মুস্কিল হবে, তার কি করা যাবে?" এই কথায় 'উনি' বলিলেন:—"এ বিষয়ে তুমি ভেবো না। মানুষ সব দিক্ বিচার না করে, কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভিক্ষুকদের যাওয়া আসায় মুস্কিলটা কি? তোমার যত লোক চাই তার ব্যবস্থা করা যাবে। তার পর, খুঁৎখুৎ কোরো না। এই বিষয়ে অনেক পয়সা খরচ করতে হবে; তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" এই কথা শুনিয়া ননদ চুপ্ করিয়া রহিলেন। কিন্তু 'উনি' এই বিষয় সম্বন্ধে শীঘ্র কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, আপন পরিবারের কোন লোককে, বিশেষত বাড়ীর বড় মেয়েদের অসন্তুষ্ট রাখা—উনি কখনই ভাল বাসিতেন না। বাড়ীর লোকেরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সে বাড়ীর প্রধান লোকদিগেরই ত্রুটি, এইরূপ ওঁর ধারণা ছিল। কখনও যদি এরূপ কোন ঘটনা হইত, তখন তিনি দোষটা আপনার ঘাড়েই লইতেন।

এই সময় আমাদের বাড়ীতে বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর, শ্রীপতি বোয়া ভিঙ্গারকর, বাড়ীর কুল-পুরোহিত ও কথক এইরূপ চার জন স্বামী আশ্রিত লোক ত ছিলই; তা ছাড়া আরও দুই বৈদিক ব্রাহ্মণকে বৎসরে ১০০ টাকা দিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার হেতু এই যে, এই দলাদলির দরুন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের আসা সম্বন্ধে শুধু আমাদের বাড়ীর লোকদের নয়, আমাদের পক্ষের অন্য লোকদেরও যাতে কোন প্রতিবন্ধক না হয়। উহাদের মধ্যে কোন গৃহস্থের গৃহে হোম-হবনাদি সংস্কার ব্রত-উপবাসাদি অনুষ্ঠান ও উপবীত লগ্নাদি উপস্থিত হইলে চালাইয়া দিবে; উদ্দেশ্য—কাহারও কাজে ব্যাঘাত না হয়। এইরূপ এই দুই বৎসর মধ্যে অনেক লোকের গৃহে আমাদের এই আশ্রিত মণ্ডলীর দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছিল। এইরূপ ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত থাকায় এই দলাদলি সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীর বড়-মেয়েদের অভিযোগ করিবার কোন হেতু ছিল না। পক্ষে এই ৪২ জনের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিত যে, এই ঘোঁটের দরুণ পুরুষদের তেমন কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমাদের মেয়েদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। প্রথম প্রথম বছরখানেক কেহ কিছু বলিত না, খুব ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিত। কিন্তু আজকাল তাদের যেন কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। যাহারা চা পান করিয়াছিল, তাদের কিছু হইল না, এবং তার দরুণ যে শাস্তি তাহা আমাদের মেয়েরাই ভোগ করিতেছে। এইজন্য প্রত্যেক পরবের সময় তাহারা এইরূপ অসন্তুষ্ট হয়; এবং তাহারা চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে না। আজ দুই বৎসর আমাদের গ্রামস্থ মেয়েদের একবারও বাপের বাড়ী আসা হয় নাই। তাহারা বিরক্ত হইয়া বারংবার লোক দিয়া বলিয়া পাঠায়; তাহা শুনিয়া আমাদের মেয়েদের বড় খারাপ লাগে। এই ব্যাপার আমি এক-এক সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি; এবং এই সম্বন্ধে কি করা যাইবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। এইরূপ কথা বারংবার কাণে আসায়, উনিও মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সেইজন্য ১৮৯২ অব্দের বৈশাখ মাসে আমাদের এক মিত্র বাহির গ্রাম হইতে, মে মাসের ছুটির মধ্যে, নিজের বাড়ী পুণায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে পিতা, মাতা; খুড়া, খুড়ী, চার পাঁচ ভাই, ভাজ, বোন, তাঁহাদের ছেলেপিলে এবং আমাদের মিত্রের ছেলে-পিলে এইরূপ বৃহৎ পরিবার ছিল। এই ভদ্র লোকটি চা-প্রকরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, ইনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। এই বৈশাখ মাসেই ইহার বাড়ীতে দুই একটা বিবাহ হইবার কথা ছিল। ইঁহার এক খুড়ো ইহার সহিত এক সঙ্গেই থাকিতেন, কিন্তু মত ইহাদের উল্টা রকমের ছিল; ইহার পিতা বাড়ীর কর্ত্তা, পরিবার-প্রতিপালক ও মায়ালু স্বভাব প্রযুক্ত, বড় ছেলে ও ছোট ভাই এই উভয়ের পরস্পরের মত একেবারে বিরুদ্ধ হই-লেও দুই জনকেই সমদৃষ্টিতেই দেখিয়া, শান্তভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এমন সময়ে, বড় ছেলের বাড়ী আসা ও বিনা প্রায়শ্চিত্তে বাড়ীতে থাকা—এই কথাটা আমাদের মিত্রের পিতা সঙ্কটের কথা মনে করিলেন। এবং বাড়ীতে এখন কাজ (বিবাহ) উপস্থিত এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের নিষ্পত্তির অপেক্ষা না করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত লইয়া খোলসা হও, ইত্যাদি বলিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত লইবার জন্য পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু এই কথা, পুত্রের কিংবা তাঁর পত্নীর অর্থাৎ বড়-বৌর ভাল লাগিল না। তাঁরা মনে করিলেন, আমরা কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই, এইরূপ যখন আমাদের ধারণা তখন এই সব লোকদিগকে খুসী করিবার জন্য কিংবা

বিবাহের চার দিন বিবাহের সমারোহযাত্রায় যোগ দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত লইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। এই দম্পতী এইরূপ স্থির করিয়া, এই কার্য্যে "ওঁর" মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন 'উনি' বলিলেন যে, "তাঁর ও তোমাদের দুজনের এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার এক উপায় আছে। তাহা এই;—তোমরা তোমাদের ছেলেপিলে নিয়ে, ছুটি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত "লোণাবালী"তে আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাক। তদনুসারে বাড়ীর লোকদিগের মত লইয়া, ছেলেপিলে সমেত এই দম্পতী লোণাবালীতে আমাদের সঙ্গে থাকিতে আসিলেন। সঙ্কট সম্বন্ধে যাই হোক না, তাঁদের আসাতে আমার খুবই আনন্দ হইল। কারণ, তাঁর স্ত্রী ও আমি—আমরা পুরাতন মৈত্রিণী; এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর দুই তিন দিন দেখা সাক্ষাৎ হইলেও, আমরা দুজনে কিছুদিন একসঙ্গে থাকিতে পাইব, এতেই আমার বেশী আনন্দ হইল। এই সুযোগে ম্যাস-দেড়েক আমাদের দুজনের এক বাড়ীতে থাকা হইল।

এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়ার দরুণ তাঁর পিতার মনে বড় ব্যথা লাগিল; বড় ছেলে ছুটির সময় ছেলেপিলে লইয়া বাড়ী আসিল,—বাড়ী আসিয়াই আমাদের এই বৃহৎ পরিবার হইতে, পুত্র পুত্রবধূ ও তিন নাতীর বাহিরে যাইতে হইল,—এটা তাঁর ভাল লাগিল না। তিনি পুত্রকে বারংবার এইরূপ পত্র লিখিতে লাগিলেন—"তুমি প্রায়শ্চিত্ত নেও এবং প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে বাড়ী এসো এবং এই বৃদ্ধবয়সে আমাকে সন্তুষ্ট কর।"

বড় ছেলে সমাজ-সংস্কার-মতাবলম্বী হইলেও তাঁহার মন অত্যন্ত কোমল ও প্রেম-প্রবণ ছিল; তাই এই পত্র পড়িয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ১০।১৫ দিন পরে পিতার দুই একখানি পত্র তিনি 'ওঁকে' দেখাইলেন এবং মুখ কাঁচুমাচু করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া ওঁর ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া 'উনি' এইরূপ বলিলেন যে, "আমি যদি তোমার জায়গায় হতুম, তাহলে সমস্ত মানহানি ও হীনতা সহ্য করে' আমার পিতাকে তুষ্ট করতুম।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ সঙ্কটে পড়েছেন; তখন সকলের সহিত আপনিও যদি প্রায়শ্চিত্ত নেন, তাহলে প্রায়শ্চিত্ত নিতে আমাদের ভাল লাগবে।" তারপর, পুণা হইতে আরও ১০।১৫ জন আসিলেন। তখন, প্রায়শ্চিত্ত নেওয়া সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইবার পর, শেষে নগরকার সকলের হইয়া এইরূপ বলিলেন,—"আমাদের সমস্ত লোকের অব্যাহতির জন্য আপনি প্রায়শ্চিত্ত নিন, এই আমাদের বক্তব্য।" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"এইরূপ যদি হয় আমিও প্রায়শ্চিত্ত নেব। এই সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমরা পুণায় গিয়ে দিন ঠিক করে আমাকে জানাও। তাহলে একদিনের জন্য আমি পুণায় যাব।" এইরূপ স্থির হইলে পর, যাঁহারা পুণা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন এবং চার পাঁচ দিন পরে, অমুক দিন প্রায়শ্চিত্ত লওয়া হইবে স্থির হইল। প্রাতঃকালেই গাড়িতে করিয়া সেখানে যাইতে হইবে, এইরূপ নগরকারের পত্র পাওয়া গেল। তার পরদিন প্রভাতে পাঁচটার গাড়ীতে উনি এবং আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের সঙ্গে যিনি ছিলেন সেই মিত্র,—দুজনে পুণায় চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বারাণসী-কথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মহাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বরদর্শনের পর দুর্গাবাড়ীর অভিমুখে রওনা হই। রামাপুরার ভিতর দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটিয়া দুর্গাবাড়ী পৌঁছাই। মহাষ্টমী বলিয়া সেই দিন বহুলোক একায় ও টমটমে চড়িয়া দুর্গাবাড়ীর দিকে যাইতেছিল। সম্মুখ দিকের ফটক দিয়া সদর মন্দিরে প্রবেশ করি। প্রবেশপথে দেখি শত শত ছাগবলি হইতেছে। শুনিলাম কাশীতে ছাগবলি নাই, বলির জন্য ছাগ-মহিষ এখানে আনীত হয়। মন্দিরের বারান্দার চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দেখি, পুলিশ পাহারা দিতেছে। সংকীর্ণ কুঠরীতে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া দশভুজা মূর্ত্তি দেখিলাম। দর্শনান্তে অন্য রাস্তা দিয়া বাহিরে আসি। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির ও দুর্গাকুণ্ড প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে বানরের অত্যন্ত উপদ্রব বলিয়া ইংরেজরা এই মন্দিরের নাম দিয়াছেন 'Monkey Temple।' মন্দিরের সম্মুখভাগ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাউনির দেশীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দুর্গাবাড়ী ও কুণ্ড দর্শন করিয়া সঙ্কটমোচন দর্শনে রওনা হই। প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটিয়া একটা নির্জ্জন কাননের ভিতর প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের সম্মুখে বহু প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। এখানে মন্দিরের মধ্যে রামলক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের বিগ্রহ দেখিয়া তথায় তুলসীদাসের আসন দর্শন করি। এই গৃহের বারান্দার এক পার্শ্বে একটা অতি বৃদ্ধ সাধু

গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। এখান হইতে বাহির হইয়া ফিরিবার পথে আমি দুর্গাবাড়ীসংলগ্ন আনন্দ বাগে প্রবেশ করি। এই পুণ্যস্থানে স্বামী ভাস্করানন্দ ২৭ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ বাগে প্রবেশ করিতেই বামপার্শ্বে স্বামীজির শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যস্থানে স্বামীজির সমাধির উপর জয়পুরের শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত অতি অপূর্ব্ব শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভক্তমণ্ডলী এক লক্ষ পাঁচশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দির অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধারণতঃ যে স্থানে বসিতেন সেই দালানে গিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসি। সেখানে একটী সাধুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। ইনি স্বামীজীর শিষ্যের শিষ্য। ইনি আগন্তুক সকলের সঙ্গেই সংসারের সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি বসিয়া থাকিতেই দেখি একটী ৪০ বৎসরের বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও বয়স্থা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিলেন। আলাপে জানিলাম ইনি বেহারে ওকালতী করেন। উকিল-পত্নী বাঙ্গালীর অন্তঃপুর-মহিলা হইলেও অতি বিশুদ্ধ হিন্দিভাষায় সাধুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপের বিষয়টী কন্যার বিবাহ। কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতা এই পুণ্যস্থানে আসিয়া যে নির্লোভ ঠাকুরের নিকট কোষ্ঠীবিচারের প্রশ্ন তুলি-বেন ইহা আমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইল। যাহাহউক সাধু দম্পতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোমার কন্যার কোষ্ঠী ভুল, আমি সব ঠিক করিয়া দিব। মা, তোমরা এখন যাও, আমি অপরাহ্নে তোমা-দের সঙ্গে দেখা করিব।' আমি অনেকক্ষণ বসিয়া সাধুর ভাবটী দেখিলাম; কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরে ব্রহ্মর্ষি ভাস্করানন্দের পুণ্যপ্রভাব বড় একটা দেখিতে পাইলাম না; তাঁহাকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হইল। আনন্দবাগ হইতে বাহির হইয়া একায় চড়িয়া দুপুর বারটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি।

* * *

মহাষ্টমীর রাত্রে ৯টার সময় বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই আরতি-দৃশ্যের বর্ণনা আমি আর কি করিব। শত শত নর-নারী আরতি দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। পাণ্ডারা বিশ্বেশ্বরকে মাল্য ও চন্দনসংযোগে অতি সুন্দরভাবে সাজাইতে ছিলেন। সেই সাজ-সজ্জার ভিতরে পাণ্ডাঠাকুরদের নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দেবতার অঙ্গরাগ শেষ হইলে সাতটী পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হাতে ঘণ্টা লইয়া সমস্বরে আরতির গান ধরিলেন। সেই সঙ্গীত শুনিয়া হৃদয়-মন মুগ্ধ হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়া-ইয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিলাম।

নবমীর দিন প্রাতে প্রথমে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া গঙ্গার ধার দিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে যাই। কাশীর মধ্যে ইহার ন্যায় পবিত্র তীর্থ আর নাই। এখানে প্রথমে 'চক্রতীর্থের' জল স্পর্শ করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করি। মণিকর্ণিকার কাহিনীটি এইঃ—শঙ্কর ও শঙ্করী যোগমগ্ন ছিলেন। একদিন মহাদেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মরিলে কি হয়, কবে
কোথায় নিবাস।'

দেবীর প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন,
'হে প্রকৃতি মানবের পরকাল প্রথা
দুর্ব্বোধ, দুজ্ঞেয় অতি, অপার অশেষ।'

উত্তর শুনিয়া মহাদেবী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 'শঙ্করীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শিব শিবানী সহ কাশীতে আসিয়া 'চক্রতীর্থ' মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। তার পর তাঁহারা উভয়ে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেবীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পদদ্বয় দেখিয়া পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে এখানে কূপে অবগাহন করিতে দেয় নাই। পরে লক্ষ্মী শঙ্করীর পাদপূজা করিয়া পাদোদক পান করিলে সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবগাহন করিতে দেন। স্নানকালে শিবের মস্তক হইতে মণি এবং শিবানীর কর্ণ হইতে কর্ণিকা কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়। সেই অবধি এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা' হইয়াছে।

মণিকর্ণিকা ঘাটের পার্শ্বে কাশীর মহাশ্মশান দেখিয়া আমরা বেণীমাধবের মন্দির দেখিতে যাই। পঞ্চগঙ্গা-ঘাট বা ধর্ম্মানন্দতীর্থের উপরেই আদি বেণীমাধবের মন্দির ছিল; ঔরংজেব সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া সেইস্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মস্‌জিদের চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের দুইটী অতি উচ্চ। এই স্তম্ভ দুইটীকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে। এই ধ্বজা হইতে কাশীর চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম দেখায়।

বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিয়া আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলিয়া আসি। এখানে ঘাটের নীচে দিয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া কেদারঘাট ও চৌষট্টি যোগিনী গিয়াছিলাম। বাঙ্গালীটোলায় গঙ্গার উপর কেদারেশ্বর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বারান্দায় বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিয়া কেদারঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে গৌরীকুণ্ডে নামিয়া আসি; কেদারেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি অনেকটা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তির অনুরূপ।

* * *

নবমীর দিন অপরাহ্ণে কাশীর মানমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের বাসার অতি নিকটেই গঙ্গা-তীরে মানমন্দির। মহারাজা মানসিংহ অনুমান ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য এই মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ সাহের অনুমতিক্রমে গ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাজা জয়সিংহ এই মন্দিরে জ্যোতিষ যন্ত্রাদি স্থাপন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাজা জয়সিংহ অতি দক্ষ ছিলেন। তিনি সাত বৎসর হিন্দু, মুসলমান ও য়ুরোপের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বহু গবেষণার পর তিনি রামযন্ত্র, সম্রাট্ যন্ত্র, বিখ্যাত জয়-প্রকাশ যন্ত্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া উহাদের সাহায্যে টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যুক্তির ভুল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'জিজ্ মহম্মদ শাহী' গ্রন্থে য়ুরোপের জ্যোতিষগণনার বহু ভুল প্রদ-র্শিত হইয়াছে। নিম্নে যন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রাদির সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

1. The Narivalaya Dakshina and Uttara Gola or the Equinoctical circle. It is a large circular slanting piece of stone placed in the equinoctical plane with a circle described on the northern side over 4½ feet in diameter. An iron spike in the centre pointing to the North Pole denotes by its shadow the meridianal distance of the sun or the stars when in the Northern Hemisphere. The use of this instrument is to find out time and also whether the heavenly bodies are in the Northern or the Southern Hemisphere.

2. Chakra Yantra, consists of a movable circle of iron and brass—the circumference of which is graduated into sixty parts turning upon an axis fixed between two walls and pointing to the North Pole. This instrument is for measuring the declination of the sun, moon and stars and their distance in time (hour angle) from the meridian.

3. Samrat Yantra, is a giant sun-dial. It is 36 feet long, and is 22½ feet high on its northern end and 6½ feet on the southern, the inclined hypotenuse thus formed pointing to the North Pole. Its use is to find time and declination and hour angle of the heavenly bodies. Another Samrat Yantra of smaller dimension and exactly similar to this lies further to the east.

4. Digansha Yantra—constructed of massive stone and consisting of two broad concentric circular walls, the outer one double the height of the inner and graduated to 360° degrees at the top. The use of this instrument is to find the degrees of azimuth of the heavenly bodies.

5. Dakshin bhilti Yantra (Mural Quadrant) is a stone wall built in the plane of the meridian eleven feet high and a little over nine feet in length, with two quadrants intersecting each other described thereon and three concentric arcs upon each of them graduated into degrees and minutes. The altitude of the heavenly bodies when on the meridian is known by this instrument.

* * * *

* * * *

বিজয়ার দিন অতি প্রত্যূষে একখানি পাল্কী গাড়ীতে চড়িয়া অদ্বৈত-আশ্রমের নিকটবর্ত্তী ছোট গৈবীর জল পান করিতে গিয়াছিলাম। বড় গৈবীর কূপটীর তখন সংস্কার হইতেছিল, তাই ছোট গৈবীর জল পান করিয়া আমি ফিরিবার পথে এনিবেশান্তের প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ ও পরাবিদ্যা সোসাইটীর সুবৃহৎ লাইব্রেরী দেখিতে যাই। কাশীর 'কুইনস্ কলেজ', 'ডফরিন ব্রিজ', শত শত ঘাটের বিবরণ নূতন করিয়া লিখিবার কিছুই নাই বলিয়া বারাণসীর বিজয়া উৎসবের কথাই এখানে লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

* * *

আজ দশাশ্বমেধঘাটে কাশীর বিজয়া উৎসব। যে দুর্গোৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী আপামর সকলকে হাবুডুবু করাইতেছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ লইয়া যেন একটা হুলুস্থূল ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল—আজ সেই মহোৎসবের শেষ দিন।

বেলা ২ টার সময় আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হই। সেখানে গিয়া দেখি একটিও লোক নাই। আমি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পর দেখি রামনগরে উৎসব দেখিবার জন্য দলে দলে মাড়ো-য়ারী ঘাটে আসিতেছে। তাহারা নৌকা ভাড়া করিয়া অপর তীরে চলিয়া গেল। আমার একবার ইচ্ছা হইল রামনগরে যাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে দশাশ্বমেধ ঘাটের বিজয়া উৎসব দেখিবার জন্য প্রাণে উৎকণ্ঠা অনুভব করিলাম; আমি চুপ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগি-লাম। বেলা চারিটার সময় ঘাট, ঘাটের উপর দালানের ছাদ লোকে ভরিয়া গেল। ঘাটে তখন হাঁটা

যায় না। আমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া গঙ্গাদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঢাক, সানাই, বিলাতী পাইপ বাজাইতে বাজাইতে কত শোভাযাত্রা ঘাটে আসিতে লাগিল। দেখি, অনেক প্রতিমা ঘাটে আসিয়া ঝুপ করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইল। এইভাবে বিসর্জ্জনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। গঙ্গায় খোল করতাল লইয়া কত লোক হরিসংকীর্ত্তন গাইতেছিল। তীরে বাঁশী-বিক্রেতা, মিঠাই-ওয়ালা, চাই-কুলপি-বরফওয়ালা কিছুরই অভাব ছিল না। জলের উপর বাঁশের মঞ্চে বসিয়া শত শত বিধবা রমণী জপ তপ করিতেছিলেন।

ধরায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চারিদিকে মন্দির হইতে আরতির ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। আমি দশাশ্বমেধ-ঘাটের পুণ্য ধূলিতে লুটিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আদর্শ

বা

দাদা ঠাকুর।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় জঙ্গল। কাল—রাত্রি।

(একাকী কুলভূষণ)

কুল। দেব? গলায় দড়ী দেব? এইবার দেব। কিন্তু বড় ভয় করে। মরতে বড় ভয় করে। রাত্রি প্রভাত হলে' আবার সকল লোকে আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরাবে। গায়ে থুথু দিবে। পুলিসের লোক আমার সন্ধানে ফিরচে। ওঃ একদিনে পথের কাঙাল হয়েছি। কেন এমন বুদ্ধি হোল! কেন রাসবিহারীর কথা শুন্‌লুম? তাড়িয়ে দিলে! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে! কি অপমান! না মরতেই হবে। উঃ কি ভয়ানক ঝড় হচ্চে! বেশ হচ্চে। বেশ হচ্চে। খুব হোক। আমার ভিতরেও একটা ঝড় চলেছে। বাইরে ভিতরে ভীষণ ঝড়। বাঃ বেশ, চমৎকার! সে দিনও এমনি অন্ধকার রাত্রি—যে দিন রাসবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম। পাগলী তাই শুনেছিল। পাগ্‌লীই তো সর্ব্বনাশ কর্লে। আর শুন্‌লুম এই পাগ্‌লী নাকি আমার মা! না—মরব—মরব।

(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ও পাগলিনী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ করিয়া—)

পাগ্‌লী। থামো।

কুল। কে? ওঃ তুই! সর্ব্বনাশী, রাক্ষসী আবার এসেছিস?

পাগ্‌লী। যাবো কোথায়? তোরি জন্যে যে এখানে রয়েছি। তোকে দেখ্‌ব বলেই যে এখনো মরিনি। যাবো কোথায়? না এসে যাবো কোথায়?

কুল। যমের বাড়ী। তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্, আমায় পথের কাঙাল করেছিস্। আমার সারা জীবনে কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছিস্। আমার সব সুখ সব আশা নষ্ট করেছিস্। যা আমার সামনে থেকে যা; না হলে' তোকে মেরে ফেলব।

পাগ্‌লী। আমায় মার্বি? পার্বি তো? সত্যি বলিস্ তো? কর্ তবে তাই কর। আমায় মেরে ফেল। আমার বুকটা জুড়াক। তোকে দেখ্‌ব বলে', তোকে একবার বল্‌ব বলে' এতদিন বেঁচে ছিলুম। আমার বলা শেষ হয়েছে, কর বাছা আমায় খুন কর্। ওঃ কি জ্বালা! কি জ্বালা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল!

কুল। খুব পুড়ুক। আরো পুড়বে। ভারী তো আমার জন্যে তোমার দরদ! তুই আবার আমার মা? মা হয়ে' আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্।

পাগলী। বুঝবি, একদিন বুঝবি। কেন এমন করেছি তা একদিন বুঝবি। মা হয়ে' যদি ছেলের জন্যে কিছু করে' থাকি তো এইটেই শুধু করেছি। মরিসনে বাছা; বেঁচে থাকলে একদিন বুঝতে পার্বি। ওরে বড় জ্বালা—পাপের বড় জ্বালা। তোর কথা ভেবে ভেবে তোর জন্যে দুঃখ হল। এর কি জ্বালা, আমি হাতে হাতে জানি। চেয়ে দ্যাখ এই আমার দিকে; আমি কি আগুনে পুড়চি। আর কেন তোকে কাঙাল করেছি জানিস? কাঙাল হয়েছিস্ বলে' আজ তোকে পেয়েছি। আমার অন্ধের যষ্টি, ভিখারীর মাণিক আবার ফিরে পেয়েছি। হোক ধুলোমাখা, আমি ধুয়ে নেব, ধুয়ে নেব। আমার চোখের জল দিয়ে ধুয়ে নেব। কাঙাল না হলে তুই ফিরে আসতিস্ না। বড়লোক হলে মাকে ভুলে থাকতিস্। তাই তোকে কাঙাল করেছি। এখন আয় কাঙালিনীর কাঙাল ছেলে, আবার তোর কাঙালিনী মায়ের বুকে ফিরে আয়। তেমনি মা বলে ডাক—যেমন একদিন ছেলেবেলায় ডাকতিস। যখন তুই বড় লোক ছিলিনে, কেবল আমাকেই চিনতি, আমাকেই জানতি, আমাকেই বুঝতি। একবার আয় বাছা, তেমনি করে একবার আমার কোলে আয়। আয় বাছা আমার বুকে আয়। উঃ আমার বুক যে পুড়ে গেল, আয় বাছা,

(হস্তপ্রসারণ)

কুল। সরে যা রাক্ষসী। তুই আমার মা নস্। তুই পিশাচী। মা হয়ে সন্তান বিক্রয় করেছিস্, কি করেছিস, উঃ কি করেছিস্ তুই তা জানিস্‌নি চিরদিনের জন্য একটা জীবন নষ্ট করেছিস। আমি তো ছেলে-

বেলা এমন ছিলুম না। ছেলে বেলায় ভালো ছিলুম; যেদিন হতে শুনলুম আমি পুষ্যিপুত্তুর, লোকে আমার ঘৃণার চক্ষে দেখে, তখন থেকে বিশ্বের উপর আমার অভিমান হোল। তারপর ক্রমে এই নরপিশাচ সেজেছি। একি আমার দোষ? না—না এ তোর দোষ। তুই যদি আমার পশুর মত বিক্রী না করতিস—আমি সেই কাঙালিনীর ছেলে থাকতুম, তা হলে আজ আমার এ দশা হোতনা। কেন আমায় ঐশ্বর্য্যের মাঝে এনেছিলি? বল্ রাক্ষসী, কেন আমায় বিক্রী করলি?

পাগলিনী। পেটের দায়ে, পেটের দায়ে। তুই কি বুঝ্‌বি ক্ষুধার জ্বালা কি জ্বালা! সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তোকে বিক্রী করেছিলুম। তুই কি বুঝবি—প্রবল শ্রাবণের ধারায় যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি; যখন রৌদ্রে, অনাহারে তোকে বক্ষে নিয়ে ঘুরেছি, পিপাসায় আমার বুক ফেটে গেছে! কেউ একটু জল দেয়নি। যখন মাঘ মাসের হাড়ভাঙ্গা শীতে বিনা বস্ত্রে পথে দাঁড়িয়ে কেঁপেছি, তুই কি বুঝবি সেই কষ্ট! সেই দুঃখ! তখন তোর পানে একবার চেয়েছি, তোর মলিন মুখ, অসহায় ভাব দেখেছি—আর আমার বুক ফেটে যেত। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌তুম, কেউ শুন্‌তো না, সে কান্না শুনে' বাতাস শুধু হাহা করে বয়ে' যেত, আর আকাশ স্থির ভাবে চেয়ে থাক্‌তো। তুই কি বুঝ্‌বি আমার সে কি কষ্ট! কি যাতনা! কি দুঃখ!

কুল। মর্‌তে পারোনি রাক্ষসী? আমাকে মেরে ফেল্লিনে কেন? সে সময়ে মেরে ফেল্‌লে আজ আমার এমন বিশ্বের ধিক্কৃত হয়ে বেঁচে থাক্‌তে হোতনা।

পাগলিনী। মর্‌তে পারিনি। তোর দিকে চেয়ে, মরতে পারিনি। তোর দিকে চাইলে আমার মরতে ইচ্ছা হোত না। এত দুঃখ কষ্টেও তোর মুখখানি দেখ্‌লে আমার বুক জুড়াতো। ভাব্‌তুম যদি মরে যাই তোর কি দশা হবে। আর তোকে মারব? তোকে মারব? হায় বাছা, তুই কি বুঝ্‌বি, মায়ের প্রাণ কি দিয়ে গঠিত! মায়ের প্রাণ শুধু মা-ই বোঝে, তা আর কেউ বোঝে না, আর কেউ জানে না। এই দ্যাখ্ এখনো আছে—ছেলেবেলায় তোর গলায় একখানি পদক ছিল, আমি তোর সে চিহ্ন এখনো আমার সাথে সাথে রেখেছি। পাগল হয়েও ফেলে দিতে পারিনি। আমি এই কত বছর এ চিহ্ন বুকে করে' বেঁচে আছি। বেঁচে আছি তোকে শুধু দেখ্‌ব বলে'। আবার তোকে বুকে কর্‌ব বলে'। আর বাছা বুকে আয় (অগ্রসর হইল)

কুল। খবর্দ্দার, এসোনা আমার কাছে—এসোনা। হায়, জানোনা তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছো, মা হয়ে' সন্তান বিক্রী করেছো। আমি যদি মহাপাপী হই তবে তুই মহাপাপিনী।

পাগলিনী। তুই-ও বল্‌বি? মহাপাপিনী তা তুই ও বল্‌বি? ওঃ তোর মুখে একথা শুনে——ঈশ্বর ঈশ্বর, এই আমার শেষ কথা শোনা হয়েছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? বাছা, আমি অপরের কাছে মহাপাপিনী হতে' পারি, বিশ্বের ধিক্কৃত হতে পারি—এমন কি ঈশ্বরের কাছেও অপরাধিনী হতে পারি, কিন্তু তোর কাছেও কি——উঃ!

কুল। না আর আমি এখানে দাঁড়াব না। যাই, পাগ্‌লী, তুই আমাকে মর্‌তেও দিবিনে?

পাগলিনী। ওরে! ছেলের কাছে মা যে শুধু মা, সে কি আর কিছু হতে' পারে? বাছারে! যে মুখে আজ আমায় রাক্ষসী পিশাচী বল্‌ছিস্ সেই মুখে যখন তোর কথা ফোটে নাই' যখন কচি হাত দু'খানি দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতিস, যখন আধো আধো কথায় মা বলে' ডাক্‌তিস, তখন যে আমার কি হোত তা বোঝাতে পারিনে। তা আর কেউ বোঝে না; কেবল মা-ই বুঝ্‌তে পারে। ওঃ মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিন বিক্রী করেছিলুম——

(কুলভূষণ নীরবে শুনিতে লাগিল)

পাগলিনী। শুনবি? শোন্ তবে। উঃ সে কথা মনে করতে বুক ফেটে যায়। যে দিন তোকে খেলনার লোভ দেখিয়ে অন্যের হাতে দিলুম, যখন তারা তোকে নিয়ে যেতে চাইলে, তুই তা বুঝ্‌তে পার্‌লিনি। আমি রাক্ষসী, আমার বুক থেকে তোর কচি হাতের বাঁধনখানি ছাড়িয়ে দিতে হোল। তুই জোর করে আমার গলা সাপটে ধরলি—তা এমন জোরে—এমন জোরে সাপটে ধর্‌লি যেন আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়ে' আস্‌তে লাগলো। তবু আমি তোকে দিলুম। তোকে তাদের হাতে দিলুম। আমার বুকের ভিতর থেকে প্রাণ টেনে ছিঁড়ে দিলুম। তার পর যখন তোকে তারা নিয়ে যায়, তখন চীৎকার করে, মূর্চ্ছিত হয়ে' পড়লুম। যখন জ্ঞান হোল তখন দেখি আমি পাগ্‌লা গারদে আছি—উঃ! (ক্রন্দন)

কুল। কাঁদো, কাঁদো, খুব কাঁদো। আর একটু কাঁদো—আমিও কাঁদব। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোনো দিন কাঁদ্‌তে পারিনি। কাঁদো—আমি দেখ্‌বো।

পাগলিনী। না আর কাঁদব না। আমার কান্নাও শেষ হয়েছে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। আর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে না—এ রক্ত এ আমার বুকের রক্ত, চোখ্ দিয়ে জল হয়ে' বের হচ্চে। তবে যাই, যাবার বেলায় একবার আমায় মা বলে' ডাক্‌বিনে? বাছারে আমি তোর অপরাধিনী, বিশ্বের ধিক্কৃতা

মা—থাক্ আমায় মা বলে' ডাকিস্ নি আর। যাই তবে যাই বাছা। যাই—

কুল। মা, মা, মা, মাগো (পাগলিনীর বক্ষে মুখ লুকাইল)

পাগলিনী। কি বল্লি? বল্ বল্ আবার বল। আবার ডাক্। আমি যে ঐ ডাকের কাঙালিনী। ডাক্ বাছা আবার ডাক্।

কুল। মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। গেছে, আমার সব দুঃখ, সব কষ্ট গেছে। ডাক্ ডাক্ আবার ডাক্। একি আমার মাথা ঘুরচে! বাছা আমায় ধর্।

কুল। (মাকে ধরিয়া) মাগো, আমি তোর অবোধ ছেলে, তোর অপরাধী ছেলে। মা আমায় কোলে নে, তেমনি করে কোলে নে, যেমন একদিন ছেলেবেলায় নিতিস্। আজ পৃথিবীতে আর কেউ নেই—কিছু নেই। আছে শুধু মা আর ছেলে। মা, বিশ্ব ত্যাগ করেছে, করুক। আমি কি তোকে আর ফেলে দিতে পারি? তুই যে আমার উৎপীড়িতা মা। মা, মা, তোকে ফেলে কোথায় যাবো? মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। একি আমি কোথায়? আমার যে বুকের ভিতর কেমন করছে! বুঝি এই আমার শেষ হয়ে এল। ডাক্ ডাক্ বাছা আবার ডাক্।

(ভূমিতে পতন)

কুল। মা, মা, একি—মাগো তুই কোথা যাচ্ছিস্।

পাগলিনী। বাছা, আমার শরীরে আর সৈলো না। যা—ই—ত—বে।

কুল। মা, মা, তোর অপরাধী অবোধ ছেলেকে কোথায় ফেলে যাবি? আমি যে বড় একা।

পাগলিনী। ঈশ্বর আছেন। অপরাধিনী হলেও আমায় শেষের দিনে বড় সুখের ভাগিনী করেছেন। ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের উপর মতি রেখো। আমার শেষ হয়ে আসচে তবে যা—ই—(মৃত্যু)

কুল। মা, মা ওমা। একি! সব শেষ! মা মা ওমা মাগো! চল্ তোকে শ্মশানে নিয়ে যাবো। তার পর আমিও সেই চিতায় পুড়ে মর্‌ব। দুঃখিনী মা আর তার অপরাধী ছেলে এক সঙ্গে যাবে। তবে চল্ মা।

(মৃতদেহ স্কন্ধে লইতে উদ্যত)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্খ্যদিগের এই দ্বৈত ভগবদ্-গীতার মান্য নহে। গীতান্তর্ভূত অধ্যাত্মজ্ঞানের এবং বেদান্ত শাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই অতীত এক সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ত্ব চরাচর জগতের মূলে আছে, সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু যাহা সগুণ তাহা নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্রকৃতিরও নাশ হইলে পর শেষে যে অন্য কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও নিত্য তত্ত্ব, প্রকৃতিপুরুষ বিচার করিবার সময় এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০ তম শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। আরো পরে ১৫ম অধ্যায়ে (গী. ১৫. ১৭) ক্ষর ও অক্ষর—ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে এই দুই তত্ত্ব বলিবার পর উক্ত হইয়াছে—

> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

অর্থাৎ এই দুই হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অব্যয় ও সর্ব্বশক্তিমান, এবং তিনিই ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের সংরক্ষণ করেন। এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুয়েরই অতীত হওয়ায় তাঁহার যথার্থ সংজ্ঞা 'পুরুষোত্তম' হইয়াছে (গী. ১৫. ১৮)। মহাভারতেও ভৃগু ঋষি ভরদ্বাজকে 'পরমাত্মা' ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

> আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
> তৈরেব তু বিনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ "আত্মা যখন প্রকৃতিতে বা দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) বলে, তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত হইলে তাহার 'পরমাত্মা' এই সংজ্ঞা হয় (মভা. শাং. ১৮৭. ২৪)। 'পরমাত্মা'র উক্ত দুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়া সম্ভব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর জগৎ ও জীব (অথবা সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দুয়েরই অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই কারণেও বলা যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের অতীত, আবার

কথনও বলা যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার (পুরুষের) অতীত—এইরূপে এক পরমাত্মারই এই দুইটি লক্ষণ কিংবা ব্যাখ্যা করা হইলেও বস্তুত কোন ভিন্নতা হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়া কালিদাসও কুমারসম্ভবে পরমেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছেন যে, "পুরুষের লাভের জন্য সচেষ্ট প্রকৃতিও তুমিই, এবং নিজে উদাসীন থাকিয়া সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা পুরুষও তুমিই" (কুমা. ২. ১৩)। সেইরূপ আবার গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম"—এই প্রকৃতি আমার যোনি বা আমার এক স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আত্মাও আমারই অংশ (১৫. ৭)। ৭ম অধ্যায়েও ভগবান বলিতেছেন যে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অর্থাৎ "পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারের আমার প্রকৃতি; ইহা ব্যতীত (অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং) সমস্ত জগৎ যাহা ধারণ করিয়া আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি (গী. ৭. ৪, ৫)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অনেক স্থানে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের অতীত ষড়্‌বিংশতম এক পরম তত্ত্ব আছে, যাঁহাকে জানিতে না পারিলে মনুষ্য 'বুদ্ধ' হয় না (শাং ৩০৮)। আমাদের নিজের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্থের যে জ্ঞান হয় তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই কখন কখন 'জ্ঞান' এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিতে 'পুরুষ' জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত হয় (শাং ৩০৬. ৩৫-৪১)। কিন্তু প্রকৃত 'জ্ঞেয়' যিনি (গী. ১৩. ১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতায় তাঁহাকেই 'পরমপুরুষ' বলা হইয়াছে। ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া তাহার ধারয়িতা এই যে পরম বা পর-পুরুষ তাঁহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর,—এ কথা শুধু ভগবদ্গীতা নহে, বেদান্তশাস্ত্রের সকল গ্রন্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। 'অক্ষর' ও 'অব্যক্ত' এই দুই বিশেষণ বা শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কারণ, জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্য কোন মূল কারণ নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং. কা. ৬১)। কিন্তু বেদান্তদৃষ্টিতে দেখিলে, পরব্রহ্মই এক অ-ক্ষর অর্থাৎ তাঁহার কখন নাশ হয় না; তিনিই অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; অতএব গীতায় 'অক্ষর' ও 'অব্যক্ত' এই দুই শব্দই প্রকৃতির অতীত। পরব্রহ্মের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই বিষয় পাঠকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গী. ৮. ২০; ১১. ৩৭; ১৫. ১৬, ১৭)। বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও তাহাকে 'অক্ষর' বলা যে ঠিক নহে, এ কথা সত্য। কিন্তু জগদুৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এই তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্ব্বশক্তিত্বে কোন বাধা না আনায় এই সিদ্ধান্ত গীতারও মান্য হইয়াছে এবং সেইজন্য সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে কোন অদল-বদল না করিয়া তাঁহাদের শব্দেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা ব্যক্তাব্যক্ত জগতের বর্ণনা করা হইয়াছে; তাই, ভগবদ্গীতাতে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদান্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জন্য, (সাংখ্য) অব্যক্তেরও অতীত অব্যক্ত এবং (সাংখ্য) অক্ষরেরও অতীত অক্ষর, এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। উদাহরণ যথা—এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা, গীতা পড়িবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, 'অব্যক্ত' এবং 'অক্ষর' এই দুই শব্দই কখন সাংখ্যদিগের প্রকৃতির উদ্দেশে, কখন বেদান্তের পরব্রহ্মের উদ্দেশে—অর্থাৎ দুই বিভিন্নপ্রকারে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্যক্তই, বেদান্তের মতে জগতের মূল। জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে ইহাই উপরি-উক্ত পার্থক্য। এই পার্থক্য হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত মোক্ষের স্বরূপ এবং সাংখ্যদিগের মোক্ষস্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদের এই দ্বৈতকে না মানিয়া, যখন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুষোত্তমরূপী এক তৃতীয় নিত্য তত্ত্ব আছেন এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তাঁহার বিভূতি; তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, এই তৃতীয় মূলভূত তত্ত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের সহিত উহার কি সম্বন্ধ? প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর—এই ত্রয়ীকে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্ম বলা হয়; এবং এই তিন বস্তুরই স্বরূপ ও ইহাদের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ণয় করাই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য কার্য্য; উপনিষদেও ইহারই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সমস্ত বেদান্তের মতৈক্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই; এবং কেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত ভিন্ন। ইহা হইতেই বেদান্তী-

দিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈতী এইরূপ ভেদ হইয়াছে। জীব ও জগতের সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য। কিন্তু কতক লোক বলেন যে, জীব, জগত ও পরব্রহ্ম এই তিন বস্তুর মূলস্বরূপ আকাশের ন্যায় এক বস্তুসার ও অখণ্ড; আবার অন্য বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে না বলিয়া, দাড়িমের ফলে অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় না, তেমনি জীব ও জগত পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিলেও উহা পরমেশ্বর হইতে মূলেতে ভিন্ন এবং তিনই "এক" বলিয়া যখন উপনিষদে বর্ণিত হয় তখন তাহার অর্থে 'দাড়িমের ফলের ন্যায় এক' এইরূপ বুঝিতে হইবে। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন এই মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজ নিজ মতানুসারে উপনিষদসমূহের এবং গীতারও শব্দসকলের টানিয়া বুনিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন। তাহার পরিণামে গীতার প্রকৃত স্বরূপ—উহার প্রতিপাদ্য সত্য—কর্ম্মযোগ বিষয় তো একপাশে থাকিয়া গেল এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মতে, গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গীতা বেদান্তের দ্বৈতমতের কি অদ্বৈতমতের। হৌক; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ (প্রকৃতি), জীব (আত্মা কিংবা পুরুষ), এবং পরব্রহ্ম (পরমাত্মা কিংবা পুরুষোত্তম) ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কি বলিয়াছেন। এই বিষয়ে গীতা ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার সমস্ত বিচার উপনিষদে প্রথমেই যে আসিয়াছে, পরবর্ত্তী বিচার হইতে পাঠকদিগের তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুষোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তাঁহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্গীতায় প্রথমে তাঁহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর) এই দুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর রূপ যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাকী রহিল অব্যক্ত। এই অব্যক্ত রূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা যে নির্গুণই হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সূক্ষ্মরূপে থাকিতে পারে। তাই, অব্যক্তেরও সগুণ, সগুণ-নির্গুণ ও নির্গুণ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। 'গুণ' শব্দে শুধু মনুষ্যের বহিরিন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা নহে, মনের দ্বারাও যে সকল গুণের জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের মূর্ত্তিমান অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, উপদেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের নির্দেশ এই প্রকার করিয়াছিলেন—যথা, "প্রকৃতি আমার স্বরূপ" (৯. ৮), "জীব আমার অংশ" (১৫. ৭) "সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা আমি" (১০. ২০) "জগতে যে যে শ্রীমান্ কিংবা বিভূতিমান মূর্ত্তি আছে সে সমস্ত আমার অংশ হইতে হইয়াছে" (১০. ৪১), "আমার পরে মন রাখিয়া আমার ভক্ত হও" (৯. ৩৪), "তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি" (১৮. ৬৫), এবং যখন নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান তাঁহাকে এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা করা অধিক সহজ; তাই তুমি আমার উপর তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২. ৮) আমিই ব্রহ্মের, অব্যয় মোক্ষের, শাশ্বত ধর্ম্মের ও নিত্য সুখের মূল-স্থান (গী. ১৪. ২৭)। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতার অধিকাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপই অন্তিম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কারণ, উপরি-উক্ত বর্ণনার সঙ্গেই ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং তাহার অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপই আমার সত্য স্বরূপ। উদাহরণ যথা—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

অর্থাৎ—"আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় স্বরূপ তাহারা জানে না" (গী. ৭. ২৪); এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে (৭. ২৫) ভগবান বলিতেছেন যে, "আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে জানে না।" আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্ত স্বরূপের উপপত্তি এইপ্রকার বলিয়াছেন; 'আমি জন্মবিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজ মায়ার দ্বারা (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়া থাকি" (৪. ৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন—এই "ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি আমার দৈবী মায়া; ওই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে ও সে-ই আমাকে প্রাপ্ত হয়,

এবং সেই মায়ার দ্বারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সেই মূঢ় নরাধম আমার সহিত মিলিত হইতে পারে না" (৭·১৫)। শেষে ১৮ তম অধ্যায়ে (১৮·৬১) ভগবান উপদেশ করিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! সমস্ত ভূতের হৃদয়ে জীবরূপে ঈশ্বরই বাস করেন, তিনি আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন"। অর্জ্জুনকে ভগবান যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তাহাই ভগবান নারদকেও দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণী প্রকরণে কথিত হইয়াছে (শাং ৩৩৯); এবং নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মই গীতারও প্রতিপাদ্য ইহা আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। নারদকে এইরূপ সহস্র চক্ষুর, রঙের এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥

"তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা আমার উৎপাদিত মায়া; ইহা হইতে তুমি এরূপ বুঝিও না যে, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত।" আবার ইহা বলিয়াছেন যে, "আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহা সিদ্ধপুরুষেরা জানেন," (শাং ৩৩৯. ৪৪, ৪৮)। এই জন্য বলিতে হয় যে, গীতায় বর্ণিত অর্জ্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মায়িকই ছিল। সারকথা, উপাসনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত স্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠস্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এবং সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই তাঁহার মায়া; এবং এই মায়া কাটাইয়া শেষে তাহার পরমাত্মার শুদ্ধ ও অব্যক্ত স্বরূপের জ্ঞান না হইলে মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই যে গীতার সিদ্ধান্ত, তাহা উপরি উক্ত বিচার হইতে নির্ব্বিবাদে দেখা যায়। মায়া জিনিসটা কি তাহার অধিক বিচার পরে করিব। উপরে প্রদত্ত বচনাদি হইতে এইটুকু স্পষ্ট হইতেছে যে, এই মায়াবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য নূতন বাহির করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বে তাহা ভগবদ্‌গীতায়, মহাভারতে এবং ভাগবত ধর্ম্মেতেও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এইরূপ জগতের উৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং" (শ্বেতা, ৪·১০)। "মায়াই অর্থাৎ (সাংখ্যের) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি তিনিই আপন মায়ার দ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন।

পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত,—ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্তস্বরূপ সগুণ কি নির্গুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক। কারণ, যখন সগুণ অব্যক্তের আমার সম্মুখে এই এক উদাহরণ আছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সগুণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, তখনই পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপও ঐ প্রকার সগুণ বলিয়া মানিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আপন মায়ার দ্বারাই হোক্‌না কেন; কিন্তু যখন ঐ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেন (গী· ৯·৮) ও সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দ্বারাই সমস্ত করাইয়া থাকেন (১৮·৬১), যখন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (৯·২৪), যখন প্রাণীগণের সুখ-দুঃখাদি সমস্ত 'ভাব' তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন প্রাণিগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদনকারী তিনিই এবং "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (৭.২২)—প্রাণীদিগের বাসনার ফল দাতা তিনিই; তখন তো এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্তৃত্ব প্রভৃতিগুণের দ্বারা যুক্ত সুতরাং 'সগুণ'। কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও বলিতেছেন যে "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি"—কর্ম্ম অর্থাৎ গুণও আমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না (৪. ১৪); প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খলোক আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭; ১৪.১৯); কিংবা এই অব্যয় ও অকর্ত্তা পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপ থাকা প্রযুক্ত (১৩. ৩১), প্রাণিমাত্রের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম এই দুই হইতেই বস্তুত তিনি অলিপ্ত হইলেও অজ্ঞানে অভিভূত লোক মোহে পতিত হয় (৫. ১৪, ১৫)। এইপ্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের স্বরূপ সগুণ ও নির্গুণ, এই দুই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে এরূপ নহে; কিন্তু কোন কোন স্থলে এই দুই রূপকে একত্র মিশাইয়া পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো" (৯. ৫)—আমি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি নাই; এইরূপ নবম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "পরব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন" (১৩. ১২); "সর্ব্বেন্দ্রিয় আছে বলিয়া প্রতিভাত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত এবং নির্গুণ হইয়াও গুণের উপভোক্তা" (১৩.১৪), "দূরে এবং নিকটেও আছেন অবিভক্ত অথচ বিভক্তরূপে দৃষ্ট" (১৩. ১৬) এইপ্রকার পরমেশ্বর-স্বরূপের পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থাৎ সগুণ নির্গুণমিশ্রিত বর্ণনাও করা হইয়াছে। তথাপি প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য" (২. ২৫); আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয় হওয়া প্রযুক্ত শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না" (১৩. ৩১)। এইরূপ

পরমাত্মার শুদ্ধ, নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, অচিন্ত্য, অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সুরা।

(উদ্ধৃত)

(কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব)

সাধারণতঃ সুরাশব্দে সর্ব্বপ্রকার মদ্যই বুঝায়। সুরার অনেক নাম—মদ্য, মদিরা, মধু, সীধু, আসব ইত্যাদি। কাদম্বরী, বারুণী প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর নামও পাওয়া যায়; তন্ত্রশাস্ত্রে 'কারণ' 'তত্ত্ব' 'তীর্থ' প্রভৃতি গূঢ়ার্থক নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত কোষগ্রন্থে ষাটটির অধিক নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। মদ্ ইতি ভাষা; মদ্য বা মদিরা সেবনে মদ বা মত্ততা উপস্থিত হয়, ইহাই নামের ব্যুৎপত্তি।

যাবনিক 'সরাপ' বোধ হয় সুরার বৈমাত্রের ভাই। 'সরবৎ' ও ইংরাজী 'সিরাপ' (syrup) হয়ত নিকট আত্মীয়।

সুরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত উক্ত হইয়াছে—"গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।"

প্রাচীন শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার মদ্যের উল্লেখ রহিয়াছে,—

"মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধুকং নারিকেলজম্।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যানি দ্বাদশৈব চ।" (জটাধর)

(মহুয়া, কাঁটাল, আঙ্গুর, খেজুর, তাল, আক, আমলকী, বেল, মধু, যষ্টিমধু, নারিকেল ও ধান হইতে প্রস্তুত।)

ইহার মধ্যে—

"ধাতকীরসগুড়াদিকৃতা মদিরা—গৌড়ী।
পুষ্পদ্রবাদিমধুসারময়ী মদিরা—মাধ্বী।
বিবিধধান্যজাতা মদিরা——পৈষ্টী।"

অর্থাৎ ধাইফুল ও গুড় হইতে হয় গৌড়ী; ফলরস, ফুলমধু হইতে হয় মাধ্বী; নানা রকম ধান চাল হইতে হয় পৈষ্টী—অর্থাৎ ধেনো মদ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহারই চুরাশীটি ভেদ আছে, যাহা পথ্য বলিয়া গণ্য; অপথ্য মদ্যের সংখ্যা নাই।

উদ্ভবস্থান (বস্তু) হইতেই এই বিবিধ নাম, বুঝাই যাইতেছে।

পুরাণ-ইতিহাসে দৃষ্ট হয় সুধা বা অমৃতের উৎপত্তি স্থান যাহা, সুরারও তাহাই। অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, গরল, কালকূট বা হলাহলের উৎপত্তিস্থানও তাহার সন্নিকটে। সুরা—দেবী; অনেকেই বলিবেন শীতলা ওলাউঠার ন্যায় ইনিও এক মহা-প্রকোপ-বিশিষ্টা জাগ্রতা দেবী।

অমৃতসংগ্রহের প্রয়াসে দেবদৈত্যে মিলিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করেন। মন্থনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রীই উত্থিত হইয়াছিল—হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু সুরভি, পুষ্পশ্রেষ্ঠ পারিজাত, রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ, ওষধির রাজা চন্দ্র, ঐশ্বর্য্যের রাণী লক্ষ্মী, প্রভৃতি। সেই সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন—সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা, সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারুণী। উত্থিতা হইয়াই ইনি গ্রহীতার অন্বেষণ করিলেন। দৈত্যেরা ইহাকে গ্রহণ করিল না, দেবগণ আশ্রয় দিলেন। এই প্রতিগ্রহনিবন্ধন তদবধি দেবগণ উপাধি পাইলেন 'সুর', দৈত্যগণের নাম হইল 'অসুর।' *

[রামায়ণ। আদি ৪৫

"সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।"

সুরাপক্ষপাতী সুরগণ অসুরগণকে স্বর্গ হইতে খেদাইয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণ অনুসারে এই পৃথিবীতে সাতটি সমুদ্র আছে, তন্মধ্যে একটি সুরাসমুদ্র।

সুরা যে দূর পূর্ব্বকালেও বড় আদরের বস্তু ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কি দেবদেবতা কি মুনিঋষিগণ সকলেই ইহার গুণমুগ্ধ ছিলেন, সেবা করিতেন; সামান্য মনুষ্যের ত কথাই নাই। কালক্রমে অসুর দৈত্যরাও আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া দেবীর যে পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুরাণ-উপপুরাণে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আমি ভুল করিতেছি। দেব-ঋষিরা পান করিতেন সোমরস, সে কি সুরা? সত্য; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে স্বীকার করি। কিন্তু ব্যবহারফলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ তফাৎ আছে, মনে হয় না।

সুরা প্রস্তুত হয়, ধান্য-ফল-ফুল-রস হইতে; আর সোমরস প্রস্তুত হইত, লতা-বিশেষের নির্য্যাস হইতে। সোমরস পান করিলে স্বর্গলাভের—অমরত্ব লাভের সম্ভাবনা ঘটিত; সুরা পান করিলে বিষম প্রত্যবায়—নরকবাস ঘটে; শাস্ত্রে ঐরূপ উল্লেখ আছে।

স্মৃতিগ্রন্থ বিষ্ণু-সংহিতায় রহিয়াছে,—"সোমপায়ী ব্যক্তি সুরাপায়ীর মুখ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করতঃ এক দিন থাকিবে, তবে তাহার পাপ মোচন হইবে।"

[বিষ্ণু। ৫১।১-২

সোমপায়ী ও সুরাপায়ীর মধ্যে এতই প্রভেদ! সুরা-স্পর্শে পাপ, সুরার আঘ্রাণে পর্য্যন্ত পাপ। সুরার আঘ্রাণমাত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুরাপায়ী পতিত, সুরাপান করিলে নরক অনিবার্য্য—বহু স্মৃতিকার ঋষিই বিধান দিয়াছেন। আর সোমরস দেবতার ভোগ "সোম জ্যোতি দান করে, স্বর্গ দান করে, সমস্ত সৌভাগ্য দান করে, শত্রু নাশ করে ও মঙ্গল বিধান করে।" বৈদিক ঋষিগণ উল্লাসভরে গান করিয়াছেন। [ঋক্। ৯৪।২।৩] সুরার উপর শুক্রশাপ, ব্রহ্মশাপ, কৃষ্ণশাপ আছে, দৃষ্ট হয়। সোম ও সুরায় এতই পার্থক্য!

---

* কোন কোন পুরাণে ইহার বিপরীত কথা আছে; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত। ৮ স্ক ৮ অ।

সোম নামক লতা (এক প্রকার পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্) প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়ন করতঃ অর্থাৎ থাঁতলাইয়া, দশ আঙুলে চট্‌কাইয়া শ্বেতবর্ণ (অথবা হরিত কিম্বা পিঙ্গল বর্ণ) * এক প্রকার ঈষৎ অম্লস্বাদ রস বাহির হইত; সেই রস জলে ফেনাইয়া লইয়া মেষলোমনির্ম্মিত ছাঁকনীতে ছাঁকিয়া কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে নয় দিন ধরিয়া রাখিয়া পচাইয়া লওয়া হইত; তখন মাদক অবস্থার পরিণত হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইত। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর কিম্বা নাবার ও ভূষৈব সহযোগে অতি উপাদেয় পানীয় হইয়া উঠিত—যাহার জন্য দেবতা ঋষিরা লালায়িত হইয়া থাকিতেন।

সোমরস পান করিলে যে বিলক্ষণ নেশা হইত, বেদে ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ আছে। সোমপানে প্রাণে স্ফুর্ত্তি আইসে, মাদকতা জন্মে, এমন কি নিদ্রা আসিয়া পড়ে, ঋক্‌বেদে (৯ মণ্ডল) সে কথাও রহিয়াছে। সোমের একটী বিশেষণ—মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ (৯।১০৮।১২)। এই দুর্ব্বাদলবর্ণ সোম যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন (৯৫৩।৪)। সোমরস দেবতাদিগের অতি প্রিয় পানীয়। পানীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত (৯।৫১।২)। দুগ্ধসংযোগে সুবাসিত সোমপানে আমোদ। পানে সুখ (৯।৪৫।৩)। সোমের নামান্তর অমৃত। সোমই অমৃত। † ৬।৪৪।১৬

পুরাকালে আর্য্যজাতির সোমযাগ ছিল। ‡ সোমযজ্ঞে দেবতাকে সোমরস নিবেদন করা হইত। যাজ্ঞিকেরা, যজ্ঞকর্ত্তারা, ঋত্বিক্ ও যজমান যজ্ঞশেষ গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ প্রসাদী সোমরস পান করিতেন। সোমযজ্ঞে দেবতাদিগকে ভাণ্ড ভাণ্ড চিত্তমুগ্ধকর সোমরস সমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিবার উল্লেখ আছে। যজ্ঞকারীরা উৎফুল্ল হইয়া গাহিয়াছেন "সে অমিয়ধারা পান করিলে অসুস্থ সুস্থ হইয়া উঠে, কবির কবিত্ব-উচ্ছ্বাস ফুটে, দরিদ্র মনে মনে ধনভাণ্ডার লুটে!" (৯।৬৭।১৩) "ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহা কিছু উলঙ্গ তাহাই আবৃত এবং যাহা কিছু আতুর তাহাই আরোগ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় অন্ধ দেখিতে ও খঞ্জ হাঁটিতে পারে।" (৮।৭৯।২) (ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য সংবাদ।

গত ২৬শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ ভবনে ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরমা দেবীর সহিত দারিয়াপুর নিবাসী ৺ প্যারিমোহন শিকদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ শিকদারের শুভ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চৌধুরীপরিবার সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে সাদরসম্ভাষণে পরম পরিতোষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে প্রীতি-ভোজন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি পৌরোহিত্য করেন।

গত ২৯ শে বৈশাখ (১২ই মে) সোমবার কলিকাতা ৫১ নম্বর গড়পার নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র পাকড়াসী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সবিতা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শোক সংবাদ।

৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর— আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে প্রথিতনামা পণ্ডিত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। তিনি ৯ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দুরারোগ্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে অশীতিপরা বৃদ্ধা মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ঊনষাট বৎসর হইয়াছিল। আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিসুখ প্রার্থনা করি।

আয় ব্যয়।

১৮৪০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৯০১৮॥৵১
পূর্ব্ববৎসরের স্থিত	...	৫৮৶৬
সমষ্টি	...	৯০২৪॥৴৭
ব্যয়	...	৯০২২৸৭
স্থিত	...	২॥৴০

* ঋক্‌বেদে সোমরস নানাবর্ণ—শ্বেত, হরিত, পিঙ্গল, লোহিত, রক্ত। সোমলতা দুর্ব্বাবর্ণ।

† বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও মতে অমৃত ও সোম অভিন্ন। দেবগণের পানীয় সমুদ্রমন্থনোদ্ভব অমৃতের উল্লেখ ঋক্‌বেদে নাই। বহুস্থলে আছে, সুপর্ণ শ্যেন পক্ষী আকাশ হইতে সোম আনিয়াছিলেন (৯।৪৮।৪); ইহা হইতেই পুরাণে সুপর্ণ গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত আহরণ আখ্যানের উৎপত্তি। সোম যদি হয় অমৃত বা সুধা, সুরার সহিত সুধার বড় তফাৎ নাই।

‡ প্রাচীন আর্য্যজাতির শাখা ইরানীয়দিগের মধ্যেও সোমের ব্যবহার ও উপাসনা ছিল। তাঁহারা সোমকে হওমা কহিতেন ও যজ্ঞে ইহার অভিষব প্রদান করিতেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষ বোম্বায়ের পার্শী সম্প্রদায় এখনও উহা করিয়া থাকেন।

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২৪০০৲
বাৎসরিক দান	২১৲
আনুষ্ঠানিক দান	২৭৲
এককালীন দান	২৬।/০
মাঘোৎসবের দান	৪০॥০
বণ্ডেড্ ওয়ার হাউস ডিভিডেণ্ড	১০০৲
কোম্পানীর কাগজের সুদ	৯২৫৪
ওয়ারলোনে সুদ	৬/১০
সস্পেন্স আদায়	৯৭৫৩
সস্পেন্স জমা	৩৬৵০
Theological College fund	২৯॥/৮
দানাধারে প্রাপ্ত	২॥/৬
পুরাতন কাগজ বিক্রয়	৬৴৯
গচ্ছিত আদায়	২৩২৫॥৴৩
হাওলাত আদায়	৫৭৲
হাওলাত জমা	১০৭৩।৴৯
সমষ্টি	৬৩৪১।৴৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বকেয়া মূল্য	[২২২৸৯
হালমূল্য	২৪৬৵০
ডাকমাশুল	২৫/০
নগদ বিক্রয়	৪/৯
সমষ্টি	৪৯৮/৬

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৯১৸/০
গচ্ছিত পুস্তক	১১৯।০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১৫।৴৬
ডাকমাশুল আদায়	৮॥৬
সমষ্টি	২৩৫/০

যন্ত্রালয়।

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৪৯৫৲
সমাজের পুস্তক মুদ্রণ	৩৬৲
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৭০৫৴৯
কাগজের মূল্য	৫৯১॥৴৯
দপ্তরী	১০৬৸/৯
বিবিধ জমা	৯৲
সমষ্টি	১৯৪৪/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	৯১৭৴০
আসবাব	৩১৸/৬
সরঞ্জামী	১৫৸/৩
ডাকামাশুল	২২৵৬
পাখাকুলি	৮।০
গান ছাপান	৩৬৲
ইলেক্ট্রিক্লাইট	৩৬॥৴০
আলো মেরামত	৫॥/০
ট্যাক্স	২০৭৸৵০
লাইসেন্স	১২৲
কেরোসিন তৈল	৮।৬
বারবরদারী	২৪৸৯
পার্ব্বনী	৩৲
সস্পেন্স	৬০।/৯
মাঘোৎসব	১০৪॥০
কোম্পানীর কাগজক্রয়	১৭০।৵০

১৯১৭ সালের ১১শে আগষ্ট তারিখের ০৩৪৬১২ নং ৫৲ সুদের ওয়ারলোন ও ১৮৫৪।৫৫ সালের ১৮৬০৬৮ নং ৩।৹ সুদের কাগজ।

সস্পেন্স শোধ	৩২৸৵০
অন্যান্য	২১৸৵৩
গচ্ছিত	২৪৮৪৸৵১
হাওলাত দাদন	৫০৸৵৯
হাওলাত শোধ	১৫২৯॥৵৩
সমষ্টি	৫৭৮৪৸৵৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কাগজের মূল্য	২২২।৵৬
মুদ্রাঙ্কণ মূল্য	৪৯৫৲
বাঁধান	২৮॥০
প্রবন্ধ	১০৭৸০
ডাকমাশুল	৭৭৴৩
কর্ম্মচারীর বেতন	৬০৲
কমিশন	৪৸০
অন্যান্য	১।৵৩
সমষ্টি	৯৯৬৸৵০

পুস্তকালয়।

দপ্তরী	৫৴৩
গ্রন্থভাণ্ডারের জন্য পুস্তক	১৮৫৩
বিক্রয়ের জন্য পুস্তক ক্রয়	৯৸৵০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	৭৯।৩
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১১৸৵৯
বিজ্ঞাপন	৬।/৩
ডাকমাশুল	১১॥/০
অন্যান্য	৸৩
সমষ্টি	১৪৩৲

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	৯৭৭।৵৬
জলপানী	৫॥৴০
প্রুফ কাগজ	১৩৸৵০
অপরের কাগজ	৫১৪॥৴৯
কালী	২১।৵০
দপ্তরী	১৫৫৸/০
অক্ষর	১৮৫॥৩
মাশুল	৮৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১১১॥৵০
সস্পেন্স	৪২॥০
অন্যান্য	৬০৸৵৬
সমষ্টি	২০৯৭৴০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

চিরাশ্রয়।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

শুধু তুমি—শুধু তুমি—শুধু তুমি নাথ,
আছ—আছ মোর তরে! নিঠুর ভুবন
সুকোমল বুকে মোর করিয়া আঘাত
বিকচ জীবনখানি করিতে দহন
জ্বালে শত দাবানল—নিবিড় আঁধার
ঘেরে আসে চারিধারে, মনে হয় হায়,
নাহি বুঝি মুক্তি আর! হে প্রিয় আমার!
তুমি হাস প্রাণে বসি', পীযূষ-ধারায়
কনে যাই সিক্ত হয়ে! চেয়ে দেখি কবে
দুই বাহু প্রসারিয়া মায়ের মতন
আমারে রেখেছ ঢাকি' বিষ-দগ্ধ ভবে
সকল বেদনা হতে! বুঝি না কেমন
এ লীলা—এ দয়া তব! শুধু সত্য জানি
হারাব না কভু এই চিরাশ্রয়খানি!

জাতীয় জীবনের অন্যতর ভিত্তি।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

যখন কোন অধঃপতিত জাতি নানা অত্যাচার ও কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই সেই মৃতকল্প জাতির মধ্যে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যেও প্রকৃত জাতীয় জীবনের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই পবিত্র 'জাতীয়-জীবন' যে কয়েকটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আপনার জনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মান-স্পৃহা তন্মধ্যে একতম, প্রধানতমও বটে।

যে জাতির আত্মসম্মান বোধ নাই, যাহারা আপনার জনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে জানে না, তাহারা শত সাধনা সত্বেও জগতে উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। সে জাতি জীবিত হইলেও মৃত।

প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তোলে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রমুখে তাহাকে সজোরে আকর্ষণ করে। পরস্পরকে যথোপযুক্ত সম্মান করিতে জানিলে প্রথম দর্শনেই পরস্পরের গুণাবলী পরস্পরের চক্ষে পড়ে; নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার সুযোগ ঘটে। ইহাতে হিংসা বিদ্বেষ কিংবা পরশ্রীকাতরতা মনে আসিতে পারে না; পক্ষান্তরে অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও সহজসাধ্য ও সুদৃঢ় হয়।

ইতিহাস আবহমান কাল হইতে প্রাগুক্ত বিষয়-দ্বয়ের অশেষ গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। যে ইংরাজ আজ উন্নতির সর্ব্বোচ্চগ্রামে আরূঢ় বলিয়া এত স্পর্দ্ধা করে, তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানজ্ঞান ও পরস্পরের প্রতি সম্মান-স্পৃহা অতীব বলবর্ত্তী। ইংরাজ আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কি না করে?

সম্প্রতি জাপানসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে পড়িতেছিলাম—"জাপানীদের মনুষ্যত্বের মূল্য কোথায়? একটা উৎকট আত্ম-মর্য্যাদা বা আত্ম-সম্মান জ্ঞানে। যে আত্ম-সম্মানবোধ মনুষ্যের আপাদমস্তকে এক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারণ করে, এবং অবমাননার ছায়পাতেও জীবনটা অবলীলা-ক্রমে মৃত্যুর পায়ে ঠেলিয়া দিতে প্রস্তুত করে, সেই তীব্র আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান যে জাতির আছে, তাহাকে জগতের সমক্ষে হীন করিয়া রাখে, এ শক্তি কাহার?

"যাহাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম—পাশ্চাত্য জগতে যাহাকে স্বদেশ-প্রেম বলে, উহা এই আত্মমর্য্যাদারই নামান্তর মাত্র।

"এই আত্ম-মর্য্যাদাবোধ এবং তৎপ্রসূত আত্ম-নির্ভর ও স্বাবলম্বন জাপানীদের মধ্যে সুতীব্র ভাবে বিদ্যমান এবং উহার মূলে এক অমর তেজ নিহিত রহিয়াছে।"

জাপানীরা যে পরস্পরকে সম্মান করিতে কত পটু, লেখক সে কথা এ স্থলে না লিখিলেও আমরা অবগত আছি; প্রকৃত মানীই অপরের মান রক্ষা করিতে জানেন।

কথায় বলে "প্রাণ অপেক্ষা মান বড়"। মহা-রাজ দুর্য্যোধন এই মানের জন্যই প্রাণ দিয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সোনার ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যদোষে মানীর মান রক্ষা করিতে জানিতেন না—তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার জ্যেষ্ঠোচিত সম্মানপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাই পরিণামে তাঁহার এত শোচনীয় অধঃপতন।

আজ আমরা আশার অত্যুজ্জ্বল আলোকে মুগ্ধ হইয়া জাতীয় জীবন লাভার্থ ছুটিয়াছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন আত্মসম্মানজ্ঞান, তেমন পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা কোথায়? তবে আমাদের জাতীয় জীবন কোন্ অক্ষয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

আমাদিগের পূজ্যতম পিতৃপুরুষগণের অতীত গৌরবকাহিনী স্মরণ করিয়া আমরা যে মধ্যে মধ্যে স্ফীত হই, তাহা আত্মসম্মান-জ্ঞান নহে; তাহা আত্মাভিমান বা আত্মছলনা। আমরা মাঝে মাঝে পরস্পরকে সম্মান দেখাইবার জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠি, তাহা অনেক স্থলে পরস্পর-সম্মান-স্পৃহা-সঞ্জাত নহে; স্থলবিশেষে তাহা আন্তরিকও নহে; প্রকৃত পক্ষে উহা বাহ্যিক শিষ্টাচার বা লোকাচারের একটী অস্থায়ী উচ্ছ্বাস মাত্র।

আত্মাভিমান বা আত্মছলনা মানুষকে আত্মোন্নতি বিষয়ে অন্ধ করে, আর সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক উচ্ছ্বাসই জলবুদ্বুদ্‌বিশেষ; যেমনি জাগিয়া উঠে, তেমনি মিলাইয়া যায়, হৃদয়ে চিহ্নমাত্রও অঙ্কিত করিতে পারে না। ফলতঃ কার্য্যকারিতা হিসাবে এ গুলির কোনও মূল্য নাই, ইহাদের দ্বারা ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অবশ্যম্ভাবী।

ইতিপূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, স্বদেশের সহিত বাস্তব পরিচয়ে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, সকল অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইয়া যায়। আজ মনে হয়, এই স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহার বিকাশেই পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা আপনি জাগিয়া উঠে। যে নিজের মূল্য বুঝে না, সে অপরের মূল্য বুঝিবে কিরূপে?

আপনাদিগের প্রাচীন জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আত্মসম্মান বোধ পরিস্ফুট হইতে পারে বটে। কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান স্থলে আত্মাভিমান সংক্রামিত হইবারও আশঙ্কা আছে।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে আমাদের দেশনেতা বলিয়া মান্য করি, তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় দুটীর বিশেষ অসদ্ভাব দেখা যায়। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে কিছু শুভজনক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

জানি না কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে বিধাতা আমাদিগের মধ্যে জাপানীদের মত তীব্র আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিবেন—আমাদিগের গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ভাবকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবেন। আমরা কি

সে পুণ্য মুহূর্ত্ত অদূরবর্ত্তী বলিয়া আজ আশ্বস্ত হইতে পারি না? একমনে ভগবানকে আহ্বান করিয়া প্রাণের ভিতরে বসাও, তাহা হইলেই জাতীয় ভাব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে। ভগবদ্ভক্তিই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানতম ভিত্তি।

স্বদেশ-সঙ্গীত।

(বাউলের সুর)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

ভারতের মলিন মুখ—মুছাও মুছাও!
ভারতের গভীর দুখ—ঘুচাও ঘুচাও!
তৃষ্ণা-ক্ষুধায় হাহা করে লোক
নিবার' নিবার' এ যাতনা শোক্
অবমান স্মরি' ভরে আসে চোখ্
জননী, বাঁচাও বাঁচাও!
তোমা সম ওগো জননী
কে বুঝিবে ব্যথা অমনি!
তোমারে ডাকি গো এ ঘোর দুর্দ্দিনে
মুনি ঋষি সনে আন গো সুদিনে
এ তিমির-রাত কর গো প্রভাত
আঁখি, মুছাও মুছাও॥

লাইব্রেরি—আমাদের জীবনের অঙ্গ।

(একটী ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোন মহাত্মা বলেছেন যে "একটা ছোট লাইব্রেরিকে প্রত্যেক বৎসর বাড়িয়ে তোলা মানুষের জীবনের একটা খুব ভাল কাজ। পুস্তক রাখা মানুষের কর্ত্তব্য; লাইব্রেরী বিলাসের বস্তু নয়, কিন্তু জীবনের একটী অঙ্গ।" এই লাইব্রেরী অর্থে বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত গ্রন্থভাণ্ডার নহে, কিন্তু পড়িবার জন্য রক্ষিত গ্রন্থাগার। মনুষ্যের জীবনে, কেবল মনুষ্যের কেন, জাতীয় জীবনে লাইব্রেরী যেমন প্রভাব বিস্তার করে, এমন আর কোন কিছুও করিতে পারে কি না সন্দেহ।

অনেক লাইব্রেরী সম্বন্ধে সুপাঠ্য ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কত অমূল্য লাইব্রেরী পুড়িয়া যাইবারও বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ নীরস নহে; সেগুলি পড়িলে মনে হয় যেন উপন্যাস পড়িতেছি। কোন দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটিবার সঙ্গে, কিম্বা যুদ্ধ বাধিলে কত ভাল ভাল লাইব্রেরি যে বিনষ্ট হইয়া যায় বা যাইবার সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলেই বিদ্রোহবিপ্লব বাধাইতেও ইচ্ছা হইবে না, আর অন্যায় লোভে অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতেও ইচ্ছা জাগিবে না। প্যারিসে একবার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব উপলক্ষে ক্ষিপ্তপ্রায় লোকেরা সেখানকার একটা বৃহৎ লাইব্রেরি পুড়াইয়া দিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি কবি ভিক্টর হিউগো তাঁহার এক গ্রন্থে ("ভীষণ বৎসর") ইহারই উদ্দেশে মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন:—

"তুমি তবে পুড়ায়েছ গ্রন্থাগার ওই?—
পুড়ায়েছি আমি—আগুন দিয়েছি আমি।
অপরাধ—এত বড় শুনিনিকো কোথা—
হতভাগ্য নিজপ্রতি করেছ এ পাপ!
বুঝিয়া দেখেছ তুমি করেছ কি কাজ?—
নিভায়েছ আপনার প্রাণের আলোক।"

পুরাকালে মিশর দেশের আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে একটী সুবৃহৎ গ্রন্থগার ছিল। এই একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, একবার যখন মুসলমানগণ আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর দখল করিয়াছিল, তখন তাহাদের সেনাপতি নিজের গোঁড়ামির ফলে সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটী পুড়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিল। সেই সেনাপতির কথা ছিল এই যে, কোরাণে যে কথা আছে, সেই কথাই যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে থাকে, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ রাখিয়া এত স্থান বৃথা অধিকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; আর যদি কোরাণে যে কথা আছে, সে কথা যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে না থাকে, অথবা কোরাণের কথার অতিরিক্ত কোন কথা থাকে, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ অপাঠ্য, সুতরাং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করা অনুচিত। এই যুক্তিতে সেনাপতি সমস্ত লাইব্রেরি পুড়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিল। ইহা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মুল কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, আলেকজাণ্ডিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটী এক সময়ে পুড়িয়া গিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে বিস্তর বহুমুল্য গ্রন্থও ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই ঘটনার ফলে

জগতের যে লোকসান হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

আমাদের দেশেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এদেশের তান্ত্রিক রাজাগণ এবং মুসলমান নবাবগণ নিজেদের গোঁড়ামির কারণে কত শত বৌদ্ধস্তূপ এবং সেই সকল স্তূপে সঞ্চিত কত সহস্র অমূল্য পুঁথি যে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, আমাদের পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর খড়বিচালিতে ছাওয়া। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সমস্ত খড়বিচালি শুকাইয়া গিয়া সামান্য বাতাসের হিল্লোলে নড়িতে নড়িতে অথবা কোন সূত্রে একস্ফুলিঙ্গ অগ্নি পাইলেই সহজে জ্বলিয়া উঠে। সেই অগ্নির মুখ হইতে ঐ প্রকার ঘর-দুয়োর রক্ষা করাই অসম্ভব। এই প্রকারে আগুন লাগিয়াও কত পণ্ডিতের কত যে অমূল্য পুঁথি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিলেও চক্ষের জল ধরিয়া রাখা যায় না। এই সেদিন বেলজিয়মের লুভেন নগর ধ্বংস করিবার ফলে তাহার যে সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, শুনা যায় যে সেই লাইব্রেরিতে এমন অনেক পুস্তক ও পুঁথি ছিল যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যাইত না। সেগুলি যদি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার আর উদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নাই।

তারপর, লড়াই-যুদ্ধ উপলক্ষে এক দেশের লাইব্রেরির গ্রন্থ পুঁথি প্রভৃতি আর এক দেশে যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন কত গ্রন্থ, কত যন্ত্র প্রভৃতি যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই। ইহার ফলে একদেশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে সেই সমস্ত গ্রন্থনিহিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে; যে দেশে সেই সমস্ত গ্রন্থ গিয়া পড়িল, তথাকার লোকেরা নূতন করিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে ধীরে ধীরে নূতন জ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হইতে লাগে। লড়াই-যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেও কত শত লাইব্রেরি নানা কারণে একের অধিকার হইতে অপরের অধিকারে চলিয়া যায়, একদেশ হইতে অপর দেশে চলিয়া যায়। এই প্রকার লাইব্রেরি সমূহের উত্থানপতন, হস্তান্তর ব্যাপার প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে আমরা এত মোহিত হইয়া পড়ি যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে লাইব্রেরি আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে যাও, দেখিবে সেখানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পুস্তক তোমাকে ঘিরিয়া আছে; সেখানে কত শত বিদ্বান ব্যক্তি আলোচনা-অধ্যয়নে সমুদয় মনোযোগ নিয়োগ করিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিলে কে অস্বীকার করিবে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে, এই উচ্চ শিক্ষা এবং জ্ঞানবিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে, লাইব্রেরি আমাদের জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ? কার্লাইল ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরির সঙ্গে রীতিমত বিবাদ করিলেও ইহার বিশেষ উপকারিতা বুঝিয়া প্রত্যেক নগরে এক একটী সাধারণ লাইব্রেরি খুলিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

কেবল কার্লাইল কেন, অন্যান্য অনেকেও লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এবং সাধারণের পক্ষে সুপাঠ্য পুস্তক পাইবার সুবিধা করিবার জন্য আন্তরিক উপদেশ দিয়াছেন। রাজনীতিজ্ঞেরা খুব জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয় উন্নতির পক্ষে লাইব্রেরি বিশেষ সহায়। এইপ্রকার সকল শ্রেণীর লোকদের উৎসাহ ও অনুমোদনের ভিতরে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রবর্ত্তিত হইয়া হুহু শব্দে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে যে রকম বেশী হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জাতিমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ লাইব্রেরি অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক।

সাধারণ পাঠাগার প্রবর্ত্তিত হইবার পর জগতে দু'এক পুরুষ নূতন লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছে। নব্যযুগের নূতন লোকদের কার্য্যকলাপে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সাধারণ গ্রন্থাগার সকল আমাদের জীবনে জাতীয় মঙ্গলের দিকে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি দেখিয়া অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠাগার অপেক্ষা আর একটী জিনিস লোকের সুখ ও আনন্দ বিধানে অধিকতর সাহায্য করিবে—সেটী হইতেছে যাহারা পুস্তক ভাল বাসে, তাহাদের পুস্তক পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া—এক কথায়, প্রত্যেকের নিজ নিজ গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিবার সাহায্য করা।

মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে এই রকম লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিয়া দেশের খুব উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই উপকার সম্বন্ধে আমরা বড় বেশী কথা শুনিতে পাই না। আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রে ছাপিবার তড়িদ্গতি এবং তাহার ফলে পুস্তকপ্রকাশে ও পুস্তকের মূল্যে মহাপরিবর্ত্তন প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিবার একপ্রকার আশ্চর্য্য প্রণালী বাঁধিয়া দিয়াছে বলিলেও চলে। পুস্তক প্রকাশ খুব উচ্চ সীমায় উঠিলেও এখনও সে বিষয়ে উন্নতি সাধনের অনেক অবসর আছে।

এখনও অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা বলিতে পারেন যে এক সময়ে কি-প্রকার উচ্চ মূল্যে পুস্তক কিনিতে হইত—এত উচ্চ মূল্যে যে, অনেক স্থলে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে পুস্তক ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এখন তাঁহারা সুলভ মূল্যে ভাল ভাল পুস্তক বিক্রয় হইতে দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবেন যে তাঁহাদের সময়ে সুলভ মূল্যে এ রকম ভাল ভাল গ্রন্থ কেন বিক্রয় হয় নাই। আমাদের দেশে এই বিষয়ে আদিব্রাহ্মসমাজ পথ-প্রদর্শক। আদিব্রাহ্মসমাজ এ দেশে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও শাস্ত্রমূলক নানাবিধ গ্রন্থের সম্ভবমত সুলভ মূল্যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যখন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, তখন জনসাধারণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে মূল্যে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা সম্ভব-মত অল্প হইলেও এ দেশের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। তারপর, জনসাধারণের উপ-যোগী মূল্যে গ্রন্থপ্রকাশের পথপ্রদর্শক হইলেন বঙ্গবাসীর প্রথম স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য ৺ যোগেন্দ্র নাথ বসু। তিনি অধিকসংখ্যক ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মূল মন্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার এই উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেন, আমরা শুনিয়াছি যে, তখন অনেক প্রবীণ গ্রন্থপ্রকাশকও যোগেন বাবুর সে উদ্যমের সার্থকতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ এদেশে এ বিষয়ে একরথী ছিলেন। তাঁহার পর, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ৺উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বহুসংখ্যক ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মন্ত্র আয়ত্ত পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদেরই পুণ্যপ্রভাবে আজ বঙ্গদেশ সাহিত্যপ্রেমে সমুদয় ভারতবর্ষের অগ্রণী বলিলেও চলে।

বর্ত্তমানে আমরা ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও মন্ত্রী ব্যালফরের সহিত একবাক্যে বলিতে পারি যে, "জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সময় অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেই সংগৃহীত বিষয় সকল জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিবারও অনেক বেশী সুবিধা হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কল্পনাই করিতে পারেন না যে, আমরা এখন কি সুলভ মূল্যে ছোট ছোট বই—ভাল কাগজে ছাপা, ভাল বাঁধা পাইতে পারি।

আর একটী গ্রন্থ-বিক্রয়ের নূতন প্রণালী প্রব-র্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রণালীর নাম আমরা কিস্তিবন্দী প্রণালী দিতে পারি। সামান্য কিছু অগ্রিম দিয়া তুমি এক সেট গ্রন্থের গ্রাহক হইলে; তাহার পর প্রতি মাসে কিছু কিছু করিয়া দিয়া কয়েক মাসে সেই সেটের সমস্ত দামটাও চুকাইয়া দিলে, আর তোমারও বিশেষ কিছু গায়ে লাগিল না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। আমার এক সেট বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ চাই। মনে কর সেই সমুদয় সেটের দাম ২০৲ টাকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এমন কয়জন লোক আছেন, যাঁহারা একেবারে ২০৲ টাকা দিয়া একসেট গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারেন? কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ১৲ টাকা অগ্রিম দিয়া তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এইরূপে তাঁহারা গ্রাহক হইলে বহিগুলো তাঁহাদের গৃহে আনা হইল, তাঁহারা বহিগুলি পাঠ করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন। তাহার পর, যদি তাঁহাদের মাসে মাসে ৪৲ টাকা করিয়া ছয় মাসও দিতে হয়, মোটের উপর ২০৲ টাকার স্থলে ২৫৲ টাকাও দিতে হয়, তাহাতেও হয়তো তাঁহাদের গায়ে লাগিবে না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই চাকুরী করেন, মাসে মাসে মাহিনা পান; কাজেই তাহাদের পক্ষে এ ভাবের একটা গ্রন্থক্রয়ের প্রণালী বড়ই সুবিধা-জনক। এভাবে লাইব্রেরি করিতে থাকিলে ক্রেতা,

তাঁহার কত খরচ হইল, তাহা ধারণা করিতে না করিতে তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। এই প্রণালীতে যাঁহারা কখনও দুচারখানি ভাল গ্রন্থ কিনিবার আশাও করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও অনেকগুলি গ্রন্থের অধিকারী হইতে পারেন।

এই প্রণালী প্রবর্ত্তনের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা বিশ্বাসস্থাপনরূপ আর একটী গুরুতর সুফল হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সত্যবাদিতা এত বেশী ছিল যে, অনেক সময়ে মুখের কথাই বাণিজ্যব্যবসায়ে যথেষ্ট বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন তাহার ঠিক উল্টা হইয়াছে। এখন আমরা আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপ প্রতিপদে লিখিত দলিল চাই। কিন্তু গ্রন্থ কিনিবার কিস্তিবন্দী প্রণালীতে যদিও নামেমাত্র একটা দলিল লিখিয়া দিতে হয়, তথাপি উহার প্রধান ভিত্তি হইল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। এই প্রণালী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেই খুব প্রচলিত। বিলাতের টাইমস পত্রের স্বত্বাধিকারীগণ এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটরেচার কোম্পানি আমাদের দেশে বিলাতী পুস্তক সম্বন্ধে এই প্রণালী সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে চালাইবার সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে দেশীয় পুস্তকাদি সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি এ প্রণালী চালাইতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। আমাদের বিশ্বাস, একটী কোম্পানি খুলিয়া এই প্রণালীতে গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে, এবং সেই সঙ্গে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাসস্থাপনের একটী পথ খুলিয়া যাইবে।

একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, 'যে গৃহে গ্রন্থ নাই, সে গৃহ জানালাবিহীন ঘরের ন্যায়। ছেলেদিগকে গ্রন্থের দ্বারা ঘিরিয়া না রাখিলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার কথা বলিবার অধিকার কোন পিতামাতার নাই। এরূপ করিলে সমস্ত পরিবারের পক্ষে গৃহকর্ত্তার অন্যায় করা হয়, তিনি পরিবারকে প্রতারিত করিতেছেন! গ্রন্থের সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতেই ছেলেরা পড়িতে শিক্ষা করে।' সেই কারণেই আমরা বলিতে চাই যে, গৃহে একটা লাইব্রেরি থাকা আমাদের জীবনের অঙ্গ।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কিস্তিবন্দী প্রণালীতে বিলাতে অনেক বড় বড় লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সমস্ত লাইব্রেরি যে ভালরকমে চলিতেছে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে যে, সেই সমস্ত লাইব্রেরি স্থানীয় অভাব মোচন করিয়াছে। যে রকম কোম্পানির কথা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি, যদি সে রকম কোন কোম্পানি গঠিত হয়, আর যদি সেই কোম্পানি সত্য সত্য দেশের মঙ্গল সাধনে উদ্যুক্ত হয়, তবে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন মহৎ লোকের জীবনী প্রকাশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দেন। চাষাভুষো বলিয়া পূর্ব্বে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, আজকাল তাহারাও একটু পয়সার সুবিধা হইলেই ছেলেপিলেদিগকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য স্কুলে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেয়। তাহার উপর প্রস্তাবিত শাসনসংস্কারের ফলে অনেক "চাষাভুষোর"ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকার পাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আমাদের উচিত যে তাহাদের হাতে খুব ভাল ভাল গ্রন্থ, বিশেষত মহৎলোকের জীবনী তুলিয়া দেওয়া এবং এই প্রকারে তাহাদের প্রাণে মহৎলোক হইবার ইচ্ছা জাগাইয়া তোলা।

চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই জীবনীর মূল্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক লর্ড লিটন বলিয়াছেন—"তুমি যাহা পাইতে চাও, তাহা না পাইয়া যখন তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতে থাক যে, ভগবান আমাকে এটী দিলেন না, ভগবান আমাকে ঐটী দিলেন না, এবং নিজের জীবনকে শূন্য মরুভূমি বলিয়া ভাবিতে থাক, তখন মহৎ-জীবন অধ্যয়নে সমস্ত মনোযোগ দাও। দেখিবে একটা দুঃখ জীবনের কত ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে। জীবনীর একটী পৃষ্ঠাতেও তোমার মতো হতাশা দেখিতে পাও কি না সন্দেহ। বরঞ্চ দেখিবে, মহৎলোকের জীবন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে!" জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আমাদের প্রাণে মহৎলোকদের প্রতি একটা মনুষ্যোচিত অনুরাগ জন্মে এবং সেই কারণে কেবল উপন্যাসরাশি অপেক্ষা জীবনীসংগ্রহ অনেক উপকারী। এই প্রকার

জীবনী গ্রন্থের সংগ্রহে আমাদের দেশের বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, নানক, রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহৎ লোকদিগের জীবনীর সমাবেশ হওয়া উচিত। আবার সেই সঙ্গে তুলনার সুবিধার জন্য উহাতে বিদেশেরও মহৎলোকের জীবনী স্থান পাওয়া উচিত।

দেখা গিয়াছে, এক একজন এক একটী বিশেষ গ্রন্থ পড়িতে খুবই ভাল বাসেন—পড়িয়া পড়িয়া শেষ করিতেছেন, আবার সেই গ্রন্থই পাঠ করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার 'আশ' মিটিতেছে না। আমাদের কোন পূজ্যপাদ আত্মীয় রবিনসন্ ক্রুসো এইরূপে কতবার যে পড়িয়াছেন তাহা বলা যায় না—এখনো তিনি তাঁহার গম্ভীর বিষয়ের অধ্যয়ন হইতে বিশ্রাম পাইলেই রবিনসন ক্রুসো পড়িতে বসেন। আবার দেখা গিয়াছে যে হয়তো কোন মহৎজীবনী পাঠকের জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। হর্নপ্রণীত নেপোলিয়নের জীবনী বাল্যকালে পড়িয়া লেখকের জীবনে অধ্যয়নশীলতা কিরূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লেখকেরই প্রত্যক্ষ; মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ পড়িয়া বাল্যকাল অবধিই তাঁহার মনে নূতন প্রণালীতে ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছা কিরূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে মন্দ উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া পাঠকের জীবন চিরকালের জন্য কিরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের জীবনের ভালমন্দ গ্রন্থের ভালমন্দের সহিত বিশেষ জড়িত। কার্লাইলের কথায় আমরা বলিতে পারি—" "গ্রন্থ অসম্ভবকে সম্ভব করে, গ্রন্থ মানুষের মত গড়াইয়া দেয়।" সুপ্রসিদ্ধ বক্তা জনব্রাইটের সহিত আমরা একবাক্যে বলিতে পারি যে "ভাল ভাল গ্রন্থ মানুষকে অনেক প্রলোভন অনেক মন্দ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করে।"

রসকিন বলিয়াছেন—"আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলিয়াও সারা জীবন ধরিয়া জীবনের সদ্ব্যবহারের উপযোগী ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিই। ঘরের বৃথা সাজসজ্জা অপেক্ষা লাইব্রেরিটাকে খুব সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থে সুসজ্জিত করা উচিত।" সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে ভাল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা আবশ্যক নাই। এখন অনেক ভাল গ্রন্থ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিস্তিবন্দী প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইলে তো ভাল গ্রন্থ কিনিবার জন্য অতিরিক্ত মিতব্যয়িতার অবসরই থাকিবে না। রসকিনের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ লেখক সিডনি স্মিথও বলিয়াছেন যে "গ্রন্থের ন্যায় ঘরের উৎকৃষ্টতর সাজসজ্জা আর কিছুই নাই।"

যে দিক দিয়া দেখা যাউক, একটী ভাল লাইব্রেরির মতো উপকারী ও মূল্যবান আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। হাতের কাছে প্রয়োজন মতো পুস্তক পড়িতে দেখিতে পাওয়া যে, জীবনপথে কৃতকার্য্য হইবার একটী প্রধান উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বহিগুলি পড়িতে ভালবাসি, সেগুলি হাতের কাছে পাইলে কত সুখ হয়। উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, সেগুলি আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্ত্তমানে লাইব্রেরি কেবল আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ও সুখ প্রদান করে না, কিন্তু বলিতে গেলে তাহা আমাদের জীবনের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

এইভাবে প্রতিগৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিলে আমাদের দেশে শীঘ্রই এক মহান পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখিব নিঃসন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিংস্লির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

"জীবিত মনুষ্যকে ছাড়িয়া দিলে জগতে গ্রন্থের ন্যায় আশ্চর্য্যতর বস্তু দ্বিতীয় নাই।"

আনন্দ রহো।

সহজ কথাটী বটে আনন্দে নাচিতে
সহজ কথাটী বটে হাসিতে খেলিতে,
সহজে যখন যায় সময় চলিয়া,
মনের মতন সব ঘটনা ঘটিয়া।

কঠিন কথা রে হায় আনন্দিত চিতে
নিয়মেতে ধরা দিয়ে কাজ করে যেতে,
সকলি যখন যায় বিরুদ্ধে আমার
দিনের আলোক গিয়ে আসে গো আঁধার

আনন্দ রহোরে ভাই—যাবে কেটে মন্দ,
আঁধার কাটিবে, মনে কোরোনাকো দ্বন্দ্ব ;
উঠুক ঝটিকা মেঘ যত কালো ঘোর,
প্রভাতে নামিবে জেনো আলোকের ঘোর ॥

রাজভক্তি।

(কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ,
আয়ুর্বেদ-রত্নাকর)

ভারত চিরকালই রাজভক্ত। সেই রাজভক্তির পরিচয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। বেদে, পুরাণে, ইতিহাসে, ধর্ম্মসংহিতার বহুস্থলে এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।

রাজার অভিষেক উপলক্ষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তে ধ্রুব ঋষি বলিতেছেন,—"হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও, অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। ১ ॥

"তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ২ ॥

বরুণদেব তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন"। ৫ ॥

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি ॥"

(মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

বালক হইলেও রাজা সামান্য মনুষ্য নহেন। সামান্য মনুষ্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ একান্ত অকর্ত্তব্য। তিনি মহান্ দেবতা; নররূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র।

ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ৪০ ম শ্লোক।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিতেছেন—ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমান করা উচিত নহে; কারণ, এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।

"চূড়ামণিঃ সমুদ্রোঽগ্নির্মণ্ডলাখণ্ডমম্বরম্।
অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধ্নি পাদঃ প্রমাদজঃ ॥"

(গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, (নীতিসার খণ্ড,)
দশাধিকশততম অধ্যায় ১১শ শ্লোক।

চূড়ামণি, ইন্দ্রধনু, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি, ও রাজা ইহাঁদিগের মস্তকে থাকাই স্বভাব। কখনও ভ্রমবশেও পাদ দ্বারা স্পর্শ (অবমাননা) করিবে না।

"যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥

(মনুসংহিতা, ৭ম অঃ, ১১শ শ্লোক।

রাজা প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, তাঁহার ক্রোধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাঁহার পরাক্রম-প্রভাবে বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। তিনি সর্ব্ব-তেজোময়।

"তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ ॥

(মনু, ৭ম অঃ ১২শ শ্লোক।)

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ ক্বচিৎ।
কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥
নমস্যেবংশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা।
দেবা ইব চ দেবেন্দ্রং তত্র রাজানমন্তিকে ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়, ৩৩—৩৪ শ্লোক।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মঙ্গল-কামনা করিবেন, তাঁহারা প্রজাবর্গের অনুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্যগণ যেরূপ গুরুর নিকট প্রণত থাকেন এবং দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট প্রজাগণ প্রণত হইয়া থাকিবেন।

"যস্তস্য পুরুষঃ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়েৎ।
অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ প্রেত্যাপি নরকং ব্রজেৎ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৩৯ শ্লোক।

যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে নরকে পতিত হইবে।

"রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

"প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবে; তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধনরক্ষায় যত্নবান হইবে; কারণ রাজা না থাকিলে, তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে?

"তস্মাদ্রাজৈব কর্ত্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছতা।
ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্ ॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬৭ অঃ, ১২শ শ্লোক।

"প্রজাগণের আত্মমঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, অরাজক হইলে ধন অথবা দারাদির প্রয়োজন থাকে না।

"রাজমূলো হি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ জগতাং বর।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু সুরক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥"
(রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, একচত্বারিংশ সর্গ, ১০ম শ্লোক।

রাজারাই প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশোলাভের মূল, সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রজাবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য।

"মাতা ন পালয়েদ্ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ।
রাজা যদি হরেদ্ বিত্তং কা তত্র পরিবেদনা ॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্রস্বজনপার্থিবাঃ।
গৃহমগ্ন্যশনিহতং কা তত্র পরিবেদনা।"
(শুক্রনীতি, ৩য় অধ্যায়, ৪৭।৪৮ শ্লোক।

মাতা যদি বাল্যকালে প্রতিপালন না করেন, পিতা যদি সাধু পথ প্রদর্শন না করেন, রাজা যদি ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লন, বিলাপ করিয়া কোনই ফল নাই। মিত্র, আত্মীয় ও নৃপতি সুসেবিত হইয়াও যদি ক্রোধপরায়ণ হন, গৃহ যদি অগ্নি বা বজ্র দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অনুশোচনা করিয়া কি ফল আছে?

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রজাবিদ্রোহ হয় নাই। একবার বেণ রাজার হত্যার পর প্রজাগণ সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া দেশের দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছিল।

ভারতীয় রাজনীতির বিবরণ ধর্ম্মসংহিতা ব্যতিরেকেও কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারত, ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজজাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে ও ঔদার্য্যে অনুকরণীয় ও স্মরণীয়। বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, এবং ত্যাগে ইংরাজজাতি আমাদের নমস্য।

ইংরাজশাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা স্মরণ করিলে দেখিবে, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; রাজন্যগণ পরস্পর বিবাদপ্রিয় ছিলেন, দেশ দস্যুতস্করের লীলাভূমি হইয়াছিল; দেশবাসী ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিত; তখন ভারত অন্তর্বিপ্লবের বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দেশ হইতে শিক্ষার আলোক অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

দেশের নৈতিক জীবন, ধর্ম্মজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, কর্ম্মজীবন অসাড়, নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী জীবনসংগ্রামের ফলে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল হা-হুতাশ, দীর্ঘ-নিশ্বাস, নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালাময়ী অভিব্যঞ্জনা। সংসার-মরুভূমিতে দেশবাসী কেবল ওয়েসিসের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহারা চাহিতেছিল কেবল শান্তি। এই অবস্থায়, ভগবানের মঙ্গল বিধানে ইংরাজজাতি এ দেশে আসিয়া ভারতের নব অভ্যুদয় সূচিত করিল। শান্তি-অন্বেষণকারী ভারতবাসী শান্তির আশায় ইংরাজের পতাকাতলে আশ্রয় লইল।

ইংরাজজাতির সহিত সংঘর্ষণ ও সংমিশ্রণের ফলে, নব নব ভাবের আদান প্রদানের ফলে, মৃতপ্রায় তরু মুঞ্জরিয়া উঠিল, ভারতের দেহে নব যৌবনের মধুর শোভা বিকশিত হইল।

ইংরাজ আমাদের প্রতীচ্যভাবের শিক্ষার আলোক দেখাইল। প্রতীচ্যের ভাবমঞ্জুষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিয়া দিল; আমাদের দেশাত্মবোধের ভাব জাগাইয়া দিল। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার কর্ম্মভূমি, আমার পিতৃপুরুষের অতীত গৌরবের লীলা নিকেতন, আমিত্বের ধারা, আমিত্বের মর্য্যাদা—এ সমস্তই ইংরাজ আমাদের শিক্ষা দিল।

বাষ্পযান, জলযান, তড়িৎযান ও বায়ুযান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিল। ইংরাজরাজত্বে পুলিশ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিল।

ইংরাজ রাজ-শক্তি এতই আমাদের আপনার করিয়া লইয়াছিল যে, যে দিন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া পরলোক গমন করিলেন সে দিন ভারতবাসী মাতৃহারা শিশুর ন্যায়—"মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আবার যে দিন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন সে দিন ভারত কত না অশ্রু পরিত্যাগ করিয়াছিল। আবার যে দিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সেই পরম পবিত্র পুণ্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, সে দিন কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা ভারতের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার যখন যুদ্ধের জন্য সম্রাট ভারতবাসীকে আহ্বান করিলেন, তখন ভারতবাসী অবিচারিত চিত্তে প্রাণের প্রেরণায় রণস্থলে গমন করিয়াছিল।

সম্রাটের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারত ক্লৈব্য পরিহার করিয়া ইউরোপীয় মহাসমরে যে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা জগতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

ছত্রিশ বৎসর গত হইল, যাঁহার বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়া বাঙ্গালী একদিন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার কথা কি বাঙ্গালীর মনে আজ উদয় হয়? ১২৯০ সালের এই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অক্ষয়কুমারকে আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য বাঙ্গালার কোথাও কি কোনও উদ্যোগ-আয়োজন আজ হইয়াছে?

আদর্শ বাঙ্গালা-গদ্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা বলিয়া যে কেবল এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিবার চেষ্টা করে নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠক কেহ আছে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু সে ঋণের কথা স্মরণ করিয়া কি আজ আমরা একটি কথাও বলিব না?

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্যও সামান্য নহে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে"র মত উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর একখানিও আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। তিনি কুম্ব সাহেব প্রণীত "Constitution of Man" নামক পুস্তক অবলম্বনে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" নাম দিয়া যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অসামান্য লিপি-ভঙ্গীর গুণে মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীকে নূতন তত্ত্ব শিখাইবার জন্য বিলাতী সাহিত্য হইতে তিনি বহু সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। আজ আমরা রাধাকুমুদ বাবুর 'Indian Shiping' পড়িয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছি বটে, কিন্তু প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়কুমারই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের নাবিক বহুশত বর্ষ ধরিয়া, এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাকূলে একাধিপত্য করিয়াছে। 'ভারতের অর্ণবযান' নাম দিয়া সে প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অক্ষয়কুমারের লেখনীপ্রভাবেই 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল।

অক্ষয়কুমার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিলে তাঁহার সাহিত্যসাধনার পরিচয় পরিস্ফুট হয় না। সাহিত্য সাধনাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। প্রাণের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য-সেবী হইয়াছিলেন। নহিলে, রুগ্ন অবস্থায় ভগ্ন-হৃদয় লইয়া তিনি 'উপাসক সম্প্রদায়ে'র মত বিরাট গ্রন্থ কখনও লিখিয়া যাইতে পারিতেন না।

নানা বিষয়ে তিনি গুরুস্থানীয় আমাদের।—বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিয়া গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনার পথ বোধ হয় তিনিই বাঙ্গালীকে প্রথম দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক রচনারও প্রকৃত প্রবর্ত্তন তিনিই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট বহু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট আমরা অশেষ ঋণে ঋণী। তাই আজ ভক্তি-কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহার স্মৃতির বেদীতে অর্পণ করিতেছি।

হিন্দুস্থান ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

মদ্যপানের অপকারিতা।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় ভূখণ্ডেরই প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মাদক দ্রব্য কোন-না-কোন আকারে তখনকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের মত স্থানেও একদিন মদ্যের ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের সেই প্রাচীনকালের জ্ঞানগুরু ঋষিরাও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহারা যখন ধীরে ধীরে মদের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন মদ্যপানের প্রথা যাহাতে দেশ হইতে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহার জন্য তাঁহারা

বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের স্মৃতিপুরাণ অনুসন্ধান করিলে সেই চেষ্টার তীব্রতা যে কত অধিক ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। অতি প্রাচীনকালে দেশের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারাও যদি সুরা পান করিতেন তবে তাহাও:কাহারও নিকট দোষের বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু পরে উহা দেশের মধ্যে এরূপ নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল যে লোকে সুরাপানের পাপ ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নীগমনের পাপের সহিত সমান বলিয়া মনে করিত। দেশের হিতৈষিগণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ তীব্র চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষ একটী মহাপতনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহিরেও আমরা এই একই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখি। রোমের মত সুবৃহৎ সাম্রাজ্য যখন গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন সেখানকার ধনী ও দরিদ্র এই উভয় শ্রেণীরই অধিবাসীদিগের মধ্যে অহিফেন অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা অহিফেনের নেশায় বিভোর হইয়া দিন দিন অজ্ঞাতভাবে ধ্বংসের পথে নামিয়া চলিতেছিল। সকলেই মোহাচ্ছন্ন; কে কাহাকে প্রবুদ্ধ করিবে? তাই ভারতবর্ষের মত রোম আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। সেই আসন্ন দুর্দ্দিনের করাল ছায়ায় সমগ্র রোমক-সাম্রাজ্য কবলিত হইলেও দেশের কোন হিতৈষীর অন্ধ চক্ষে তাহা প্রতিফলিত হইল না। রোম ডুবিল; অবনতির চরম সাগরতলে চিরতরে অদৃশ্য হইল।

অহিফেন প্রাচীনকালে কেবল যে রোমেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল তাহা নহে; বর্ত্তমান কালেও তাহা অনেকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; রুষিয়া ও চীনে তাহার পূর্ণপ্রভাব। প্রবল প্রতাপশালী তুর্কিদিগকে সে আপনার দাস করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল অহিফেন নহে—মদ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি যে কোন প্রকারের মাদক দ্রব্য যখন যে দেশ দীর্ঘ কাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়াছে তখন সেই দেশই মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পশুত্ব বা জড়ত্বকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত হইলেও সেখানে মদ্যের ব্যবহার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়ায় তাহাদের চরিত্র হইতে পশুভাবের প্রভাব কিছুতেই অপনোদিত হইতেছে না। কৃত্রিম বাহ্য সভ্যতার অন্তরালে তাহারা আপনাদের কুৎসিত পশুভাবকে প্রচ্ছন্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া যে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রদীপ্ত আলোকে সেই কুৎসিত পশুভাবের নগ্নমূর্ত্তি বিশ্ববাসীর নয়ন সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর 'ছিন্নমস্তা' মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিশ্ববাসীর সহিত তাহারাও অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিনকার সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনও তাহাদের মধ্যে মঙ্গল বহন করিয়া আনিল, তাহারা জাগরণ লাভ করিল। সেইদিন হইতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের ইহাই একটী প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কেমন করিয়া এই ভীষণ পশুত্বের গ্রাস হইতে দেশবাসীর উদ্ধার সাধন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের মধ্যে যাহাতে মদ্যের প্রচলন কমিয়া যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকপরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমেরিকা জগদ্বাসীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে! আজ সেখানে মদ্য একেবারে নিসিদ্ধ। ইহা যে একদিনে বা একটীমাত্র চেষ্টায় সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। কতদিনের কত প্রকারের কঠিন সাধনার ফলে আজ মার্কিণগণ এই অভিলষিত সিদ্ধিকে লাভ করিয়াছে। যাহারা আজীবন মদ্যপানে অভ্যস্ত তাহাদিগকে ইহার অপকারিতা বুঝান যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কারণ যে কোন অভ্যাস বা প্রথার মধ্যে আমরা আজন্ম আবদ্ধ থাকি, লালিতপালিত হই, তাহাকে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলি; তাই সেখানে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সময় হইতেই মদ খাইলে কি কুফল আর না খাইলেই বা কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা অতি ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়া আসা হইতেছিল। কেবল যে এক বিদ্যালয় হইতেই এই শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল তাহা নহে, দেশীয় নানাবিধ নৈতিক সভাসমিতি এবং ধর্ম্মমন্দির হইতেও এই শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইতেছিল। চারিদিক দিয়াই ইহার অপকারিতাসম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার তীব্র চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার ফলও আশানুরূপ ফলিয়াছিল; দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই একটী ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, এই মদ্যব্যবসায়ের মূলে একটী দুষ্ট রাজনীতি রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছিল যে দেশের মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় পদ রহিয়াছে, সেগুলি যাহারা মদ্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরই অধিকৃত; নানাবিধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেই তাহাতে অধিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাবে দেশের জনসাধারণের মনোভাব যখন এইরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হইল। দেশবাসীর চিত্তক্ষেত্রে যে মঙ্গলের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এখন অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মদ্যের ব্যবসায় বেশীর ভাগ জার্ম্মানদিগেরই হাতে ছিল; তাই এই যুদ্ধের

সময় মদ্য অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। যে কর্ত্তব্যকে আমেরিকাবাসী অতি কঠোর বলিয়া মনে করিতেছিল প্রয়োজনের তাড়নায় তাহা অতি সহজ হইয়া আসিল; তাহারা মদ্য পরিত্যাগ করিল। যাহারা যথার্থ মানুষ তাহারা যদি একটীবারও জানিতে পারে যে কোথায় তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, তবে সহস্র বাধাবিপত্তি তাহাদিগকে সে পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। আমেরিকাবাসী যে যথার্থ মানুষ, তাহা আমরা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই নিদর্শন পাইয়া আসিতেছি; ইহাও তাহাদের মনুষ্যত্বের একটী অন্যতম নিদর্শন।

সমগ্র জগদ্বাসী যখন জাগরিত হইয়া মদ্যপানের কুফল উপলব্ধি করিয়া তাহার হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট, তখন চিরনিদ্রিত ভারতবর্ষ একেবারে উদাসীন! পূর্ব্বপিতামহগণের পরম শুভকর নিষেধ বাক্যকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে তাহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্যজাতির মধ্যেও মদ্যের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেও ভারতবর্ষে উহার প্রসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গাঁজা ও অহিফেনের ব্যবহারও প্রতিদিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না; বিশেষত এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়াছে; বৎসরে বৎসরে আবগারীবিভাগের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে! শুনিলে ঘৃণায় মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না যে সামান্য অর্থের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত যুবকগণও আত্মমর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া গাঁজা, মদ ও অহিফেন প্রভৃতির দোকান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণও আজ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ উলঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান ও তাহার ব্যবসায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। দেশমাতার কোন সুসন্তান যদি কখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতে বাধ্য হন, তখন যাঁহারা শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিত হইল বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর হন, এখন তাঁহারা কোথায়? শাস্ত্র যে মদ্যকে "অদেয়মপেয়ম্ অগ্রাহ্যং তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; এমন কি যাহাকে "দ্বিজাতীনামনালোচ্যম্" দ্বিজাতিদিগের আলোচনার অযোগ্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, আজ দ্বিজাতিগণ—ব্রাহ্মণগণ তুচ্ছ অর্থের জন্য সেই মদ্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন; অথচ এজন্য তাঁহাদের কোন সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইল না! সম্মানেরও কোন লাঘব ঘটিল না! ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি দুর্দ্দশা হইতে পারে?

আমরা কি এমনই পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি যে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও আমরা আমাদের প্রকৃত হিত কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে অন্ধ থাকিব? বিশ্বের মধ্যে যে উন্নতির ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি আমরা শ্রবণ করিব না? যে আমেরিকাবাসী পুরুষানুক্রমে মদ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যদি আজ মদ্যকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; তবে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার শত শত যুগ রহিত হইয়া গিয়াছে, যাহারা অল্প কয়েক দিন মাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুনর্ব্বার মদ্যব্যবহারে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে—তাহারা মদ্যপান ত্যাগ পারিবে না? আমরা সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ না করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে; যতদিন পর্য্যন্ত লোকে নিজের অভাব নিজে বুঝিয়া তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত না হয়, ততদিন কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের হিত না বুঝিয়া ব্যবসায় করিয়া দিনদিন মদ্যের প্রসার বাড়াইয়া দিতে থাকি আর মুখে কেবল গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন জানাই, তবে তাহা কোন দিনই সুফল প্রসব করিবে না; কিন্তু আমরা যদি দেশবাসীকে এই মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আন্তরিক চেষ্টা করি, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে; আমরা সফলকাম হইব; উন্নতি আমাদের করায়ত্ত হইবে।

কবে?

(শ্রীবিধুমুখী দেবী)

কবে তুমি সহজ হবে এ জীবন মাঝে
কবে তুমি সহজ হবে মোর সব কাজে?
কবে তুমি সহজ হবে সংসারের পথে
কবে তুমি সহজ হবে, রবে সাথে সাথে?
কবে তুমি সহজ হবে আশায় নিরাশায়
কবে তুমি সহজ হবে দুঃখ বেদনায়?
কবে তুমি সহজ হবে শয়নে স্বপনে
কবে তুমি সহজ হবে অজ্ঞানে সজ্ঞানে?
কবে তুমি সহজ হবে শোকে আনন্দে
কবে তুমি রবে প্রাণে মোর সব ছন্দে?

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ হৌদ "মিশন"-গৃহে চা-পানের ব্যাপার ও তাহা লইয়া ঘোট।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ওঁর বাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইল। কোন দোষ করিয়া শাস্তি পাইবার সময় যে দুঃখ হয়, তাহা অপেক্ষা এ দুঃখ বড় কিছু বেশী নয়; কিন্তু আমাদের যে মানহানি হইল, ইহার দরুণ আমার কান্না আসিল। তখন প্রাতঃকাল,—আমি বিছানাতেই পড়িয়া থাকিয়া ১০।২০ মিনিট আমার মনকে ইচ্ছামত ছুটিতে দিলাম। প্রথম বেগটা একটু কম হইলে পর, এই সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন প্রকারেই মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না; মন কিছুতেই ভাল হইল না। যাঁহারা এই সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত নিন না কেন, কিন্তু আমরা কেন ইহাতে লিপ্ত হইয়া আমাদের মান-হানি করি? আমরা প্রায়শ্চিত্ত না লইলে কিছু কি আটকায়? যাঁরা ওঁর ভীরু স্বভাবের সুবিধা পাইয়া এইরূপ কাজ আদায় করেন, সেই মিত্রমণ্ডলীকেই বা কি বলিব? ভাল, উনি কেন এই বিষয়ে লোকের কথা শুনিলেন? এই পুণার লোকদের জন্য সব করিতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তাহার জন্য লোকনিন্দাও সহিতে হইবে—এইরূপ প্রথম হইতেই ওঁর মনোভাব। এই ধরণের উদ্বেগ ও কষ্টজনক চিন্তা সমস্ত দিন আমার মনে আন্দোলিত হইতেছিল। এইজন্য আমার ঐ দিনটা একেবারে উদাসভাবে ও বিষণ্ণভাবে কাটিল।

এই সময়ে, আমার অন্য এক মৈত্রিণী আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার জন্য লোণাবালীতে আসিয়াছিলেন; তিনি আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে, ১০।২০ শব্দও আমরা পরস্পর বলি নাই। কারণ, এই চিন্তায় আমার মন উদ্বেলিত হওয়ায় কোন কাজ করিতে কিংবা কাহারও সহিত কথা কহিতে আমার ইচ্ছা হইত না।

সন্ধ্যার গাড়ীতে 'উনি' ফিরিয়া আসিলে, আমি তাঁর সম্মুখে একেবারেই যাইতে পারিলাম না। কারণ, আমার মনে হইল, সকালের কথা সম্বন্ধে ওঁর খুবই খারাপ লাগিয়া থাকিবে এবং আমি সম্মুখে গেলে হয়ত আরো খারাপ লাগিবে; আর আমি ত সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াতেও পারব না; তার চেয়ে এখন সামনে না যাওয়াই ভাল। এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া, যেন কোন কাজে ব্যাপৃত আছি এইভাবে দূরে-দূরেই রহিলাম কিন্তু বাহিরে কি চলিতেছে জানিবার জন্য দুই তিনবার কাণ পাতিয়া শুনিলাম, উঁকি মারিয়া দেখিলাম; আমার নজরে আসিল,—ওঁর মন রোজকার মোতোই শান্ত; ডাকের চিঠি দেখা ও খবরের কাগজ পড়া—এই নিত্য নিয়মিত কাজ, একটার পর একটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে করিয়া যাইতেছেন। ওঁর মনে কোন রকম উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য হইয়াছে বলিয়া দেখা গেল না। ইহা দেখিয়া আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হইল।

তারপর, আহারের সময় হইলে সকলে আহার করিতে বসিলেন। আহারের সময়েও একেবারে শান্ত-ভাবে, অন্যদিনের মতো কথা কহিতে কহিতে ও হাসিতে হাসিতে আহার করিলেন তারপর ঘণ্টাখানেক সেইখানে বসিয়া নিত্যানুসারে কথাবার্ত্তা কহিয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শুইতে গেলেন।

যতই ওঁর এই সব ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম ততই আমার আশ্চর্য্য মনে হইতে লাগিল। এবং এইরূপ কেন হইল? সকালের কথার দরুণ ওঁর কিছুই মনে হইল না কেন? ঐ সম্বন্ধে ওঁর কি কোন কষ্ট হয় নাই? এ রকম ত হওয়া উচিত নয়; ওঁর মনে কষ্ট হওয়াই উচিত। কিন্তু উহা বাহিরে না দেখাইয়া মনে-মনেই রাখিয়া মনকে রোজকার মতো শান্ত ও নিশ্চিন্ত রাখা ও নিত্যনিয়মিত কার্য্যক্রমের কোন প্রকার ব্যতিক্রম না করা—এই কাজ উনি সহজে কি করিয়া সাধন করেন? ইহা একটা মস্ত রহস্য বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল।

আর উনি বাড়ী আসিলে ওঁকে অমুক অমুক কথা জিজ্ঞাসা করিব, অমুক কথা বলিব—এইরূপ যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম তাহা সেইখানেই বিলীন হইয়া গেল।

"পুণার সব লোকই ভাল—না?" এইটুকু শুধু আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ছাড়া আর কিছুই বলি নাই। অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। কিন্তু আমি চাকরকে বিদায় দিবার জন্য ডাকিয়া, নিত্যানুসারে আনীত মরাঠী পুস্তকের মধ্যে এক পুস্তক উঠাইয়া লইয়া পড়িতে বসিলাম। তবুও উনি 'না' কি 'হাঁ' কিছুই বলিলেন না। নিদ্রা আসা পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া শান্তভাবে পড়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ওঁর নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে দেখিয়া আমি পুস্তক বন্ধ করিলাম ও প্রদীপটা দূরে রাখিয়া চাকরকে 'হয়েছে, এখন তুই যা' এইরূপ বলিয়া আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম এবং অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসিল। নিত্যানুসারে আমরা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলাম; কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হইল না। নিত্যানুসারে উনি শ্লোক পাঠ করিয়া ভজনা আরম্ভ

করিলেন এবং ভজনা শেষ হইলে উনি উঠিয়া নিত্য নিয়মিত কাজ করিতে চলিয়া গেলেন।

কেবল আমার মনে এতক্ষণ এই কথা তোলাপাড়া করিতেছিল যে হয় ত উনি আপনা হইতেই আমাকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু ঐ কথা সেইখানেই রহিয়া গেল। পরে ৮-টা ৯-টার সময়, আমাদের ন্যায় ছুটিতে লোণাবলিতে থাকিবার জন্য যাঁরা আসিয়াছেন সেই সব মিত্রদের মধ্যে দুই তিন জন মিত্র আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, এবং আগের দিনকার কথা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা সুরু হইলে ক্রমে তাঁরা খুব জোরে জোরে কথা বলিতে লাগিলেন; তথাপি ওঁর মনোভাবের একটুও বদল হইল না। বরং তাঁহাদের সহিত শান্তভাবে ও বুঝাইবার স্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। কিন্তু এই ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের তাহা ভাল লাগিল না। তৃতীয় দিনে টাইম্‌স্ কাগজে, দুই একজন মিত্র, নিজের নাম দিয়া খুব কড়া সমালোচনা করিয়া আমাদের এই প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তথাপি উঁহার মনে একটুও উদ্বেগ হইল না কিংবা উনি একটু টুঁ-শব্দও করিলেন না। এই কথার পর, আরও দুই একদিন কাটিয়া গেল। "ওঁর" এইরূপ শান্ত আচরণ দেখিয়া আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং রাগ ও উদ্বেগ এক্ষণে একেবারে তিরোহিত হইয়া আমার মন একেবারে ঠাণ্ডা হইল। তার পর আমি একবার সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই প্রায়শ্চিত্ত কেন নিলে বল দেখি? চারিদিকে এর জন্যও এখন কত কষ্ট হচ্চে। বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা যতই গালমন্দ দিক্ না, সে সম্বন্ধে মন প্রস্তুত আছে বলে কিছুই খারাপ মনে হয় না; কিন্তু পরশু সকালে, কত কালের পুরাণো ও আমাদের তথা কথিত মিত্রদের কথা শুনে আমার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। অন্যের উন্নতি সহ্য না হওয়ায় মনে মনে মৎলব এঁটে তারা এইরূপ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কি? তাদের আবেগ-উক্তি ও কথার স্বরে আমার এই রকম মনে হয়েছিল"। তখন উনি বলিলেন—"তাঁরা ঐরূপ করেছেন বলে কেন একটা ভুল ধারণা মনে রেখে দেবে? কেহ কিছু বলেছে বলে' তোমাকে উদ্দেশ করেই বলেছে এ রকম কেন মনে করবে? প্রকৃত অবস্থাটা নিজের মনে জানা থাক্‌লেই হল। যে সকল লোক আমাদের বন্ধু বলে পরিচয় দেন এবং যাঁরা আমাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করেন তাঁদের জন্য, লোকের কাছ থেকে যদি একটু মন্দ ব্যবহার পাওয়া গিয়া থাকে তাতে কি হল?" আমি বলিলাম, "প্রকৃত কারণটা আমাদের আপনাদের মধ্যেই জানা আছে। কিন্তু তা অন্য লোকে কেমন করে জান্‌বে? এতে লোকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা প্রচার হয়ে পড়ে না কি?"

কাল সকালে ...... কুৎসিতভাবে ও এমন রাগের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেন এই কাজটা আমরা নিজের স্বার্থের জন্যই করেছি। এত দিনকার সহবাসেও যাঁরা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পান নি তাঁরা আপনাদিগকে মিত্র বলে পরিচয় দেন কি করে'? মিত্রতার দ্বারা পরস্পরের অন্তঃকরণের যোগ্যতা ও মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে। যতক্ষণ তা না হয় সে পর্য্যন্ত ওটা শব্দ মাত্রই থেকে যায়"। তখন 'উনি' বলিলেন,—"তাঁদের স্বভাব একটু ঐ রকমই বটে। তাঁরা কিছু বলেছেন বলে' কি হল? কোন্‌টা ঠিক্, তাঁরা কি বোঝেন না? কিন্তু মানুষ একবার অভিমানের মধ্যে গিয়ে পড়লে, সেই অভিমানের আবেশে ঐ রকমই বলে থাকে। মনুষ্য স্বভাবই এই। এই সময়ে তার অন্যপক্ষের বিচার থাকে না। এই বিষয়ে লোকেরা শান্তমনে আরও বিচার করলে, আজ যেমন জোরে তারা আমাদের উপর আঘাত করছে, ততটা জোরে আর আঘাত করবে না। তারা গালমন্দ দিচ্ছে; কিন্তু কালপর্য্যন্ত তুমিও ত এইজন্য অভিমান করে বসেছিলে? তাদের চেয়ে তোমার আসল অবস্থা জান্‌বার কথা না কি? আমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের উপবীত কিংবা বিবাহে কোন বাধা হয় না, কিংবা বাড়ীর কাহারও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণের অভাবে আট্‌কায় না। দলাদলির ঘোঁট হয়েছে বলে' তোমার বাড়ীতে কখন কিছু আট্‌কেছে কি? তোমার যা কিছু কাজকর্ম্ম তার আগের মতই ঠিক্ চল্‌চে। এই অবস্থায়, প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াতে আমার দোষ হয়েছে এইরূপ তুমিও মনে করেছ। এই রকমের ধারণা যার যে রকম হবে, তারা কিছু দিন সেই রকমই বল্‌তে থাক্‌বে, এ কথা আমি বুঝতে পারি। মানুষ যে কাজ করে তা পুরাপুরী বিচার করেই করে, তাড়াতাড়ি কিছুই করে না, এইরূপ মনে বিশ্বাস রাখ্‌বে। কোন বিষয়ে যথোচিত জানা না থাক্‌লে জিজ্ঞাসা করে নেবে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অভিজ্ঞতা অনুসারে মনকে শান্ত রাখ্‌বে। অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সমস্ত ব্যাপার জানিবার অভিপ্রায় প্রথমে জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে দোষ দিলাম, ইহার দরুন আমার পশ্চাত্তাপ হইয়া মন বড় খারাপ হইল।

যাক্। মে মাসের ছুটির মধ্যে আমাদের এক মিত্র এবং তাহার পত্নী তিন পুত্র লইয়া আমাদের সহিত থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি

তিনি প্রায়শ্চিত্ত লইয়া সোণাবাদিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় 'উনি' বারান্দায় এক আরাম কেদারায় বসিয়াছিলেন, তাওজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন আর উনি তাহা শুনিতেছিলেন। উপরি-উক্ত ভদ্রলোকটি সিঁড়ির নিকট আসিয়াছেন দেখিলেন এবং হাসিয়া 'উনি' তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হল?" ইহাতে তিনি তখনি বলিলেন, "আপনি যা বলেছিলেন তাই আমার ঘটল। আমি এই সময় পিতার প্রকৃত প্রেম বুঝতে পেরেছি এবং তার দরুণ আনন্দ লাভ করেছি। প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে আমি যখন উঠলুম তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "পিতাকে প্রণাম কর"; তখন আমি বৃদ্ধ পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করিবার জন্য নতকায় হইলাম এবং প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবামাত্র তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এবং তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন,— "এত লোকের মধ্যে তুমি আজ আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ!" এইরূপ বলিবার সময় তাঁর চোখে জল আসিতে লাগিল এবং তাহা দেখিয়া আমারও চোখে জল না আসিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পূর্ব্বে পিতাকে এতটা প্রেমের সহিত আচরণ করিতে কিংবা তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িতে আমি কখন দেখি নাই। প্রায়শ্চিত্ত নেবার সময় পর্য্যন্ত, আমরা যা করচি তা ভাল নয় এইরূপ আমারও মনে হচ্ছিল; কিন্তু পিতার এই আচরণ দেখিয়া, যা করেছি তা ভালই করেছি এইরূপ আমার মনে হল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

কিরাতার্জ্জুনীয়ে দ্রৌপদী-চরিত্র।

মহাকবি ভারবি, তাঁহার অমরকাব্য 'কিরাতার্জ্জুনীয়ের' কয়েক পৃষ্ঠায় দ্রৌপদীর একখানি মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন। যদিও ইহা অমর কবি ব্যাসদেবের চিত্রেরই অনুরূপ হইয়াছে, যদিও ইহাতে তিনি কোন নূতন বর্ণ সংযোজিত করেন নাই, তাহা হইলেও জানি না কবি কোন্ মুগ্ধমন্ত্রে এই চিত্রখানিকে কতকটা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। যে কেহই ভারবির দ্রৌপদী-চরিত্র পড়িয়াছেন, তিনিই মহাভারতের দ্রৌপদী হইতে ইহাতে একটা নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যখানির প্রায় সকল চরিত্র ও সকল ঘটনাই মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার এই "পরকে আপন করিয়া লইবার" অনন্যসাধারণ মহাকবিসুলভ ক্ষমতাটুকু না থাকিত, তবে কি আজ আমরা তাঁহার কাব্যখানির নামগন্ধও পাইতাম? ব্যাসের আবিষ্কৃত পথে গমন করিয়াছেন বলিয়া, ভারবির কবিপ্রতিভা যে তত প্রখর ছিল না তাহা বলা যায় না। সংস্কৃতসাহিত্যের কোন্ কবিই বা বাল্মীকি ও ব্যাসের নিকট ঋণী নন?

ভারবির এই মহাকাব্যখানির মাত্র প্রথম ও তৃতীয় সর্গে আমরা দ্রৌপদীকে দেখিতে পাই; আর একাদশ সর্গে অর্জ্জুনের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটী কথা শুনিয়াই আমাদের নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু কবি এই অল্প কয়েকটী রেখাপাত করিয়াই পাঠকের হৃদয়কন্দরে দ্রৌপদীর এমনই একখানি পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া দেন, যে তাহা আর সমস্ত জীবনেও ভুলিতে পারা যায় না।

কাব্যের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই একজন গুপ্তচর আসিয়া দুর্য্যোধন কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন তাহা গোপনে যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়া গিয়াছে; তিনি দ্রৌপদীর কুটীরে আসিয়া শত্রুর সেই অভ্যুদয়বার্ত্তা সকলের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছেন; আর ক্ষত্রিয়কুমারী দ্রৌপদী, তেজস্বিনী পতিপরায়ণা দ্রৌপদী যখন দেখিলেন যে, শত্রুর সেই সমুদ্ভাসিত যশঃপ্রভায় পঞ্চভ্রাতার পূর্ব্বার্জ্জিত কীর্ত্তিমালা যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে, যখন দেখিলেন ভ্রাতৃপ্রেমের স্নিগ্ধস্পর্শে যুধিষ্ঠিরের ক্ষাত্র তেজ বুঝি বা নির্ব্বাপিত হইয়াই যায়; বুঝি বা তিনি স্নেহের মোহে পতিত হইয়া কঠোর নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তাই তখন ভারতেশ্বরের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী নিজের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি ভাবিলেন যে এই সুপ্ত সিংহকে জাগাইতে হইলে একটু আঘাতের প্রয়োজন, হৃদয়ের এই স্নেহময় আবরণখানিকে তুলিয়া ফেলিতে হইলে কঠোর নীতির প্রয়োজন, তাই দ্রৌপদী অতি বিচক্ষণতার সহিত নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা ও শত্রুকৃত দুরবস্থা একটী একটী করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ অবস্থার দাস'; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয় তখন অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারি মত করিয়া আপনাকে গঠিত

করিয়া লয়; তখন আর সে অবস্থা তাহাকে কোন কষ্ট দিতে পারে না; কিন্তু কষ্ট তখনই, যখন সেই অবস্থার সহিত পূর্ব্বের অবস্থার তুলনা করা যায়, যখন অবস্থাদ্বয়ের বৈষম্য নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, যখন বোঝা যায় যে আমাদের অবনতিটা কত বড়! দ্রৌপদী মনুষ্যহৃদয়ের এই গূঢ় রহস্যটুকু অবগত ছিলেন; তাই তিনি কাতরকণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন;—

অনারতং যৌ মণিপীঠশায়িনৌ
অরঞ্জয়দ্রাজশিরঃস্রজাং রজঃ।
নিষীদতস্তৌ চরণৌ বনেষু তে
মৃগদ্বিজালূনশিখেষু বর্হিষাম্॥

"আপনার যে চরণযুগল সর্ব্বদা মণিময় পাদপীঠের উপর থাকিত; কত নৃপতিবৃন্দের শিরোমালিকার পরাগপুষ্পে যে চরণযুগল সর্ব্বদা রঞ্জিত হইত; হায়! আজ আপনার সেই চরণযুগল,—যেখানকার কুশাগ্র মৃগেরা খাইয়া ফেলিয়াছে, কিংবা ঋষিরা যেখানকার কুশাগ্র পুণ্য কর্ম্মের নিমিত্ত কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন, সেই খরস্পর্শ কুশারণ্যের মধ্যে রহিয়াছে।"

দ্রৌপদী দেখিলেন যে, শত্রুরা পদে পদে তাঁহাসহিত শঠতা করিতেছে। তাহারা ভীমার্জ্জুনের তীব্র ক্ষাত্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ছলে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যদি সেই শঠদিগের সহিত শঠতা বা মন্ত্রগুপ্তি না করেন, তবে তাঁহারা নীতির মর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন না; এই ভীষণ সংসারক্ষেত্রে নীতিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ কেবল পরাভবই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাই তিনি কঠোর স্বরে যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছেন,—

"ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।"

দ্রৌপদী আবার আপনার তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, মনুষ্যের হৃদয় নিজের দুঃখদৈন্যের মধ্যে যতই কেন অবিচলিত থাকুক না, কিন্তু কখনও সে নিজের স্নেহাস্পদের দুঃখদৈন্যকে তেমন অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার একটুখানি ম্লান হাসিতেই অন্তরের সমস্ত উৎসব একেবারে আঁধার হইয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না; তাই দ্রৌপদী নিজের তেজস্বিনী ভাবায় ভীমার্জ্জুন ও নকুলসহদেবের সেই তীব্র দৈন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করিলেন। আমরা তাঁহার যে উক্তিটাই লইয়া একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহারি মাঝে তাঁহার অপূর্ব্ব নীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই।

দ্রৌপদী ভাবিলেন বুঝি বা ধর্ম্মরাজ ক্রোধকে একটা 'কুবৃত্তি' মনে করিয়াই তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শত্রুকৃত অপমানকে অঙ্গের ভূষণই মনে করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন যে একেবারে ক্রোধরাহিত্যটা মোটেই ভাল নয়; বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে কিছু ক্রোধ থাকা বিশেষ দরকার। ভগবান তাঁহার সেবকগণের কেবল দুঃখকষ্ট বাড়াইবার জন্যই, এই বৃত্তিটাকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কখনও এত নিষ্ঠুর নন, তবে আমরা বড় অসংযত, তাই তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি না বলিয়াই কষ্টভোগ করিয়া থাকি। তাই তিনি বলিলেন যে ক্রোধ একেবারেই পরিত্যাগ করিলে লোকে মোটেই মানে না; কিন্তু যে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যকে নিপীড়িত বা অনুগৃহীত করে লোকে তাহারই বশবর্ত্তী হয়। আপনি রাজা হইয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন; আপনার এরূপ হইলে চলিবে কেন? অতএব নরনাথ! আপনার নির্ব্বাপিতপ্রায় ক্ষাত্র তেজকে আবার প্রজ্বালিত করুন, আবার শত্রুবধের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, তাহা হইলে আবার আমাদের গৌরবসূর্য্য দিক প্রোদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইবে।

দ্রৌপদীর যেমন অপূর্ব্ব নীতিজ্ঞতা ও বিচারক্ষমতা, তাঁহার তেজস্বিতাও তেমনি অপূর্ব্ব। যুধিষ্ঠির যখন প্রশান্তহৃদয়ে দুর্য্যোধনের অভ্যুদয় বর্ণনা করিলেন, তখন সেই দ্বৈতবনের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করার সৎসাহস এক দ্রৌপদী ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যদিও ভীম পরে যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট বলিয়াছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী যদি অগ্রবর্ত্তী না হইতেন তবে কি আমরা ভীমকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখিতাম? দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন, অন্ধানুবর্ত্তিতা কিছুই নয়। অবশ্য ভাল বুঝিয়া যাহা বলা যায় তাহা দোষসঙ্কুল হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া

ভয়ে ভয়ে যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করা অপেক্ষা নিজে যাহা সত্য ও নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাই সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ সৎসাহস জগতে অতীব বিরল। দ্রৌপদীর এই সৎসাহসই তাঁহার মনের ও ধর্ম্মের বল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করিতেছে।

দ্রৌপদীকে আবার যখন কবি তৃতীয় সর্গে উপস্থিত করিয়াছেন, সেখানেও তাঁহাকে আমরা এইরূপই নীতিজ্ঞা ও তেজস্বিনী দেখিয়া থাকি। একমাত্র কর্ত্তব্যের দিকে, নীতির দিকে, ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সর্ব্বত্রই কার্য্য করিয়া যাইতেছেন; একদেশদৃষ্টি বা অন্যবিধ মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। রমণীরত্ন তিনি যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল সেই কর্ত্তব্যকেই নিজের জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সংসারের পথে চলিয়াছেন। তিনি ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সহস্র অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত নিরীহের মত দুর্বৃত্তের শঠতাজালে বিজড়িত হইয়া দুঃখভোগ করাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ; তাঁহার অভিজ্ঞতার উপদেশ দৈববাণীর মত ফল প্রসব করে। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে মনে করিও না যে, 'আমি ত নিস্পৃহ, আমার আবার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়'? কারণ,—

"মাৎসর্য্যরাগোপহতাত্মনাং হি
স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি॥"

অর্থাৎ লোকে স্নেহ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধ সাধুর প্রতিও অত্যাচার করিতে পারে। আমরা যখন ত্রয়োদশ সর্গে মূকদানবকে বরাহমূর্ত্তিতে তপস্যাপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান দেখি তখন মনে হয়, বুঝি বা দ্রৌপদী দৈববাণীই করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ভবিষ্যৎও তাহার রহস্যময় আবরণকে অনেক সময়ে মুক্ত করিয়া দেয়।

প্রথম সর্গে দ্রৌপদীর তেজঃপূর্ণ উক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বুঝি বা তিনি রমণীর পবিত্র ধর্ম্ম পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা রাখিতে পারিতেছেন না; বুঝি বা তিনি সে অমূল্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু যদি আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করি, যদি আমরা তাঁহার হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয়খানি মিশাইতে পারি, তবে তাঁহার পতিপ্রীতির চরমোৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইব, ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা অনাবিল, পতির পরম মঙ্গলবিধায়ী তাঁহার সেই পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রতি স্থির লক্ষ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইব, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেরূপ উন্নত আদর্শের স্রষ্টার প্রতি বিস্ময় ও ভক্তিতে হৃদয় অবনত হইয়া পড়িবে।

দ্রৌপদীর পতিপ্রীতি এত উন্নত, এত স্বর্গীয় যে পৃথিবীর লোক আমরা, হঠাৎ তাহার সে উচ্চতা, সে স্বর্গীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই আমরা বড় ভুল করি, দ্রৌপদীকে ভাল বুঝিতে পারি না। ক্ষত্রিয়রমণী তিনি, কর্ত্তব্যপরায়ণা ভারতের ঈশ্বরী তিনি, তাঁহার পতিপ্রীতি একজন সাধারণ রমণীর সহিত সমান হইবে? পতির সর্ব্ববিধ মঙ্গলের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার কোমল হৃদয়, পতির প্রতি কত স্নেহময়! কত ব্যগ্র! তিনি যেন আপনার সুখদুঃখের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন; কেবল স্বামীর সুখদুঃখের মাঝেই আপনার হৃদয়খানি ডুবাইয়া দিয়াছেন, তাই স্বামীর পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলেও সে আঘাতে তাঁহার কোমল হৃদয়খানি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়; তাই ত স্বামীকে বিপন্ন হইয়াও উদাসীন থাকিতে দেখিয়া, মর্ম্মবেদনায় ক্ষুব্ধা দ্রৌপদীকে বলিতে শুনি,—

ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং
বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।
বিচিন্তয়ন্ত্যা ভয়দাপদং পরাং
রুজন্তি চেতঃ প্রসভং মমাধয়ঃ।

"আপনার এই বুদ্ধি আমি বুঝিতে পারি না; লোকের মনোবৃত্তি কত বিচিত্র! আপনার বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে আর আপনি কেমন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন!"

দ্রৌপদীর মানসিক বল অসীম। তিনি আসন্ন

দৈন্যকে হাস্যমুখে আলিঙ্গন করিতে পারেন। কিন্তু ইহা ত শুধু দৈন্য নয়, ইহা যে শত্রুর প্রচ্ছন্ন উপহাস! তেজস্বিনী পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর এ অপমান কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? তাই ত ভারতের উপযুক্তা ঈশ্বরীর মত দ্রৌপদীর কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইতেছে,—

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।"

"আপনি শত্রুর জন্যই এরূপ দুরবস্থা ভোগ করিতেছেন দেখিয়া, আমার মন সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে।"

দ্রৌপদীর বেদনাপ্লুত জ্বালাময়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি পড়িতে পড়িতে আমাদের স্বতঃই রাজপুতমহিলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়; আর ভাবি তিনি বুঝি ভারতের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়াই, অমরার সুখসম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া আবার রাজপুত-মহিলারূপে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সীতা, শকুন্তলা ও দ্রৌপদীতে রমণীচরিত্রের পূর্ণ পরিণতি দেখান হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই তিনটী চরিত্র, যে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সে-ই ভারতবর্ষকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সক্ষম, সে-ই ইহার অন্তঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে।

আর এক জায়গায় আমরা দ্রৌপদীর একখানি "কোমল-কঠোর" মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই; আত্মহারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-ধারা পান করিতে থাকি; আর তাঁহার পতিপ্রীতির উচ্চ আদর্শ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য দেবতার আরাধনা করিতে যাইতেছেন; তাঁহাকে কিছু কালের জন্য বিদায় দিতে হইবে; তাই আসন্ন বিরহের দুঃখে দ্রৌপদীর নীল নয়ন দুইটী অশ্রুকণিকায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; যেন হেমন্তপ্রাতের শিশির-সিক্ত দুইটী নীলোৎপল! প্রবাসগামী স্বামীকে একটীবার প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য সাধ্বী রমণী বড় আশায় তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! কোথা হইতে দুই ফোটা অশ্রু আসিয়া তাঁহার সে আশাটুকু পূর্ণ করিতে দিল না, তাঁহার স্বামীদর্শনপুণ্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল। চোখের জল পড়িলে পাছে স্বামীর কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় স্নেহময়ী রমণী নয়ন নিমীলিত করিতে পারিতেছেন না। আহা কি হৃদয়হারী চিত্র! জানি না কবি কোন্ কলা-বিদ্যার সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, এই মুগ্ধ আলেখ্যখানি খোদিত করিয়া দিলেন। কোন্ অতীত যুগে, কে জানে কোথাকার কোন্ নিভৃত গৃহে বসিয়া কবি এই আলেখ্যখানি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া চিত্রে তাহা ফুটাইয়া গিয়াছেন!

কিন্তু দ্রৌপদীর সংযম-শক্তি অসীম; সর্ব্বত্রই কর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তির উপর তাঁহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া শোক প্রকাশ করা কি সে চরিত্রে সম্ভব? হৃদয়ের মাঝে শোকের ফল্গু নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে যে এখনই কর্ত্তব্যের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে হইবে। পতনোন্মুখী অশ্রুধারাকে রুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে যে এখনই অর্জ্জুনের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। তাই ত আমরা দেখিতে পাই কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী শোকসাগরের তীব্র বিলোড়নে অবিচলিত থাকিয়া কঠোর ভর্ৎসনার স্বরে স্বামীকে বলিতেছেন,—"তুমি কোন্ অর্জ্জুন? একদিন যার ক্ষাত্রবীর্য্যে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল সেই অর্জ্জুন অথবা আজ যাহার সম্মুখে দুঃশাসন তাহার স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করিয়া বীরত্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে, সেই অর্জ্জুন"?

দ্রৌপদীর এই তীব্র ভর্ৎসনাবাণী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আজ যিনি তাঁহাদের ভাবী মঙ্গলের জন্য বিদেশ-যাত্রা করিতেছেন, তাঁহাকে এত করিয়া বলাটা বুঝি দ্রৌপদীর ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের দুঃখ, নিজের অপমানটাই এত বড় করিয়া প্রকাশ করাটা আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলেই আমরা এখানেও তাঁহার সেই পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের প্রতি স্থির লক্ষ্যটাই দেখিতে পাই। দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন যে পুরুষমাত্রই—সে যতই কেন হীন, দুর্ব্বল ও নগণ্য হউক না—যদি সে কাহাকেও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে

দেখে, তবে সে অম্লানবদনে কখনও তাহা সহ্য করিয়া যাইতে পারে না; আর যাহাদের বীর্য্যে জগদ্ বিকম্পিত, সেই ভীমার্জ্জুনের কথা ত স্বতন্ত্র; আজ বিদায়ের দিনে অর্জ্জুনের মনের মধ্যে কতকটা বিষাদ সঞ্চিত হইয়া যাহাতে তাঁহার হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া না ফেলে তাহারই জন্য নীতিকুশলা দ্রৌপদীর এই কৌশল।

একাদশ সর্গে ইন্দ্র যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া অর্জ্জুনের মানসিক বল পরীক্ষা করিতেছিলেন, আর তিনি তাঁহার এক একটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ লাভ করিতেছিলেন, সেই সময় আমরা অর্জ্জুনের কয়েকটী কথা হইতে বুঝিতে পারি যে দ্রৌপদীর এই তীব্র ভর্ৎসনা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল এবং সেরূপ অবস্থায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে তেমন একটা কঠোর আঘাতের কতখানি দরকার ছিল। অর্জ্জুন যেন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন, যে দুঃশাসন আসিয়া দ্রৌপদীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; আর তিনি নিতান্ত অসহায়ার ন্যায়, সিংহকবলিতা হরিণীর ন্যায় মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। জানি না কত ক্ষোভে, কত দুঃখে, অর্জ্জুনের সেই বীর-হৃদয়কে বিলোড়িত করিয়া তখন বিনির্গত হইয়াছিল ;—

অযথার্থক্রিয়ারম্ভৈঃ পতিভিঃ কিং তবেক্ষিতৈঃ।
অরুধ্যেতামিতীবাস্যা নয়নে বাষ্পবারিণা ॥

"তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ অতএব পতিনামের অযোগ্য, ইহাদিগকে দেখিয়া আর কি হইবে? এই বলিয়াই যেন তাঁহার আঁখিজল নয়ন দুইটাকে রুদ্ধ করিয়া দিল"। কবি এই একটী মাত্র কথায় অর্জ্জুনের হৃদয়খানি খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন যে দ্রৌপদীর তেমন কঠোর উক্তির মধ্যেও পতিপ্রীতির কেমন অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল।

ভারবি-অঙ্কিত দ্রৌপদীর চরিত্রে আমরা দেখি যে, তিনি কর্ত্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধন করিতেন। সহস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও কখনও তিনি এই চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আমরা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক বাক্যে এই কর্ত্তব্যের প্রতি অসীম গৌরবের ভাবটুকু অনুস্যূত দেখিতে পাই। আমরা যখন দেখিতে পাই যে এই মহান্ পবিত্র ভাবটীই তাঁহার আর সকল ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন সত্য সত্যই আমাদের মস্তক ভক্তিভরে কবির পদপ্রান্তে অবনত হইয়া পড়ে। এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণা বীররমণীর আদর্শ চরিত্র কেবল ভারবিতেই আমরা দেখিতে পাই।

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

কামরূপ অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সম্পৎ-সম্ভারে পরিপূরিত। কামরূপে যে সকল পুরা-তত্ত্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলে তাহাতে অনেক সামগ্রী লাভ করিবেন সংশয় নাই। মহামতি গেট (E. A. Gait) সাহেব বাহাদুরের অনুসন্ধিৎসার ফলে কামরূপের প্রাচীন ভূপতিগণের যে সকল তাম্রশাসন (copper plate grant) বঙ্গীয় এসিয়েটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হইয়াছিল, প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হর্ণলী (A. F. Rudolf Hoernle) কর্ত্তৃক সে সমস্ত সমালোচিত হইয়াছে। কল্কিপুরাণে উল্লেখ আছে "শম্ভুনেত্রাগ্নিদগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ তত্র রূপং যতঃ প্রাপ ততোভবেৎ" অর্থাৎ হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া তাঁহার কৃপাবশতঃ এই স্থানে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন; এই জন্য এই দেশ কামরূপ নামে অভিহিত।

"ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি," অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঈশানকোণে এবং পূর্ব্বভাগে কামরূপ দেশ অবস্থিত। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানাদির বর্ণনায় পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ ইত্যাদিতে কামরূপ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতের কোন স্থানে কামরূপের উল্লেখ নাই। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা "অমূর্ত্ত-রজা" পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপে ধর্ম্মারণ্য-

সমীপে একটী আর্য্য রাজ্য স্থাপন করেন। সেখানে উল্লেখ আছে—

"তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগজ্যোতিষং পুরং
ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং" ইত্যাদি রামায়ণ।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমে কামরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দানবরাজ নরকের নাম যে যে স্থানে উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থানে প্রাগজ্যোতিষপুরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যোগিনী তন্ত্রে কামরূপের সীমা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে :—

নেপালস্য কাঞ্চনাদিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াত্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠো দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি
কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
(একাদশ পটল ১৬-১৮)।

ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে কামরূপের ভূভাগ পশ্চিম দিকে করতোয়া * ও পূর্ব্বদিকে দিক্করং † (Dikrang) নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা কঞ্জগির ও কনকগিরি এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষী নদীর সঙ্গম স্থল; অর্থাৎ মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ভূটান, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, মৈমনসিংহ, কোচবিহার, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রানুসারে কামরূপের এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ (১) উপবীথি, (২) বীথি, (৩) উপপীঠ, (৪) পীঠ, (৫) সিদ্ধপীঠ, (৬) মহাপীঠ, (৭) ব্রহ্মপীঠ, (৮) বিষ্ণুপীঠ ও (৯) রুদ্রপীঠ এই নবপীঠ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে :—

"উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ, উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদান্তরম্॥
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদান্তরম্।
নব যোনিরিতি খ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥
(একাদশ পটল ২৫ শ্লোক)।

যোগিনী তন্ত্র অপেক্ষা "কালিকাপুরাণ" বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে কামরূপের সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ কামরূপের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘে একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত পর্ব্বত বেষ্টিত এবং একশত নদী সমাযুক্ত; ইহাই কামরূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমোত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী হইতে ব্রহ্ম ও আসাম দেশের যে বিবরণ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়—আসাম নামে অদ্যাবধি অভিহিত প্রদেশ ব্যতীত বর্ত্তমান রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী বিভাগ, মৈমনসিংহ জেলার কিয়দংশ * এবং শ্রীহট্ট, মণিপুর, জয়ন্তীয়া ও কাছাড় প্রভৃতি জেলা কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যোগিনীতন্ত্রানুসারে শ্রীহট্ট দেশ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এই তন্ত্রের কোন কোন স্থানে লিখিত আছে :—

ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি
জালন্ধরস্তু বায়ব্যে কোলাপুরন্তু উত্তরে।
ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্রমুত্তরে কিয়ৎ
শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ উপপীঠান্যথ শৃণু॥
(দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১ম পটল ১৪-১৫)।

---

* করতোয়া নদী বগুড়া জেলার সেরপুর গ্রাম হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই করতোয়া তটে সতীর বামতল্প মতান্তরে বসন পতিত হয়। এই জন্য ইহা একটা পীঠ স্থান হইয়াছে।

† দিকরং নদী লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত সদীয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত।

* মৈমনসিংহের পূর্ব্বভাগ প্রাচীন কালে কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। মদনপুরের রাজা মদনমোহন, গড়জরিপার দলিপ সামন্ত এবং জঙ্গল বাড়ীতে ভবানন্দ প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের অধীন থাকিয়া ময়মনসিংহ জেলার সীমাবদ্ধরূপে শাসন দণ্ড পরিচালিত করিতেন। ইঁহারা সকলেই কোজাদিতি সম্ভূত ছিলেন।

পংক্তিহস্তং কামরূপে সৌমারে তারহস্তকম্।
কোল্বপীঠে তুর্য্যহস্তং চৌহারে দ্বিগুণং ভবেৎ॥
মহেন্দ্রে তু কলাহস্তং শ্রীহট্টে বহ্নিহস্তকম।
উপপীঠে তু পাতালে হস্তমেব বিজানীহি॥

(২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল ৪২-৪৩ শ্লোক)। যোগিনীতন্ত্রের কয়েক স্থানে শ্রীহট্টদেশ কামরূপের সীমান্তর্গত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। উক্ত তন্ত্রে কোচবিহারের আদিভূত রাজা বিশ্বসিংহের নাম পাওয়া যায়। তিনি মোগলকেশরী বাবরের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় শ্রীহট্টদেশও মুসলমানদিগের অধীন হইয়া সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং যোগিনীতন্ত্রমতে শ্রীহট্ট-দেশ তৎকালে কামরূপ রাজ্যান্তর্গত বলিয়া স্থির নির্দ্ধারণ করা যায় না।

প্রাচীন রাজগণ।

মহীরঙ্গ দানব কামরূপের আদি রাজা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তার পর হাটকাসুর, শম্বরাসুর, রত্নাসুর প্রভৃতি দানবগণ পর্য্যায়ক্রমে কামরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অসুরশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা বৈদিক দেবদ্বেষী ছিলেন। তারপর নরকাসুর কামরূপের রাজা হয়। যোগিনী-তন্ত্রে লিখিত আছে, "দেবেশ্বর নামক জনৈক শূদ্র-রাজ শকাব্দের প্রারম্ভে কামরূপে রাজত্ব করিতেন। উক্ত তন্ত্রমতে "নাগাখ্যা" বিশ্বনাথ নামক স্থানের সন্নিকটে প্রতাপগড়ে আবির্ভূত হন। অনেকে অনুমান করেন এখানে যে দুর্গটীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা তাঁহারই সময়ে বিরচিত হইয়াছিল। যোগিনীতন্ত্রমতে মীনাঙ্ক, গজাঙ্ক, শূকরাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক নামে অভিহিত নরপতিগণ দুই শত বৎসর কামরূপের লৌহিত্যপুর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। উপরোক্ত প্রথম তিন জন রাজার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সুস্থির বর্ম্মা।

হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, "পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিতেঃ স্থিতিবর্ম্মণঃ সুস্থিরবর্ম্মা নাম মহারাজাধিরাজো যজ্ঞে তেজসাং রাশি মৃগাঙ্ক ইতি সংজ্ঞনা জগুঃ (হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস)। কামরূপের রাজা সুস্থিরবর্ম্মা "মৃগাঙ্ক" উপাধিতে অভিহিত হইতেন। হর্ষচরিতে "র" যুক্ত নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎপুত্র ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার নাম সুস্থিতবর্ম্মা লেখা আছে। হর্ষচরিত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর লোক। তিনি ঐ সময়েই শ্রীকণ্ঠের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই রাজা শিলাদিত্য নামেও পরিচিত। তাহারই রাজধানীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ আহূত হন। বাণভট্ট ঐ ভ্রমণকারীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মগধের দামোদরগুপ্তের পুত্র "মহাসেন গুপ্ত" কামরূপ-রাজ সুস্থিত বর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লৌহিত্য-তীরে (ব্রহ্মপুত্রতটে) সুস্থিত-বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন :—

"শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্মঃ যুদ্ধবিজয়শ্লাঘাপদাঙ্কং মুহু
র্যস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধকন্দকুমুদকুন্নাৎস্ছহার [৺] তং।
লোহিতস্য তটেষু শীতলতলেষুৎফুল্লনাগদ্রুম
চ্ছায়াসুপ্তবিবুদ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃস্ফীতং যশো গীয়তে॥

Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum.

কুন্নাৎচ্ছহারের পরবর্ত্তী লিপি অবুদ্ধ থাকায় উক্ত স্থানে বন্ধনীসমন্বিত একটী চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হইল।

মগধের এই গুপ্তবংশ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র "গোবিন্দ গুপ্ত" হইতে উৎপন্ন। অফসঁড় ও দেওবরনার্কের খোদিত লিপি হইতে গুপ্তরাজবংশের যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(৪০০-১৪) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত = ধ্রুবদেবী

(৪১৫-৫৪) প্রথম কুমারগুপ্ত   গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্ত
|
হর্ষগুপ্ত
|
প্রথম জীবিত গুপ্ত
|
তৃতীয় কুমার গুপ্ত
|
দামোদর গুপ্ত
|
মহাসেন গুপ্ত

মহাসেন গুপ্ত
শশাঙ্ক মাধবগুপ্ত = শ্রীমতী দেবী
আদিত্যসেন = কোন দেবী
দেবগুপ্ত = কমলা দেবী
২য় জীবিত গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করেন আদিত্যসেন ৬৪০-৭৫ খৃঃ অব্দে মগধে রাজত্ব করেন। অফসঁড় নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অফসঁড় নগর অতি প্রাচীন স্থান, ইহা সাকরী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। দেওবরনার্কের প্রাচীন নাম "বরুণিকা"। বিষ্ণুপুরাণ মতে মগধের গুপ্ত রাজ্য গঙ্গার উপকূল ভাগে প্রয়াগ (Allahabad) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে সাকেত (অযোধ্যা) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মগধের প্রধান নগরী ললিতপট্টন (পাটলিপুত্র) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল। মিঃ গ্রাণ্ট (A. Grant) গুপ্ত সম্রাটদিগের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করেন তাহাদের অধিকাংশই প্রাচীন সাকেত (ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তী অযোধ্যা) নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। মিঃ হুপার অযোধ্যার পূর্ব্বভাগ হইতে অনেক গুপ্তমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এতদ্দ্বারা বায়ুপুরাণের ঐতিহাসিক সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ভগবদ্গীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ কখন সগুণ, কখন সগুণ-নির্গুণ এইরূপ উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ নির্গুণ, এই তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। উপাসনায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই চোখের সম্মুখে থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর না হইলে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনা অর্থে চিন্তন, মনন বা ধ্যান। চিন্তিত বস্তুর রূপ না হইলেও অন্য কোন গুণও মনের উপলব্ধি না হইলে মন কিসের চিন্তা করিবে? তাই অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসনা (চিন্তন, মনন, ধ্যান) উপনিষদে যে যে স্থানে কথিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপাসকের অধিকার অনুসারে ন্যূনাধিক ব্যাপক কিংবা সাত্বিক হইয়া থাকে; এবং যাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩. ১৪. ১) উক্ত হইয়াছে, "পুরুষ ক্রতুময়, যাহার যেরূপ ক্রতু (নিশ্চয়), মরিবার পর সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়", এবং ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, "দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহিত গিয়া মিলিত হয়েন" (গীতা ৯. ২৫), অথবা "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় (১৭. ৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকের অধিকারভেদে উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রকরণকে 'বিদ্যা' বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপ্তির (উপাসনারূপ) মার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও শেষে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাং-৩. ১৪), পুরুষবিদ্যা (ছাং. ৩. ১৬, ১৭), পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌষী. ১), প্রাণোপাসনা (কৌষী. ২) ইত্যাদি অনেক প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। এই প্রকরণে অব্যক্ত পরমাত্মার সগুণ বর্ণন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস (৩. ১৪. ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তো অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা আনন্দ—এই সকল রূপেও পরমাত্মার ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে (তৈ. ২. ১-৫; ৩. ২-৬)। বৃহদারণ্যকে (২. ১) অজাতশত্রুকে গার্গ্য বালাকী সর্ব্ব প্রথম আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল বা দিক্‌সমূহে অধিষ্ঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে; কিন্তু পরে প্রকৃত ব্রহ্ম এই সকলেরও অতীত, ইহা

অজাতশত্রু তাহাকে বলিয়া শেষে প্রাণোপাসনাকেই মুখ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পরা কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্তসমস্ত ব্রহ্মরূপকে ‘প্রতীক’ অর্থাৎ এই সকলকে উপাসনার জন্য কল্পিত গৌণ ব্রহ্ম-স্বরূপ কিংবা ব্রহ্মনিদর্শক চিহ্ন বলা যায়; এবং এই গৌণ রূপই কোন মূর্ত্তির রূপে চোখের সামনে রাখিলে তাহাকেই ‘প্রতিমা’ বলা হয়। কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন (কেন. ১. ২-৮)। এই ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় কোন স্থানে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তি. ২. ১) কিংবা “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃ. ৩. ৯. ২৮) বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ,—এই প্রকারে তিন-গুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এবং অন্যস্থানে ভগবদ্গীতার ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া ব্রহ্মের: বর্ণন এইপ্রকার করা হইয়াছে যে, “ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন” (ঋ. ১০. ১২৯. ১) অথবা “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ (কঠ. ২. ২০), “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে” অর্থাৎ তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, তিনি নিকটেও আছেন—(ঈশ. ৫; মুং, ৩. ১. ৭), অথবা ‘সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস” অথচ ‘সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত’ (শ্বেতা. ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, কৃত ও অকৃতের, কিংবা ভূত ও ভব্যেরও অতীত যিনি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া, জান (কঠ. ২. ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারা-য়ণীয় ধর্ম্মে ব্রহ্মা রুদ্রকে (মভা. শাং. ৩৫১. ১১), এবং মোক্ষধর্ম্মে নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন (৩৩১.৪৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২. ৩. ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিনটাকে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্ত্তরূপ বলিয়া, দেখাইয়াছেন যে, এই অমূর্ত্তের সারভূত পুরুষের রূপ বা রং বদল হয়; এবং শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ‘নেতি নেতি’ অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহা নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে,—এই সমস্ত নামরূপাত্মক মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত পদার্থের অতীত (পর) যে ‘অগৃহ্য’ বা অবর্ণনীয় তাহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে (বৃহ. ২. ৩. ৬ এবং বেসূ. ৩. ২. ২২)। অধিক কি, যে যে পদার্থের কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে সেই সমস্তেরও অতীত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মের অব্যক্ত ও নির্গুণ স্বরূপ দেখা-ইবার জন্য ‘নেতি নেতি’ এই এক ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ, আদেশ বা সূত্রই হইয়া গিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেই উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ. ৩. ৯. ২৬; ৪.২. ৪; ৪. ৪. ২২; ৪. ৫. ১৫); সেইরূপ অন্য উপ-নিষদেও পরব্রহ্মের নির্গুণ ও অচিন্ত্যরূপের বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—“যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈত্তি. ২. ৯); “অদ্রেশ্যং (অদৃশ্য), অগ্রাহ্য” (মুং. ১. ১. ৬), “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” (মুং. ৩. ১. ৮)—চোখে দেখা যায় না কিংবা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; অথবা—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে॥

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পঞ্চ মহাভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ-বিরহিত, অনাদি, অনন্ত, ও অব্যয় (কঠ. ৩. ১৫; বেসূ. ৩. ২. ২২-৩০ দেখ)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মের বর্ণনাতেও ভগবান নারদকে আপন বাস্তব স্বরূপ “অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অস্পৃশ্য, নির্গুণ, নিষ্কল (নিরবয়ব), অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিষ্ক্রিয়” এইরূপ বলিয়া তিনিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়কর্ত্তা ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইহাঁ-কেই ‘বাসুদেব পরমাত্মা’ বলা হয়, এইরূপ বলিয়াছেন (মভা. শাং. ৩৩৯. ২১-২৮)।

অতএব উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুধু ভগবদ্গীতায় নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারা-য়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে এবং উপনিষদেও পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হই-য়াছে, এবং এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, সগুণনির্গুণ ও শেষে কেবল নির্গুণ এই তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে করা যাইবে? এই তিনের মধ্যে সগুণ-নির্গুণ অর্থাৎ উভয়াত্মক যে রূপ তাহা সগুণ হইতে নির্গুণে (কিংবা অজ্ঞেয়ে) যাইবার সোপান বা সাধন এইরূপ বুঝা যায়। কারণ, প্রথমে সগুণ রূপের জ্ঞান হইলে পর আস্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে নির্গুণ স্বরূপের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনু-সারেই ব্রহ্মপ্রতীকের ক্রমোচ্চ উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বল্লীতে বরুণ ভৃগুকে প্রথমে এই উপদেশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম তদনন্তর ক্রমে ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছেন (তৈত্তি. ৩. ২-৬)। কিংবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশেষণের দ্বারা কেহ নির্গুণের বর্ণনা কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পরস্পরবিরুদ্ধ বিশে-

ষণের দ্বারা তাহার বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, 'দূর' বা 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কোন বস্তু 'নিকটে' বা 'অসৎ' এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন তবে পরমেশ্বরকে 'দূর' বা 'সৎ' বিশেষণ দিয়া 'নিকট' বা 'অসৎ' কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে 'দূর নহেন, নিকট নহেন; সৎ নহেন, অসৎ নহেন'—এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে,—দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়া দিয়া, বাকী যাহা কিছু নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ বোধ হইবার জন্য, ব্যবহারক্ষেত্রে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণের এই ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই (গী. ১৩. ১২)। যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, নিকটেও তিনিই, সৎও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে, সেই ব্রহ্মের পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে বর্ণনা করিলেও চলে (গী. ১১. ৩৭; ১৩. ১৫)। কিন্তু সগুণ-নির্গুণ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপপত্তি এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে কথার ব্যাখ্যা অবশিষ্টই রহিয়া যায়। যখন অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ধারণ করেন তখন উহা তাঁহার মায়া; কিন্তু ব্যক্ত কিংবা ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই যখন তিনি নির্গুণের স্থানে সগুণ হইয়া যান তখন তাঁহাকে কি বলিবে? উদাহরণ যথা—একই নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্গুণ বলেন, আবার কেহ তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বকর্ম্মা ও দয়ালু বলেন। ইহার বীজ কি? কিম্বা উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্‌টি? এই নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক। সমস্ত সঙ্কল্পের দাতা অব্যক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ; উপনিষদে ও গীতায় নির্গুণস্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর উক্তি—এইরূপ বলিলে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। যে বড় বড় মহাত্মাগণ ও ঋষিরা মনকে একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম ও শান্ত বিচারের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈ. ২. ৯)—মনেরও যিনি দুর্গম, বাক্যও যাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, তাহাই চরম ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয়োক্তি, কি প্রকারে বলা যায়? আমরা সাধারণ মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনন্ত ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা হয় না বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হইবে বলা আর সূর্য্যাপেক্ষা আমাদের দীপ শ্রেষ্ঠ বলা একই। হাঁ, যদি এই নির্গুণ স্বরূপের উপপত্তি উপনিষদে অথবা গীতায় না দেওয়া হইত তবে পৃথক কথা হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দেখ-না, ভগবদ্‌গীতায় তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্তই; এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ ধারণ করেন সে তো তাঁর মায়া (গী. ৪. ৬); কিন্তু ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা "মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খ লোক (অব্যক্ত ও নির্গুণ) আত্মাকেই কর্ত্তা মনে করে" (গী. ৩. ২৭-২৯), কিন্তু ঈশ্বর তো কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বারা লোক ভ্রান্ত হয় (গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, অব্যক্ত আত্মা বা পরমেশ্বর বস্তুত নির্গুণ হইলেও (গী. ১৩. ৩১) মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাঁহার উপর কর্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া তাঁহাকে সগুণ অব্যক্ত করিয়া তোলে (গী. ৭. ২৪)। এইরূপ ভগবান স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন ইহা হইতে পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতায় এ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়:—(১) গীতায় পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও পরমেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নির্গুণ ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাঁহাকে সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত জগত এই পরমেশ্বরের মায়া; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ বা জীবাত্মা যথার্থত পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নির্গুণ ও অকর্ত্তা, কিন্তু 'অজ্ঞান'-বশত লোকে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ; কিন্তু উত্তর-বেদান্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায়া ও অবিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ করা হইয়াছে। উদাহরণযথা—পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; এই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী (সাংখ্যদিগের মূল) প্রকৃতি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই আবার 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' এইরূপ দুই ভেদ করিয়া, বলা হইয়াছে; মায়ার ত্রিগুণের মধ্যে 'শুদ্ধ' সত্ত্বগুণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়া, এবং এই মায়াতেই প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে সগুণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ) বলা হয়; এবং এই সত্ত্বগুণ যে, 'অশুদ্ধ' হইলে 'অবিদ্যা' হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে 'জীব' এই নাম দেওয়া হয় (পঞ্চ. ১. ১৫-১৭)। এই-ভাবে দেখিলে, একই মায়ার স্বরূপত দুই ভেদ করিতে হয়—অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিলে,

পরব্রহ্ম হইতে 'ব্যক্ত ঈশ্বর' উৎপন্ন হইবার কারণ মায়া এবং 'জীব' উৎপন্ন হইবার কারণ অবিদ্যা মানিতে হয়। কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ করা হয় নাই। গীতা বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ ধারণ করেন (৭.২৫), কিংবা যে মায়ার দ্বারা অষ্টধা প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের সমস্ত বিভূতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, (৪.৬), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বারা জীব মোহ প্রাপ্ত হয় (৭. ৪-১৫)। 'অবিদ্যা' এই শব্দ গীতার কোথাও আসে নাই; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যেখানে ঐ শব্দ আসিয়াছে সেখানে তাহার অর্থও এইপ্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, (শ্বেতা. ৫.১)। তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল নিরূপণের সুবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ার সূক্ষ্ম ভেদ স্বীকার না করিয়া আমি 'মায়া', 'অবিদ্যা' ও 'অজ্ঞান' এই শব্দগুলিকে সমানার্থকই মানি; এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, ত্রিগুণাত্মক মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্ত্বিক স্বরূপ কি, এবং উহার সাহায্যে গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে করা যায়।

নির্গুণ ও সগুণ এই শব্দ দুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। যথা, জগতের মূল যখন ঐ অনাদি পরব্রহ্মই, যিনি এক, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, তখন তাঁহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের গোচর অনেক প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং এই প্রকার তাঁহার অখণ্ডতা কি প্রকারে ভগ্ন হইল; কিংবা যিনি মূলেতে একই তাঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ পদার্থ কিরূপে দৃষ্ট হইতেছে; যে পরব্রহ্ম নির্বিকার এবং যাঁহাতে, মধুর, অম্ল, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তাঁহাতেই বিভিন্ন রুচি, ন্যূনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা শীতল ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, মৃত্যু ও অমরতা ইত্যাদি অনেক প্রকারের দ্বন্দ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে পরব্রহ্ম শান্ত ও নির্বাত, তাঁহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে পরব্রহ্মে অন্তর-বাহির কিংবা দূর-নিকট ভেদ নাই, তাঁহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার ও-পার কিংবা দূর-নিকট অথবা পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিক্‌কৃত স্থলকৃত ভেদ কিরূপে আসিল; যে পরব্রহ্ম অবিকারী, ত্রিকালে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত, তাঁহাতে ন্যূনাধিক কাল-পরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল; কিংবা যাঁহাতে কার্য্যকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রহ্মের কার্য্যকারণরূপ,—যথা মৃত্তিকা ও ঘট—কেন দেখা যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের সমাবেশ উক্ত ছোট শব্দ দুটির মধ্যে হইয়াছে। কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্দ্বন্দ্বে অনেক প্রকার দ্বন্দ্ব, অদ্বৈতে দ্বৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারেরা এই বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নির্গুণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিও নিত্য ও স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দ্বৈতের দ্বারা তাহার সমাধান হয় না শুধু নহে, প্রত্যুত যুক্তিবাদেও এই দ্বৈত টেঁকে না। তাই, প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠপদবীর 'নির্গুণ' ব্রহ্মই জগতের মূল। কিন্তু এক্ষণে নির্গুণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যাহা নাই তা হইতেই পারে না; এবং তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্গুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই ব্রহ্ম হইতে, সগুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে আবার সগুণ আসিল কোথা হইতে? সগুণ যদি নাই বল, তাহা তো চোখের সামনে দেখা যাইতেছে। এবং নির্গুণের ন্যায় সগুণও যদি সত্য বল, তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি সমস্ত গুণের স্বরূপ আজ এক প্রকার কল্য অন্য প্রকার—অর্থাৎ উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তো (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া) ইহাই বলিতে হয় যে এইরূপ সগুণ পরমেশ্বরও পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। কিন্তু বিভাজ্য ও নশ্বর হওয়ায় যিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধতির মধ্যে নিত্য পরতন্ত্র হইয়া কাজ করেন তাঁকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে? সারকথা, চাই ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা আধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, সমস্ত পদার্থ একই অব্যক্ত কিন্তু সগুণ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;—যে কোন পক্ষই স্বীকার কর না কেন, ইহা নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, নশ্বর গুণ যে পর্য্যন্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত না হয় সে পর্য্যন্ত পঞ্চ মহাভূতকে বা প্রকৃতিরূপ এই সগুণ মূল পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না। তাই যিনি প্রকৃতিবাদ স্বীকার করেন তাঁহার পরমেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত

বলা ছাড়িয়া দিতে হয়; অথবা পঞ্চ মহাভূতের অথবা সগুণ মূল প্রকৃতিরও অতীত কোন্ তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই। মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণা নিবারণ কিংবা বালুকা হইতে তৈল বাহির হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্তু হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও এইরূপ ব্যর্থ; এবং এই জন্য, যাজ্ঞবল্ক্য আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যতই কেন সম্পত্তিলাভ হউক না তাহা দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ. ২-৪. ২)। ভাল, এখন যদি অমৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে কোন মানুষের এই স্বাভাবিক ইচ্ছা দেখা যায় যে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম বা পুরস্কার কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থাৎ চিরকাল উপভোগ করিতে চায়; অথবা ইহাও দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্ত্তির অবসর উপস্থিত হইলে আমরা জীবনেরও পরোয়া রাখি না। ঋক্‌বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূর্ব্বতন ঋষিদের এই প্রার্থনা যে, "হে ইন্দ্র! তুমি 'অক্ষিতশ্রব' অর্থাৎ অক্ষয় কীর্ত্তি বা ধন দাও" (ঋ. ১. ৯. ৭), অথবা "হে সোম! তুমি আমাকে বৈবস্বত (যম) লোকে অমর কর" (ঋ. ৯.১১৩.৮)। পূর্ব্বঋষিদিগের প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেও অর্ব্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া, স্পেন্সর, কোঁৎ-প্রভৃতি নিছক আধিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, "কোন ক্ষণিক সুখে না ভুলিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরন্তন সুখের জন্য চেষ্টা করাই এই জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্ত্তব্য" আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে নিরন্তর কল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পনা আসিল কোথা হইতে? যদি বল তাহা স্বভাবসিদ্ধ, তাহা হইলে এই বিনশ্বর দেহের বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্তু আছে এইরূপ বলিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্তু কিছু নাই যদি বল, তবে আমাদের যে মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌতিক পণ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংসা হইবার নহে, তাই ইহার বিচার না করিয়া, দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মের বাহিরে আমাদের মনকে ধাবিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মনে তত্ত্বজ্ঞানের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কে আটক করিবে, আর কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-স্পৃহাকে একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা হইতে হইবে? যে দিন মনুষ্য এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়া আসিয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ত্ব কি, এবং তাহা আমি কিরূপে প্রাপ্ত হইব। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, মনুষ্যের অমৃততত্ত্বের জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হইবার নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, সমস্ত আধিভৌতিক জগৎ-বিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত দৌড়িতে থাকিবে! দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও ঐ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক কি, মানব-বুদ্ধির এই আকাঙ্ক্ষা যে দিন চলিয়া যাইবে সেই দিন তাহাকে "স বৈ মুক্তোঽথবা পশুঃ" এইরূপ বলিতে হইবে!

যাক্। দিক্‌কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্র, সম, এক, নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ তত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অথবা সেই নির্গুণ তত্ত্ব হইতে সগুণ জগতের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপাদিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক উপপাদন অন্য কোন দেশের তত্ত্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির করেন. নাই। অর্ব্বাচীন জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যান্ট মনুষ্যের বাহ্য-জগতের নানাত্বজ্ঞান একত্বের দ্বারা কেন ও কি প্রকারে হয় তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এই উপপত্তিই অর্ব্বাচীন-শাস্ত্র-পদ্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন; এবং হেগেল নিজের বিচারে ক্যান্ট হইতে কিছু আগাইয়া গেলেও তাঁহারও সিদ্ধান্ত বেদান্তকে আগাইয়া যাইতে পারে নাই। শোপেন্‌হোরেরকথাও তাই। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি একথাও লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, 'জগতের সাহিত্যের এই অত্যুত্তম গ্রন্থ' হইতে কোন কোন বিচার তিনি আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক প্রমাণে কিংবা বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং ক্যান্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তে কতটা সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য; অথবা উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত এবং তদুত্তর-কালীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত—ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। তাই, গীতার অধ্যাত্ম সিদ্ধান্তের সত্যতা, উপপত্তি ও মহত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিয়া, মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য—অবলম্বনে, আমি কেবল ঐ সকল বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যোক্ত এই দ্বৈতের অতীত কি

তাহার নির্ণয় করিবার জন্য জগৎদ্রষ্টা ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই দাঁড়াইয়া না থাকিয়া জগৎদ্রষ্টা পুরুষের বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার স্বরূপ কি, তাহা কি করিয়া ও কাহার হয়, এই বিষয়েরও সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। বাহ্য জগতের পদার্থ মনুষ্যের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাকা প্রযুক্ত, বাহ্যজগতের পদার্থমাত্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে। এই বিশেষ শক্তি যে একীকরণের ফল, সেই শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা আত্মার শক্তি,—ইহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি। কেবল একটীমাত্র পদার্থের নহে, প্রত্যুত জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কার্য্যকারণভাবাদি যে অনেক সম্বন্ধ—যাহাকে জাগতিক নিয়ম বলে—তাহারও জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কিন্তু দ্রষ্টা স্বীয় মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা—কোন এক পদার্থ আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার রূপ ও গতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, তাহা একজন যুদ্ধের সেপাই এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়া যায়। ইহার পরেই আর কোন পদার্থ ঐ প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চোখের সম্মুখে আসিলে আবার সেই মানসিক ক্রিয়া সুরু হয় এবং উহাও আর এক সিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে একের পর এক করিয়া যে অনেক সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয় আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি স্মরণ করিয়া একত্র করি; এবং যখন ঐ পদার্থসমূহ আমাদের সম্মুখে আসে, তখন ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমরা বলি যে আমাদের সম্মুখ দিয়া 'সৈন্য' চলিতেছে। এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত পদার্থের রূপ দেখিয়া তাহাকে 'রাজা' বলিয়া নির্দ্ধারিত করি। এবং সৈন্য-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব সংস্কার ও 'রাজা' সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার—এই দুই সংস্কারকে একত্র করিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, 'রাজার সোয়ারী' চলিয়াছে এই জন্য বলিতে হয় যে, জগৎ-জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের যে একীকরণ 'দর্শক' আত্মা করে, তাহারই ফল এই জ্ঞান। এইজন্য ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, "অবিভক্তং বিভক্তেষু" অর্থাৎ যাহা বিভক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিভক্ততা বা একত্ব যাহা দ্বারা বুঝা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান * (গী. ১৮. ২০)। কিন্তু ইন্দ্রিয়-যোগে মনের উপর যে সংস্কার প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহা কিরূপ, এই বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিলে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থমাত্রের রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ্য গুণ যে দ্রব্যের মধ্যে আছে সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহা আমরা দেখি সত্য, কিন্তু যাহাকে আমরা 'ভিজা মাটি' বলি সেই পদার্থের মূল তাত্ত্বিক স্বরূপ কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দ্রতা, ময়লা রং বা গোলার ন্যায় আকার (রূপ), ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিয়যোগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত হইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়া 'দর্শক' আত্মা, বলিয়া থাকে যে ইহা 'ভিজা মাটি'; এবং পরে এই দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের সাত্ত্বিক স্বরূপ বদলিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই) ভিতরফাঁপা, গোলাকার, খন্‌খনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গুণ মন অবগত হইলে পর, তাহাদের একীকরণ করিয়া 'দর্শক' আত্মা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকে। সারকথা, সমস্ত পরিবর্ত্তন বা ভেদ, 'রূপ বা আকারেই' হইতে থাকে এবং যথা, মনের উপর উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, 'দ্রষ্টা' সেই সকল সংস্কারের একীকরণ করিবার পর, একই তাত্ত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ—সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা সুবর্ণ ও অলঙ্কার। কারণ, এই দুই উদাহরণে রং, ঘনত্ব, তরলতা, ওজন প্রভৃতি গুণ একই থাকে, কেবল রূপ (আকার) ও নাম এই দুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদান্তে এই সহজ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সোনা একই, কিন্তু তাহার আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইন্দ্রিয়যোগে গৃহীত তাহারই সংস্কারসকল মনের দ্বারা একত্র করিয়া 'দ্রষ্টা', তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একই মূল পদার্থের একবার 'ঠুসী', একবার 'পৌঁচী' একবার 'সল্লে', একবার 'তন্মণি' এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকে। আমরা সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম দিয়া থাকি, এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির

* Cf. "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold" Kant's *Critique of pure Reason*, P. 64. Max Muller's translation 2nd Ed.

দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে থাকে সেই আকৃতিসমূহকেই উপনিষদে 'নামরূপ' (নাম ও রূপ) বলা হয়; অন্য সমস্ত গুণেরও উহারই মধ্যে সমাবেশ করা যাইতে পারে (ছাং· ৩৩৪; বৃ. ১. ৪. ৭)। কারণ, যে কোন গুণ ধর না কেন, তাহার কোন না কোন নাম বা রূপ থাকিবেই। কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, তাহাদের মূলে এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং আধারভূত কোন দ্রব্য আছে বলিতে হয়। জলের উপর যেমন কোন প্রকার ফেণপুঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ একই মূল দ্রব্যের উপর অনেক নামরূপের আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন ঐ যে মূল দ্রব্য, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এ কথা সত্য। কিন্তু সমস্ত জগতের আধারভূত এই তত্ত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় হইলেও তাহা সৎ, অর্থাৎ সত্য সত্যই সর্ব্বকালে সকল নামরূপের মূলে নামরূপের মধ্যেও বাস করিতেছে, কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত অনুমান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, এইরূপ মানিলে 'হার' ও 'বলয়' প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে না। এই অবস্থাতে 'হার' আছে, 'বলয়' আছে, ইহাই বলা যাইতে পারিবে; কিন্তু 'হার সোনার', এবং 'বলয় সোনার' ইহা কখনও বলা যাইতে পারিবে না। তাই ন্যায়ত ইহা সিদ্ধ হয় যে, 'সোনার হার', 'সোনার বালা' ইত্যাদি বাক্যে 'সোনার' এই শব্দের দ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরূপাত্মক হার ও বালার সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা সমস্ত অলঙ্কারের আধারভূত দ্রব্যাংশেরই বোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সমস্ত পদার্থে প্রয়োগ করিলে, এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, মুক্তা, রূপা, লোহা, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্মক যে সকল পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত একই কোন নিত্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন নামরূপের গিল্টি চড়াইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপেরই, মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার নামরূপের নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে। 'সমস্ত পদার্থে এইরূপ নিত্যরূপে সর্ব্বদাই থাকা'—ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'সত্তাসামান্যত্ব' বলে। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লাটকে ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়া নাইট্ উপাধি বর্জ্জন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

পঞ্জাবের কয়েকটী স্থানীয় দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়া পঞ্জাব সরকার যে বিরাট প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে এবং আমাদের মনে হইতেছে যে, ভারতবাসী প্রজাকুল আমরা নিতান্তই অনাথ। হতভাগ্য অপরাধিগণের অপরাধগুলি যেরূপ, শাস্তি তাহার গুরুত্বের অনুপাতে অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। সেই কঠোর শাস্তি এবং ঐ শাস্তি যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, অধুনা এবং দূরভূতকালে সংঘটিত কয়েকটী জলন্ত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, ঐরূপ শাস্তি পৃথিবীর সভ্যজাতির ইতিহাসে একেবারে তুলনাবিহীন। যে সকল লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা নিরস্ত্র এবং নিরুপায়। যে সরকার তাহাদের প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার হাতে মানুষমারার ভয়ানক সুবিধাজনক কল্-কজ্বা প্রস্তুত আছে। সুতরাং উভয় পক্ষের অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, ঐরূপ ব্যবহারে রাজনীতিক সুবিধাতো নাই-ই, নীতির হিসাবেও উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পাঞ্জাববাসী আমাদিগের ভ্রাতারা যেরূপ অপমান ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহার সংবাদ ভারতের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। লোকের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করা, তাহা সকলে নীরবে শুনিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বহৃদয়ে রাগ ও কষ্টের উদয় হইয়াছে, তাহা যেন গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াও বুঝেন নাই। সরকারের সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ঐরূপ ব্যবহারের ফলে লোকে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে। এই বিশ্বাসে সরকারের মনে সম্ভবতঃ আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হইয়াছে। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ-চালিত সংবাদপত্র এই কঠোরতার প্রশংসা করিয়াছে। কোনও কোনও কাগজ আমাদের কষ্ট দেখিয়া পাশবোচিত হৃদয়হীনতার সহিত পরিহাস করিয়াছে। অথচ কর্ত্তৃপক্ষ সেই সকল সংবাদপত্রের ঐরূপ কার্য্য নিবারণ করিতেও কোনও প্রকার প্রয়াস পান নাই। যে সকল সংবাদপত্র নির্জ্জিত জনসাধারণের পক্ষ হইয়া তাহাদের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে ও ন্যায়ের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছে, সরকার নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগের আর্ত্তনাদ ও কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের আবেদন বৃথা হইয়াছে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়াছেন। উদার রাজনীতিকের যেরূপ

তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকা উচিত, তাঁহাদের তাহা লোপ পাইয়াছে। সরকারের যেরূপ শক্তি, যেরূপ নৈতিক খ্যাতি, তাহার হিসাবে ইচ্ছা করিলে সহজেই গবর্ণমেণ্ট উদারতা প্রকাশ করিতে পারিতেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমার দেশের সেবার এই সামান্য কাজটুকু করিতে ইচ্ছা করি। আমার স্বদেশীয়গণ বিস্ময় ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছেন, আমি ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দেশের কোটী কোটী লোকের নির্ব্বাক্ প্রতিবাদ বাক্যে প্রকাশ করিতে চাই। এ হেন অপমান যাহাদের ভাগ্যে ঘটিল, তাহাদের পক্ষে এখন এ সব বিসদৃশ সম্মান-চিহ্ন যেন লজ্জা আরও বৃদ্ধি করে। আমার স্বজাতীয়গণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইতেছে, এবং অমানুষিক অপমানে অপমানিত হইতেছে। সুতরাং আমি সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া, সদুঃখে ও সসম্মানে আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাকে নাইট্ উপাধি হইতে অব্যাহতি দান করুন। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী লাটের হস্তে আমি ঐ সম্মান-সূচক উপাধি রাজপ্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী লাটের সহৃদয়তা এখনও বিশেষ প্রশংসার সহিত স্মরণ করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ ত এইরূপে তাঁহার নাইট্ উপাধি পরিত্যাগ করিলেন; এদিকে সার শঙ্কর নায়ারও বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাইট্ উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নাকি সার শঙ্কর নায়ারেরও সদস্যপদ পরিত্যাগ করিবার অন্যতর কারণ। এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, পঞ্জাবের কঠোর শাসননীতির কারণে দেশবাসীর অন্তঃকরণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। প্রজাগণের প্রাণে এত বড় আঘাত করা কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অক্ষম ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করাই পরম ধর্ম্ম।

উন্নতি প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালির মহাপ্রাণতা। মাদ্রজের অন্তর্গত দক্ষিণ আর্কটে কুষ্ঠরোগীদিগের একটী হাঁসপাতাল আছে। কলিকাতানিবাসী মহাপ্রাণ দানবীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় উহার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বাড়ী প্রস্তত করিবার নিমিত্ত ছয় হাজার টাকা পৃথক্ ভাবে দান করিয়াছেন। মাননীয় সার আব্দুর রহিম এবং মাননীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিও ইহার উন্নতির জন্য অর্থ সাহার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙ্গালীর এই মহাপ্রাণতার সংবাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশান্বিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রকাশ কেবল তাহার বঙ্গদেশীয়গণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে না, ইহা খুবই আশার কথা।

৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষা—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, স্বর্গীয় দেশপূজ্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহের হাসপাতালে ১২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থের দ্বারা সেখানে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামানুসারে একটী চিকিৎসাবিভাগ খোলা হইবে। জমিদার মহাশয়ের এই সদনুষ্ঠানটীর দ্বারা যুগপৎ পূজ্যের প্রতি সম্মান ও দীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

শোক সংবাদ।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরলোকগমনে আদিব্রাহ্মসমাজ একটী আন্তরিক বন্ধু হারাইয়াছেন। তিনি উদার সম্প্রদায়ের হিন্দু ছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে আদিসমাজের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও আপনাকে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে স্বীকার করেন নাই। এই তো সেদিন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরীতে কি উদারভাবের কথা বলিয়া স্বীয় উদার হৃদয়ের কেমন সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন বন্ধুকে যে আমরা এত শীঘ্র হারাইব, তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বজ্রাহত হইয়াছিলাম—অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আজ তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের হৃদয় অধিকার করেন নাই। তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার প্রাণ আমাদের সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর মনুষ্যত্বের একটা গভীর স্তর ছিল বলিয়াই তিনি নিজের রসধারার উৎস খুলিয়া দিয়া বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে সকলকেই সেই রসের স্রোতে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। এই মনুষ্যত্বই তাঁহাকে ধনমানের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই

মনুষ্যত্বই তাঁহাকে তাঁহার সুনির্ব্বাচিত বঙ্গসাহিত্যের সেবার পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইতে দেয় নাই।

তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে না চাহিলেও আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহার হৃদয় স্বাধীনভাবে পূর্ণ ছিল। সেই কারণেই স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিসদের অবস্থানকালে তাহার স্বাধীনতায় এতটুকু আঘাতের আশঙ্কা যেই উঠিল, অমনি রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাহিত্যপরিষদের স্থানান্তরিতকরণে অগ্রণী হইলেন। এই সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার প্রাণের জিনিস ছিল। তিনি ইহাকে সাহিত্যিকদিগের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করাইয়া সাহিত্যবিষয়ে অনন্যসাধারণ শক্তিশালী করিবার চেষ্টায় ছিলেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কোন কোন পরিষৎসভ্য তাঁহার ইচ্ছা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অসঙ্গত ইচ্ছার আরোপ করাতে তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। গত ১লা জুন তাঁহাকে পরিষদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করাতে হয়তো সে কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরিবার এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদানে আবদ্ধ না হইলেও এই পরিবারকে আমরা বাঙ্গালী পরিবার এবং রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যিকদিগের মুকুটমণি বলিয়া গৌরব করিতে পারি নিঃসন্দেহ। এই একটী লোক বঙ্গসাহিত্যে ছিলেন যিনি সাহিত্যের দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উভয় বিভাগেই নিজেকে up-to-date করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাদি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি কোন বিভাগেই পল্লবগ্রাহী হইয়া আত্মপ্রতারণা করেন নাই এবং যাহা একেবারে ঠিক না জানিতেন, সে বিষয়ে কখনও সাধারণকে ভুল বুঝাইতে যাইতেন না।

দর্শনে ও বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে সে পাণ্ডিত্য কখনও প্রকাশ পাইত না—বন্ধুগণের সহিত আলাপে তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখনও তর্কবিতর্কের ছলে পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করিতেন না। তিনি যেমন পণ্ডিত লোক ছিলেন, তেমনি সুসামাজিক ছিলেন। বর্ত্তমান কালে প্রকৃত সুসামাজিক ব্যক্তি বড়ই বিরল।

তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী এবং নীরব স্বদেশসেবক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেরাই দেশের আশাভরসা এবং বিজ্ঞানই বর্ত্তমান যুগে দেশকে উন্নতির মুখে পরিচালিত করিতে পারে। সেই কারণে তিনি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। দেশীয় নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিশেষে তাহার অধ্যক্ষ হইয়া নিজের ব্রতগ্রহণের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরেই রিপণ কলেজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশালা সুনিপুণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ জন্য কেবল রিপণ কলেজ কেন, বঙ্গবাসীমাত্রই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি রিপণ কলেজে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, ইহাতেই তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানে তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি প্লেগের টীকা লইবার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে প্লেগের টীকা লইয়াছিলেন। কে জানে যে, সেই টীকা তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত করিয়া দেয় নাই?

বৈদিক সাহিত্যেও তাঁহার পাণ্ডিত্য বড় অল্প ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে একক। ইংরাজীতে Martin Haug ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অনেকস্থলে বৈদিক প্রাণ ধরিতে না পারিয়া ভ্রান্ত অনুবাদ চালাইয়া গিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুবাদ সম্ভবমত নির্ভুল হইয়াছে বলিতে পারি। তিনিই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম বৈদিক বিষয়ের উপর বঙ্গভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

তাঁহার পরলোকগমনে দেশের প্রাণে যে আঘাত পড়িল, তাহার যন্ত্রণা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এক কন্যা সান্নিপাতিক জ্বরে পরলোক গমন করাতেই তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। আজ তাঁহার বিরহে আমরাও ভাঙ্গিয়া পড়িলাম।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক বসুমতীতে তাঁহার যে জীবন-কথা বাহির হইয়াছে তাহাকে স্থায়িত্ব দিবার মানসে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, তাঁহার কোন শোকসন্তপ্ত বন্ধু তদবলম্বনে তাঁহার এক জীবনী প্রকাশ করিয়া বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিবেন।

"প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বৎসগোত্রীয় জিঝোতীয়া ব্রাহ্মণ * * মুর্শিদাবাদ জিলার টেঁয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের দুই পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালায় মাধব-সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণসিন্দুর-সিংহ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও চরিত্রগুণে সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেক্সপীয়রের

একখানি নাটক সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

"'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য রামেন্দ্র বাবু স্বীয় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।

"পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি-সাহিত্য ও ইতিহাস-পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক লাভ করি।

"১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি, এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ বন্ধ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।

"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম, এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব একটা 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ঐ 'out of the way the best'—কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার—"out of the way the best"। তাঁহার, ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

"পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮), পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—'The candidate who took up physics and chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination,' অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্‌স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এনট্রান্সে পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফার্ষ্ট আর্টসে পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এনট্রান্সে অন্যতম হেড্ এক্‌জামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। * * * কৃষ্ণকমল বাবুর পদত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছি।

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইলে মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

"১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়াছি।

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

"১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি

উহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছি। ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

শেষে রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।"

৺ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।—বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ১॥০ দেড়টার সময় সর্ব্ববিদিত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার গিরিডির বাসভবনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন; শেষে এই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। মনোরঞ্জন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একজন প্রধান ভক্ত শিষ্য ছিলেন; এবং পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে "স্বদেশী আন্দোলনের যুগে" তিনি স্বদেশী প্রচার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার পরিজনদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন।

৺ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন প্রায় ৬ ঘটিকার সময় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর মহাশয় তাঁহার কলিকাতার মাণিকতলার বাসভবনে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গভর্ণমেন্টের অধীনে একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। বহুদিন যাবৎ যোগ্যতার সঙ্গে এই কার্য্য করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের সকল বিভাগে ইঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। যেমন সঙ্গীতের তেমনি সাহিত্যেরও তিনি একজন ভক্ত সেবক ছিলেন। তিনি নানাবিধ নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া আজীবন বঙ্গবাসীর সেবা করিয়া গিয়াছেন; উচ্চ ধরণের সাহিত্য-সমালোচনায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সাধারণের নানাবিধ কার্য্যে তিনি আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। এরূপ সঙ্গীতজ্ঞ সামাজিক লোক বঙ্গদেশে বিরল। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত ৮ই ফাল্গুন ভবানীপুরের শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাকে শতায়ু বলিলেই হয়—৯৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। হুগলি জেলার অন্তর্গত জাঁই-পাড়া কৃষ্ণনগরে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বংশে তাঁহার জন্ম। এগার কি বার বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। সেই সময় রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অনেকের সঙ্গে শ্রীনাথ বাবুও রাজাকে দেখিতে যান। তার পর রাজার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই কারণে বার্ষিক স্মৃতি সভায় তাঁহার মুখে রাজার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করা হইত। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রতিষ্ঠাতা। তদ্ভিন্ন ঐ সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদকের কার্য্যে বহু বৎসর বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। ভবানীপুরের তাবৎ সৎকার্য্যে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মার্সম্যান, কেরি ও ডফ্ প্রভৃতি সাহেবদিগের কার্য্যকলাপ ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ডি, রোজারিওর পুস্তকালয়ে ইনি অনেক কাল লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। সুতরাং নূতন নূতন পুস্তক সকল পাঠ করিবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ থাকায়, যাহা একবার পড়িতেন কি শুনিতেন, তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। বঙ্গের পুরাতন বড় বড় বংশের বিবরণ হইতে, উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল। লোকে তাঁহাকে walking encyclopedia বলিত। জাল প্রতাপচন্দ্রের ও ওহাবি আমীর খাঁর বিচার, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, প্রিভিকাউন্সিল রিপোর্ট ও ক্রণলজিক্যাল টেবেল ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট সংবাদ পত্রে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ বৃদ্ধ বয়সেও অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত কোন দিন চসমার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ভাল রূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পাইলে ইনি নিশ্চয়ই এক জন বড়লোক মধ্যে গন্য হইতে পারিতেন। শেষ বয়সে অর্থকষ্টজনিত অনেক প্রকার অশান্তিভোগ করিয়াছেন। স্নেহময়ী জগজ্জননীর শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।*

* নানা গোলমালে এই শোকসংবাদটী প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।
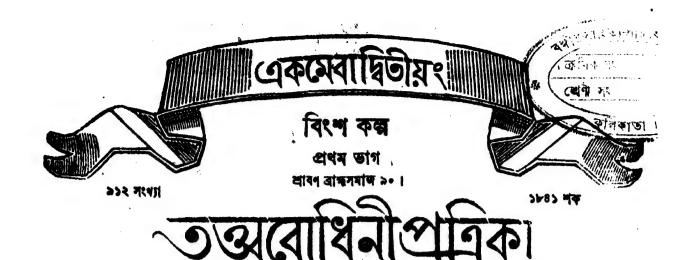
তং, বোং, সং।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।

পবিত্র বুধবারের পবিত্র সন্ধ্যাকালে যখন আমি উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করতে থাকি, তখন মনে হয় বিশ্বপতির সৃষ্ট ঐ আকাশের সমস্ত ভারটা যেন আমার মাথার উপর নেমে পড়েছে। সে ভার সহ্য করা কি আমার সাধ্য? যাঁহার আকাশ, আর যিনি আমাকে এ কার্য্যে পাঠিয়েছেন তিনিই সেই ভার সহ্য করবার ক্ষমতাও আমাকে দিচ্ছেন।

এই উপাসনাতে প্রাণের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য অল্প লোককেই অগ্রসর দেখি। কিন্তু তাতে নিরাশ হবার কোনই কথা নেই। আমরাও যেমন আজ অল্প লোককে এবিষয়ে অগ্রসর দেখছি, পুরাকালে ঋষিরাও তা দেখেছিলেন। তাই না ভগবদগীতাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে হাজারের মধ্যে একজন ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন, আর সেই রকম চেষ্টাশীল দশহাজারের ভিতর একজন যদি সিদ্ধি পান তো যথেষ্ট। কিন্তু এই মনে করে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের নিজেদের জীবনে একেবারে মিশিয়ে নিতে হবে, আর তার পর সেটা পরিবারে, সমাজে, দেশে প্রচার করতে হবে—ছড়িয়ে দিতে হবে। ভগবানের কাজে নির্ভয় হৃদয়ে লাগতে হবে। এই সময় এসেছে যখন সমস্ত দেশের হৃদয় ঈশ্বরের পথে দাঁড়াবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বন্ধুগণ, এই সুসময় অবহেলায় নষ্ট হতে দিও না—ঈশ্বরের উপাসনার আগুন জ্বালাবার এমন সময় পাবে কি না সন্দেহ। ঐ যে একটা কথা আছে অধিকারীভেদ চাই—ছেড়ে দাও সে কথা। আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা হয়েছে, তাতে কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী, সে বিচার করবার সময় নেই। ভগবানের উপাসনার বীজ চারদিকে ছুচোখো ছড়িয়ে যাও—যার ধরবার সময় এসেছে সে ধরে নিক, যার ধরবার সময় আসেনি সে তুদিন পরে ধরে নেবে। তাতে ক্ষতি তো হবে না। ভগবানের নাম প্রচারে ক্ষতি হবে, এ কথা শুনতেই চাই নে—শুনলেও পাপ স্পর্শ করবে বলে মনে হয়।

আমরা যে কয়জন প্রাণের সঙ্গে ভগবানের উপাসনায় যোগ দিয়েছি—এসো দিকিন, একবার জোর করে বলি যে, ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও হৃদয়ের পূজা দেব না—সত্যি সত্যি একথা জোর করে বলতে পারলে তো আমরা আগুন লাগাতে পারব। যিশু খৃষ্টের বারোজন শিষ্য কি রকম আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কি আমরা ভুলে যাব? মহম্মদও তো মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের নিয়ে কি রকম আগুনের বীজ ছড়িয়েছিলেন, সেটা কি ভোলবার কথা? প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেরই প্রতিষ্ঠাতা গোড়ায় খুবই অল্প লোক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা

রামমোহন রায়ই বল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই বল, কয়জন সঙ্গী নিয়ে এ কার্য্যে নেমেছিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো মাত্র ২১ জন সঙ্গী পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ২১ জনেরই প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালাতে পেরেছিলেন। আমাদেরও সেই রকম নিজেদের প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালাতে হবে, তবে চারদিকে সেই আগুন ছড়াতে পারব। এসো সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে হৃদয়ে ধরে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর নামের আগুনে আপনাকে বলি দিই।

নাস্তিকমতের প্রমাণ চাই।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আস্তিক মত ধরিয়া চলিলে সকল দিকে ভালই হয়; আর নাস্তিক মত ধরিয়া চলিলে মন্দ ফল হইবার সম্ভাবনা বেশী। ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, পৃথিবীর বেশী লোকেই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন একভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। তাহা হইলেও আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, যে ঈশ্বরের উপর আমরা নির্ভর করিতে চাহিতেছি, তিনি একটা কাল্পনিক বস্তু কিম্বা তিনি সত্য সত্যই আছেন; অন্ধভক্তিতে ঈশ্বর আছেন বলিয়া কল্পনা করিয়া লই, অথবা জ্ঞানের আলোচনার ফলে তিনি আছেন বলিয়া সত্যসত্যই প্রাণের ভিতর জানিতে পারি বুঝিতে পারি। জ্ঞানেতে যদি তাঁহাকে না জানিতে পারি, তবে নাস্তিকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমরাই বা কি প্রকারে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? কোন বুদ্ধিমান লোকেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বালির উপর ঘর প্রস্তুত করিতে রাজী হইবেন না। কল্পনার উপর যতই বেশী দিন নির্ভর করিয়া থাকিব, আমাদের বিপদও তত বেশী ঘনাইয়া আসিবে। চক্ষু বুজিয়া বিপদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা বিপদ কাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করাই মনুষ্যত্ব। তাই, পাছে বিচার আলোচনা করিতে গিয়া নাস্তিক মতে গিয়া পড়ি, সেই ভয়ে ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পিছাইয়া যাওয়া আমাদের কথনই উচিত নহে। বরঞ্চ এই রকম বিচার আলোচনার ফলে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, এই সকল সত্য নিঃসন্দেহভাবে জানিতে পারিলে আমাদের প্রাণে কত বড় একটা শান্তি আসিবে বল দিকিন?

আলোচনার মুখেই আমরা দেখি যে, নাস্তিকেরা আস্তিকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করেন যে, ঈশ্বর, আত্মা, এ সমস্ত আস্তিকদিগের কল্পনার খেয়াল মাত্র, আসলে ওসকল কিছুই নাই, আর যদি বা থাকে তাহা হইলেও সে সমস্ত জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কোন রকম যন্ত্রের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করিয়াও ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিকে দেখিতে পান নাই, আর ক খ-য়ের সমান, খ গ-য়ের সমান, অতএব ক গ-য়ের সমান এই রকম কাটাছাঁটা তর্কের দ্বারাও ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এমন কোন প্রমাণ পান নাই; কাজেই তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস রাখিতে পারেন না। তাঁহাদের কথার ভাবে মনে হয় যে, বোধ হয় তাঁহাদের মতে যন্ত্রতন্ত্র আর তর্ক ছাড়িয়া ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি জানিতে পারিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদের মতে অন্য কোন উপায় যদি বা থাকে, তবে সেটা আস্তিকেরাই দেখাইয়া দিতে বাধ্য। তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির প্রমাণের ভার আস্তিকদিগেরই স্কন্ধে চাপানো থাকুক, তাঁহারা কেবল আস্তিকদিগের প্রমাণের ভিতর দোষ ধরিতে থাকিবেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে চাই যে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির প্রমাণের ভারটা কাহার স্কন্ধে রক্ষা করা উচিত। ঐ সকল বস্তু যদি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাইত, তাহা হইলে প্রমাণের ভার কাহার উপর রাখা উচিত, সে বিষয়ে কোন আলোচনাই আবশ্যক হইত না। কারণ ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তু সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে আমরা তাহাকে সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতে পারি। ঈশ্বর প্রভৃতি যদি কেবল তর্কের ফল একটা কথার কথা মাত্র হইত, তাহা হইলে কেহ ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহিলে তাঁহাকে আমরা তর্কের নিয়ম ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি না ইন্দ্রিয়-

গোচর বস্তু, না তর্কের ফল। আস্তিকদিগের নিকট ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি স্বপ্রকাশ। তাঁহাদের মতে আমরা প্রত্যেকেই জানিতেছি যে আত্মা আছে, আর সেই আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ জানিতেছি। মিষ্ট বস্তু আছে। কিন্তু আমি তাহা খাইয়া জানি যে মিষ্ট বলিতে কি বুঝায়। আর কেহ যদি বলেন যে যন্ত্রতন্ত্র দ্বারা মিষ্ট বস্তু দেখা যায় না, কিম্বা তর্ক করিয়াও মিষ্ট বস্তু কি তাহা বুঝা যায় না, তাহা হইলে যে মিষ্ট খাইয়া মিষ্টের আস্বাদ জানিয়াছে সে, সেই তার্কিককে মিষ্ট বস্তু আছে, ইহা ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? সেইরূপ আস্তিকেরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, ইহা তাঁহারা জানিতেছেন; নাস্তিকেরা যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারিবেন যে, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, ততক্ষণ তাঁহারা আস্তিক মত ছাড়িতে পারেন না। কাজেই দাঁড়ায় এই যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, তাহার প্রমাণের ভার আস্তিকদিগের স্কন্ধে ফেলা উচিত নহে। ইহার বিপরীতে, নাস্তিকদিগেরই উপর প্রমাণের ভার থাকা উচিত যে ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই ইত্যাদি।

নাস্তিকদিগকে আস্তিকদিগের এ কথা বলিবার অধিকার আছে। কারণ, আস্তিক মত তো কোন নূতন মত নহে—ইহা যে মানবজাতির অতি পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস। মানুষের যে সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই সময়ের যেটুকু অল্পস্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, সেই খুব আদিম কালেও মানুষের ভিতর কোন-না-কোন আকারে ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, আস্তিকভাব ছিল। এই আস্তিকভাব কোন বিশেষ লোকে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহে, কিম্বা কোন বিশেষ কালেতেও বদ্ধ নহে। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত ঘুরিয়া আইস, দেখিবে যে, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির ভিতরেই কোন-না-কোন আকারে আস্তিকভাব অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস, নিজে (কাজেই আত্মা) আছে বলিয়া বিশ্বাস জাগিয়া আছে। এমন কি, যে বৌদ্ধেরা নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও নাস্তিকতা ঠিকটী রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতে গেলে বুদ্ধনামে ঈশ্বরকে পূজা দিয়া এবং বুদ্ধের অধীনে অনেক দেবদেবীর কল্পনা করিয়া আস্তিকভাব যে মানুষের স্বাভাবিক, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আজকাল তো বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকগণ অনেকেই স্পষ্টরূপেই বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক ধর্ম্ম বলিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব কোন কথা বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই বলিয়াই সে সকল বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু তিনি ঐ সকল বিষয় তাঁহার উপদেশের কোথায়ও অস্বীকার করেন নাই। আস্তিক মতের পক্ষে যখন সমস্ত মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে, তখন নাস্তিকেরা সে মতকে ভুল বলিলেই বা আমরা তাহা স্বীকার করিব কেন? বরঞ্চ তাঁহারা আস্তিক মতকে ভুল প্রমাণ করিতে না পারিলে আমরাই বা তাঁহাদের সঙ্গে বৃথাতর্কে প্রবেশ করিব কেন? তাঁহারা এইটুকু বলিলেই আমরা শুনিতে পারি না যে, মানুষ ঈশ্বরকে আত্মাকে জানে না বা জানিতে পারে না; কিম্বা ঈশ্বর আছেন আত্মা আছে, ইহার পক্ষেও যেমন অনেক কথা বলিবার আছে, বিপক্ষেও তেমনি অনেক কথা বলিবার আছে। এসব ফাঁকা কথা আমরা শুনিতে চাই না। তাঁহারা যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ঈশ্বর নাই বা আত্মা নাই, অথবা ওসকল থাকিতে পারে না, তবেই আমরা তাঁহাদের কথায় কান দিতে পারি।

নাস্তিক মত তেমন কঠিন ভিত্তির উপর না দাঁড়াইলেও দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকভাবটা বেশ শীঘ্র শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে। তাহার কারণ, নিম্ন শ্রেণী হইতেই বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়ানো হয়, কিন্তু খুব উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রেরা খুব উচ্চ শ্রেণীতে না উঠিলে দর্শনসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থই পড়িতে পায় না। সেই সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ছাত্রেরা হক্‌স্লি, টিণ্ডাল প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের গভীর পাণ্ডিত্যের আভাস পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা দিতে শিক্ষা করে। তার পর, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই সকল ছাত্রেরা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া দর্শনবিষয়ের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে দেখে যে, তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি আস্তিকদিগের বিশ্বাসের বস্তুগুলি হয় একেবারেই উড়াইয়া

দিয়াছেন অথবা সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, তখন তাহারা স্বভাবতই তাঁহাদিগের মত যুক্তি সকলই নির্ব্বিচারে ঠিক বলিয়া মানিয়া লয়। আমাদের স্বভাবই এই যে, কোন বিদ্বান কোন এক বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য একবার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিলে, তিনি অন্য যে কোন বিষয়ে যে কোন মতামত প্রকাশ করিবেন, তাহাই আমরা নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লইতে চাই—তাঁহার সেই মতামত সম্বন্ধে বিচার করিতে চাহি না—এক-কথায়, আমরা একপ্রকার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা তাঁহার পদতলে ন্যস্ত করিয়া রাখি। আমাদের উচিত অবশ্য বিচার করা যে, যে বিষয়ে তিনি মতামত দিতেছেন সে বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না। কোন জ্যোতির্বেত্তা চিকিৎসা শাস্ত্র অল্পস্বল্প অধ্যয়ন করিলেও রোগী ব্যক্তি কি তাঁহাকে নিজের চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতে পারে? কখনই নহে—চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে রোগী সুচিকিৎসকরই কাছে দৌড়াইবে। সেইরূপ, বিজ্ঞানের বিষয় কোন কিছু জানিবার থাকিলে হক্স্লি বল, ডার্বিন বল, বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের নিকট যাইতে পার। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে চাহিলে সেই সকল বিষয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কাছে যাওয়া উচিত।

ভারতের আস্তিকশ্রেষ্ঠ ঋষিরা আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া মহা-শান্তিময় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সেই ভগবানকে নিজের অন্তরে দেখিলে মনের গাঁইট ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মেরও অবসান হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

উন্নতি প্রসঙ্গ।

মহাসমরের শান্তি। গত ২৮শে জুন সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে যে রকম মনোমালিন্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে এই সন্ধি চিরস্থায়ী হইবে না। আসল কথা এই যে, ভগবানের উপর ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোন সন্ধি, কোন সৎকার্য্য দাড়াইতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বেশ মনে হয় যে, তাহারা নিজেদের স্বার্থপরতার জন্য কঠোর শাস্তি পাইতে পাইতে উপযুক্ত সময়ে সত্যধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবেই। সন্ধিপত্র সাক্ষরের সময়ে কোন্ তিথি, কোন্ নক্ষত্রের সম্মিলন হইয়াছিল, ফলিত-জ্যোতিষীগণ তাহা দেখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গালীর সম্মান। ভগবানের বিধানে বিগত মহাসমরসূত্রে বিশেষভাবে বাঙ্গালী সকল ক্ষেত্রে সম্মান লাভ করিতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণে নবতর আশা-ভরসা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, এক এক যুগ উঠিবার সময়ে তাহার অগ্রপশ্চাৎ কতকটা সময় সন্ধিক্ষণরূপে কাটিয়া যায়। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। আমরা চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি যে, ভারতে উন্নতির এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই নবযুগের সন্ধিক্ষণেই জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙ্গালীই ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের ভাব-সম্পদের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জগতকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। তার পর দেখি, একদিকে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য নিজের কৃতিত্বের বলে পাশ্চাত্যভূখণ্ডের দেশ-বিদেশের উচ্চতম সম্মান লাভ করিতেছেন; অপরদিকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীরা কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্যে বীর্য্যে বাঙ্গালীরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কিছুমাত্র নিম্ন আসন অধিকার করে নাই। দেশের শাসনকার্য্যেও বাঙ্গালীরা কমিশনর, একজিকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য প্রভৃতি উচ্চতর পদ পাওয়াতেই অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের অবসর পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল প্রভৃতি বাঙ্গালীরা যে কমিশনর পদে উন্নীত হইয়াছেন, ইহার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধির প্রশংসা করি। তার পর, শাসনকার্য্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় দেখাইবার অবসর পাওয়াতে বাঙ্গালীর জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজের একচেটিয়া রেল-ওয়ের উচ্চপদে শ্রীযুক্ত এন, কে, বসু প্রভৃতি অধিষ্ঠিত হইয়াও বাঙ্গালীর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়া আজ আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে অনুরোধ করি, একজনও বাঙ্গালী যেন বৃথা সময় নষ্ট না করেন, যাঁহার যে বিষয়ে ক্ষমতা তিনি সেই বিষয়েই যেন নিজের উন্নতি সাধন করেন, দেশের মঙ্গল

সাধন করেন এবং ভারতভূমিকে জগতের সাম্রাজ্যগণতন্ত্রে এক উচ্চ আসন অধিকারলাভের পথে অগ্রসর করিয়া দেন।

কাজের লোক। ইহা একটী মাসিক পত্রের নাম। অল্পদিন যাবৎ ইহা আমাদের হস্তগত হইতেছে। আমরা এরূপ একখানি কাগজের বহুলপ্রচার দেখিলে সুখী হইব। ইহাতে বাঙ্গালী যাহাতে কেবল কলমপেষার পেশা পাইবার পরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার পথ দেখাইবার জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। আমাদের অনুরোধ যে, ইহাতে দেশ-বিদেশের বড় বড় কাজের লোক কি প্রকারে কাজের লোক হইয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহাদের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

আয়ুর্ব্বেদ। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া আশ্চর্য্য করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের ফল তো আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু বিলাতে ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য আমরা এই কারণে সুখী যে, গবর্ণমেণ্টের প্রসন্ন দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে এ দেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিসাধন এবং প্রসারবৃদ্ধি হইবে।

সমাজ-সংস্কার সমিতি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে লেফটেনেণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাজ-সংস্কার সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ নানা উপায়ে হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উদ্যোক্তাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি এবং প্রার্থনা করি যে তাঁহারা তাঁহাদের সংকল্পসাধনে সিদ্ধকাম হউন। একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। কেবল কতকগুলি সভাসমিতি স্থাপন বা কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত করিলেই সমাজের সংস্কার সাধন হইতে পারে না। প্রত্যেক সৎকার্য্যেই আত্মবলি চাই। নিজের কথা, নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিব, অথচ সৎকার্য্যে সিদ্ধ হইব, জগতে তো এ রকম ঘটনা দেখিতে পাই না। আমরা জানি, উদ্যোক্তাদের বাড়ীর অনেকেই হয় তো প্রস্তাব সমর্থনের সময়ে খুবই জোরের সহিত সমর্থন করিবেন, কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে খুবই পশ্চাৎ-পদ। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বাড়ীর পুরুষেরা সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী হইলেও বাড়ীর মেয়েদের ভয় ও অজ্ঞতাজন্য জেদের কারণে সে বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। আসল কথা—প্রয়োজন কোন বাধা মানে না—necessity has no law। ভগবানের বিধানে প্রয়োজনের মত প্রয়োজন পড়িলে সকল বাধা দূর হইবে। বিধবাবিবাহের জন্য কত চেষ্টা হইল, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারেই তাহার কৃতকার্য্যতা হইতেছে। আমরা সমিতির আবশ্যকতা কম করিতেছি না। বরঞ্চ প্রয়োজন পড়িলে লোকেরা যাহাতে একটা কূল খুঁজিয়া পায়, আদর্শ দেখিতে পায়, তাহার জন্য এরকম সমিতির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করি। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমিতির প্রত্যেক সভ্য দেশে প্রয়োজন পড়িবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। আর তাহা না করিলে ভগবৎপ্রেরিত প্রয়োজনের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তখন অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

রাজনারায়ণ বসু পবলিক লাইব্রেরি। আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে না জানেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বড়ই বিরল। তাঁহারই সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" স্বনামধন্য মোক্ষমূলরকে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ বহুকাল যাবৎ দেওঘরে কাটাইয়াছিলেন। দেওঘরের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ বলিলেও বলা যায়। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরের পাণ্ডাদের উৎপাত বড় বেশী রকমের ছিল; এমন কি, মধুপুর হইতে সেই উৎপাতের সূত্রপাত হইত। রাজনারায়ণ বাবুর প্রদত্ত একটী মন্ত্রবলে আমি সেই উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম। অনেকগুলি পাণ্ডা মধুপুর হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাঁহাদের চীৎকারে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছিল। আমিও তাঁহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেওঘরে পৌঁছিলাম। যখন পাণ্ডারা তখনও সঙ্গত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন দেখিলাম, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম—বলিলাম যে "রাজনারায়ণ বোস আমার পাণ্ডা"। অবিলম্বে পাণ্ডাদিগের ব্যূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেওঘরে শিক্ষিত বাঙ্গালী গিয়া সদা হাস্যমুখ রাজনারায়ণ বসুর সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তিনি নিজের জীবন বিফল মনে করিতেন। সেই মহাপুরুষের নামে অল্পকাল হইল একটী সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু বহুকাল যাবৎ মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থাগার যে তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট স্মৃতিচিহ্ন হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা একটী আবেদন পাইয়াছি। এই গ্রন্থাগারের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় আট

হাজার টাকা লাগিবে। যে মহাপুরুষের নামে গ্রন্থাগার উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নামে আট হাজার টাকা সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে করি না। দেশের মহাপুরুষদিগের নাম চির-স্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা যতটুকু সাহায্য করিতে পারিব, দেশও তদনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে নিঃসন্দেহ। এই উপলক্ষে যাঁহার ইচ্ছা আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে অথবা Honorary Secretary R. N. Bose Public Library, Deoghar (S. P.) এই ঠিকানায় অর্থ পুস্তক প্রভৃতি যে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন। আবেদনখানি স্থানাভাবে আচ্ছাদনীর তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

হুগলি সঙ্গীতবিদ্যালয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর হুগলি বড়ালপাড়ায় একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আদিসমাজের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত লাল বেহারী বড়াল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি হুগলি জেলার গণ্যমান্য প্রায় সকলেরই নিকটে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছেন। এখানে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে প্রধানত ধর্ম্মসঙ্গীতই শিক্ষা দেওয়া হয়। আপাতত লালবিহারী বাবুই সঙ্গীত শিক্ষা দেন। কলিকাতায় সঙ্গীতসংঘ যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হুগলির এই বিদ্যালয়টীরও উদ্দেশ্য তাহারই একাংশসাধন। এই কারণে আমাদের অনুরোধ যে, এই বিদ্যালয়টী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত না হইয়া সঙ্গীত সঙ্ঘেরই শাখা স্বরূপে গণ্য হয়। বৃথা স্বাতন্ত্র্যে বলহানি, মিলনেই বলবৃদ্ধি। উভয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হইয়া এ বিষয়ের একটা সুবন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, ধর্ম্মসঙ্গীত দেশে-বিদেশে যতই গীত হইতে থাকিবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে, ততই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। হুগলি সঙ্গীতবিদ্যালয়ের সাহায্যে ভগবানের নাম সমস্ত হুগলি জেলা ছাইয়া ফেলুক এই প্রার্থনা করি। লালবেহারী বাবুর সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক।

সাধারণ গ্রন্থাগার। বরোদা রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই সকল গ্রন্থাগারে ধর্ম্ম, জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব জন্মে, সেই সকল বিষয়েরই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, উপন্যাসের গ্রন্থ স্থান পায় না। ইহা ব্যতীত, এই সকল গ্রন্থাগারের আর একটী গুরুতর বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের তত্ত্বাবধায়কগণ স্বয়ং নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকদের নিকট ব্যাখ্যা করেন। আমাদের দেশে অবশ্য কথকতা দ্বারা কতকটা এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সে শিক্ষা প্রধানত ধর্ম্মবিষয়েই আবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান উন্নতির যুগে কেবল ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে travelling library বা চলন্ত গ্রন্থাগার নামে এক ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা উপরোক্ত ব্যবস্থার কতকটা কাছাকাছি যায়। এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রধানত অল্পশিক্ষিত চাষাভুষো কারিগর প্রভৃতির জন্য একটা বৃহৎকায় গাড়ীর উপর সংগঠিত হয়। কাজেই এই সকল গ্রন্থাগারে কৃষি প্রভৃতি শ্রমশিল্পবিষয়ক গ্রন্থই প্রধানত সংগৃহীত হয় এবং এই সকল গ্রন্থাগারকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এক একটী গ্রামের মধ্যে সেগুলি দাঁড় করাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ যথোপযুক্ত বিষয়সমূহের উপর সংক্ষেপে উপদেশ দেন; এমন কি, যন্ত্রাদি দ্বারা অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখানোও হইয়া থাকে। আমাদের দেশের জমীদারেরা শিক্ষা বিষয়ে দেশকে সত্যসত্য অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিলে গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো এক একটা লাইব্রেরি করিয়া দিন; তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, সেই সকল লাইব্রেরিতে উপন্যাসের (খুব সুনির্ব্বাচিত না হইলে) প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ হয়। এই প্রকার দেশের উন্নতির উদ্দেশ্য লইয়াই আজ শ্রীযুক্ত কার্ণেগী মহোদয় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজা হইয়াও জন্মভূমি স্কটলাণ্ডের গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

জাতিভেদ ও ব্রাহ্মসমাজ। গত ১লা জ্যৈষ্ঠের "ধর্ম্মতত্ত্ব" কাগজে (নববিধান সমাজের মুখপত্র) "জাতিভেদ ও ব্রাহ্মসমাজ"শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—"অনেকে মনে করেন, উপবীত পরিত্যাগ করিলে, ইউরোপ ভ্রমণ করিলে এবং চীনামাটির বাসনে গোমাংস ইত্যাদি আহার করিলেই বুঝি জাতিভেদের সংহার সাধন হইল। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং ভারতবাসী ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে জাতিভেদের তিরোধান হইবে। এই সমস্ত প্রথার দ্বারা জাতিভেদের দুই একটী শাখা ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু মানবজাতির প্রাণ হইতে জাতিভেদের মূল বিনষ্ট হইবে না .... সূতার উপবীত স্কন্ধ হইতে পরিত্যক্ত হইলে কি হইবে, পদমর্য্যাদার উপবীত হৃদয়ের উপর ঝুলিবে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে কি হইবে? ধনী ও দরিদ্রের জাতিভেদ হৃদয়ে আসন পাতিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন দ্বারা ব্রহ্ম ও মানবের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে উপবীত আপনা আপনি ছিন্ন হইবে, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইবে। সমস্ত মানবজাতি একই ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইতে সক্ষম হইবে"। ইহা আদিসমাজের সমাজসংস্কারসম্বন্ধীয় মূলমন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। টীকা নিষ্প্রয়োজন—সত্যমেব জয়তে, সত্যেরই জয় হয়।

ধারবার ব্রাহ্মসমাজ। আদিসমাজের মূলমন্ত্র (সত্য ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া) যে অল্পে অল্পে কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে ধারবার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাই তাহার অন্যতর প্রমাণ। আদিসমাজের মূলমন্ত্র লইয়া এবং আদিসমাজকেই আদর্শে রাখিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপত এম বিজুর। এই ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি মেডিক্যাল মিশন খোলা হইয়াছে। এই মিশনেও সুবিধার কারণে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত এম, কুরুন্দার, ডাক্তার এস, আর, কির্লসবতার এবং ডাক্তার এ, শিবরাও এই মিশনের চিকিৎসা কার্য্যে সহায়তা করেন। ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় এক বৎসর কালের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র লোককে ঔষধপত্র দেওয়া হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ পোষ্টার মিশন (Poster Mission) নামে একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। এই মিশনের সাহায্যে স্থানে স্থানে বড় বড় অক্ষরে ধর্ম্মমন্ত্র ছাপাইয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মভাবে জাগাইয়া তোলা হয়। এই ব্রাহ্মসমাজ গত মাঘ মাসে ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নানা গোলযোগে তাহার বিবরণ আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। ভগবানের দৃষ্টি বড়ই সূক্ষ্ম। তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুর সাধু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন। আমরা সংবাদ পত্রে দেখিলাম—"২৪ পরগণার সুপ্রসিদ্ধ টাকী গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত জালালপুর নামক গ্রামে নন্দলাল জৈনীর একটি ধ্বংসোন্মুখ দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে একটি নূতন দেবমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পৌরোহিত্যের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অথবা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের তথায় যাওয়ার কথা ছিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় মন্দিরস্থাপনের প্রবর্ত্তক ও উদ্যোগী বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান ও বৈষ্ণবদের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের এডিশনাল ইন্স্পেক্টার খাঁ বাহাদুর মৌলবী আশানুল্লা সাহেবের পৌরোহিত্যে মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মৌলবী সাহেব একজন ভক্ত লোক। ইনি কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বহস্তেই মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" ধর্ম্মের রাজ্যে আমরা এইরূপ উদারতা ও একপ্রাণতাই তো দেখিতে চাই। "যতক্ষণ রাস্তাপরে ততক্ষণ জাতবিচারে। খেয়াপরে চড়লে পরে নাহি কোন ভেদ।"

রাজনৈতিক জাতিভেদ। গত ১৩ই আষাঢ় "রায়ত" কাগজে একটি কথা বড়ই ঠিক বলিয়াছে—সামাজিক জাতিভেদে অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছেই, আবার রাজনৈতিক জাতিভেদ কেন? আমরা "রায়তের" নিম্নের কথা উদ্ধৃত করিলাম:—

"রায়ত আলাদা বাছাই চাহে না। তোমরাও আলাদা বাছাই লইও না। শাসক এক জাতি, শাসিত এক জাতি। এই দুই জাত বাস্। আর দোসরা কোন কথা নাই। দিনরাত হিন্দুর জাতিভেদের নিন্দা কর—ভেদে যে কি ফল হয় তাহা হিন্দুর জাতিভেদে বেশ বুঝিতেছ। তবু রাজনৈতিক জাতিভেদ গড়িতে চাও? যদি খাঁটি গণতন্ত্র চাও ত এক বাছাই চাহিয়া লও। আর যদি এক একটা দলতন্ত্র চাও ত আলাদা বাছাই লও। যাহারা শাসনসংস্কার চাও তাহাদিগকে একটা কথা সুধাই, তোমরা কি গণতন্ত্রের হিসাবে সংস্কার চাও? না, গণতন্ত্রের যুগে দলতন্ত্রের হিসাবে সংস্কার চাও? গণতন্ত্রের যুগে যদি দলতন্ত্রের উমেদারী কর, তবে লাভ হইবে পিতলের কাটারী। তার "ঝিকি মিকি সার" হইবে।" ইহাই ভারতবাসীর প্রাণের কথা বলিয়াই মনে হয়। সকল রকমেরই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানো কর্ত্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফী বৃদ্ধি। আমরা এই ফী বৃদ্ধির বিরোধী। সমস্ত দেশ চাহিতেছে শিক্ষাবিস্তার। আপাতত সেই কারণে নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমীচীন হইয়াছে কিছুতেই বলিতে পারি না। যে মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নশিক্ষায় বিস্তার দেখিতে চাই, সেই মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চ শিক্ষার আরও বেশী বিস্তার দেখিতে চাই। তৎপরিবর্ত্তে ফী বৃদ্ধির ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার কমিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের স্থির ধারণা। একজনও যদি এই ফী বৃদ্ধির কারণে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঘোর অমঙ্গলজনক। দেশের অবস্থা যাহারা জানেন, তাঁহারাই এক-

বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী-গণের অনেকেই নিতান্ত দরিদ্র না হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভুক্ত। তাঁহাদের ফী সংগ্রহের কাহিনী শুনিলে সময়ে সময়ে পাষাণও "গলিয়া গিয়া হয় যে অশ্রুর ধারা।" এ বিষয়ে আমরা বেশী কি আর বলিব? যতদূর বুঝিতেছি, সমগ্র বঙ্গদেশ একবাক্যে এই বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত দেখিতে চাহিতেছে। আমাদেরও অনুরোধ এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই বিধি প্রত্যাহৃত করুন।

জননী জন্মভূমি।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

না রহিত যদি তোর অসীম উদার
নীলিম আকাশতল; রবি-শশী-তারা
যদি না ঢালিত নিতি আলোকের ধারা
তোর মুক্ত শ্যামাঙ্গনে; স্নেহাঞ্চল-ছায়
যদি না ফুটিত কলি ঊষায় সন্ধ্যায়
তোর পুণ্য বন-ভূমে; যদি না গাহিত
বিহঙ্গ ললিত সুরে; যদি না বহিত
মৃদু মন্দ গন্ধবহ থাকিয়া থাকিয়া
তোর প্রাসাদের দ্বারে; নাচিয়া নাচিয়া
যদি না ছুটিত নদী; যদি হিমাচল
না রহিত; চুম্বি তোর চরণ কমল
না গর্জ্জিত মহাসিন্ধু! এই মত আমি
ভাল বাসিতাম তোরে তবু দিন-যামি।

প্রসাদজীবনীর সন্ধানকথা।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদের জীবনী বঙ্গভাষায় অনেকেই লিখিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই, সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকার ১৭৭৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় ৺হরিমোহন সেন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে প্রসাদ-জীবনী অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা প্রসাদজীবনীর সর্ব্ব প্রথম প্রবন্ধ হইলেও ইহাতে মালমসলার অভাব হেতু পরবর্ত্তী লেখকগণের প্রসাদপ্রসঙ্গ আলোচনার বিশেষ কোন সাহায্য হয় নাই। এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী এই যে ইহাতে সাধকের পদাবলী-সংগ্রহ একেবারেই নাই। পদাবলীই সাধকের শ্রেষ্ঠ দান; এই ধনের অধিকারী বলিয়া বাঙ্গালী ধনী। প্রসাদের কথা উত্থাপিত হইলে প্রথমেই পদাবলীর কথা মনে পড়ে। ইহা ভিন্ন সাধকের সাধনরহস্য জানিবার অন্য কোন উপায় নাই বলিলেও চলে। পদাবলী ছাড়া প্রসাদী প্রবন্ধ একেবারে শক্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কারণ প্রসাদের সাধন-জীবনের পরিচয় দিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহার পদাবলীবিশেষের ভাব তাহাতে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা উহার কোন মূল্য আছে বলিয়া কেহই মনে করেন না। ইহার পরই প্রসাদ-প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা গুপ্ত কবিকে দেখিতে পাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে গুপ্ত কবির প্রভাব এক সময়ে যে কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেকেই করিয়াছেন, সে বিষ-য়ের পুনরুক্তি করিয়া এখানে কোনই ফল নাই। গুপ্ত কবিই রামপ্রসাদের লুপ্তপ্রায় জীবনী-কথা সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। গুপ্ত কবির গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশ বর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ের সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত 'কালী-কীর্ত্তন' 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ের অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। ১২৬০ সালের ১লা পৌষ গুরুবারে মাসিক 'প্রভাকর' পত্রিকার ৪৮০১ সংখ্যায় চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী 'কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধ চৌদ্দটি পদাবলী সহ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১লা আশ্বিনের মাসিক 'প্রভাকরে' 'মনরে আমার এই মিনতি', 'আর কাজ কি আমার কাশী', 'আর বাণিজ্যে কি বাসনা', 'মায়ের পরম কৌতুক', 'মন কর কি তত্ত্ব তারে', 'এই সংসার ধোঁকার টাটি', * 'ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ'

---

* এই পদাবলী ১ পৌষের সংখ্যাতে লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই দেখা যায় গুপ্ত কবি মাত্র কুড়িটী পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সাতটি পদাবলী সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। এই পৌষ সংখ্যার প্রসাদ-জীবনী পড়িয়া হালিসহর নিবাসী গুপ্তকবির কোন বন্ধু একখানা পত্র লেখেন, তাহা তিনি ১লা মাঘের 'প্রভাকরে' ছাপাইয়াছিলেন।

গুপ্তকবির সংগৃহীত প্রসাদ-জীবনীর 'উপাদানই প্রামাণিক এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই প্রসাদ-জীবনী লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন লেখক ভিন্ন অপর কেহই একথা স্বীকার করেন নাই। এমন কি 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কার' তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানেই গুপ্তকবির প্রবন্ধের উল্লেখ করেন নাই। তবে এই ক্ষেত্রে এরূপও হইতে পারে যে তিনি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া গুপ্তকবির প্রবন্ধের কোন সংবাদই লন নাই। যাহা হউক তিনি গুপ্তকবির প্রবন্ধের ভিতর অনেক নূতন সংবাদ পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে গুপ্তকবির এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধের জন্য আট বৎসর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থানে এবং বহুব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি। বহু প্রসাদ-প্রসঙ্গ লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা এই মূল প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ পান নাই বলিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলার নানা পত্রিকায় আমি বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট নিবেদন ছাপাইয়াছিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয় আমি কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই।

এই ভাবে নানা দিক দিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমি কলিকাতা মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের গুপ্তকবির সহোদরের দৌহিত্র-বংশীয়দের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছিলেন 'এই সংখ্যাখানা কে জানি লইয়া গিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই।' ইহার পর গুপ্তকবির জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়ায় অনুসন্ধান করিয়াও সফলকাম হইতে পারি নাই। হালিসহরেও অনুসন্ধান করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি। শুনিয়াছিলাম রামপ্রসাদ মেমোরিয়াল কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত মহাশয় প্রসাদ জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনিও 'প্রভাকরের' কোন সংবাদ আমাকে দিতে পারেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ আছে, সেখানেও দুই তিন বার অনুসন্ধান করিয়া কোনই ফল হয় নাই। শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরী, বহরমপুর ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটী, সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরী, * চৈতন্য লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতার বহু গ্রন্থাগারে, রামপ্রসাদের বংশধরদের গৃহে, বড় বড় রাজা মহারাজা ও জমিদারদের বাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী, দীনধামে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী, ভূকৈলাসের রাজবাটী এবং কলিকাতার গলিতে গলিতে যে কত খুঁজিয়াছি তাহার বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। গুপ্তকবির এই প্রবন্ধটী এবং নূতন অপ্রকাশিত পদাবলীর জন্য অনেক সময় বড় বড় লোকদের গৃহে যাইয়া বলিয়াছি 'মহাশয়, আপনাদের গ্রন্থাগারে রামপ্রসাদের পদাবলী ও গুপ্তকবির ১২৬০ সালের 'প্রভাকর' আছে কি'? প্রায় সকলেই 'না' করিয়াছেন; এবং কেহ বা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অনেককে দেখিয়াছি তাঁহারা প্রসাদের নামটী পর্য্যন্ত শুনেন নাই। ইহাতে আমি একটুও আশ্চর্য্য হই নাই। ধীরে ধীরে সেই সব 'বড়লোকদের' গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই ক্ষেত্রে কলিকাতা 'ভক্তি-ভবনের' আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তের নিকট হইতে আমি নানা সাহায্য পাইয়াছি। তিনি নিজে কলিকাতার বহু স্থানে 'প্রভাকরের' সংবাদ লইয়াছেন। কিন্তু তিনিও এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কেবলমাত্র 'পরিষদে' রক্ষিত আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যার নকল আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে লিখিয়াছিলেন 'যদি তাড়াতাড়ি না থাকে, আমি আপনাকে "প্রভাকর" সংগ্রহ করিয়া দিব।' সম্ভবতঃ তিনি অনুসন্ধান করিয়াও 'প্রভাকর' পান

* 'সাহিত্যপরিষদ্' গ্রন্থাগারে ১২৬০ সালের ১ আশ্বিন ও ১ মাঘ সংখ্যা আছে। পৌষ সংখ্যাখানা নাই।

নাই। এইভাবে কত লোককে যে 'প্রভাকরের' জন্য ধরিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে আমি উহা কি করিয়া পাইলাম সেই কাহিনীটি এখানে বলিব।

বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ-ভাগে একদিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমি 'বঙ্কিম-ভবন' হইতে ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সহসা দেখা হয়। তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি বলিলেন 'আমার মনে হইতেছে, আমরা হকা-রের নিকট হইতে কতকগুলি 'প্রভাকরের' ফাইল কলেজের জন্য খরিদ করিয়াছিলাম, উহাতে প্রসাদ-জীবনী আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না। আপনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া এই বিষয়ের সঠিক সংবাদ জানুন।' আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তখনই কানাইলাল ধরের লেনে ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলিলেন, 'আপনি রাঁচি ফিরিয়া গিয়া আমাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখিবেন। আমি অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে সংবাদ জানাব। এখন বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ বলিয়া আপ-নাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না।' যেন আমার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। তবুও আবার মনে হইল এ ভাবেতে কত স্থানে আশা পাইয়া অবশেষে নিরাশ হইয়াছি। প্রতিদিনই বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার দৈনিক অনুসন্ধানের ফলাফল বলিতাম। আজও সে কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, 'গুপ্তকবির প্রবন্ধটী যদি প্রকা-শের যোগ্য হয় তাহা হইলে তোমার মা তোমাকে ইহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তুমি ত বহু অনুসন্ধান করিলে, এখন মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাক।' এখানেই আমার অনুসন্ধানের শেষ হইল। ভাগ্য-ক্রমে রাঁচি বসিয়া আমি মায়ের আশীর্ব্বাদে ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রবন্ধটী পাইয়াছি। বিগত ১৭ই জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী-য়ানের পত্রে জানি যে সংস্কৃতকলেজের গ্রন্থাগারে প্রসাদজীবনী-সম্বলিত ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকর' খানা আছে। এই শুভ সংবাদে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। যে প্রবন্ধের অনুসন্ধানে আমি এত দীর্ঘকাল ঘুরিয়াছি এবং যাহা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহা সাহিত্যসেবী ও প্রসাদ-ভক্তের পাইতে আমার মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে না হয় এজন্য উক্ত মূল প্রবন্ধটী 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' পুনঃ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কেবল তাহাই নয় যাহাতে জনসাধারণ উহা সহজে পাইতেপারেন এজন্য উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। গুপ্ত কবির মূল প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আকারে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, স্থল বিশেষেও গুপ্ত কবির বানান সংশো-ধন করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ সেই সময়ে এই বানান ও ভাষা বাঙ্গালীর আদর্শ ছিল।

এই দুর্দ্দিনে আমার ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পুস্তিকা-কারে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চির-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই আশা-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া এই অমূল্য সম্পদ আমি পাই-য়াছি। আমি যে বহুদিনের চেষ্টায় জগজ্জননীর আশীর্ব্বাদে এই প্রবন্ধটী পাইয়াছি, এজন্য মায়ের নিকট আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি। অলমিতি—

গীতাধ্যায়-সঙ্গতি।

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাহারও কাহারও মত এই যে, কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনা এইখানে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে; ইহার পরে, জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই নিষ্ঠা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ কিংবা কর্ম্মযোগের সামিল অথচ তাহা হইতে ভিন্ন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিকল্প বলিয়া আচরণীয় এইরূপ ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তি এবং পরে বাকী ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন; এবং এই প্রকারে আঠারো অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান

ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভের শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং "যুদ্ধ কর" বলিলে তাহার পাপ কি করিয়া এড়াইব, যখন অর্জ্জুনের এই মুখ্য সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 'জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় আর কর্ম্মের দ্বারাও মোক্ষলাভ হয়; এবং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, ভক্তির তো এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে' এইরূপ 'ধরা-ছাড়া' ও নিষ্ফল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুন যখন এক নিশ্চয়াত্মক মার্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও চতুর শ্রীকৃষ্ণ আসল কথা ছাড়িয়া তাঁহাকে তিন স্বতন্ত্র ও বিকল্পাত্মক মার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় 'সন্ন্যাস' ও 'কর্ম্মযোগ' এই দুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫. ১); তন্মধ্যে 'কর্ম্মযোগ' যে অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা তো কোথাও বলা হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের নিজের মনগড়া; এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার করা হইয়াছে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা থাকায় এই তিন নিষ্ঠার কথা প্রায় ভাগবত হইতেই তাঁহাদের মনে আসিয়াছে (ভাগ. ১১. ২০. ৬)। কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য যে এক নহে, সে কথা টীকাকারদিগের ধ্যানে হয় নাই। শুধু কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের জন্য জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও মান্য। কিন্তু ইহা ব্যতীত, ভাগবতকার এ কথাও বলেন যে, জ্ঞান ও নৈষ্কর্ম্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও ঐ দুই-ই (অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) ভক্তি ব্যতীত শোভা পায় না—নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ (ভাগ· ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ৫. ১২)। এইরূপে দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগবতকার ভক্তিকেই এক প্রকৃত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদ অবস্থা গণ্য করেন। ভগবদ্ভক্তেরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবেনই না, ভাগবত এরূপ বলেন না এবং করিতেই হইবে এ কথাও বলেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম কর বা না কর, এ সমস্ত ভক্তিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩. ২৯. ৭-১৯), ভক্তি না থাকিলে সমস্ত কর্ম্মযোগ পুনর্ব্বার সংসারে অর্থাৎ জন্মমরণের ফেরে আনিয়া ফেলে (ভাগ. ১· ৫. ৩৪, ৩৫), ভাগবত কেবল এই কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই থাকায়, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেও ভক্তিযোগের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই একমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা। কিন্তু ভক্তিই গীতার কিছু মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত কিংবা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম লাগাইবার মতো অনুচিত। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তি আর কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনের ভক্তি এক সহজ মার্গ—এ কথা গীতার সম্পূর্ণ মান্য। কিন্তু এই মার্গের সম্বন্ধেও আগ্রহ না রাখিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক যাহার যে মার্গ সহজ মনে হইবে সেই মার্গ অনুসারেই সেই জ্ঞান সে সম্পাদন করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন। শেষে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম্ম করিবে কি করিবে না—ইহাই গীতার মুখ্য বিষয়। তাই, সংসারে কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা—জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনে এই যে দুই মার্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দুই মার্গ হইতেই গীতার আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে, ভাগবতকারের অনুসারে প্রথম মার্গের 'ভক্তিযোগ' এই নূতন নাম না দিয়া, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'কর্ম্মনিষ্ঠা' এবং জ্ঞানোত্তর কর্ম্মত্যাগকে 'সাংখ্য' বা জ্ঞাননিষ্ঠা', নারায়ণীয় ধর্ম্মের এই প্রাচীন নাম গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে। গীতার এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমান ভক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না। কারণ, 'কর্ম্ম করা' ও 'না করা অর্থাৎ ছাড়া' (যোগ ও সাংখ্য) এই অস্তি-নাস্তিরূপ দুই পক্ষ ব্যতীত কর্ম্ম-সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষ এক্ষণে অবশিষ্টই থাকে না। তাই, ভক্তিমান্ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তি করে ইহা ধরিয়াই তাহার নির্ণয় না করিয়া, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম করে কি করে না তাহারই বিচার করা আবশ্যক। ভক্তি পরমেশ্বর-প্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থে যদি ভক্তিকেই যোগ বলা যায় (গী· ১৪· ২৬) তথাপি তাহা চরম 'নিষ্ঠা' হইতে পারে না। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কর্ম্ম করিলে কর্ম্মনিষ্ঠা এবং না করিলে সাংখ্যনিষ্ঠা বলিতে হয়। তন্মধ্যে কর্ম্ম করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়স্কর, ভগবান্ আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম করিলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না, তাই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেই হইবে;—সন্ন্যাসমার্গীর কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ একটা বড় আপত্তি আছে। এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্ন্যাসমার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহা

কর্ম্মযোগের দ্বারাও যে প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী· ৫· ৫) পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোন খোলসা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তাই কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার দ্বারাই শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট মহত্বপূর্ণ বিস্তৃত বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন। এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ভক্তি নামক এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি, এরূপ না বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

"হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সাধন করিবার সময় 'যথা' অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় পূর্ণ জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি) তুমি শোন" (গী· ৭· ১); এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 'জ্ঞানবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে (গী· ৭. ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি-প্রদত্ত 'ময্যাসক্তমনাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে 'যোগং যুঞ্জন্' অর্থাৎ "কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে" এই পদের খুবই গুরুত্ব আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টীকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 'যোগং' অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগ, যাহা পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এই কর্ম্মযোগ সাধন করিলে যে প্রকার বিধি বা রীতিতে ভগবানসম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথা এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে বলিতে আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেওয়া হইয়াছে। তাই এই শ্লোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া "প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে' ভক্তিনিষ্ঠা স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে" এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ অর্থ যাহাতে কেহ না করে এই জন্যই "যোগং যুঞ্জন্" এই পদ এই শ্লোকে ইচ্ছা করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ এইরূপ স্থির করা হইয়াছে; এবং তাহার পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক সেই পাতঞ্জল যোগের সাধন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কর্ম্মযোগের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের একপ্রকার কসরত করানো। এই অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অধীনে রাখা যায় সত্য; কিন্তু মনুষ্যের বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্দ্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোন লাভ হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাসনা দুষ্ট হইলে, কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ দুষ্কর্ম্মে, এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সিদ্ধির উপযোগ করিয়া থাকে। তাই ষষ্ঠ অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই (গী· ৬. ২৯); এবং বাসনার এই শুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি ব্যতীত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মযোগে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিলেও 'রস' অর্থাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইতে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা বিষয়বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হওয়া চাই, এই কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে (গী. ২· ৫৯)। তাই, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান যে প্রকারে অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন। 'কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে' এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কর্ম্মযোগ যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হয় না; এবং সেইজন্য কর্ম্মযোগের পরিবর্ত্তে বিকল্প হিসাবে ভক্তি ও জ্ঞানকে মানিয়া এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বলা হইয়াছে, এ কথাও নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। গীতার কর্ম্মযোগ ভাগবতধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হওয়ায়, কর্ম্মযোগে জ্ঞানলাভবিধির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধর্ম্ম কিংবা নারায়ণীয় ধর্ম্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা; এবং এই অভিপ্রায়েই শান্তিপর্ব্বের শেষে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তিমূলক নারায়ণীয় ধর্ম্ম, এবং তাহার বিধি ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে" (প্রথম প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ)। বৈশম্পায়নের উক্তি অনুসারে সন্ন্যাসমার্গের বিধিও ইহারই অন্তর্ভূত। কারণ, কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা—এই ভেদ এই দুই মার্গের মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক; সেই জন্য দুই মার্গেরই জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু, "কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে" এইরূপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি উক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ মুখ্যতঃ কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য করা হইয়াছে, উহারই ব্যাপকতার কারণ উহাতে সন্ন্যাস মার্গেরও বিধিসমূহের সমাবেশ হয়, কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া

কেবল সাংখ্যনিষ্ঠার স্বতন্ত্র সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান বলা হয় নাই। ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে, সাংখ্যমার্গী জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্ম্ম বা ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না; এবং গীতাতে তো ভক্তিকে সুগম ও প্রধান বলা হইয়াছে—ইহাই বা কেন; বরঞ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণন করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'তুমি কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ কর' (গী. ৮·৭; ১১, ৩৩; ১৬. ২৪; ১৮·৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ হইয়াছে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য বলা হইয়াছে; এখানে কেবল সাংখ্য-নিষ্ঠা বা ভক্তির স্বতন্ত্র সমর্থন বিবক্ষিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরস্পর-স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে; কিন্তু এখন বুঝা যাইবে যে, এই মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) কাল্পনিক ও মিথ্যা। তাঁহারা বলেন যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে তিনটী পদ আছে এবং গীতার অধ্যায়ও আঠারো; তাই, "তিন-ছয় আঠারো" এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় অধ্যায়ের তিন সমান খণ্ড করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বম্' পদের, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'তৎ' পদের এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'অসি' পদের বিচার করা হইয়াছে। এই মতকে কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিবার কারণ এই যে, গীতায় কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের বিবৃতির বাহিরে গীতায় আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শী পক্ষই এক্ষণে আর দাঁড়াইতে পারে না।

ভগবদ্গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের সঙ্গতি সহজে অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবর্জ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-দৃষ্টিতে করা আবশ্যক, এবং তাহা হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, যে তত্ত্ব পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কখনও ব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গোচর) হয়, আর কখন বা অব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তাহার পর, এই দুই স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই নিরূপণে করা আবশ্যক হয় সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল তাহারও নির্ণয় করা অতি আবশ্যক হয়। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানো আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারো অধ্যায়ের যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার মোটেই করা হয় নাই এ কথা আমি বলি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠা স্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল বুঝিয়া গীতার আঠারো অধ্যায়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে যে সমান ভাগ-বণ্টন করা হইয়া থাকে তাহা উচিত নহে; কিন্তু জ্ঞান-মূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগরূপ একই নিষ্ঠা গীতার প্রতিপাদ্য; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান বা ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদ্গীতায় আছে তাহা এক কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পূর্ত্তি ও সমর্থনার্থ আনুষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম্মযোগের পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য কথিত জ্ঞানবিজ্ঞানের অধ্যায়-ওয়ারী বণ্টন গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপে করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক্।

সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিচার আরম্ভ করিয়া ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, যে এই সমস্ত সৃষ্টিকে—পুরুষ ও প্রকৃতিকে—আমারই পর ও অপর স্বরূপ জানে, এবং যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করিয়া আমাকে ভজনা করে, তাহার বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্গতি দিই; এবং পুনরায় তিনি আপন স্বরূপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত কর্ম্ম, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম আমিই, আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। তাহার পর, অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত কি, তাহার অর্থ আমাকে বল, অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শব্দের অর্থ বলিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকে আমি বিস্মৃত হই না। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী বা অক্ষর তত্ত্ব কি; সমস্ত জগতের সংহার কখন ও কিরূপে হয়; এবং পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়,

এবং জ্ঞান ব্যতীত শুধু কাম্য কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধ্যায়েও ঐ বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অনন্যভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ বা রাজমার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্যা বা রাজগুহ্য বলে। তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মমার্গের এই প্রধান তত্ত্ব ভগবান বলিতে বিস্মৃত হন নাই। উদাহরণ যথা :— "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ" এই জন্য সর্ব্বদা নিজের মনে আমাকে স্মরণ রেখো এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৮. ৭); আবার "সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে" এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৯. ২৭, ২৮)। সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা আমারই রূপ, উপরে এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়া অর্জ্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বস্তু আমারই বিভূতি'। অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে একাদশতম অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া (আমিই) পরমেশ্বর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এই কথার সত্যতা অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া এবং 'সমস্ত কর্ম্ম আমিই করাইতেছি' অর্জ্জুনের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই বলিলেন যে, "প্রকৃত কর্ত্তা তো আমিই এবং তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ কর" (গী. ১১. ৩৩)। সমস্ত জগতে একই পরমেশ্বর আছেন ইহা এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও অনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত স্বরূপকেই মুখ্য মানিয়া বর্ণন করা হইয়াছে যে,"আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকেরা আমাকে ব্যক্ত মনে করে" (৭. ২৪); "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" (৮. ১১) বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলে; "অব্যক্তকেই অক্ষর বলে" (৮. ২১); "আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া আমি মনুষ্যদেহধারী এইরূপ মূঢ় লোকেরা মনে করে" (৯. ১১); "বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রেষ্ঠ" (১০. ৩২); এবং অর্জ্জুনের কথন অনুসারে "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ" (১১. ৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 'পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে ব্যক্তের অথবা অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে'? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা সুগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগবদ্ভক্তের অবস্থার বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র খণ্ড না করা হইলেও, সপ্তম অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান এই দুই পৃথক্ বিভাগ সহজেই হয়, এইরূপ কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতও যে সত্য নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সপ্তম অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভক্তি হইতে নহে। এবং যদি বলা যায় যে,দ্বাদশতম অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা শেষ হইয়াছে, তবে আমি দেখি যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তিরই এই উপদেশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা যাহারা আমার স্বরূপ অবগত হয় নাই তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার ধ্যান করিবে" (গী. ১৩. ২৫), "যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সে-ই ব্রহ্মীভূত হয়" (১৪. ২৬), "যে আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্তি করে" (গী. ১৫. ১৯), এবং শেষে অষ্টাদশতম অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে, "সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি আমাকে ভজনা কর" (গী. ১৮. ৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র, ভগবানের যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া (৪. ৩৪-৩৭) সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক ষড়ধ্যায়ীর আরম্ভে ভগবান বলিতেন না যে, সেই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' তোমাকে এখন বলিতেছি (৭. ২)। ইহার পরবর্ত্তী নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষাবগম্য ভক্তিমার্গের কথা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু অধ্যায়ের আরম্ভেই "বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি" (৯. ১) এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের মধ্যেই গীতোক্ত ভক্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু একাদশতম অধ্যায়ের আরম্ভেই অর্জ্জুন তাহাকেই 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন (১১. ১); এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে

মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তস্বরূপ শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিধান আছে, ইহাও উপরে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন এই প্রশ্ন করিলেন যে, উপাসনা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হইবে? তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইরূপ উত্তর দিয়া ভগবান ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 'জ্ঞানের' কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভের ন্যায়, চতুর্দ্দশতম অধ্যায়ের আরম্ভেও বলিলেন যে, "পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" (১৪. ১)—পুনর্ব্বার তোমাকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিয়া বলিতেছি। এই জ্ঞানের কথা বলিবার সময়, ভক্তির সূত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভক্তির কথা পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা করিয়া বলা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই দুই-টিকে একত্র গাঁথা হইয়াছে। ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা বলা সেই সেই সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততায় ভ্রান্ত উক্তি; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তি-মার্গেও আবশ্যক হয়; কিন্তু ব্যক্ত-উপাসনাতে (ভক্তি-মার্গে) আরম্ভে ঐ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩. ২৫), তাই, ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং সাধারণত সকল লোকে-রই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯. ২), এবং জ্ঞানমার্গ (বা অব্যক্তোপাসনা) কষ্টকর (১২. ৫)—ইহা ছাড়া এই দুই সাধনের মধ্যে, গীতা আর কোন ভেদ করেন নাই। পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিকে সম করা—কর্ম্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহা এই দুই সাধনের দ্বারা সমানই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্তোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, দুই-ই ভগবানের সমান গ্রাহ্য। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার ন্যূনাধিক আবশ্যকতা থাকায়, চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়া (গী. ৭. ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। যাই হোক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা যখন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গক্রমে কোন অধ্যায়ে ব্যক্তো-পাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত উপাসনার বিশেষ বর্ণনা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ সন্দেহ যেন না হয় যে, এই দুইটী পৃথক পৃথক, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ব্যক্তস্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্তের বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে ভগবান ভক্তির আবশ্যকতা বলিতে ভুলেন নাই। এখন বিশ্ব-রূপের ও বিভূতির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ায় এই তিন চার অধ্যায়কে (ষড়ধ্যায়ীকে নহে) মোটামুটিভাবে 'ভক্তিমার্গ' নাম দেওয়া যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যাহাই বল না কেন, ইহা নিশ্চিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক করা হই-য়াছে, না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থ মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের জ্ঞান হওয়া চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক বা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক, সুগমতা ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশতম অধ্যায় পর্য্যন্ত, সমস্ত বিষয়েরই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' বা 'অধ্যাত্ম' এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

যাক; পরমেশ্বরই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জুনের 'চর্ম্মচক্ষুর' প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দিলে পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মারূপে অবস্থিত এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্র-জ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরেরই (পরমাত্মার) জ্ঞান এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পরব্রহ্মের "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' নামক সাংখ্যবিচারে অন্তর্ভূত হইয়াছে; এবং শেষে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' ভেদ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বগত নির্গুণ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষু'র দ্বারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। তথাপি তাহার মধ্যেও কর্ম্মযোগের এই সূত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, "সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতি করে, আত্মা কর্ত্তা নহে—ইহা জানিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না" (১৩. ২৯); এবং "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি" (১৩. ২৪) ভক্তির এই সূত্রও বজায় রহিয়াছে। চতুর্দ্দশতম অধ্যায়ে এই জ্ঞানের কথা সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে বর্ণন করা হইয়াছে যে, একই আত্মা বা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র থাকিলেও সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির গুণসমূহের ভেদ প্রযুক্ত জগতে বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্ত্তা নহে উপলব্ধি করিয়া, ভক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের সেবা করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রিগুণাতীত কিংবা মুক্ত। শেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উপর স্থিত-

প্রজ্ঞ ও ভক্তিমান পুরুষের অবস্থার সমানই ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিগ্রন্থসমূহে পরমেশ্বরের কথন কথন বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভে তাহারই বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, 'প্রকৃতির বিস্তার বলে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়; এবং শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম তাঁহাকে জানিয়া তাঁহাকে 'ভক্তি' করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। ষোড়শতম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আসুরী সম্পত্তিবিশিষ্ট, এইরূপ দুই ভেদ হয়; এইরূপ বলিয়া, তাহাদের কর্ম্ম কিরূপ এবং তাহারা কোন্ কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলে পর সপ্তদশতম অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য প্রযুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহা শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি কর্ম্মের মধ্যেও কিরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, 'ওঁতৎসৎ' এই ব্রহ্ম নির্দ্দেশের মধ্যে, 'তৎ' এই পদের অর্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম, এবং 'সৎ' এই পদের অর্থ 'ভাল কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম,' এবং এই অর্থ অনুসারে ঐ সাধারণ ব্রহ্মনির্দ্দেশও কর্ম্মযোগেরই অনুকূল। সারকথা, সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশতম অধ্যায় পর্য্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে চতুর্দ্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন—তুমি তাঁকে বিশ্বরূপদর্শনেই উপলব্ধি কর কিংবা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞও তিনি এবং ক্ষর জগতে অক্ষরও তিনি; তিনিই দৃশ্যজগৎ ভরিয়া আছেন এবং তাহারও তিনি বাহিরে কিংবা অতীত; তিনি এক হইলেও প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নানাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এই মায়া হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, তপ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্ত্বের উপাসনার দ্বারা—আবার সেই উপাসনা ব্যক্তেরই হউক বা অব্যক্তেরই হউক—প্রত্যেকে আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া সেই নিষ্কাম, সাত্ত্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবহার জগতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে হইবে। এই জ্ঞানবিজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর প্রতিপাদিত করিয়াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্তদশতম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই প্রকরণে দিয়াছি—অধিক বিস্তৃতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের যে "জ্ঞানবিজ্ঞান" আবশ্যক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ের নিরূপণ করা হইল যে অধিকার-ভেদানুসারে ব্যক্তের কিংবা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে পর, বুদ্ধি স্থৈর্য্য ও সমতা প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও শেষে তাহার দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। ইহারই সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেরও বিচার করা হইয়াছে। তথাপি বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশয় ছাড়িয়া লোকসংগ্রহার্থ আমরণ কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা ভগবান্ নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন (গী. ৫. ২)। তাই স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সন্ন্যাসাশ্রম' এই কর্ম্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ এবং কর্ম্মযোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এইরূপ এক সংশয় মনে উপস্থিত করিয়া 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ'—এই দুয়ের রহস্য কি, অর্জ্জুন অষ্টাদশতম অধ্যায়ের আরম্ভে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল অর্থ 'ত্যাগ করা' হওয়ায় এবং কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও ফলাশা ত্যাগ করা হইয়া থাকে বলিয়া কর্ম্মযোগ তত্ত্বতঃ সন্ন্যাসই; কারণ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়া ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্মৃত্যুক্ত তত্ত্ববুদ্ধিকে নিষ্কাম রাখা—কর্ম্মযোগেও বজায় থাকে। কিন্তু ফলাশা চলিয়া গেলে স্বর্গলাভেরও আশা না থাকায় যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা কি, এইরূপ আর এক সংশয় এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হওয়ায় তাহাও অন্য কর্ম্মের সঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া লোক-সংগ্রহার্থ যজ্ঞচক্র বজায় রাখা আবশ্যক। অর্জ্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া হইলে পর, প্রকৃতি-স্বভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিয়া গুণ-বৈচিত্র্যের বিষয়টা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার পর স্থির করা হইয়াছে যে, নিষ্কাম

কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ত্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্তিসম্ভূত সুখ এবং "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আত্মৈক্যজ্ঞানই সাত্বিক বা শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্ব অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যেরও উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত কর্ম্ম সাত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়া শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ করে। শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় তাহা ছাড়িব মনে করিলেও ছাড়া যায় না; তাই, পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা ইহা বুঝিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক; আমিই সেই পরমেশ্বর, আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবান গীতার প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোক ও পরলোক এই দুয়েরই বিচার করিয়া জ্ঞানবান ও শিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত 'সাংখ্য' ও 'কর্ম্মযোগ', এই দুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের নির্ণয় অনুসারে যে কর্ম্মযোগের মহত্ব অধিক, যে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, যে কর্ম্মযোগের আচরণবিধির বর্ণন পরবর্ত্তী এগারো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্যন্ত) পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানপূর্ব্বক সবিস্তর নির্ণয় করা হইয়াছে, এবং ইহা বলা হইয়াছে যে ঐ বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া শেষে মোক্ষলাভ হয়. সেই কর্ম্মযোগের সমর্থন অষ্টাদশতম অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে; এবং মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হইয়া পরমেশ্বরার্পণ-পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে স্বধর্ম্মানুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম করিবার যে এই যোগ বা যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবৎপ্রণীত উপপাদন অর্জ্জুন যখন শুনিলেন, তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া—কেবল ভগবান্ বলিতেছেন বলিয়া নহে, কিন্তু—কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই গীতার আরম্ভ হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপ হইয়াছে (গী· ১৮· ৭৩)।

(ক্রমশঃ)

Brahmo Dharma.

PART I.

CHAPTER I.

1. The divine spark of the knowledge of Brahma dwells within every heart; in every soul the infinite good will of Brahma is written in indelible characters. We have only to kindle this flame by the contemplation of universal phenomena, when God the Infinite Good stands revealed to us. He has impressed His holy image of good on all material things and on the mind of man. Those wise and fortunate men,—sinless and noble-minded,—who have striven and succeeded in realising this, they know Brahma; and those who, after such realisation, impart their knowledge to others, they are the exponents of Brahma. To know and to tell others about Brahma, it is not necessary to belong to any particular age, race or country. The men of God of all countries have a right to discourse upon Brahma. In this first part of the Brahmo Dharma are collected those eternal verities and self-evident truths, which have been taught by the ancient sages of India with regard to Brahma. That is why it begins with the words. "So say the Brahmavadins."

2. He from whom all things moveable and immoveable have sprung, upon whom all things depend for their existence, not an atom of which would remain, if He so wills it,—He is Brahma, He is Truth, He is our Lord. That Almighty Lord's will is true. His resolves are true; as He wishes, so it comes to pass. That Perfect Being from whose energy all things have been created and each received their respective forces,—should He wish to destroy them, then all these things together with their forces, would become merged in His energy and revert to Him,—not a sign of them would be seen anywhere. God alone is the creator, preserver and destroyer. We can, indeed, fashion some wonderful machine, if we are given certain things, by examining their properties and combining them in due proportion; we can also easily destroy it; but we do not possess the power of creating or destroying one single grain of sand. The

one and absolute God alone has the power of creation, preservation and destruction.

3. That indefinable Lord who is Creator, Preserver and Destroyer, has no particular name. Those ancient Brahmavadi sages, who have tasted the unalloyed bliss of feeling the presence of that supremely great, all-pervading all-indwelling benign Being within their hearts, they have pronounced Him to be joy itself. When our souls melt and sink into the ineffable beauty of his love, then we too cannot but call him Joy.

4. That Lord, who is the infinite source of wisdom, is not a finite object; He is neither mind nor matter, therefore the mind cannot grasp Him; and since the mind cannot grasp Him, words also cannot express Him. The mind tries to think of Him, and desists; words try to describe Him, and fail. That Infinite Being can only be defined as the mind of minds, the word of words, the conscious cause and refuge of all things. He who enjoys the heavenly bliss of seeing constantly within his soul this indefinable and all-pervading joyous entity,—all his desires are at an end. He rests satisfied in union with his beloved, and has attained fulfilment. He becomes His willing and devoted slave, and is diligent in the performance of deeds that please Him. He never fails to act thus, through fear of contumely; insufferable indignities, undeserved reprouches, or irrepressible tyranny. It is an easy matter for him to sacrifice his life in fulfilling the behests of his beloved,—so how can he know fear? He has been released from fear by placing his life in the hands of Him who gave it,—and for him even dread Death the destroyer holds no terrors.

5. That benign Being, by reaching whose fount of love His creatures are immersed in ecstatic happiness,—what can words call Him but divine joy.

6. It is because this Supreme Spirit exists, that this incomparable universe has been created, and all creatures have obtained their means of sustenance. Without Him all this could never have been done. If that Supreme Holiness, the creator and refuge of all things, had not created this world and established such perfect law and order, then where would be the earth and the heavens, all these living and moving creatures and their doings, all happiness and prosperity? He it is who scatters delight among all creatures. We are blest in the enjoyment of every kind of pleasure which the beneficent protector of the universe has ordained for our happiness from each particular thing. The sight of nature's beauty, the taste of good food, the benefits of parental affection and loving friendship, the cultivation of knowledge, the performance of righteous deeds,—and all suchlike things from which we derive various kinds of pleasure by various means,—everything is by His grace. Oh, how great is His compassion! Not satisfied only with granting us all kinds of material joys, if we so beseech Him, He gives us even Himself, and thus soothes our souls, fills our minds, and satisfies our longing.

To those calm-minded saints who, unsatisfied with the pleasures of this world, desire Him night and day, He inwardly appears without delay, wipes away the sorrowful tears from their eyes, and makes the withered lotus of their hearts bloom again with plentiful showers of divine bliss. Ah! he alone knows His glory, who has even for a moment enjoyed the unalloyed bliss of seeing that immortal and perfect Being within his soul.

7. Like the frightened child which secures itself from fear in its mother's lap, so are we safe from the terrors of this fearsome world by taking refuge in the all-embracing lap of that divine Being. Free from all fear, and knowing Him to be our only friend and guardian we then dedicate ourselves to that supreme Lord, who sees all yet is not seen, who contains all yet is not contained, who is the refuge of all; and obedient to His commands, we walk in His appointed path with dauntless hearts.

8. He who believes not in the goodness of God, and who knows not His real intentions, even though he live in this well-ordered and stable universe, yet is he a prey to various fears, like one imprisoned in a dark cell; but he who sees reflected through the universe the holy light of that supreme being, the source of all goodness,—he no longer knows any fear.

9. Of all desirable states in the next world, God is the highest; to attain Him is virtue's last reward. Of all riches, God is the most precious; he who has gained this wealth, thinks nothing of any other possesion. Of all worlds, God is our best refuge; he who dwells in Him, covets not the fleeting and imperfect joys of any frail and finite world. Of all delights, the attainment of God is our greatest delight; compared to this ineffable bliss, all other earthly delights are but infinitesimal, yet all creatures live upon this infinitesimal atom of delight.

আদর্শ
বা
দাদাঠাকুর

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল-অপরাহ্ন।

(দাদাঠাকুরকে পুষ্পমাল্যচন্দনাদিতে সজ্জিত করিয়া সকলের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

পুণ্যোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ললাটে
অঙ্কিত করি গৌরবে;
অপ্রধৃষ্য, বিজয় চিহ্ন
মণ্ডিত মহা বৈভবে।
মহিমাদীপ্ত ময়ূখমাখা
অবিনশ্বর যশোছবি আঁকা
ধরিয়া মহতী কীর্ত্তি-পতাকা
এসেছ জীবন-আহবে
অদ্ভুত তব কর্ম্ম-যজ্ঞ
বিস্মিত হেরি মনুজ বর্গ
আপনি নামিয়া এসেছে স্বর্গ
মর্ত্ত্যে তোমারি উদ্ভবে।
বঙ্গগগনে দিব্য সূর্য্য
বিশ্ববাসীর হৃদয় পূজ্য
মহাসমারোহে বাজায়ে তূর্য্য
বরিব তোমারে উৎসবে।
হে মানি, তোমারে মহৎ মান
আপনি যে "মান" করেছে দান
সে মানে করিতে মহা মহীয়ান
দীনের কি দান সম্ভবে?

দাদা। দ্যাখ্ তোরা অমন কর্ব্বি তো আমি চলে' যাবো।

সেবা। দাদাঠাকুর আজ একটু অবাধ্য হব।

দাদা। তা হলে' মার খাবি। তোরা অমন কর্‌ছিস্ কেন? ছেলেরা কৈ? আমায় তাদের কাছে যেতে দে। তারা তোদের মত আমায় নিয়ে অমন করবে না। তাদের কেবল আমোদ—আমার তাই ভালো লাগে। এ সব মান দেওয়া, গণ্ডগোল,—এ হলে' আমি ছুটে পালাব।

সেবা। এ আমরা আজ কর্‌বই।

দাদা। শেষটা কিন্তু দৌড় দেব। এই দৌড় দিলুম বুঝি।

সেবা। দৌড় দিয়ে আর পালাবার যো নেই। যে যায়গায় বসায়েছি, সেখান দিয়ে কেউ যেতে পারে না।

(সার্ব্বভৌম, ন্যায়রত্ন ও তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

তর্ক। দাদাঠাকুর, তোমাকে আমরা এতদিন চিন্‌তে পারিনি। তুমি মহৎ আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষমা কর।

দাদা। (উঠিয়া) আমি আপনাদের দাস (পদধূলি-গ্রহণ)। সেবাব্রত, এ সব গণ্ডগোলের মূল তুই।

সেবা। (হাসিতে হাসিতে) দোষ আমার না আপনার?

তর্ক। দাদাঠাকুর, তুমি আজ জগতে এক মহৎ আদর্শ দেখালে। এখন প্রার্থনা কর, বিশ্ব যেন এ আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে।

দাদা। আমায় ও সব বলে' লজ্জা দিবেন না। আমি অধম। আপনাদের দাসানুদাস। আমি কি করেছি? কি কর্‌তে পারি? যার কর্ম্ম তিনি করেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।

তর্ক। তোমায় পদধূলি দেব? না দাদাঠাকুর, ও কথা বলো না। তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে, যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ধন্য হ'তে পারি। দাদাঠাকুর ধর, আজ এই শ্রদ্ধাচন্দনাক্ত মাল্য গ্রহণ কর।

(গলায় মালা পরাইয়া দিলেন ও দাদাঠাকুর প্রণত হইলেন)

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিম। দাদাঠাকুর (কাঁদিয়া ফেলিল)

দাদা। (ছুটিয়া গিয়া বক্ষে ধরিলেন) রহিম, রহিম, ভাই তুই আয়, আমার বুকে আয়। তুই আমায় আলিঙ্গন কর; রহিম আমি তোকে একটু কালের জন্যও

ভুলতে পারিনি। একি রহিম, তুই তো আর সে রহিম নেই! তুই যে বড় শুকিয়ে গেছিস্। আপনারা দেখুন, এই সেই রহিমদী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না বলে' সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

তর্ক। এমন মানুষ! এস ভাই আমরা সবাই তোমাকে আলিঙ্গন করব। তোমারো গলায় আজ মালা দেব। (মাল্য দান)

রহিম। আমায় অত করবেন না। সইতে পারবো না। দেমাক হবে। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!!

দাদা। আর আমায় ডাকলে কি হবে? চিনে ফেলেছে। লুকোচুরি আর ক'দিন চলে?

(দ্বারদেশে নিধিরাম ও ফেলারামের প্রবেশ)

নিধি। আমরা আস্তে পারব তো?

দাদা। কে আসচে? দেখুন দেখুন। (উঠিয়া) এস ভাই, সবাই এস, কারো আস্তে বাধা নেই।

(নিধিরামের প্রবেশ)

দাদা। ও কে—নিধিরাম? এসো ভাই (আলিঙ্গন)

নিধি। দাদাঠাকুর! (পায়ের কাছে দুইটী পেয়ারা রাখিয়া)

দাদা। ও আবার কি?

নিধি। এই দুইটী পাকা পেয়ারা। দাদাঠাকুর এই গাছের পেয়ারা খেয়ে তুমি একদিন বড় খুসী হয়েছিলে। তুমি চলে' গেলে পর আর এ গাছের তলায় যাইনি। গাছের দিকে চাইলে প্রাণ কেঁদে উঠত। তুমি আসবে বলে' এ দু'টো বড় কষ্ট করে' রেখেছি।

দাদা। নিধিরাম, এত স্নেহ, এত ভালবাসা দিয়ে কি তোরা আমায় পাগল করে' দিবি? ঠাকুর, এরা আমায় এত স্নেহ করে কেন? এদের আমি কি দেব? এদের নিয়ে আমি কি করব?

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। (দুর্ব্বলভাবে যষ্টি ভর করিয়া) দাদাঠাকুর কৈ? (কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না। সবাই মুখ ফিরাইয়া রহিল)।

দাদা। (উঠিয়া) এই যে। আসুন। (প্রণত হইলেন)

ধন। আমি আসতে কি পারব? দাদা ঠাকুর, কৈ তুমি? আমি প্রায় অন্ধ হয়েছি। আমার কাছে এস।

(দাদাঠাকুর নিকটে গেলেন)

ধন। আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

দাদা। আদেশ করুন।

ধন। বলতে পারব তো? আমি কি বলবার মুখ রেখেছি?

দাদা। সে কি!

ধন। দাদাঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর। আজ একটু কালের জন্য ভুলে যাও—আমি পীড়নকারী আর তুমি পীড়িত। আজ আমি শুধু পাতকী, লাহিড়ি ধনদাস আর তুমি আমার ইষ্টদেব। দাদাঠাকুর, আজ তোমার কাছে এসেছি প্রাণের আগুন নিভাতে। বল আমার ক্ষমা করবে কি না?

দাদা। আপনি কোনো অপরাধ করেন নি। কোনো অত্যাচার করেন নি।

ধন। অপরাধ করি নি? না না আমায় ক্ষমা করো না। আমি ক্ষমার অযোগ্য। আমায় শাস্তি দাও,র আমি অপরাধী, আমায় শাস্তি দাও। ক্ষমায় প্রাণে আগুন আরো জলে' উঠে। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় শাস্তি দাও। (পদধারণোদ্যত)।

দাদা। আঃ এ কি কচ্ছেন? আমায় অপরাধী করবেন না—আপনি আমার পূজনীয়।

ধন। দাদাঠাকুর, তুমি কি মানুষ? মানুষে এত সইতে পারে? এত বিপদে মানুষ স্থির থাকতে পারে? মানুষে বাল্যকালাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এমন অবিরল আনন্দে থাকতে পারে? মানুষে এত কাজ করতে পারে? এত জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি কি মানুষের থাকে? না দাদাঠাকুর, তুমি মানুষ নও। আজ আমি অনুতপ্ত হয়ে' তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি, তুমি দেবতা আমায় শাস্তি দাও।

দাদা। রায়মশাই, কে কার উপরে অত্যাচার করে? সবি ঠাকুরের লীলা। আপনার চোখের জলে আপনার প্রাণের কালী মুছে যাবে। কেন এ মূল্যবান মানব-জীবন চিরকাল অনুতাপদগ্ধ করে রাখবেন? মানুষ মিথ্যা বলে, চুরি করে, নরহত্যা করে; তবু সে মানুষ। আর এই বৃক্ষাদি জড় পদার্থ—এরা চুরি করে না, মিথ্যা কথা কয় না; তবু এরা জড় পদার্থ। মানুষ ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যে ভগবানের প্রতিনিধি। কেন তবে মূল্যবান মনুষ্যজীবন নষ্ট করতে চাচ্ছেন? হয়েছে না হয় একটা অপরাধ, তা বলে' কি সে চিরদিন কেবল অনুতাপ করতে থাকবে? প্রেমময় ঠাকুরকে ডাকুন। পিতার কাছে সন্তান কি চিরদিন তাড়িত হয়ে থাকতে পারে? সখা কি সখাকে একটা অপরাধের জন্য চিরদিন দূরে ফেলে রাখতে পারে? তেমনি ভগবান—যিনি আমাদের আপনার হ'তে আপনার, তিনি কি কাউকে দূরে রাখতে পারেন? তিনি যে না ডাকলেও আপনি কাছে আসতে চান? কেন এ জীবন নষ্ট করবেন?

ধন। আমার জীবন একটা মরুভূমি, একটা শ্মশান,

একটা হাহাকার। এখন আমি জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, অন্ধপ্রায়, রুগ্ন, বৃদ্ধ। রাস্তার ছেলেরা দেখলে আমায় টিট্‌কারী দেয়। মনস্তাপে পাগল হয়ে গেছি। এমন জীবন কেউ রাখতে পারে?—উঃ!

দাদা। স্থির হোন। ঠাকুরের দয়া হয়েছে। পিতা অবাধ্য পুত্রকে শাস্তি দেন, সে শাস্তিতে দুঃখ নেই—তা ভালোর জন্য। আর আপনার দুঃখ নেই। তিনি আপনাকে ডাক দিয়েছেন, আপনার পানে মুখ তুলে চেয়েছেন। কিছু ভয় নাই আর। এ জীবন অনন্ত কাল হ'তে আছে, অনন্ত কাল থাকবে। কালে এ পাপ ধুয়ে যাবে। তাঁর দয়া যে অসীম। মানুষের আর পাপ করবার শক্তি কতটুকু?

ধন। মরতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সাহস হয়নি। মরতে আমার ভয় করে: কি জানি এ জীবনের পরেও যদি কিছু থাকে।

দাদা। হাঁ আছে; অনন্তকাল অনন্ত জীবন আছে। তাতে ভয় কি? বরং আশার কথা। বিস্তৃত উন্নতি-ক্ষেত্র আপনার সম্মুখে। আমরা যে অসীমের শিশু, আমরা কি এমন ছোট হয়ে এখানে থাকতে পারি? আমাদের পবিত্র, নির্ম্মল শুদ্ধ হতেই হবে। জাগ্রত করুন, আপনার আত্মার ভিতরের সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করুন। জানবেন, আমাদের পবিত্রতাই স্বাভাবিক; অপবিত্রতা অস্বাভাবিক। আত্মার এ অকারণ দৈন্য পরিত্যাগ করুন, সেই মহাশক্তি জাগ্রত করুন।

ধন। জুড়িয়েছে! আমার বুক জুড়িয়েছে! এমন আশার কথা আর তুমি বিনা আমায় কে বলতে পারত? আমার প্রাণ যে গলে' যাচ্ছে। দাদাঠাকুর আমি এ দুঃখ জানাই কারে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ, আজ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ এই যে আপনাকে পেয়েছি।

ধন। দাদাঠাকুর আমার একটা অনুরোধ—

দাদা। বলুন—

ধন। রাখবে তো?

দাদা। রাখব।

ধন। তোমার পূর্ব্ব সম্পত্তি তোমায় সব দিলুম। আর আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার হাতে দিলুম। তুমি সৎকার্য্যে ব্যয় কর। আর আমার হতভাগ্য ছেলেটা ——কুলভূষণকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আজীবন তোমার কাছে রেখো। আমি আজ হতে তোমার কাছে কাছে থাকব।

দাদা। আমার আর অর্থের প্রয়োজন নাই। বেশ আছি। আপনার এ সম্পত্তি জগতের হিতে ব্যয়িত হবে। গাও ভাই সবাই মিলে তাঁর জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরস্থ কানন। কাল—সন্ধ্যা।

(দাদাঠাকুর গাহিতে ছিলেন)

গীত।

মরি কি আনন্দ জাগে পরাণে
চিদানন্দ ব্রহ্মধ্যানে
মুগধ মুখর উদার গীতি
নীরবে ছুটে অসীম পানে।
প্রকাশে বিরাট্ বিমল জ্যোতিঃ
কোটি রবি শশী তারকা দ্যুতি
শান্তি সৌম্য মধুর ভাতি
কান্ত হৃদয়-গগনে।
মুদিত লোচন তবু হেরে সব
নাহি মন শুধু জ্ঞানে অনুভব
নাহিক শ্রবণ তবু শোনে রব
ভরা অভিনব তানে।
একিরে বিপুল মহান্ দৃশ্য
আমা-মাঝে আমি বিরাট্ বিশ্ব
কেবা গুরু আর কোথা বা শিষ্য
কেবা জানে কারে জানে।

দাদা। সন্ধ্যা হয়ে' আস্‌চে, ঐ দিগন্তবিতত শ্যাম বনানীর উপরে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দিয়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কি করুণ-গম্ভীর মহিমময় দৃশ্য। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আস্‌চে। এখনি বিশ্বের এ আলোক নিভে যাবে। ঘোর তমসাবৃত হবে। আবার প্রভাতে ধরা আলোক-স্পর্শে হেসে উঠবে। এই তো বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন ক্রমাগত হ'চ্চে। হে অনাদি অনন্তদেব, এস; এমনি কালরাত্রির মত আগে একবার বিশ্ব-সংসারকে গ্রাস কর; তোমার ভীষণ বজ্রাগ্নিতে যত ভেদ, বিবাদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সমস্ত দগ্ধ কর। তার পর তারে আবার এক নবীন প্রভাতে আলোকোজ্জ্বল, হাস্যমুখরিত, পুণ্য-প্রেম-প্রীতিবিলসিত কর। এস হে কালরূপী মহাপুরুষ, এবার ভীষণ হতে ভীষণতর হ'য়ে এস, এই পতিত হিন্দু-সমাজ তোমাকে চাচ্ছে, এবার প্রলয়ের বেশে এসে তার উপরে পতিত হও, একটা প্রবল প্লাবনে এসে উচু নীচু

সব সমান ক'রে দাও। আজ এ সন্ধ্যাগগনতলে দাঁড়িয়ে তোমায় এ কি মূর্ত্তিতে দেখ্‌ছি রাজাধিরাজ!

(গাহিতে গাহিতে পুনর্ধ্যানস্থ হইলেন)

গীত।

রাজ-রাজেন্দ্র রাজে
বিরাট্ ব্যোম মহাশূন্য সিংহাসন মাঝে।
চন্দ্র সূর্য্য করিছে আরতি
অনিল বহিছে যশোভারতী
বিশ্ব করিছে চরণে প্রণতি
নিখিল-ভুবন-রাজে।
অগণন কত সৌর লোকে
গাহে বন্দনা প্রেমে পুলকে
গম্ভীরমন্দ্রে দ্যুলোকে ভূলোকে
মঙ্গলারতি বাজে,
স্থাবর জঙ্গম দেশ কাল পাত্র
জনম-মরণধারা দিবস রাত্র
স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণু তন্মাত্র
অরূপ-স্বরূপমাঝে।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। গুরুদেব! (নিকটে আসিয়া) একি ধ্যানস্থ! আ মরি মরি! একি অপূর্ব্ব ধ্যানসমাহিত মূর্ত্তি। সেবাব্রত, এ সময় একবার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করে ধন্য হও। (সেবাব্রত পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দাদাঠাকুর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।)

দাদা। কে?

সেবা। আমি।

দাদা। সেবাব্রত? (পুনর্ধ্যানস্থ)

সেবা। একি আবার ধ্যানস্থ?

দাদা। সেবাব্রত, এস একবার—তাঁর নাম গান করি, দেখ কি সুন্দর সন্ধ্যা।

(উভয়ে চাহিলেন)

গীত।

একি আনন্দ পুলক বেদনা হৃদয়নাথ হৃদয়পুরে
মরমের বাণী উঠিল বাজিয়া মোহন মধুর নবীন সুরে
কি প্রেম মদিরা পান
পরাণে জাগিল নবীন প্রাণ
জ্ঞানে বিকশিত নবীন জ্ঞান
একি অনুভূতি হৃদয় জুড়ে।
সকল ইন্দ্রিয় নয়ন মাঝে
আমার সকলে সবার সাজে
সকল জুড়িয়া মুরতি রাজে
ভিতরে বাহিরে নিকটে দূরে।

সেবা। আপনাকে আজ একি মূর্ত্তিতে দেখ্‌চি গুরুদেব?

দাদা। কি দেখ্‌ছো?

সেবা। একটা সূর্য্যের মত; একটা হোমশিখার মত। এমন তো আর কখনো দেখিনি! আপনি যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন, তখন দেখেছি এক আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির সঙ্গেই আমরা বিশেষ পরিচিত। কিন্তু আজ একি ভাবে দেখ্‌ছি! এ নির্জ্জনে বসে' কি কর্চ্ছিলেন গুরুদেব?

সেবা। ধ্যান কর্চ্ছিলাম।

সেবা। কিসের ধ্যান? কি ধ্যান? কার ধ্যান?

দাদা। ধ্যান-রহস্য তোমায় আরো কিছুদিন পরে বলুব।

সেবা। ধ্যানের কথা শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে।

দাদা। তবে শোন। তার আগে একবার এই সন্ধ্যাকাশের প্রশান্ত মাধুরী, এই কাননের পবিত্র শান্তিতে স্নান করে' তোমার দেহ মন স্নিগ্ধ করে' নও, তারপর স্থির চিত্তে বসে' শোনো। তোমাকে এ শুভ লগ্নে দীক্ষিত করব; তোমার সময় হয়েছে।

(সেবাব্রত স্থিরভাবে বসিলেন)

দাদা। এখন ভাবো, তুমি আত্মা; এই বিশ্বে আর কিছু নাই, মাত্র তুমি আছ। সেই আত্মার মাঝে জেগে আছেন সেই শুদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ। তিনি অনন্ত তিনি মহান্ নামরূপাদি বর্জ্জিত। তুমিই ধ্যাতা, তিনিই ধ্যেয়।

গীত।

কেবা করে কার আরাধন?
(যেন) আপনি পাতিয়া কাণ,
শোনা আপনার গান
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাকো বারে বারে কে দিবে সাড়া?
আপনারে নাহি চেন আপন-হারা
মুঠোর ভিতরে রাখি, মোহ বশে মুদি আঁখি
আঁধারে নিবায়ে বাতি খোঁজ হারাধন।
কেবা তুমি কেবা আমি সব আমি হই
আমাতেই আমি-তুমি ভিন্ন কেহ নই,
হয় শুধু তুমি থাক, নয় শুধু আমি রাখ
উভয়ের নহে একাসন।

সেবা। গুরুদেব, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আজ আমায় একি দিলে? এ আমার

কি দেখালে? এ যে এক অমৃতহ্রদে অবগাহন কর্চ্ছি! একি অমৃত পান কর্চ্ছি! একি চক্ষে দিব্য সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি! একি কর্ণে সুধাসঙ্গীত শ্রবণ কর্চ্ছি! আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ যে সৈন্তে পারি না! এ কোথায় ছিল? এ আমায় কি দেখালে? এ আমায় কি দিলে? গুরুদেব! গুরুদেব!

দাদা। আনন্দম্! সেবাব্রত!

সেবা। গুরুদেব!

দাদা। চল এখন যাই।

সেবা। গুরুদেব, এ অমৃত ফেলে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। আমি আর যাবো না। আমি এ আনন্দসুধা নিরবচ্ছিন্ন পান করব, এতদিন এর আস্বাদ পাইনি। আমি আর যাবো না।

দাদা। সেবাব্রত, তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘোর স্বার্থপরতা। যে আনন্দ তুমি পেয়েছ, চল তাই ঘরে ঘরে বিলোতে হবে। মনে কর বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের কথা। এ নিবিড় আনন্দ তাঁরা সম্ভোগ কর্চ্ছেন। কিন্তু তাঁরা এ আনন্দ একা ভোগ করেন নি। মানবের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। এ আনন্দকে দেহে প্রাণে সহজ করে নাও। বিশ্বপ্রেমে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার কর। বিশ্ব আপনার করে লও।

সেবা। তাতে যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে?

দাদা। তা হবে না, উপরে কাজ করবে; কিন্তু ভিতরে এ আনন্দ জমাট হয়ে থাকবে। আনন্দের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থাই ভালো। আরো দেখ, এ সময়ে এ যুগে কেবল ধ্যানধারণা নিয়ে থাকলে চলবে না। স্থূল কার্য্যও কর্ত্তে হবে। রজোগুণকে একটু জাগ্রত করতে হবে। আমাদের কার্য্য আদর্শ গৃহস্থ তৈরি করা, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক প্রেম। এর উদ্দেশ্য জগন্মঙ্গল, পরিণাম সমগ্র জগতের মুক্তি। আমাদের এ ধর্ম্মে জাতিবর্ণসম্প্রদায়ের কোনো ভেদ নাই। চল সেবাব্রত, মানবসমাজ আজ এই চায়; একবার জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ কর, যেন সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে, একটা শুভ সংবাদ, একটা মহাশান্তি চাচ্ছে।

সেবা। কাজ করে যাচ্ছি সত্য, কিন্তু জগৎ তো একটুকুও অগ্রসর হচ্ছে না।

দাদা। কাজ করো, বিচার কোরো না। তোমার কার্য্য তুমি কর। ফলাফলের অধিকারী আমরা নই। কাল সময়ে তার কার্য্য আপনি করবে। জগতে ভেদ চিরদিন থাকবে। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই জগতের রীতি; এ ভেদ, এ বৈষম্য দেখে হতাশ হয়ো না। এতে বহুদর্শিতা লাভ কর। ভেদ একভাবে কি অন্যভাবে চিরদিন আছে ও থাকবে। এ না হলে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকে না। বৈষম্যই সৃষ্টি। মহাসাম্য মহাপ্রলয়, চেয়ে দেখ জগতে একপ্রকার দুটি পদার্থ নেই। যে পরমাণুসমূহ অথবা যে পঞ্চতন্মাত্র জগতের উপাদান কারণ, তাও যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই প্রলয়; তার অসমান অবস্থা অর্থাৎ প্রকৃতির বিক্ষোভই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকলেই এ ভেদ থাকবে। একবার মহাপ্রেমে প্রাণ উদার কর, দেখবে ভেদের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য রয়েছে। সেই বিশ্ববীণার সুরে একবার সুর মিলাও দেখি।

সেবা। আপনি বলছেন কর্ম্মের কথা; তার সঙ্গে কি জ্ঞানভক্তির বিরোধ নেই?

দাদা। না, জ্ঞানভক্তিকর্ম্ম তিনটিই এক সূত্রে বাঁধা। বায়ু পিত্ত কফ অথবা সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের মত। তিনটি সংহত হয়ে জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হচ্চে। সেবাব্রত, একবার মনশ্চক্ষে জগতের ভবিষ্যৎপানে চাও দেখি! কি দেখছো?

সেবা। একটা দুর্জ্ঞেয়, অস্পষ্ট, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মহারহস্য।

দাদা। না সেবাব্রত, দুর্জ্ঞেয় নয়, অস্পষ্ট নয় বড় স্পষ্ট, এর চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছুই নেই। বর্ত্তমানই ভবিষ্যতের জনক, চেয়ে দেখ জগতের ভবিষ্যৎ এক মহামহিম আলোকোজ্জ্বল প্রদেশ—যেখানে চিন্তা বর্ণময়ী, কল্পনা কর্ম্মময়ী, আশা ফলবতী; যেখানে কেবল শান্তি, কেবল পবিত্রতা, কেবল আনন্দ, কেবল মধুরতা, যেখানে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর হাতধরাধরি করে চলেছে। একদিন পাপী তাপী পুণ্যবান্ সব একসঙ্গে এক মহাপুণ্যপূত শান্তিময় রাজ্যে মিলিত হবে। দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ সেবাব্রত, আর বল জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। জয় সচ্চিদানন্দ।

(যবনিকাপতন)

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

রাগিণী—জয়জয়ন্তী।

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
তবে সব কালো কি আলো হয়ে
ফুটবে না?
কাঁটার বন যে হৃদয় আমার—
ও তার গায়ে গায়ে কুসুমরাশি
লুটবে না?

শুষ্ক কঠিন মরুভূমি
জান আমার হৃদয় তুমি,—
সেই পাষাণ-পথে সহস্র-ধার
উৎস কি গো
ছুটবে না ?
তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
তবে তারার মালা আঁধারে কি
দুলবে না ?
গোপন প্রাণের বেদন-জ্বালায়
গভীর ধারে সুধার ধারা
গলবে না ?
তোমায় ভুলেই আছি আমি
কত যুগ যে হৃদয়-স্বামী ;
তুমি আমায় না জাগালে
এ মোহ-স্বপন
টুটবে না ॥

৺বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভা।

আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে গত ৬ই জুলাই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা ৺বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং এইরূপ অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের স্মৃতিসভা খুব সহজেই হয়, কারণ আমাদের দেশ আজকাল ঐ সকল বিষয়ই বোঝে ভাল। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এত অল্প বাঙ্গালী উন্নতি লাভ করেছেন যে, সে বিষয়ে কে কতদূর দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা মোটেই দৃষ্টি করিতে শিখি নাই। যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নবযুগের বঙ্গদেশকে ব্যবসায়ের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন, কয়জন বাঙ্গালী তাঁহার স্মৃতিসংস্থাপনে বা স্মৃতিসভার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ? রামদুলাল দের কয়খানি জীবনচরিত বাহির হইল ? কার-তারক কোম্পানির তারকনাথ সরকারের উন্নতির মূল কোথায়, তাহা কয়জন সন্ধান করিয়াছেন ? বাণিজ্যের মাহাত্ম্য, দেশের উন্নতির পক্ষে বাণিজ্য কিরূপ উপযোগী, দু'চার জন বাঙ্গালী তাহা বুঝিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহা এতদিনেও বোঝে নাই। আজ বটকৃষ্ণ পালের স্মৃতিসভা হওয়াতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যে, বুঝিয়াছে যে বাণিজ্যই আমাদের একমাত্র রক্ষার উপায়, তাহারই পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাতে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র হইতেছে খাঁটি হওয়া অর্থাৎ honesty। এই honestyর অভাবেই আমাদের দেশের অনেক ভাল ভাল কাজ একেবারে মাটী হইয়া গেল। কত অর্থভাণ্ডার উঠিল, অথচ তাহার কোন কূলকিনারাই পাওয়া যায় না। এই কারণে বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ে চাঁদা উঠাইতে গেলেই লোকে আর বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেই চাহে না এবং টাকার অভাবে কোন ভাল কাজও দাঁড়াইতে পারে না। সুখের বিষয় যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি এমন কয়েকজন লোক উঠিয়াছেন, যাঁহাদের নাম কোন ব্যবসায়ে সংলগ্ন থাকিলেই তাহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় থাকে না এবং ইচ্ছা করিলেও যাঁহাদের নামে এতটুকু অবিশ্বাস মনে আনিতেই পারি না। যেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের প্রত্যেক কথার উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারিব, সেইদিন সত্য সত্য আমাদের প্রিয়তম জন্মভূমি বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে জয় লাভ করিবে। বাঙ্গালীর মধ্যে বটকৃষ্ণ পালের মত ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তখন আমরা ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বক্তাগণের সহিত এক প্রাণে বলিতে পারি যে, এখনও আমাদের দেশের আশা আছে, এখনও দেশের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বটকৃষ্ণ পালের (ইনি দেশের আত্মীয় বলিয়া যে নামে দেশে সুপরিচিত, সেই নামেই উল্লেখ করিলাম) উদ্দেশে এরূপ বাৎসরিক স্মৃতিসভার অতিরিক্ত, তাঁহার কৃতী সন্তানগণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন কোন স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। আমরা তাঁহাদের বিবেচনার জন্য দুইটী স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের ইঙ্গিত করিতেছি—একটী হইতেছে "যথার্থ" বাণিজ্যব্যবসায় কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য একটী উপযুক্ত বিদ্যালয় ; বর্ত্তমানের কেরাণী প্রস্তুত করিবার জন্য যেরূপ বড় বড় বিদ্যালয়ে নামে মাত্র ব্যবসায় শিখাইবার শ্রেণী বা Commercial Class খোলা হয়, সেরূপ class আমরা চাহি না ; এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে বটকৃষ্ণ পালের একটী উপযুক্ত জীবনচরিত প্রকাশ করা। এই দুইটী সংসিদ্ধ হইলে বাঙ্গালী শীঘ্রই মানুষ হইতে পারিবে আশা করা যায় এবং বটকৃষ্ণ পাল মহোদয় স্বর্গবাসী হইয়াও লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর নিত্য আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন নিঃসন্দেহ।

স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও তাহার কুফল।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

[স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একজন খাঁটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের লিখিত এই প্রবন্ধ আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের ভিতরেও স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব কিরূপ গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রবন্ধটী তাহারই পরিচয় দিতেছে। তং সং]

স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দিনের পর দিন আমাদের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবারও আমরা ভাবিয়া দেখি না। যে আজ বালিকা, কাল সেই গৃহিণী; বালিকা অবস্থায় যদি সে পিতামাতার অবহেলায় শিক্ষালাভ না করিল, পরে অধিক বয়সে সে ছেলের মা হইলে আর তাহার শিক্ষার অবকাশ থাকে না। প্রত্যেক পিতা ছেলের শিক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন লয়েন, মেয়ের শিক্ষার জন্যও যে সেরূপ যত্ন লওয়া উচিত তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। আমাদের শাস্ত্রে আছে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" যেরূপ পুত্রকে পালন করিবে ও শিক্ষা দান করিবে কন্যাকেও সেইরূপ পালন করিবে ও শিক্ষা দান করিবে। যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, কোন্ শাস্ত্রে কোথায় স্ত্রীশিক্ষার নিষেধের কথা আছে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন কি? বরঞ্চ বেদে গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং পুরাণে শকুন্তলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা যে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ আদরণীয় ছিল, আমরা ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাই। উভয়ভারতী, লীলাবতী প্রভৃতি এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব আজিও দেশ ঘোষণা করিতেছে। আমার মনে হয়, মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই নানা কারণে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। তাহারই কুফল বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভোগ করিতেছি। স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিলে বিধবা হয়, এই সকল কুসংস্কার তখন হইতেই এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই সকল কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দিন দিন আমরা হীন ভীরু ও কাপুরুষ হইতেছি। মাতার নিকট সন্তান যেরূপ সহজে শিক্ষালাভ করিতে পারে অন্য কাহারও নিকট তাহা সম্ভব নয়। মাতা যদি শিক্ষিতা হন, শুধু কথায় কথায় সন্তানকে কত সৎশিক্ষা দিতে পারেন; বাল্য-কাল হইতে সেই উপদেশগুলি শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ভবিষ্যতে তাহার সুফল সমগ্র দেশবাসী ভোগ করিতে পারে। যে দেশের লোক ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা যে কতদূর অদূরদর্শী তাহা আর কি বলিব।

এইত সেদিন একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম যে একজন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া নিজের গায়ে ও কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, তাহার পরে অন্য লোক জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে; পরদিন প্রাতে স্বামীর মৃত্যু হয়, সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতালে স্ত্রীরও মৃত্যু হয়; স্ত্রীটী গর্ভবতী ছিলেন। কি ভীষণ কথা! দেখুন দেখি, শিক্ষার অভাবে কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে! সেই স্ত্রী হয়ত মনে করিয়াছিল যে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়াই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম, অতএব যে ভাবেই হউক আমাকে মরিতে হবে; সে জানে না যে আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহার পর আবার পুত্রহত্যা; হয়ত সেই একমাত্র পুত্রই তাহার বংশকে উজ্জ্বল করিত—সেই পুত্রটী পর্য্যস্ত গেল; তাহার বংশের আর পরিচায়ক কিছু রহিল না। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, সীতাদেবী নানা ক্লেশে ক্লিষ্টা হইয়াও অনেক সময় বলিতেছেন—যে কি করিব, আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই; তাহা না হইলে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতাম। আমাদের দেশের স্ত্রীগণ যদি শিক্ষিতা না হন তবে দিন দিন আরও যে কত ভীষণ দৃশ্য দেখিতে হবে তাহা বলা যায় না। স্ত্রীর সহমরণে যাওয়ার কথা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু নিতান্ত পাপ-জনক এবং দেশের ক্ষতিকারক।

এই সকল মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল লেখক লেখনী সঞ্চালনে সতীত্বের গুণগান করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, তাঁহারা যে দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহার দৃষ্টান্তে যদি আবার দশজন এই ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করে তাহার জন্য দায়ী হইবে কে? এই সকল অবিমৃষ্যকারী অদূরদর্শী লেখকগণের দ্বারা যে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও এইরূপ আত্মহত্যার পোষক কোন প্রমাণ নাই; বরং এইরূপ মৃত্যু নিতান্ত পাপজনক, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমার খুব বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশে অনেকে এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন; ইহার পূর্ব্বে স্নেহলতা প্রভৃতি অনেক অবিবাহিতা বালিকা কেরোসিন ও অগ্নির সাহায্যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। সেইজন্য কত সভা-সমিতিও হইয়াছিল। আমি জানি একদিন গোলদিঘীর

ধারে স্নেহলতার জন্য এক সভা হইয়াছিল; মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম সভায় স্নেহলতার খুব প্রশংসা করা হইয়াছিল, তাহার পিতাকেও ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না যে এ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ কি জন্য। আমাদের দেশ এমন হইয়া পড়িয়াছে যে কোন একটা কিছু হইলেই তাহার সদসৎ বিবেচনা না করিয়াই সভাসমিতি করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। সভায় বক্তারও অভাব হয় না—যাঁহারা বাঁধা বক্তা আছেন তাঁহারা দুই চার জন সভার নাম শুনিলেই উপস্থিত হয়েন; আর কোন কালেও যাঁহার যে বিষয়ের সহিত পরিচয় নাই বা নাম শুনা নাই, এমন বিষয়েও তিনি কিছু না বলিয়া ছাড়িবেন না। এই সকল আত্মঘাতিনীদের নিতান্ত দুর্গতির কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহাদের দাহ নাই, অশৌচ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, এমন কি এই সকল মৃত্যুতে শোক করা পর্য্যন্ত পাপজনক। ইহা জানিয়াও বৃদ্ধ সার্ব্বভৌমমহাশয় কিরূপে এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে উক্ত ঘটনাটী দেখিয়া আমার এই অতীত ঘটনাটী মনে পড়িল। বাস্তবিক এরূপ সভা করিয়া এই সকল কার্য্যের প্রশ্রয়দান করাতেই পর পর আরও অনেকগুলি এইরূপ ঘটনা আমরা শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এইরূপ মৃত্যু দ্বারা সমাজশরীরের বিশেষ হানি হয়; তাই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ মৃত্যুর প্রতি নানারূপ নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন—ভ্রমেও যেন কাহারও আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা না হয়, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য।

মহাভারতীয় নীতিকথা।

সভাপর্ব্ব।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

অবজ্ঞার পাত্র। যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন, প্রমদারা তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে। (লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বাধ্যায় ১৯।

কোন্ কর্ম্মের কি ফল। বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র, ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোজন, দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন, বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। (ঐ ২৭।

বিবেচনা। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য সম্পত্তি দেশ কাল আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। (রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বাধ্যায় ৫৪।

আত্মপ্রশংসা। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না। যেহেতু অন্যে যাহার প্রশংসা করে তিনিই যথার্থ পূজ্য। ঐ ৬৪।

নীতি। সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। ঐ।

অনলস। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক্ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা বলবান শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। (ঐ ৬৫।

বীরপুরুষ। বীর্য্যবানদিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু নির্বীর্য্যকুলোদ্ভব বীর্য্যবান ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়।

পরাক্রম ও অভিনিবেশ। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ ঘনীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। ঐ।

শত্রু। বলবিহীন বিপক্ষ পক্ষের দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। ঐ।

নির্গুণ পুরুষ। লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শমগুণ অবলম্বন ও কষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়। (ঐ ৬৯।

দুর্ব্বল। দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না। (ঐ ৭৯।

শত্রু। যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে তাহার স্থিরতা নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহা কখনও শুনি নাই। অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য।

(রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বাধ্যায় ৬৯।

কর্ম্মফল। যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়।

(ঐ ৯১।

স্বর্গের হেতু। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু—এই সমুদায়ই স্বর্গের হেতু। (ঐ।

সাধুর অকর্ত্তব্য। আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা এবং পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্ত্তব্য।

(শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায় ১৫৯।

কাল। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

দৈব। পৌরুষ দ্বারা দৈবশক্তির অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। (দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ১৭০। ১।

দৈব। দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক।

(ঐ ১৭৬।

অনুগ্রহ ও ভয়। যিনি কেবল অনুগ্রহ কিম্বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না।

(ঐ ১৮০।

কাপুরুষ। কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়।

(ঐ ১৮৬।

চেষ্টা। চেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়। (ঐ ১৯৮।

বুদ্ধি। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে,

যে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধ্যবন করিতে সমর্থ নহে। (ঐ ১৯৯।

আর্য্যোচিত কার্য্য। আর্য্যলোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচারপ্রদর্শন করেন না।

সৎপুরুষের কার্য্য। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকারসাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। (ঐ ২১০।

নীতি। কুলরক্ষার্থ এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থ কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার্থ গ্রাম পরিত্যাগ করিবে, এবং আত্মরক্ষার্থ পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে।

দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ২১৬।

বাক্য। লোকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। (ঐ ২২৯।

অসতী। অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। (ঐ ২২১।

(ক্রমশঃ)

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

খ্রীষ্টীয় ৪০০ শতাব্দীতে চৈনিক ফাহিয়ান * কনৌজ পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহার সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তখন উহা গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল। গুপ্তবংশের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে লিচ্ছবি বংশ মগধ ও মিথিলা হইতে দূরীভূত হইয়া নেপালের দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গুপ্ত বংশের অঙ্গীভূত রাজা "শ্রীগুপ্ত" পুষ্পপুরের (পাটলীপুত্রের) সিংহাসনে (৩১৯-৪০ খৃঃ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পূর্ব্বে (৩১৫-৩৪০ খৃঃ অব্দে) জয়দেব নেপালে লিচ্ছবি বংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই জয়দেবই নেপালের বংশাবলীতে জয়বর্ম্মণ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি লিচ্ছবি বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জয়দেব হইতে বসন্তদেব পর্য্যন্ত একবিংশতি জন লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি নেপালে রাজত্ব করেন। অতি প্রাচীনকালে ব্রিজি বা লিচ্ছবিরা ভোটদেশ হইতে মিথিলায় আসিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধ পুরাবৃত্তে ইঁহাদের বিবরণ পাওয়া যায় ৮

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নেপালে এই বংশের নিম্নলিখিত রাজত্বকাল * আনুমানিকভাবে চারিপুরুষে এক শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

লিচ্ছবি বংশ।

১। জয়দেব (৩১৫ খৃঃ অব্দ ৪০)।
২। বর্ষদেব (৩৪০ " ৬৫)।
৩। সর্ব্বদেব (৩৬৫ " ৯০)।
৪। পৃথ্বীদেব (৩৯০ " ৪১৫)।
৫। জ্যেষ্ঠদেব (৪১৫ " ৪০)।
৬। হরিদেব (৪৪০ " ৬৫)।
৭। কুবেরদেব (৪৬৫ " ৯০)।
৮। সিদ্ধিদেব (৪৯০ " ৫১৫)।
৯। হরিদেব (৫১৫ " ৪০)।
১০। বসুদত্তদেব (৫৪০ " ৬৫)।
১১। পতিদেব (৫৬৫ " ৯০)।
১২। শিববৃদ্ধিদেব (৫৯০ " ৬১৫)।
১৩। বসন্তদেব (৬১৫ " ৪০)।
১৪। শিবদেব (৬৪০ " ৬৫)।
১৫। রুদ্রদেব (৬৬৫ " ৯০)।
১৬। বৃষদেব (৬৯০ " ৭১৫)।
১৭। শঙ্করদেব (৭১৫ " ৪০)।
১৮। ধর্ম্মদেব (৭৪০ " ৬৫)।
১৯। মনদেব (৭৬৫ " ৯০)।
২০। মহীদেব (৭৯০ " ৮১৫)।
২১। বসন্তদেব (৮১৫ " ৪০)।

গুপ্তবংশীয় মাধব গুপ্তের পুত্র আদিত্য সেনের দৌহিত্রী "বৎস দেবীর" সহিত ভগদত্ত বংশীয় কামরূপ রাজ হর্ষদেবের কন্যা "রাজ্যমতী"র বিবাহ হইয়াছিল :—

মাধব গুপ্ত
|
আদিত্য সেন — মৌখরি রাজ — উদয়দেব
দেবগুপ্ত .... কন্যা = ভোগবর্ম্মণ † — নরেন্দ্র
বৎস দেবী = শিবদেব — হর্ষদেব
জয়দেব = রাজ্যমতী

---

* ফাহীয়েন একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক, যতি এবং পুরোহিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে "কুং" (kung) নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার বাসভবন "উ-ঈয়াং" বা "হুবয়েন" নামক স্থানে ছিল। ইহা শ্যানসী প্রদেশের "পিং-ইয়াং" জেলায় অবস্থিত। ৩৯১ খৃঃ অব্দে বহুদেশ পরিভ্রমণান্তর তিনি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* নব্যভারত, পৃঃ ৫০৭, ১৩০২ সাল, মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† ভোগবর্ম্মণ - ইনি ঠকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নেপালরাজ অংশু বর্ম্মণের ভাগিনেয়। ভোগবর্ম্মণ লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি শিবদেবের উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভোগবর্ম্মণের পুত্র যশোবর্ম্মণ কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই যশোবর্ম্মণের সভায় মহাকবি ভবভূতি ও বাক পতি বিদ্যমান ছিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত লিচ্ছবি ও ঠকুরী বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম নেপালে এক সময়ে সমভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শিবদেবের রাজধানীর নাম কৈলাসকূট। সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরাংশে কৈলাসকূটের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। লিচ্ছবিবংশ আপনাদের নামাঙ্কিত শাসন লিপিতে গুপ্তাব্দের এবং ঠকুরী বংশ হর্ষাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন।

মৌখরি বর্ম্মণ বংশীয় "ভোগবর্ম্মণ" মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্য সেনের জামাতা ছিলেন। মহারাজ আদিত্য সেন গুপ্ত বংশের এক কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র গোবিন্দ গুপ্ত মতান্তরে কৃষ্ণগুপ্ত এই বংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় নরপতি "শিবদেব" গুপ্ত বংশীয় আদিত্য সেনের দৌহিত্রী ও মৌখরী-রাজ ভোগবর্ম্মার দুহিতা বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শিবদেবের পুত্র জয়দেব "রাজ্যমতী" দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্ত বংশীয় কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা। ইহা নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের সংলগ্ন জয়দেবের খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায়। ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃঃ অব্দে) এই খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিত লিপি হইতে "মৌখরি" ও "গুপ্ত" বংশের সহিত "ঠকুরি" বংশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লিচ্ছবি বংশীয় মহারাজ শিবদেবের রাজত্বকাল ৬৪০-৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। হর্ষদেব কামরূপরাজ বলিয়া খোদিত লিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতীর ভগদত্তকুলজা উপাধি দেখিয়া বোধ হয় হর্ষদেব কামরূপের অধিপতি ছিলেন :—

"মাদ্যদ্দন্তিসমূহ-দন্তমুসল-ক্ষুণ্ণারি-ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ-কোশলপতি-শ্রীহর্ষদেবাত্মজা
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কূলৈ
র্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভূজা॥"

গৌড় দেশ হর্ষ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছিল অথবা তাহার পূর্ব্বে জিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। রাখাল বাবু অনুমান করেন অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়দেশ, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপরাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। *

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়।

শিবাজী—কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসুর বিরচিত "শিবাজী" নামক কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যোগীন্দ্র বাবু যখন যাহা কিছু রচনা করেন, তাহার ভিতরে আমরা তাঁহার বিশেষ গবেষণার পরিচয় পাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি কাব্য ও ইতিহাসের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একটি অন্যটিকে রেখামাত্র অতিক্রম করে নাই। কবিত্বের ভাষায় ও কবির সম্মোহন তুলিকায় তিনি শিবাজীর আদর্শ চরিত্র আশ্চর্য্যভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের বিপুল চেষ্টা ও অধ্যবসায় শিবাজীর জীবনে আরোপিত কলঙ্ক এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাবে খলিত করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান যুগের উৎগীরিত নাট্য ও ছোট বড় গল্পের ভিতরে প্রেমিক প্রেমিকার অনুরূপ মিলন কখন বা বিচ্ছেদের কাহিনী পড়িয়া সত্য সত্যই আমরা (effeminate) বীর্য্যহীন ও প্রকৃত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি। মনুষ্যত্বের পরিপোষক ও চৈতন্যবিধায়ক গ্রন্থের পঠন পাঠন ভিন্ন এ দেশের দুর্গতির অবসান হইবে না। অতীতের ভিতর হইতে অসম্ভবকে যাঁহারা স্বীয় বীর্য্যে ও প্রতিভায় সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়কর কার্য্যাবলীকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে এ দেশের পরিত্রাণ নাই। সুকবি বা সুলেখক বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের মস্তকের উপরে। প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন নানা রসের উদ্রেক করিলেই তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ হইল না। জনসাধারণকে প্রকৃত আদর্শের দিকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার গুরুভার তাঁহাদের উপরে। চিত্তবিনোদন তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য নহে। এ জাতিকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব তাঁহাদের হস্তে। যোগীন্দ্র বাবু সেই দায়িত্বটুকু বুঝিয়া কবির আসরে নামিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। নানা চিত্রের ভিতরে সাধু রামদাসের উক্তি ও ভক্ত তুকারামের প্রসঙ্গ অবলম্বনে এবং শিবাজীর বিনয় ঔদার্য্য ও বৈরাগ্যের কাহিনী ধরিয়া এই পুস্তকে ধর্ম্মের সঙ্গে শৌর্য্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার রচনাকে মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ইহা মহাকাব্য না হইলেও যে ছাঁদে ও মহান আদর্শে কাব্যখানি সংরচিত তাহাতে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া মানিয়া লইতে পাঠকের আপত্তি হইতে পারে না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। পৃ ১০৮।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১৩ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।

হে প্রাণের পরমেশ্বর, তুমি আনন্দময় হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু সময়ে সময়ে এক একটা ঘটনা দেখে এক একটা অবস্থায় পড়ে তোমার আনন্দস্বরূপে সন্দেহ এসে পড়ে। এর কারণ আর কিছুই নয়—কেবল এই যে, তোমাকে হৃদয়ের ভিতর প্রাণের ভিতর মঙ্গলময় স্বামী বলে ধরতে পারি নি, বিশ্বাস করি নে। মুখে অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু সত্যিসত্যি প্রাণের ভিতর থেকে সে সব কথা বলিনে। এই পৃথিবীতে যাঁর অধীনে আমি, আর আমার মতো আরও পাঁচজন কাজ করি, তিনি যদি আমাকে তাঁর এক কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠান, তাহলে সকলেই বলবেন যে, আমার মনিব নিশ্চয়ই ভাল বিবেচনা করেই এরকম বন্দোবস্ত করেছেন; হতে পারে যে তার ফলে তোমার বা আমার অল্প বেশী কষ্ট হবে। কিন্তু যে মনিবের ভাল হওয়াতেই আমার খাওয়া পরা চলছে, আমার তোমার ভাল হচ্ছে, তাঁর ভালর জন্য একটু কষ্ট হলেও মনিবের ভাল হবে বলে সেটা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি বলে মেনে নিই। পার্থিব মনিব-ভৃত্যের সম্বন্ধ দিয়ে সেই প্রভু পরমেশ্বর ও আমাদের সম্বন্ধে ঠিকটা বোঝানো অসম্ভব জানি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে সেটাও একেবারে অস্বীকার করতে পারি নে। এই সম্বন্ধ ধরে বোঝবার চেষ্টা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর সত্যই আমাদের ভালর জন্যই সমস্ত ঘটনা, আমাদের সকল অবস্থা নিয়মিত করছেন। তবে অনেক বিষয় আমরা বুঝতে না পেরে তাঁর মঙ্গল স্বরূপের কথা মানতে চাই নে। তোমার শোক দুঃখ হোক, বিপদ আপদ আসুক, একবার তাঁর চরণে কেঁদে পড় দিকিন, তোমার শোকের ভার কেমন নেবে যাবে। ঘনঘটা মেঘ করে খুব একটা বর্ষা নেমে গেলে যখন সূর্য্যের আনন্দমঙ্গল কিরণজাল দেখা যায়, তখন হৃদয়ে কি সুন্দর প্রেমের ভাব জেগে উঠে। আমি হয় তো অট্টালিকায় বাস করছি, এরকম ঘনঘটার কারণই বুঝতে পারলুম না, আর সেই জন্য সেই বৃষ্টি-ঝড়কে একটা মহা অমঙ্গলের কারণ মনে করে আছি। কিন্তু হয় তো কৃষকদের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতুম যে, বৃষ্টি-ঝড় হওয়া কিরকম দরকার ছিল। সেই রকম তাঁর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করলে অনেক সময়ে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার কেটে যায়, আর তখন তাঁর মঙ্গলস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নূতনতরভাবে প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি।

আজ এই পবিত্র সময়ে, এসো, আমাদের সমুদয় সংশয় দূর করে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে দিই। সুখের সময় তাঁরই দান বলে যেমন নেব, দুঃখের সময়েও তাঁরই মঙ্গলভাবের কার্য্য বলে মনে স্থির জানব। তাহলেই চারিদিকে মৃত্যু

শোক বিপদ আপদ দেখে প্রাণে যে ভয়-ভাবনা ওঠে, সে সমস্ত কেটে গিয়ে প্রাণের ভিতর শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, দেশদেশান্তরবাসীর সঙ্গে, লোক-লোকান্তরবাসীর সঙ্গে আমাদের হৃদয় একভাবে মিলিত হবে। তখন আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান থাকবে না, তখনই আমরা মৃত্যু হতে অমৃতে উপনীত হব।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মসম্মিলন। গতপূর্ব্ব বৎসর ভাদ্রমাসে ব্রাহ্মদিগের একটী সম্মিলিত উপাসনা হওয়াতে আমরা হৃদয়ে খুবই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর মাঘোৎসবের সময়ে সম্মিলিত উপাসনার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, যে সদ্ভাবের ফলে ব্রাহ্মদিগের যথার্থ সম্মিলন হইতে পারে, কেন জানি না ব্রাহ্মমণ্ডলীর ভিতর হইতে সে সদ্ভাব চলিয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মদিগের ব্যক্তিত্বের অতিমাত্র বোধ এবং মণ্ডলীর প্রতি সহানুভূতির হ্রাস। কিন্তু এ সদ্ভাবকে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ধর্ম্মমহাসঙ্ঘ উপলক্ষে মিলনের মহাফল সম্বন্ধে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। "কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না কর্ম্মক্ষেত্রে এই মহাসঙ্ঘ কি ফল দান করিল। জগতের প্রত্যেক অংশ হইতে সহস্র সহস্র লোককে সর্ব্বপ্রথম মিলিতভাবে প্রার্থনা করিতে দেখা গেল "আমাদের পিতা যিনি ঐ আকাশে আছেন" (Our father, which art in heaven), আমাদের পিতা যে একই এবং একই পরমেশ্বর যে আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সম্মিলিত প্রার্থনা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহাসংঘ ঘোষণা করিয়াছে যে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ভগবানকে যিনি চাহেন এবং সৎকার্য্য করেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। এই মহাসংঘ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে যাঁহারাই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তিনি তাঁহাদেরই নিকটে আসেন। শাস্ত্রীগণ ধর্ম্মশাস্ত্র রাশি রাশি সংগ্রহ করিতে থাকুন; কিন্তু ধর্ম্ম অতি সহজ বস্তু, এবং যে বস্তু এত সহজ অথচ আমাদের এত আবশ্যক, সেই ধর্ম্মের জীবনপ্রদ শাঁস প্রত্যেক ধর্ম্মে পাওয়া যায় বলিয়া আমার ধারণা; খোসার আকার নানাবিধ হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, ইহার অর্থ কি! ইহার অর্থ এই যে, সকল ধর্ম্মের ঊর্দ্ধে ও অধোতে, সম্মুখে ও পশ্চাতে এক চিরন্তন সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্মে কৃষ্ণকায় বা শ্বেতকায়, পীতকায় বা রক্তকায়, সকল মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে পারে।" ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রত্যেক পদে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সম্মুখে ভাদ্রোৎসব—দেখা যাক।

স্ত্রী-শিক্ষা। আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে রাজসাহী বোয়ালিয়ার ধর্ম্মসভার মুখপত্র হিন্দুরঞ্জিকা কাগজের গত আষাঢ়ের কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে স্ত্রীশিক্ষা, কেবল সাধারণ স্ত্রীশিক্ষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চ স্ত্রীশিক্ষাও সমর্থন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কয়েকস্থলে প্রবন্ধের মতের সহিত আমাদের মত না মিলিলেও আমরা ঘোর প্রাচীনপন্থী একখানি কাগজে নব্যযুগের প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সমর্থনকেই যুগধর্ম্মের অন্যতর সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধি কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ এই যে শাস্ত্রানুশাসন বিধিমতে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, প্রাচীনপন্থীগণ প্রতিপদে মুখে না হইলেও কার্য্যে যে অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজ বড়ই আশার কথা যে তাঁহারাই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অনুশাসনসিদ্ধ স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন করিতেছেন। এই ফিরিয়া দাঁড়াইবার পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আশ্চর্য্যরূপ সহায়তা করিয়াছেন। সত্যমেব জয়তে—সত্যেরই জয় হয়।

যুদ্ধশান্তির উৎসব। সমস্ত দেশ হইতে একটা প্রাণের কথা উঠিয়াছে যে, যুদ্ধশান্তির উৎসব উপলক্ষে টাকা সংগ্রহ করিয়া ধোঁয়াতে উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুচিত নহে, পাপ। পৃথিবীর অনেক অর্থ গত চার বৎসরের যুদ্ধে ধোঁয়াতে শেষ হইয়াছে। আবার যুদ্ধের শান্তিতেও, বিশেষত বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে, আমাদের মতে একটী কপর্দ্দকও বাজে কাজে খরচ করা উচিত নয়। দুইটী জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে—আহার না পাইলে বাঁচিতে পারি না এবং কাপড় না পাইলে লজ্জা নিবারণ করিতে পারি না। এ সময়ে কি জমীদার কি প্রজা, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সকলেই চাঁদার কারণে এবং দুর্ম্মূল্যতার কারণে "জেরবার" হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বলা বাহুল্য যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের চোটে পিপীলিকার শুষ্ক উদর হইতেও হয়তো গুড় বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেই পিপড়ার পেট গালিয়া বাহির করা গুড়টুকুও অপচয় না করিয়া যথাসাধ্য সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত। আমাদের মতে সংগৃহীত অর্থ হইতে সর্ব্বপ্রথম শীর্ষস্থানীয় উপযুক্ত লোকদিগের মত লইয়া আহারের এবং কাপড় সরবরাহের উপায় যে প্রকারেই হউক সংস্থাপিত করা উচিত।

প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে মরিতে হয় মরিব, কিন্তু বাজে ধোঁয়াতে নষ্ট করিবার জন্য এক কপর্দকও দিব না।

মুদ্রাযন্ত্র আইনের ফল। আমরা সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে গত নয় বৎসরের মধ্যে এই আইনের ফলে "৩৩০টী মুদ্রাযন্ত্র দণ্ডিত, তিনশত সংবাদ পত্র ৪০০০০ পাউণ্ড অর্থ জামিন রাখার জন্য তাগিদ প্রাপ্ত, এবং ৫০০ মুদ্রিত মাসিক পত্র, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির পরিচালন নিবারিত হইয়াছে। জামিন দিতে না পারায় ১০০ মুদ্রাযন্ত্র ও ১১০ খানি সংবাদপত্রের উৎপত্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই" (ঢাকা প্রকাশ ২৮শে আষাঢ় ১৩২৬)। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে এই মুদ্রাযন্ত্র আইন করিয়া গভর্ণমেণ্ট একটী বিরাট ভুল সৃষ্টি করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র আইনে উপরোক্ত কার্য্যের কি ফল, গভর্ণমেণ্ট কি জানি কেন ইতিহাসে সুপণ্ডিত হইয়াও প্রত্যক্ষ করিতেছেন না। অবশ্য যে সকল কাগজপত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সত্য সত্য রাজবিদ্রোহে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মস্তকে বজ্রদণ্ড ফেলিয়া যথার্থ দোষীদিগকে প্রচণ্ড শক্তিবলে দণ্ড করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যে-সে ভুলভ্রান্তিবিশিষ্ট মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের এবং সংবাদপত্র প্রভৃতির স্বাধীনতা হরণ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণকায়ও মানুষ, শ্বেতকায়ও মানুষ; রাজাও মানুষ, প্রজাও মানুষ। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে এক বিরাট আত্মশক্তি নিয়ত কাজ করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট নিজের স্থায়িত্ব চাহিলে—যাহা অন্তত আমরা চাহি—সেই আত্মশক্তিকে মুখ বন্ধ করিয়া সংহত হইবার অবসর দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। সংহত হইতে থাকিলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, যে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্র আইনের সৃষ্টি করিলেন, সেই বিপ্লব শতগুণ বল লইয়া রাজ্য, সাহিত্য প্রভৃতি দেশের যাহা কিছু ভাল, সমস্তই অগ্নিসাৎ করিয়া দিবে। এইভাবে দেশের মুখবন্ধ করিবার ফলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা গভীর অসন্তোষের স্রোত দেশবাসীর হৃদয়ে যে খাত কাটিতে চলিয়াছে, সেটা গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, সময় থাকিতে ভগবান এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সুমতি প্রদান করুন।

ধরাধামে স্বর্গরাজ্য। যুদ্ধের শেষ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাজ্য জাহাজবল বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন কারণে সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে প্রস্তাবক প্যারিসের শান্তিসংঘ হইতে ফিরিয়া গিয়া নিজের নৌবল বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠাইয়া লইয়াছেন। যতদূর বুঝা যায় যে এখন অবধি রাষ্ট্রসমূহের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসিত না হইয়া আপোষে মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইবে। চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই চেষ্টা যে হইবার কথা উঠিয়াছে, তাহাই তো জগতের আত্মশক্তির উন্নতির পথে আরোহণ করিবার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। আমরা দুঃখবাদীদিগের দৃষ্টিকে আর কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

হিন্দু শ্বেতকায় কিনা? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাজ্যের উচ্চতম বিচারালয়ে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে হিন্দু শ্বেতকায় জাতির মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। শ্বেতকায় হউক আর কৃষ্ণকায়ই হউক, আমরা বিচারফলে এই কারণে সন্তুষ্ট যে অন্তত প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটী জাতিও মার্কিনরাজ্যের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতিগণও কবে সেই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। প্রতীক্ষা কর এবং ভগবানের আশ্চর্য্য মঙ্গলবিধান পর্য্যবেক্ষণ কর।

বিলাতে ভারতবাসী। গত ২০শে জুলাইয়ের ষ্টেটসম্যান কাগজে একটী চিত্র দেখিলাম যে সেখানে ডরিনকোর্ট নামক স্থানে "ভারতীয় শিল্প ও নাট্যসমিতি"র তত্ত্বাবধানে "আরাকানের মহারাণী" অভিনীত হইয়াছিল, এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসী মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত থাকিয়া অভিনয়ের আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। ভারতের যে রকম দুর্ব্বৎসর চলিতেছে, তাহাতে আমরা ইহাঁদের ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। সমিতির নিশ্চয়ই ভারতবাসী সভ্য আছেন—তাঁহারা ধনী বলিয়াও ধরা যাইতে পারে; তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য হইয়াছে যে ভারতের এই দুর্ব্বৎসরের সময় আমোদ প্রমোদে জলের মত অর্থ ঢালিয়া দেওয়া? সেই টাকা যদি এদেশে পাঠাইতেন, তাহা হইলে না জানি কত কঙ্কালসার দরিদ্র স্বদেশবাসী অন্নবস্ত্র পাইয়া বাঁচিয়া যাইত? আমরা অবাক হইতেছি যে দেশভক্ত অনেকেও স্বদেশের দুরবস্থা ভুলিয়া গিয়া কেমন করিয়া এই অভিনয় দর্শনে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন? যোড়করে প্রার্থনা, বিলাসবিভব সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া আগে দেশকে বাঁচাও, তারপর না হয় বিলাসকে আদরপূর্ব্বক বুকের ভিতর টানিয়া লইও। এদেশেও যে সমুদয় ধনীগণ থিয়েটারে, বায়স্কোপে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় করিতেছেন, তাঁহাদেরও প্রতি আমাদের অনুরোধ,

তাঁহারা অন্তত একটী বৎসর এই অপব্যয় বন্ধ করিয়া অর্থ সঞ্চিত করিয়া দেশের দুরবস্থা দূর করিতে প্রয়োগ করুন দেশবাসী দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী বৃদ্ধির অন্যতর যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারও মূলোচ্ছেদ হইবে। দেশের অবস্থা ভাবিয়া আর বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারি না। জানি—ইহা অরণ্যে রোদন; কিন্তু না কাঁদিয়াও থাকিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজের অবনতির কারণ—ব্রাহ্মসমাজের অবনতির অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা আজকাল স্বার্থ দ্বারাই বেশী পরিচালিত। কিসে টাকা পাইব, কিসে যশমান পাইব, তাহারই পশ্চাতে আমরা ধাবিত হই। ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভকালে অনেকে স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া, যশোলিপ্সা মানের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে, অনেকে দেখিলেন যে, যশমান অর্থের আশা ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে ধার্ম্মিক প্রভৃতি নাম এবং তদনুরূপ যশমান পাওয়া যায়, তখন তাঁহারা সেই যশের আকাঙ্ক্ষাতেই প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ফলে দাঁড়াইল যে প্রচারকদিগের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানবান ও ভক্তিমান ব্যক্তি বিরল হইল। আজ যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারকের যে কোন বিষয়ের ক্ষমতার জন্য দেশবাসী অথবা বিদেশীয়গণ সম্মান দেখাইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমাদের মতে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ, যিনি সেই সম্মানপ্রাপ্তির লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিলাতে সম্প্রতি সল্‌সবেরির বিশপকে লর্ডসভার সভ্য করাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাশি রাশি চিঠি দিতেছেন। সেই সূত্রে তিনি লিখিতেছেন যে, "লর্ডসভার সভ্য হওয়া আমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ নহে। আমার কার্য্য এত বেশী যে লর্ডসভায় উপস্থিতি আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়"। ব্রাহ্মেরাও যখন সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার স্বার্থ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি, এক কথায় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবার অভ্যাস করিবেন, তখনই ব্রাহ্মসমাজ জয়ী হইবে; প্রাণের ভিতর ব্রহ্মোপাসক হইলেই ব্রাহ্মসমাজের জয়; মুখের কথায় ব্রাহ্মসমাজের কখনও জয় হইবে না—ইহা নিশ্চয়। মুখের লম্বাচৌড়া ভাল ভাল কথায় কখনও কোন ধর্ম্ম সমাজ উন্নতি করিয়াছে বলিয়া জানি না।

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন—যাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া অশ্লীলতার বিষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করাই নিষ্ফল। কিন্তু যাঁহারা দেশের অপবিত্রতা দূর করিয়া দেশকে উন্নতির শিখরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, তাঁহাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে রেনল্ডস প্রণীত বিলাতের শতাব্দীপূর্ব্বের অশ্লীল চিত্রসকল ভবিষ্যৎ বংশের সম্মুখে ধারণ করিয়া এবং প্রকারান্তরে সেই সকল পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দিয়া তাঁহারা কি সেই শুভ ইচ্ছাকে সফল করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন? বিলাতে যেমন অনেক মদ্যব্যবসায়ীগণ একদিকে সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনেক ধর্ম্মপ্রচার সভার যথেষ্ট সাহায্য করেন, আবার নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মদ্যের বহুল প্রচলনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, এই সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমাদের সেই কথাই মনে হয়—একদিকে বড় বড় প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বলিতেছি, ধর্ম্মপথে চল, বদমায়েসী করিও না; কিন্তু সেই আমরা নিজেদের দুচারটাকার স্বার্থের জন্য, আপাত লাভের জন্য নিজেদের ছেলেপিলের মুখে অধর্ম্মের বিষ ঘড়া ঘড়া ঢালিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না!

সংগচ্ছধ্বং। আমরা দেখিলাম, গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে সংগচ্ছধ্বং শীর্ষক একটী প্যারাগ্রাফে ব্রাহ্মদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। হায়! ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থার সেই প্রাণে প্রাণে মিলনের ভাব যে কবে আমরা ফিরিয়া পাইব তাহা কে জানে? প্রাচীন দলের ব্রাহ্মদের সঙ্গে সঙ্গে সেই একাত্মভাব আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কারণ—স্বার্থচিন্তা, নিজের উন্নতির জন্য গর্ব্ব ইত্যাদি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—অর্থকে ধর্ম্মপথের অনর্থ বলিয়াই নিত্য ভাবিবে। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের কতকগুলি অঙ্গ সাধনার ফলে যোগবিভূতিস্বরূপে অর্থ মান প্রভৃতির যথেষ্ট সমাগম হইয়াছে, কিন্তু এখন আমরা সেই বিভূতির গর্ব্বে তাল সামলাইতে পারিতেছি না। কয়জন ব্রাহ্ম অর্থ যশ মান লাভ করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মসাধারণের কাজে লাগাইয়াছেন? তাঁহারা নিজেদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত আছেন—কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় লোক বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজও তো বিশেষভাবে তাঁহাদের কাছে কিছু না কিছু সাহায্য প্রত্যাশা করে, কিন্তু পায় কৈ? ফলে দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মদিগের অনেকে এক স্থানে মিলিত হইলেই ঐ সকল বড় লোকদের নিন্দাসূচক অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু সেই সব নিন্দার

মূল কারণ কেহই সেই বড়লোকদের কাছে বলিতে সাহস করে না। এই রকমে চলিতে চলিতে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের বড়লোক এবং সাধারণ, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ছাড়াছাড়ির ভাব জাগিয়া উঠে; তখন কেহ কাহারও সাহায্য পাইতেও চাহে না, আর কেহ কাহাকে সাহায্য দিতেও চাহে না। ক্রমে এই ভাবটা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—এখন যাহা হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি প্রার্থনীয় হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—ঐ সকল বড়লোকদের নিজের নিজের অর্থ মান যশের উচ্চ উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া ব্রাহ্মসাধারণকে আহ্বান করিয়া মিলন সাধনের ব্যবস্থা সংসাধিত করা। ইহা ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগ্রত আছে—তিন শাখারই অনেক সভ্যের মনে হয় যে, যে শাখা যত হৈ চৈ করিতে পারিবে সেই শাখারই যেন জয়। ইহাও ব্রাহ্মসমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ। ইহার ফলে তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে নিন্দাবাদ, পরস্পরের প্রতি সংশয় আসিয়া—হৈচৈ করিলে কি হইবে—আসলে কোন সৎকাজ করিতে দিতেছে না। এই কারণে আমরা একটী সম্মিলিত সমিতির প্রস্তাব করিয়া নববিধানসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে পত্র দিয়াছি—দেখি তাহার ফল কি হয়। একরাশ কথাতে কোনই ফল হইবে না—প্রাণের ইচ্ছা চাই।

জননী আমার !

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

(১)

আমি জানিতাম শুধু অলক্ষ্যে সবার
তোর পূত মৃত্তিকার প্রতি স্তরে স্তরে
মোর পূর্ব্ব-পুরুষেরা নিশ্চিন্ত অন্তরে
রয়েছেন চির-সুপ্ত ; প্রতি রেণু মাঝে
তাঁহাদের কত কীর্ত্তি নিঃশব্দে বিরাজে
ফল্গুর অন্তরবাহী সলিলের সম ;
তাঁহাদের রক্ত মাংস তোরে অনুপম
গড়িয়াছে সংগোপনে ; কক্ষে কক্ষে তোর
তাঁহাদের স্মৃতি-গন্ধে আজো আছে ভোর ;
তাঁহাদের শেষ শ্বাস—শেষ সাধ-আশা
তোর বুকে হে জননি, লইয়াছে বাসা
অশরীরী আত্মা সম !—তোর আমি তাই
প্রাণে মনে চিরদিন পূজিবারে চাই !

(২)

মোরে কত স্নেহে যত্নে শ্রীঅঙ্কে তোমার
আজীবন পালিতেছ ; মেলিয়া নয়ন ,
করিয়াছি তোমারেই প্রথম দর্শন
চির কল্যাণীর বেশে ; শৈশব-কৈশোর
যাপিয়াছি তোমাতেই সুখে নিরন্তর
শত হাসি-খেলা মাঝে ; তোমারি শিক্ষায়
দীক্ষিত যৌবনে এবে ; সকল হিয়ায়
তোমারি আসন তুমি করি প্রতিষ্ঠিত
পবিত্র করেছ মোরে ; কি সুধা-সঙ্গীত
মোরে করিয়াছ দান ; ভুলায়ে সকলি
তব মহা সৌন্দর্য্যেতে রেখেছ কেবলি
আকণ্ঠ নিমগ্ন করি' !—তোরে আমি তাই
জন্মে জন্মে মা বলিয়া ডাকিবারে চাই !

মূর্ত্তিপূজা।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী)

আজকাল মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথাই শোনা যায়। উভয় পক্ষই স্বমত স্থাপনের জন্য বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ধীরচিত্তে শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মের—ঋষিপ্রোক্ত বৈদিক ধর্ম্মের সহিত এই মূর্ত্তিপূজার কোনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। আর্য্যধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ যে বেদ ও উপনিষদ তাহাতে এই মূর্ত্তিপূজার সমর্থক কোন বাক্যই পাওয়া যায় না ; অধিকন্তু ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতিরোধক বলিয়া, লোকে যাহাতে ভ্রান্ত হইয়া এই মায়াকূপে নিপতিত না হয় তাহার জন্য অনেকস্থলে ইহার বিরুদ্ধে অনেক নিন্দাবাদ পর্য্যন্ত শোনা যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে একস্থলে লিখিত আছে যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ, পশুরেব স দেবানাম্" অর্থাৎ যে পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে তাঁহাকে জানিতে পারে না,—সে দেবতাদিগের পশুস্বরূপ। ঋগবেদ বলিতেছেন "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র যাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই পরব্রহ্মের অনুরূপ কিছুই নাই। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—আজ আমরা যে মূর্ত্তিবাদকে

হিন্দুধর্ম্মের সনাতন প্রথা বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি,—যাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্ত যুক্তিজালে জড়িত আত্মাকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে পারিতেছি না, তাহা কিন্তু সেই প্রাচীন জ্ঞানোন্নত ঔপনিষদ যুগে মোটেই ছিল না। আর্য্য-ধর্ম্মের সেই গৌরবময় যুগের অনেক পরবর্ত্তীকালে—পৌরাণিক যুগেই ইহার প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার আলোচনাতেও আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানেরই সায় পাইয়া থাকি; তখন ভারতবর্ষের পবিত্র আরণ্যক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণের দৃষ্টি তখন অনেক পরিমাণে বহির্মুখীন হইয়া পড়িতেছিল। অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া বাঞ্ছিততমের পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার প্রবৃত্তি, বাহ্যজগতের প্রবল আকর্ষণে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিতেছিল। সামাজিক মন তখন অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; তাই তখনকার সেই সমাজের দুর্ব্বল মনের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দূর করিবার জন্য এই সহজপ্রাপ্য পথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু পীড়িত অবস্থায় যে লঘু পথ্য আহারে লোকে ধীরে ধীরে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে, সুস্থ হইয়াও যদি তাহার প্রতি অত্যধিক মায়াবশতঃ তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারে তখন তাহাই আবার যে নূতন রোগ ডাকিয়া আনে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর তাহার কোন ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের অবস্থাটাও এখন ঠিক এইরূপ দাঁড়াইয়াছে; তাই আমাদের আধ্যাত্মিক শরীরটা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক—আরও দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে।

মূর্ত্তিপূজা যে ঔপনিষদ নহে তাহা মহামুনি ব্যাসদেবের আক্ষেপোক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত রচনা করিবার পর ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

রূপং রূপাবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ,—

তোমার রূপ না থাকিলেও আমি ধ্যানের দ্বারা তাহা কল্পনা করিয়াছি, তুমি অনির্ব্বচনীয় হইলেও আমি স্তুতির দ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিতা নিরাকৃত করিয়াছি, দেব! তুমি আমার এই বিকলতাজনিত দোষত্রয়কে ক্ষমা কর।

পুরাণকর্ত্তা ব্যাসদেবের এই বাক্য হইতেও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, পুরাণাদি ব্যতীত শ্রুতি কোথাও মূর্ত্তিপূজার বিধান দেন নাই। আমাদের দেশে শ্রুতিপ্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। স্মৃতি পুরাণাদি শ্রুতির অনুবর্ত্তী মাত্র। শ্রুতির সহিত স্মৃতি প্রভৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অতএব মূর্ত্তিপূজা যে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত ইহা কোনও প্রকারে স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ এই মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা তো আমাদের দেশে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই; অথচ আমাদের অনেকেরই ধারণা যে ইহা বুঝি ভারতের সকল স্থানে সকল কালে সমান ভাবেই আচরিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা আমাদের দেশে অতি অল্পদিনই প্রচলিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত অন্যত্র ইহা মোটেই প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই যে বৎসর বৎসর মহাধূমধামের সহিত বাঙ্গালার প্রতিপল্লীতে দুর্গাপ্রতিমার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, ইহার উৎসবের আধিক্য দেখিয়া হঠাৎ মনে হয়, বুঝি বা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্রই এমনিভাবে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু যদি আমরা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, ইহা মাত্র সে দিন—গত ১৪শত শতাব্দীতে রাজা জগদ্‌রাম রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এই যে আজকাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কালীপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, এ প্রথাও কিন্তু আমাদের দেশে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। আগম-

বাগীশ কৃষ্ণানন্দই ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রথম প্রচলন করিয়া যান। এইরূপ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা-পূজাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। সরস্বতীর প্রতিমাপূজা তো একশত বৎসরের অধিক প্রচলিত হয় নাই।

এই প্রকার প্রতিমাপূজার আর একটী বিশেষ কুফল এই যে, ইহাতে দিন দিন বাহ্য অনুষ্ঠানের অংশটাই বাড়িয়া যাইতেছে; আন্তরিকতার অংশ কমিয়া আসিয়া ইহা কেবল আজকাল একটা ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া জাঁকজমকের সহিত পূজা করিলে লোকের মনে গর্ব্বের সঞ্চার ভিন্ন যে আর কিছু হইতে পারে, তাহা ত আমাদের মনে হয় না; এবং ঐ গর্ব্ব যে তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্নতির মহা প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল কারণে দেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার প্রচলন থাকিলেও শাস্ত্র কোনও দিন নির্ব্বিবাদে তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই; চিরদিনই তাহাকে নিম্ন আসনই প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক স্থানে বলা হইয়াছে,—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমভাবো মূর্ত্তিপূজাঽধমাধমা॥

শ্লোকটীর ভাব হইতেছে এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার যে কয়টী পথ আছে তাহার মধ্যে যেটী জ্ঞানের পথ সেইটীই হইতেছে সব হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার পর ধ্যানের পথটী মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম; আর মূর্ত্তিপূজা সব হইতে নিকৃষ্ট—অধমাধম।

কেবল প্রতিমাপূজা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ যে কত ছোট হইয়া গিয়াছে আমরা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমরা নিজেরাই নিজেকে ঠকাইতেছি। দেবতার স্বর্ণসিংহাসনে কখন্ যে ভুল করিয়া "অহং"কে বসাইয়া তাহারই আরাধনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি তাহা এখন নির্ণয়েরও বাহিরে গিয়াছে। আমাদেরই দেবতা এখন আমাদেরই মত আহার-বিহার বেশভূষা প্রভৃতির অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের স্বাভাবিক অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি এই প্রতিমাপূজার উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত হইয়া দিন দিন এত শীঘ্র বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেরাই যে সঙ্কীর্ণ ও ভেদসম্পন্ন হইয়াছি তাহা নহে, আমাদের আরাধ্যকেও আমরা আমাদেরই মত সঙ্কীর্ণ ও ভেদসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের ভেদ-বুদ্ধি এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, এখন আর আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও সন্তুষ্ট নহি। এখন আবার একটী দেবতাকেই স্থানভেদেও ভিন্ন করিতে শিখিয়াছি। "অমুক স্থানের দেবতা যেমন জাগ্রত অমুক স্থানের তেমন নন" এ কথা আমাদের মুখ হইতে এখন নিত্যই উচ্চারিত হয়; আমরা আর ইহার মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য দেখি না।

পুণ্যের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মাচরণ করা আমাদের দেশের একটা চিরন্তন প্রথা। আমরা এই প্রথাকে ভাবের দিক দিয়া বড় উন্নত করিয়া দেখি। যখন কোন শুভযোগ উপলক্ষে ভারতের কোন্ সুদূর প্রান্ত হইতে ভক্ত নরনারীসকল দলে দলে আসিয়া গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হইতে থাকে, তখন আমরা সেই বিরাট দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার বিষয় এই যে, কেবল পুণ্য সঞ্চয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অন্ধের মত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেই আমাদের ধর্ম্মাচরণ সার্থক হয় না। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রখানি যে পবিত্র রসধারায় নিত্য সিক্ত হইয়া সরস হইয়া রহিয়াছে, সেই রসধারার সহিত ইহার পরিচয় ঘটা সহজ হয় না।

আর এক কথা। ভগবান্ আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই তাহারা কেবল বাহিরের রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে আপনাদিগকে ছড়াইয়া রাখিতে চায়, ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে জানিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বড় হয় না। এইরূপ রস-গন্ধাদির মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহত করিয়া অন্তরাত্মার অভিমুখীন করাই হইতেছে,—আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু যাঁহারা সাধারণতঃ বাহিরে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আসলে বিষয়েরই উপাসনা করেন। কেবল মাত্র বাহিরের পুণ্যানুষ্ঠানে যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারা এখনও শাস্ত্রসম্মত ঋষিকথিত আধ্যা-

স্তিকতার প্রথম সোপানেও আরোহণ করেন নাই; এখনও তাঁহারা আত্মানুভূতি, আত্মপ্রীতির সন্ধান পান নাই।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই বাক্যটীর দ্বারা অনেকে মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা যে মূর্ত্তিপূজার সমর্থক তাহা ত আমাদের মনে হয় না। কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা বা উপাসনা করা যায় না বলিয়া সাধকেরা তাঁহার ধারণা ও উপাসনা করিবার জন্য সগুণ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ত অতি সত্য কথা। আমরা দেখিতে পাই যে, গীতাও এই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতেও অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনাই সহজ; তাই সেখানে অতি সরল সহজভাবে বলা হইয়াছে—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" যাঁহারা ব্যক্তরূপকে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মের অব্যক্ত রূপের উপর আসক্ত হন, তাঁহাদের বড় বেশী কষ্টভোগ করিতে হয়; কারণ, "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" দেহের উপর যাহাদের আত্মাভিমানটুকু এখনো বজায় আছে,তাহাদের বড় কষ্টে এই অব্যক্ত পথের পথিক হইতে হয়। ফুলফলভরাবনত বৃক্ষ যেমন তাহার অব্যক্ত বীজমূর্ত্তিরই বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তভাব—তেমনি এই নানা বিচিত্রতাময়ী সৃষ্টিরচনাও সেই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তভাব। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" এই শ্লোকাংশেও গীতারই ঐ কথাটী,—ঐ ব্যক্ত জগতের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া উপাসনা করিবার কথাটীই ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। এই জন্যই সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধিপতি বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া সেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধিপতির উপাসনা করিবার জন্য কোন কপোল-কল্পিত মূর্ত্তির প্রয়োজন দেখি না। শ্রুতি বলিতেছেন,—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই জগতের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি যখন তাঁহার এই দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি করুণা করিয়াই আত্মসৃষ্ট নামরূপের মধ্যে অনুস্যূত হইয়াই রহিয়াছেন, তখন আর ব্যক্ত জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিব কেন? তবে কেন আমরা তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইবার এই সহজ পথটী ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনভিমতে স্বকপোল-কল্পিত মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব? তিনি ত বিশ্বেশ্বর-মূর্ত্তিতে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তবে আর তাঁহার উপাসনার জন্য ক্ষুদ্র মৃণ্ময় প্রভৃতি মূর্ত্তির প্রয়োজন কি? ঐ যে শ্রুতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন,—"যস্য অগ্নিরাস্যং দ্যৌ র্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিশ্চ সূর্য্যশ্চক্ষুঃ দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" অর্থাৎ অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণ, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিঙ্মণ্ডল যাঁহার শ্রবণ সেই লোক সকলের অন্তরাত্মা পুরুষকে নমস্কার" আজও কি আমাদের এই বদ্ধ শ্রবণ-যুগলে শ্রুতির ঐ গম্ভীর নিনাদ পৌঁছিবে না? আমাদের নিত্য সম্মুখীন এই বিরাট পুরুষকে অবলোকন করিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবের,যে ভক্তির তরঙ্গ নাচিয়া উঠে—ভগবানের সর্ব্বব্যাপিতা যেরূপ পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের নিজের হাতে গড়া কল্পিত মৃণ্ময় প্রভৃতি মূর্ত্তি হইতে কি তাহা কখনও সম্ভব? কবি যেমন তাঁহার কাব্যখানির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াই থাকেন, তেমনি এই অনন্তবৈচিত্র্যময় বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তাও তাঁর এই স্বরচিত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াই রাখিয়াছেন। তাই ত এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কখন তাঁহার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপ দেখিয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়ি, কখন বা "আনন্দময়"রূপ দেখিয়া সুখী হই, আবার কখন বা "শান্তং শিবং" রূপ দেখিয়া শান্তি লাভ করি।

বিদ্যাসাগর।

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাৎসরিক স্মৃতি সভার শ্রীরসময় লাহা কর্ত্তৃক বিতরিত)

(১)

শক্তিশালী পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাত্মন্,
সাগর ছেঁচা মাণিক তুমি, বাংলা মায়ের বুকের ধন;
বঙ্গবাসার মাথার মণি, বঙ্গদেশের অমর মান!
কর্ম্ম তোমার বিজয় কিরীট, ধর্ম্ম তোমার বিরাট দান।
হৃদয় তোমার দুঃস্থ সেবায়, বিদ্যায় তুমি উচ্চ শির;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(২)

বহিত তোমার মানস-মাঝে ভক্তি-নদী নিরন্তর,
মাকে দেখতে অন্নপূর্ণা বাপকে দেখতে মহেশ্বর;
সকল দৈন্য তুচ্ছ করে' তাঁদের সেবায় সঁপে প্রাণ,
বিদ্যার্জ্জনে কৃতী হয়ে', করলে দেশে বিদ্যাদান!
"বিদ্যাসাগর কলেজ" যে আজ কীর্ত্তির তব শ্রীমন্দির;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৩)

ছিলে তুমি খাঁটি মানুষ—ধারতে না ধার সুবিধার,
পাঁচশো টাকার চাকরি ছাড়তে দেখনি তাই অন্ধকার;
পৌরুষ তোমায় দেখিয়ে দিলে ভবিষ্যতের দীপ্ত যশ;
ভাগ্য তোমার হাতেই গড়া ছিলে নাকো ভাগ্যের বশ।
অর্থ তোমার আশ্রয় নিল, লভিতে পথ সদ্‌গতির,
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৪)

যত্নে তোমার উদ্‌ঘাটিত প্রথম নারী-শিক্ষাগার;
মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'তে দুঃখে বঙ্গ বিধবার;
তাদের পুনঃ পরিণয়ে শাস্ত্র বিধি বলবান্—
দেখিয়ে ছিলে, ঢেলে আপন স্বাস্থ্য-জীবন-অর্থ-মান।
সংস্কৃত-শিক্ষা সুগম, প্রভায় তব "কৌমুদী"র।
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৫)

সাহিত্যিকের ব্যথার ব্যথী করতে আদর প্রতিভার;
সাক্ষ্য তাহার—জন্মদাতা অমিত্রাক্ষর কবিতার।
বঙ্গভাষার জনক তুমি, গঙ্গার যথা হিমালয়;
"সীতার বনবাসে" তাহার লীলাভঙ্গের পরিচয়।
তোমার পুণ্যে সে ভাষা আজ সম্মানিতা পৃথিবীর;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৬)

আদর্শ আজ তুমিই তাঁদের যাঁরা দেশের সুসন্তান,
তোমার স্মৃতিপূজায় সবাই শ্রদ্ধায় করেন অর্ঘ্যদান।
হৃদয় তোমার প্রয়াগ-ক্ষেত্র শিক্ষা এবং করুণার
সম্মিলিত যুগল ধারা জাহ্নবী ও যমুনার;—
অন্তর্গতা সরস্বতী—তীর্থ তুমি ত্রিবেণীর;
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৭)

সহজ সরল অসন বসন—মোটা চাদর, মোটা থান,
দেশী চটির দর্পে তোমার বাড়িয়ে ছিলে জাতির মান।
স্বাধীন চিন্তা বিলাস তোমার, ত্যাগেই তোমার মহাসুখ,
যেমনি শক্তি তেমনি ক্ষমায় প্রস্ফুটিত হাস্য মুখ।
ললাট তোমার কি উন্নত-তুষার স্বচ্ছ হিমাদ্রির!
ধর এ দীন কবির পূজা, হে প্রণম্য মানুষ বীর।

(৮)

খুলে একাই অন্নসত্র দেখে দেশের মন্বন্তর!
"বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর আর্ত্তশরণ হে ঈশ্বর"—
উল্লাস ধ্বনি দীনের কণ্ঠে; গাইলে দশে তোমার জয়!
লক্ষ্মীর বরপুত্র যত রৈল চেয়ে সবিস্ময়!
তোমার নামে হয়না কাহার সসম্ভ্রমে নম্র শির?
ধর এ দীন কবির পূজা হে প্রণম্য মানুষ বীর।

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মশাস্ত্র।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে সিদ্ধান্ত-শিখামনী সর্ব্ব প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থে লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। কথিত আছে যে এই গ্রন্থ-লিখিত শাস্ত্র, সর্ব্বপ্রথমে তেলঙ্গ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঋষি শিবযোগী রেণুকাচার্য্য দ্বারা কন্নাড়-দেশপ্রবাসী অগস্ত্য ঋষির নিকট বিবৃত হয়। হৈসুর-নিবাসী রাঃ রাঃ বৈঃ বীরসংগপ্পা, সংস্কৃত মূল ও ব্যাখ্যান এবং উহার অনুবাদ কন্নাড় ভাষায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন। বাদামী (ভূতপূর্ব্ব বাতাজী) নগর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে মহাকূট নামক লিঙ্গায়তদিগের একটি তীর্থস্থান আছে। তথা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে লিঙ্গায়ত-গণ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মলপ্রভানদীতীরে শিবমন্দির নামক একটি আশ্রম এবং ঋষিকুল বিদ্যালয়ের অনুকরণে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছে। আমি তথায় এই গ্রন্থের একখানি প্রাচীন পত্রলিপি দেখিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

স্বরূপনির্ণয়।

(তিনি) সচ্চিৎসুখস্বরূপ, লক্ষণশূন্য, ভেদ-রহিত, নিরাকার এবং সকল-বিপ্লব-নিবারিত (অবি-নাশী)। তিনি বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ-রহিত (নির্বিভাজ) প্রপঞ্চাতীত বৈভব (অলৌকিক-সামর্থ্য-সম্পন্ন) এবং প্রত্যক্ষাদি (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি) প্রমাণের অগোচর। তিনি স্বপ্রকাশ, নীরোগ, উপমারহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ (সর্ব্বত্র গতি-শালী, সর্ব্বব্যাপী) শান্ত, সর্ব্বশক্তিমান এবং নির-

ক্লুশ (প্রতিবন্ধরহিত)। তিনি শিব, রুদ্র, মহাদেব, ভব প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েন। তিনি অদ্বিতীয়, অনির্দ্দেশ্য, সনাতন এবং পরব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে চেতনাচেতন জগৎ লীন ছিল। তিনি সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে লীন থাকিয়া আপন তেজ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহাই বিচিত্র।

শৈবমত নিরূপণ।

শৈবমত চারিশাখায় বিভক্ত। এই চারি শাখার নাম, (১) বাম, (২) দক্ষিণ (৩) মিশ্র এবং (৪) সিদ্ধান্ত। বামশাখাভুক্ত শৈবগণ শক্তির উপাসনা করে। দক্ষিণশাখাভুক্তগণ ভৈরবের উপাসনা করে, মিশ্র শৈবগণ সপ্ত মাতৃর পূজা করে এবং সিদ্ধান্তীগণ বেদকে অনুসরণ করে।

শৈবশাস্ত্রনিরূপণ।

বেদোক্ত শৈবধর্ম্মের প্রতিপাদক এবং বেদ বহিষ্কৃত জৈন ও চার্ব্বাকমতের উচ্ছেদকারী এই সিদ্ধান্ত-শিবাগম-শাস্ত্র বেদসম্মত বলিয়া মান্য হয়। বেদ এবং সিদ্ধান্ত উভয়েই একমত প্রতিপাদন করে, এইজন্য বেদ ও সিদ্ধান্ত সমপ্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত। কামিকা অবধি বাতুলা পর্য্যন্ত যে আগম কথিত আছে তাহাকে সিদ্ধান্ত-মহাতন্ত্র কহে। তাহার উত্তরভাগে বীর-শৈব-(লিঙ্গায়ত) মতের বিবরণ এবং পূর্ব্বভাগে সাধারণ-শৈবমতের বিবরণ আছে।

বীরশৈব নিরূপণ।

যাহারা শিবস্বরূপী ব্রহ্মবিদ্যা মধ্যে বিশেষভাবে রমণ (অভ্যাস) করে, তাহাদিগকে বীর-শৈব বলে। 'বিদ' শব্দ বিদ্যা-অর্থবোধক। সেই বিদ্যা শিব (ব্রহ্ম) এবং জীবমধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞান করাইয়া দেয়। যাহারা এই বিদ্যাকে অভ্যাস করে, তাহাদিগকে বীরশৈব কহে। যে জ্ঞান বেদান্ত হইতে উৎপন্ন তাহাকে বিদ্যা বলে। সেই বিদ্যাকে যে অভ্যাস করে সে বীরমধ্যে গণ্য হয়। বীরশৈবগণ ভক্তাদিস্থল ভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত।

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বিবরণ।

বীরশৈবদিগের শাস্ত্র, স্থল ভেদ ধর্ম্মভেদ এবং অধিকারভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা—

(১) ভক্তস্থল, (২) মাহেশ্বরস্থল, (৩) প্রসাদিস্থল, (৪) প্রাণলিঙ্গস্থল, (৫) শরণস্থল এবং (৬) ঐক্যস্থল।

১। ভক্তস্থল পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। (১) পিণ্ডস্থল, (২) পিণ্ডবিজ্ঞানস্থল, (৩) সংসারহেয়-স্থল, (৪) দীক্ষাস্থল, (৫) লিঙ্গধারণস্থল, (৬) বিভূতিধারণস্থল, (৭) রুদ্রাক্ষধারণস্থল, (৮) পঞ্চাক্ষরী জপস্থল, (৯) ভক্তমার্গস্থল, (১০) গুরু-অর্চ্চনস্থল, (১১) লিঙ্গার্চ্চনস্থল, (১২) জঙ্গ-মার্চ্চনস্থল, (১৩) গুরুপ্রসাদস্থল, (১৪) লিঙ্গ-প্রসাদস্থল এবং (১৫) জঙ্গমপ্রসাদস্থল।

ভক্তস্থলে তিন প্রকার দানের উল্লেখ আছে। (১) উপাধিদান, (২) নিরুপাধিদান এবং (৩) সহজদান।

দীক্ষাস্থল ত্রিবিধ। (১) বেধারূপা, (২) ক্রিয়ারূপা, এবং (৩) মন্ত্ররূপা।

২। মাহেশ্বর স্থল নবম ভাগে বিভক্ত। (১) মাহেশ্বরস্থল, (২) লিঙ্গনিষ্ঠস্থল, (৩) পূর্ব্বাশ্রয়নিরসনস্থল, (৬) অষ্টমূর্ত্তিনিরসনস্থল, (৭) সর্ব্বগত্বনিরসনস্থল, (৮) শিবজগন্ময়স্থল এবং (৯) ভক্তদৈহিকলিঙ্গস্থল।

৩। প্রসাদিস্থল সপ্তমভাগে বিভক্ত। (১) প্রসাদিস্থল, (২) গুরুমাহাত্ম্যস্থল, (৩) লিঙ্গ-প্রশংসাস্থল, (৪) জঙ্গমগৌরবস্থল, (৫) ভক্ত-মাহাত্ম্যস্থল, (৬) শরণকীর্ত্তনস্থল এবং (৭) শিবপ্রসাদমাহাত্ম্যস্থল।

৪। প্রাণলিঙ্গস্থল পঞ্চভাগে বিভক্ত (১) প্রাণলিঙ্গস্থল, (২) প্রাণলিঙ্গার্চ্চনস্থল, (৩) শিবযোগসমাধিস্থল, (৪) লিঙ্গনিজস্থল এবং (৫) অঙ্গলিঙ্গস্থল।

৫। শরণস্থল চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) শরণ স্থল, (২) তামস-বর্জ্জনস্থল, (৩) নির্দ্দেশ-স্থল এবং (৪) শীলসম্পাদনস্থল।

৬। ঐক্য স্থলও চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) ঐক্যস্থল, (২) আচারসম্পত্তিস্থল, (৩) এক-ভাজনস্থল এবং (৪) সহভোজনস্থল।

উপরি উক্ত ভক্তাদি ষষ্ঠস্থলে যে সকল সদাচার বর্ণিত আছে, তাহা যথারীতি পালন করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য ষষ্ঠপ্রকার লিঙ্গস্থল আছে।

১। ভক্তলিঙ্গস্থল নবম ভাগে বিভক্ত। (১) দীক্ষাগুরুস্থল, (২) শিক্ষাগুরুস্থল, (৩) প্রজ্ঞাগুরুস্থল, (৪) ক্রিয়ালিঙ্গস্থল, (৫) ভাব-

লিঙ্গস্থল, (৬) জ্ঞানলিঙ্গস্থল, (৭) স্বয়ংস্থল, (৮) চরস্থল এবং (৯) পরস্থল।

২। মাহেশ্বরলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) ক্রিয়াগমস্থল, (২) ভাবাগমস্থল, (৩) জ্ঞানাগমস্থল, (৪) সকায়স্থল, (৫) অকায়স্থল, (৬) পরকায়স্থল, (৭) ধর্ম্মাচারস্থল, (৮) ভাবাচারস্থল এবং (৯) জ্ঞানাচারস্থল।

৩। প্রসাদিলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) কায়ানুগ্রহস্থল, (২) ইন্দ্রিয়ানুগ্রহস্থল, (৩) প্রাণানুগ্রহস্থল, (৪) কায়ার্পিতস্থল, (৫) করণার্পিতস্থল, (৬) ভাবার্পিতস্থল, (৭) শিষ্যস্থল, (৮) শুশ্রূষাস্থল এবং (৯) সেব্য-স্থল।

৪। প্রাণলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) আত্মস্থল (২) অন্তরাত্মস্থল (৩) পরমাত্ম স্থল (৪) নির্দ্দেহাগমস্থল, (৫) নির্ভাগগমস্থল, (৬) নষ্টাগমস্থল (৭) আদিপ্রসাদস্থল (৮) অন্তঃপ্রসাদস্থল এবং (৯) সেব্যপ্রসাদস্থল।

৫। শরণলিঙ্গস্থল, দ্বাদশভাগে বিভক্ত। (১) দীক্ষাপাদোদকস্থল (২) শিক্ষাপাদোদক স্থল (৩) জ্ঞানপাদোদক স্থল (৪) ক্রিয়ানিষ্পত্তিক স্থল (৫) ভাবনিষ্পত্তিক স্থল (৬) জ্ঞাননিষ্পত্তিক স্থল (৭) পিণ্ডাকাশাস্থল (৮) বিন্দাকাশাস্থল, (৯) মহাকাশাস্থল (১০) ক্রিয়াপ্রকাশস্থল (১১) ভাবপ্রকাশস্থল এবং (১২) জ্ঞানপ্রকাশস্থল।

৬। ঐক্যলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। (১) স্বীকৃতপ্রসাদৈকস্থল (২) শিষ্টোদনস্থল (৩) চরাচরলয়স্থল (৪) ভাণ্ডস্থল (৫) ভাজন-স্থল (৬) অঙ্গালেপস্থল (৭) স্বপরাজ্ঞাস্থল (৮) ভাবাভাববিনাশস্থল (৯) জ্ঞানশূন্যস্থল।

ভক্তস্থল।

শিব-(ব্রহ্ম) শক্তি হইতে উৎপন্ন এই সংসারে শুদ্ধান্তঃকরণ (নিষ্পাপ) প্রাণ, পিণ্ডনামে অভিহিত হয়। যিনি পুণ্যময়, ক্ষীণপাপ (অপাপ-বিদ্ধ) শুদ্ধাত্মা, তাঁহাকে পিণ্ড কহে। কেবলমাত্র শিব (ব্রহ্ম) এই পিণ্ড নামের অধিকারী। তিনি সচ্চিদা-নন্দময় পরমেশ্বর। সেই নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্প্রপঞ্চক পিণ্ডের অংশ হইয়াও অনাদি-কালীন অজ্ঞানতাবশতঃ জীবগণ উক্ত (জীব) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ও নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতি সর্ব্বদা সেই মায়াময় পরমেশ্বরের শরণপথে রহিয়াছে এবং তিনি তাহা-দিগকে যথারীতি নিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন।

চন্দ্রকান্তমণিমধ্যে যেমন জল, সূর্য্যকান্তমণি-মধ্যে যেরূপ অগ্নি, বীজমধ্যে যথা অঙ্কুর স্বভা-বতঃ অবস্থান করে, আত্মা মধ্যে সেইরূপ শিব (ব্রহ্ম) অবস্থিত আছেন। সূর্য্যমধ্যে যেরূপ বিম্বত্ব এবং প্রতিবিম্বত্ব উভয়ই বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মমধ্যে সেই-রূপ জীব এবং ঈশ্বর একত্রে বর্ত্তমান আছে। চিৎ-স্বরূপ পরতত্ত্বে ভোক্তৃত্ব, ভোজ্যত্ব এবং প্রেরকত্ব এই তিন গুণই বর্ত্তমান আছে। সেই পরব্রহ্ম মধ্যে সত্ব, রজ এবং তমোময়(ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে অনাদিসিদ্ধ কহে। তাহাদিগের বৈষম্যহেতু এই ত্রিবিধ বস্তু (ভোক্তৃত্বাদি) সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিঞ্চিৎ সত্বগুণ এবং তামসগুণসম্পন্ন ও রজগুণ-সম্পন্ন চৈতন্যকে ভোক্তৃ (জীব চৈতন্য), কহে। অতিশয় তামসগুণসম্পন্ন চৈতন্য, ভোজ্য (রসাদি) নামে অভিহিত হয়।

ভোক্তা, ভোজ্য এবং প্রেরয়িতা এই তিনকে বস্তু কহে। ব্রহ্মস্বরূপ অখণ্ড তথাপি সত্ব রজ এবং তম এই গুণত্রয়ের অল্পাধিক্যবশতঃ উক্ত বস্তু-ত্রয় কল্পিত হয়। এই ব্রহ্মস্বরূপ মধ্যে শুদ্ধোপাধি শঙ্কর মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। মিশ্র-উপাধি-যুক্ত ভোক্তাকে পশু কহে। ভোজ্য অব্যক্ত (অস্পষ্ট) চৈতন্য এবং কেবল তামসগুণসম্পন্ন। প্রেরক শম্ভু সর্ব্বজ্ঞ। কিঞ্চিদজ্ঞ জীবনামে অভি-হিত হয়। যাহা অত্যন্ত গূঢ়(গুপ্ত) চৈতন্য, তাহাকে জড় কহে।

উপাধি দুই প্রকার। (১) শুদ্ধোপাধি এবং (২) অশুদ্ধোপাধি। শুদ্ধ উপাধিই শ্রেষ্ঠ মায়া। ইহা স্বাশ্রয়া (নিজস্বরূপে আশ্রিত) এবং মোহ-কারিণী।

অবিদ্যাকে অশুদ্ধ উপাধি কহে। সেই অবি-দ্যার সম্বন্ধবশতঃ পরমাত্মা মোহান্বিত হন। অবিদ্যা-শক্তির ভেদমূলে নানাপ্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে। মায়াশক্তির বশে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা নিত্যমুক্ত হইয়াও নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন। জীব অল্প (সামান্য) কর্ম্মকারী, এইজন্য অল্পজ্ঞ এবং বদ্ধ

(সীমাবদ্ধ) অনাদিকাল হইতে দেহধারী থাকিয়া অবিদ্যার মোহে বিস্মৃতবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনাপন কর্ম্মানুসারে দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারে জাতি, আয়ু, ভোগ, বৈশম্য, সুখদুঃখ মধ্যে চক্রনেমীবৎ পরিভ্রমণ করে।

পরমেশ্বর কর্ম্মরূপী যন্ত্রের আবর্ত্তমে আকৃষ্ট প্রাণিমাত্রের (কর্ম্মাকর্ম্মের) প্রেরক এবং সাক্ষী-স্বরূপ। তিনি প্রাণিমাত্রের প্রেরক হেতু তাহা-দিগকে কল্যাণকর পথ (সৎপথ) এবং জন্ম-মরণ-রহিত মোক্ষপথের উপদেষ্টা।

আপন কর্ম্মের পরিচালক হইলে (কর্ম্মভোগ শেষ হইলে) অসৎ ইচ্ছা নাশ প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় জীবের মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ কর্ম্মের উদয় হইলে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং (শিব) (পরমেশ্বরের) কৃপায় উত্তম প্রকার শিবশক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) উৎপন্ন হয়। যে জীব এবম্প্রকার দেহমধ্যে (জন্মমধ্যে) মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পিণ্ড কহে। ইতি পিণ্ডস্থল।

৺রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাদুর।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

বিগত ২৮শে আষাঢ় রবিবার প্রত্যূষে ৫৷৷৹টার সময় গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় ৮৮ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দধামে যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখে কলিকাতা পঞ্চাননতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন—দারিদ্র্যহেতু পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবারও ইচ্ছা বা সামর্থ্য ছিল না—কিন্তু পরিশ্রম স্বাবলম্বন, চেষ্টা ও বুদ্ধিশক্তির সহায়ে মানুষ কিরূপে উন্নতির উচ্চ-শিখরে অধিরোহণ করিতে পারে—ইঁহার জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শৈশবে ইনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা আদর্শ-বাঙ্গলা-বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই শিক্ষকেরা তাঁহার অসাধারণ শ্রমশীলতা, তীক্ষ্ণমেধা ও প্রখর বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঐ স্কুলে দুই বৎসর থাকিবার পর স্বনামধন্য David Hare মহোদয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলুটোলা স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রদের অন্যতমরূপে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করেন এবং তথা হইতে হিন্দু-কালেজে প্রবেশ করিয়া অবশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়াশুনা করিয়া অধ্যয়ন শেষ করেন। ব্রহ্মমোহন বাবু হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষাতেই উচ্চ-বৃত্তি লাভ করিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে যে সুপ্রসিদ্ধ Woodrow সাহেবও মাঝে মাঝে কঠিন কঠিন অঙ্ক লইয়া তাঁহাকে ডাকিতেন এবং ব্রহ্মমোহন বাবু স্বচ্ছন্দে ঐ সকল অঙ্ক কষিয়া দিতেন। তিনি সিনীয়র বৃত্তি পরীক্ষাতেও (Senior Scholarship Examination) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেই যুগের সিনীয়রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণগণের মধ্যে আর কেহই বাঁচিয়া রহিলেন না। তিনি তাঁহার পড়াশুনার ব্যয় আপনিই চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাকে তাঁহার স্কুলকলেজে পড়াশুনার জন্য সর্ব্বসমেত ৬৲ টাকা মাত্র ব্যয় করিতে হইয়াছিল। 'বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও তাঁহাকে খরচ করিতে হয় নাই।' কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৫৬ সালে ব্রহ্মমোহন বাঁকুড়া জেলার স্কুলসমূহ দেখিবার জন্য ডেপুটি-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বদলী হইয়া হাবড়ায় আসেন। এই সময় কলিকাতায় Education Gazette নামক পত্রিকাখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ঐ কাগজে 'রণজিৎ সিংহের জীবন-বৃত্তান্ত' লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। হাবড়ায় অবস্থানকালে তিনি কলিকাতা হুঁকাপটীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—তাহার নাম Model School। বর্দ্ধমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল সুবিখ্যাত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তৎপরে প্রায় দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া তিনি হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি এরূপ সুচারুরূপে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন ও সকলের প্রতি এরূপ বিনয়-নম্র ব্যবহার করিতেন, যে ছাত্র, শিক্ষকও কর্তৃপক্ষ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ১৮৭৭ সালে সহকারী স্কুল-ইন্সপেক্টরের পদ প্রথম সৃষ্টি হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথম আপন গুণে ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে কুচবেহার রাজ-ষ্টেটে শিক্ষা বিভাগের উৎকর্ষ সাধন জন্য তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হন। তিনি চারি মাস কাল সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি উহার উন্নতিকল্পে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয় তদনুযায়ী কার্য্য

অদ্যাপিও বলিয়া আসিতেছি। পরে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার স্থানে স্কুল-ইন্সপেক্টর নির্ব্বাচিত হ'ন এবং সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরে গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। বহুবৎসর শিক্ষাকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ব্রজমোহন বঙ্গদেশে নানাস্থানে স্কুল-পাঠশালাদি খুলিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ-অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম মাতৃভাষায় জ্যামিতি প্রণয়ণ করেন। উহার পরিভাষা সম্পূর্ণ তাঁহারই রচিত। এবং ১৮৭২ সালে উহা মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত জ্যামিতি ত্রিকোণ-মিতি প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গভাষায় গণিত বিদ্যাশিক্ষা প্রদানে সোপান স্বরূপ দিন। একখানি ভূগোলের পুস্তকও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই।

তিনি ১৮৮৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও Central Text Book Committeeর সভ্য হন। সুযোগ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Scienceএর তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। Sir Stnart Campbell এর শাসনকালে ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; এই পরীক্ষাকে Statutory Civil Sariroe পরীক্ষা বলা হইত; ব্রজ-মোহন বাবু তিন বৎসরই এই পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার অন্তর অতি মহৎ ছিল। ক্ষমা, সৌজন্য, সকলের প্রতি বিনয়-নম্র ব্যবহার, শিশুর মত সারল্য তাঁহার চিত্তের আভরণ স্বরূপ ছিল। হিংসা বিদ্বেষ তাঁহার মনে কদাপি স্থান পায় নাই। তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, এবং ধনী নির্ধনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এক সময়ে এইরূপ ধারণা প্রবল ছিল যে হিব্রু ভাষাই প্রাচীনতম ভাষা এবং অন্যান্য ভাষা উহা হইতে উৎপন্ন। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে সে ধারণা চলিয়া গিয়াছে এবং বিদ্বৎমণ্ডলী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রীক, ইটালীয় এবং সংস্কৃত ভাষার মূল একই আকরের মধ্যে নিহিত। রোমন ক্যাথলিক প্রচারকগণ সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া কোন কোন বিষয়ে বাইবেলের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে বাইবেলে যাহা আছে তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহারা তিব্বতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, পাপস্বীকার উপবাস সংসারত্যাগ ও মালাজপ উভয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রায়ই এক। কিন্তু কেমন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এই ঐক্য আসিয়া দাঁড়াইল? পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারমূলক ধর্ম্ম। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। গ্রীস দেশেও তাঁহাদের প্রভাব বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীসীয় প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে এইরূপ অনেক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়া গ্রীসীয় পরি-চ্ছদে শোভা পাইতেছে। বাইবেলের ভিতরেও এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। বৌদ্ধজাতকের অনেক গল্প বাইবেলের উভয় খণ্ডের ভিতরে স্থান পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে সেণ্ট জোসেফ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সলোমনের বিচার-বিবরণের ছায়া বৌদ্ধগ্রন্থের ভিতরে রহিয়াছে; পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র। একজনের দুই স্ত্রী ছিল, প্রথম স্ত্রীর পুত্র হয় নাই। দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি পুত্র হইয়াছিল। প্রথম স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের ভার প্রথম স্ত্রীর উপরে অর্পিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে উভয় স্ত্রীই ঐ সন্তানের দাবী করে। যিসাকার নিকট তাহারা বিচারার্থী হইয়া গমন করে। যিসাকা বলিলেন দুইজনের মধ্যে যে বলপূর্ব্বক সন্তানটি ছিনাইয়া লইতে পারিবে, সন্তানটি তাহারই। যখন শিশুটি উভয়ের বলপ্রয়োগফলে কাঁদিয়া উঠিল, একজন শিশুর ক্রন্দন শ্রবণে নিরস্ত হইয়া গেল। যিসাকা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন যে শেষোক্ত স্ত্রীলোকই তাহার প্রকৃত মাতা। Prodigal sonএর কাহিনীও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে রহিয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস অটল থাকিলে জলের উপর দিয়া চলা যায় এবং বিশ্বাস হারাইবা-মাত্র জলে নিমগ্ন হইতে হয়, বাইবেলের এই কাহি-নীও বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকে দেখা যায়। এইরূপ সাদৃশ্য

আকস্মিকতার ফলে হয় নাই। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে লূকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকখানি রুটি ও কয়েকটি মৎস্য লইয়া অসংখ্য লোককে খাওয়াইবার বৃত্তান্ত বাইবেলে রহিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের কাহিনীর সহিত উহার পার্থক্য এই যে একখানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচশত লোককে খাওয়াইয়াও এত উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল যে তাহা পর্ব্বত গুহায় নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে খৃষ্টের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধগণের সংস্পর্শে এইরূপ অনেক কাহিনী পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মোক্ষমূলার নিজে সিদ্ধান্ত না টানিয়া পাঠকের উপর সিদ্ধান্তের ভার দিয়াছেন। আমরা মোক্ষমূলারের ইঙ্গিতে বলিতে চাই যে অনেক বিষয়ে বাইবেল বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ঋণী।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের উক্ত সিদ্ধান্তই কাণ্ট প্রভৃতি অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন, নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ হইতে ভিন্ন, এই যে কিছু অদৃশ্য দ্রব্য তাহাকেই তাঁহারা আপন গ্রন্থে 'বস্তুতত্ত্ব' বলিয়া এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে 'বহির্দৃশ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নামরূপাত্মক বহির্দৃশ্যকে 'মিথ্যা' বা 'নশ্বর' এবং মূল দ্রব্যকে 'সত্য' বা 'অমৃত' এইরূপ বলিবার রীতি আছে। সাধারণ লোক 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; এবং লোকব্যবহারেও লাখ টাকা পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাকা পাইবার কথা কাণে শোনা, এবং লাখ টাকা হাতে পাওয়া,—ইহাদের মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, আছে তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। এইজন্য কাণাঘুসা কোন কথা যে শুনে এবং চক্ষে যে দেখে, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহা বলিবার জন্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে, 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' এই বাক্য আসিয়াছে (বৃ. ৫. ১৪. ৪)। কিন্তু টাকা পদার্থটি—'টাকা' দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ বর্ত্তুল আকৃতিতে, সত্য কিনা—যে শাস্ত্র ইহার নির্ণয় করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের এই আপেক্ষিক ব্যাখ্য কি উপযোগী? ব্যবহারেও দেখা যায় কোন ব্যক্তির কথায় যদি মিল না থাকে, যদি সে এখন এ কথা পরক্ষণে আর এক কথা বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। তাহা হইলে, 'টাকার' নামরূপের প্রতি (আভ্যন্তরিক দ্রব্য সম্বন্ধে নহে) ঐ ন্যায়ই প্রয়োগ করিয়া টাকাকে মিথ্যুক কিংবা মিথ্যা বলিতে বাধা কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুগ্রাহ্য নামরূপ আজ টাকা হইতে বাহির করিয়া লইয়া কাল তাহার স্থানে 'চেন' কিংবা 'পেয়ালা' এই নামরূপ দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের মিল থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া চোখে যাহা দেখা যায় তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একীকরণের যে মানসিক ক্রিয়াতে জগৎজ্ঞান হয় সেই ক্রিয়াও চোখে দেখা যায় না অতএব তাহা মিথ্যা এইরূপ বলিতে হয়; সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিতে হয়। এই বাধা এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহা চোখে দেখা যায় এইরূপ সত্যকে, সত্যের এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া, যাহা অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় লোপ পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায় না তাহাই সত্য, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং সেইরূপ মহাভারতেও—

সত্যং নামাঽব্যয়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ। †

অর্থাৎ—"যাহা অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্তন কখনই হয় না, তাহাই সত্য"—এইরূপ সত্যের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে (মভা. শাং. ১৬২. ১০)।

---

* কাণ্টের *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে এই বিচার করা হইয়াছে। নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি 'ডিং আন্ জিশ্' (Ding an sich—Thing in itself) এইরূপ নাম দিয়াছেন এবং ইহারই ভাষান্তর আমরা বস্তুতত্ত্ব করিয়াছি। নামরূপের অবভাস কাণ্টের 'এরশায়নুঙ্' (Ercheinung—appearance)। কাণ্টের মতে 'বস্তুতত্ত্ব' অজ্ঞেয়।

† গ্রীন real এর (সৎ সত্য) ব্যাখ্যা করিবার সময় "whatever anything is *really*, it is *unalterably*" এইরূপ বলিয়াছেন (*Prolegomena to Ethics* § 25)। গ্রীনের এই ব্যাখ্যা এবং মহাভারতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা এই দুই অন্ততঃ একই।

এখন এক কথা বলা, আর এক সময়ে আর-এক কথা বলা—এই ব্যবহারকে যে মিথ্যা ব্যবহার বলা হয়, ইহাই তাহার বীজ। সত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে,—চোখে দেখিলেও ক্ষণ পরিবর্তনশীল নামরূপ মিথ্যা; এবং চোখে না দেখা গেলেও নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অমৃত বস্তুতত্ত্বই সত্য, এইরূপ অগত্যা বলিতেই হয়। ভগবদ্‌গীতাতে "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" (গী. ৮. ২০; ১৩.২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামরূপাত্মক শরীর লোপ পাইলেও যাহা লোপ পায় না তাহা অক্ষর ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এইরূপ যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মের নিরূপণে, "যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইহার বদলে 'ভূতগ্রামশরীরেষু' এইরূপ পাঠভেদে এই শ্লোকই পুনর্ব্বার আসিয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৯. ২৩)। সেইরূপ আবার, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যও ইহাই। বেদান্তে 'অলঙ্কার' মিথ্যা এবং 'সুবর্ণ' সত্য এইরূপ যখন বলা হয়, তখন অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অথবা মাটিতে গিল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। 'মিথ্যা' শব্দ এইস্থানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ উপরকার বাহ্য দৃশ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরিক তাত্ত্বিক দ্রব্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। কারণ, তাত্ত্বিক দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তত্ত্ব আছে বেদান্তী তাহাই দেখেন; তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারেও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহনা গড়াইবার জন্য আমরা অনেক মজুরী দিলেও আপৎকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করিবার সময়, পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে "গহনা গড়াইতে তোলা-পিছু কত খরচা হইয়াছে আমি তা দেখিব না; তুমি এই গহনা যদি সোনার দরে দাও ত কিনিব!" বেদান্তের পরিভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে "পোদ্দারের চোখে গহনা মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই সত্য" এইরূপ বলিতে হয়। নূতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় উক্ত গৃহের সুন্দর আকার (রূপ.), অথবা সুবিধাজনক রচনা (আকৃতি) করিতে কত খরচা হইয়াছে সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমস্‌লা ও কাঠের দামে আমাকে বিক্রয় কর, খরিদ্দার এইরূপ বলিয়া থাকে।

নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য বেদান্তের এই উক্তির অর্থ উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ চক্ষে দেখা যায় না এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবে না; একই দ্রব্যের নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক স্থলকৃত কিংবা কালকৃত দৃশ্য নশ্বর অতএব মিথ্যা, এবং এই সমস্ত নামরূপাত্মক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত অবস্থিত অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয় দ্রব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহনা মিথ্যা এবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে স্বর্ণকার, তাঁহার কারখানায় মূল এক দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দিয়া তাহার সোনা, পাথর, কাঠ, জল, বায়ু প্রভৃতি, সমস্ত গহনা গড়া হয় বলিয়া বেদান্তী পোদ্দার অপেক্ষা আরও কিছু বেশী তলাইয়া সোনা, রূপা কিংবা পাথর প্রভৃতি নামরূপকে গহনারই ন্যায় মিথ্যা জানিয়া এই সমস্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্তুতত্ত্বের নামরূপ আদি কোন গুণই না থাকা প্রযুক্ত উহা নেত্রাদির গোচর কখনই হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আঘ্রাণ না করিলেও, হাতে স্পর্শ না করিলেও অব্যক্তরূপে তাহা থাকেই, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যায় শুধু নহে, কিন্তু জগতে যাহার কখন পরিবর্তন হয় না এমন একটা কিছু যাহা আছে তাহাই সত্য বস্তুতত্ত্ব, এরূপও নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাকেই জগতের মূল সত্য বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, বেদান্তশাস্ত্রের এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্য না করিয়া কিংবা আমরা এই শব্দের যে অর্থ মনে করি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কি না ইহা দেখিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া "আমাদের চোখে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতও বেদান্তী মিথ্যা বলে, এর উপায় কি?" এই কথা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতম্মন্য লোকও অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাস্কের উক্তি অনুসারে বলিতে পারি যে, অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না তাহা কিছু স্তম্ভের দোষ নহে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অতএব নশ্বর নামরূপ সত্য নহে; যে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী তত্ত্ব দেখিতে চায় তাহার দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াইয়া নামরূপের বাহিরে যাওয়া চাই, ছান্দোগ্য (৬. ১; ও ৭. ১), বৃহদারণ্যক (১. ৬. ৩), মুণ্ডক (৩. ২. ৮), এবং প্রশ্ন (৬. ৫) প্রভৃতি উপনিষদে ইহা বারম্বার উক্ত হইয়াছে। এই নামরূপকে কর্ম্মে

(২. ৫) মুণ্ডক (১. ২. ৯) প্রভৃতি উপনিষদে 'অবিদ্যা' এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'মায়া' নামে কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার 'মায়া' 'মোহ' 'অজ্ঞান' এই সকল শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বিবক্ষিত। জগতের আরম্ভে যে-কিছু ছিল তাহা নামরূপবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্গুণ ও অব্যক্তছিল; পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যক্ত ও সগুণ হইয়া পড়িল (বৃ. ১. ৪. ৭; ছাং. ৬. ১. ২, ৩)। তাই বিকারী কিংবা নশ্বর নামরূপকেই 'মায়া' সংজ্ঞা দিয়া এই সগুণ বা দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ার খেলা কিংবা লীলা এইরূপ বলা হয়। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহা সত্বরজতমোগুণী অতএব নামরূপের দ্বারা যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (৮ম প্রকরণে বর্ণিত) ব্যক্ত বিশ্বের যে উৎপত্তি বা বিস্তার, তাহাও সেই মায়ার সগুণ নামরূপাত্মক বিকার। যে কোন গুণই বল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর সুতরাং নামরূপাত্মক হইবেই হইবে। সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রসমূহও এইরূপ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে আসে। ইতিহাস, ভূজ্ঞান, বিদ্যুৎশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আলোচনা করা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত নামরূপেরই অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়া গিয়া সেই পদার্থের অন্য নামরূপ কি করিয়া হয় তাহারই বিচার-আলোচনা করা হয়। উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাষ্প নাম কখন ও কিরূপে আসে, কিংবা এক কুচকুচে কালো জাম হইতে তাম্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের রং (রূপ) কি করিয়া হয় ইত্যাদি নামরূপের ভেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে করা হইয়া থাকে। তাই, নামরূপের মধ্যেই মগ্ন এই শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা নামরূপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে, ইহা সুস্পষ্ট। এবং এই অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কথার মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কথারম্ভে নারদ ঋষি সনৎকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া 'আমাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেও', এইরূপ বলিলেন; তখন সনৎকুমার "তুমি কি শিখিয়াছ আগে বল তার পর আমি বলিব" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। নারদ বলিলেন "আমি ঋগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, কালশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার নিকট আসিয়াছি।" তাহাতে সনৎকুমার "তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ তাহা সমস্ত নামরূপাত্মক, প্রকৃত ব্রহ্ম এই নাম ব্রহ্মের অতীত" এইরূপ উত্তর দিয়া পরে ক্রমে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কল্প, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রাণ—ইহাদেরও বাহিরে এবং ইহাদের খুব উপরে যে পরমাত্মরূপী অমৃত তত্ত্ব নারদকে তাহারই সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

নামরূপের অতিরিক্ত মানব-ইন্দ্রিয়ের আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই অনিত্য নামরূপের আবরণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত এইরূপ কোন কিছু নিত্য দ্রব্য অবশ্যই থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের দ্বারা হইয়া থাকে, ইহাই উপার-উক্ত বিচার আলোচনার তাৎপর্য্য। যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়া থাকে, তাই আত্মা জ্ঞাতা; এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহা নামরূপাত্মক জগতেরই জ্ঞান; তাই, নামরূপাত্মক বাহ্য জগতই জ্ঞান (মভা. শাং. ৩০৬. ৪০); এবং এই নামরূপাত্মক জগতের মূলে যে-কিছু বস্তুতত্ত্ব আছে তাহাই জ্ঞেয়। এই বর্গীকরণ স্বীকার করিয়া ভগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা এবং জ্ঞেয়কে ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্ম (গী. ১৩. ১২-১৭) বলা হইয়াছে এবং পরে জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়া ভিন্নত্ব কিংবা নানাত্বের দ্বারা উৎপন্ন জগৎ-জ্ঞানকে রাজসিক এবং শেষে নানাত্বের যে জ্ঞান একত্বরূপ হইতে হয় তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ২০, ২১)। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক নহে; আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হয়, এই জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গরু ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বাহ্য বস্তু আমরা দেখিতে পাই তাহা আমাদেরই জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান সত্য হইলেও তাহা কি করিয়া উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না; এই জ্ঞান ব্যতীত বাহ্য পদার্থ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কিংবা এই সকল বাহ্য বস্তুর মূলে অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ জ্ঞাতা না থাকিলে জগত থাকে কোথায়? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের মধ্যে জ্ঞেয় এই তৃতীয় বর্গ থাকে না; জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞান এই দুই শুধু বাকী থাকে; এবং এই যুক্তিবাদকে আর একটু দূরে লইয়া গেলে 'জ্ঞাতা' বা 'দ্রষ্টা', ইহাও একপ্রকারের জ্ঞান হয়, তাই শেষে জ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তুই অবশিষ্ট

থাকে না। ইহাকে 'বিজ্ঞানবাদ' বলে; এবং ইহাকেই যোগাচারপন্থী বৌদ্ধেরা প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছে; জ্ঞাতার জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছুই এই জগতে নাই; অধিক কি, জগতই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা মনুষ্যের জ্ঞান, এইরূপ এই মার্গের বিদ্বানেরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও হিউমের ন্যায় পণ্ডিত এই প্রকার মতের অগ্রণী। কিন্তু বেদান্তীদিগের নিকট এই মত মান্য নহে; বাদরায়ণাচার্য্য বেদান্তসূত্রে (বেসূ. ২. ২. ২৮-৩২) এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রসমূহে ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারও শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহা মিথ্যা নহে; এবং ইহাকেও আমরা জ্ঞান বলি। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতীত যদি অন্য কিছু না থাকে, তবে 'গরু' এই জ্ঞান ভিন্ন, 'ঘোড়া' এই জ্ঞান ভিন্ন, 'আমি' এই জ্ঞান ভিন্ন,—এইরূপ জ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যেও যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়া সর্ব্বত্র একই মানিলাম; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল কোথা হইতে? স্বপ্নজগতের ন্যায় মন আপনা হইতেই আপন মর্জ্জি অনুসারে জ্ঞানের এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে স্বপ্নজগৎ হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না। (বেসূ. শাং ভা. ২. ২. ২৯; ৩. ২. ৪)। তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, 'দ্রষ্টার' মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করে এইরূপ বলিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার 'আমার মন' অর্থাৎ 'আমিই স্তম্ভ' কিংবা 'আমিই গরু' এইরূপ 'আমি-পূর্ব্বক' সমস্ত জ্ঞান হওয়া চাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, আমি পৃথক, স্তম্ভ গরু প্রভৃতি পদার্থও আমা হইতে ভিন্ন, যখন এইরূপ প্রতীতি সকলের হইয়া থাকে, তখন দ্রষ্টার মনে উৎপন্ন সমস্ত জ্ঞানের আধারভূত বাহ্যজগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু অবশ্যই থাকিবে, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. শাংভা. ২. ২. ২৮)। কান্টের মতও এইরূপ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যের বুদ্ধির একীকরণ অপরিহার্য্য হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিরাধার কিংবা নূতন উৎপন্ন করে না তাহা সর্ব্বদাই জাগতিক বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করে, এইরূপ, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "কিহে! শঙ্করাচার্য্য একবার বাহ্য জগৎ মিথ্যা বলেন এবং পুনরায় বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ্য জগতের অস্তিত্বই 'দ্রষ্টা'র অস্তিত্বেরই ন্যায় সত্য, এইরূপ প্রতিপাদন করেন! কেমন করিয়া ইহার সমন্বয় করা যাইবে?" এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য বাহ্য জগৎকে যখন মিথ্যা কিংবা অসত্য বলেন তখন বাহ্যজগতের দৃশ্য নামরূপ অসত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। কিন্তু নামরূপাত্মক বাহ্য দৃশ্য মিথ্যা হইলেও তাহার মূলে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত সত্য বস্তু আছে,—উহার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা হয় না। সার কথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যেমন এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে;—সেইরূপ নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের মূলেও কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে, এইরূপ বলিতে হয়। তাই, দেহেন্দ্রিয় ও বাহ্য জগৎ এই দুয়ের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্যমান বস্তুর মূলে দুইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সত্য বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া আছে, এইরূপ বেদান্ত-শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরে দুই দিকের এই যে ইহা নিত্য তত্ত্ব, বিভিন্ন কি একরূপ এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্ব্বে, অনেক সময় এই মতের অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে যে আপত্তি করা হয় প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত না হইলেও, চক্ষুর গোচর বাহ্যজগতের নামরূপাত্মক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার মূলদেশে যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শঙ্করাচার্য্যের এই মত—যাহাকে মায়াবাদ বলে—প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদান্তশাস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পারা যায় না। কিন্তু উপনিষদ্ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এই আপত্তি যে, ভিত্তিহীন ইহা যে-কোন ব্যক্তির সহজে উপলব্ধি হইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, 'সত্য' শব্দ সাধারণ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য 'সত্য' শব্দের এই ব্যবহারিক অর্থ লইয়াই উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামরূপাত্মক বাহ্য পদার্থকে 'সত্য' এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে 'অমৃত' নাম দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৬. ৩) "তদেতৎ অমৃতং সত্যেনচ্ছন্নং"—এই অমৃত সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত—এইরূপ বলিয়া অমৃত ও সত্য এই দুই শব্দের "প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ"—প্রাণ অমৃত এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে 'প্রাণের' অর্থ প্রাণস্বরূপ পরব্রহ্ম। পূর্ব্বে ইহা হইতে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী উপনিষদে যাহাকে 'মিথ্যা' ও 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহারই অনুক্রমে সত্য' ও 'অমৃত' এই নাম

ছিল কোন কোন স্থানে এই অমৃতকেই 'সত্যস্য সত্যং'—চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ ২. ৩. ৬) এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেই উক্ত আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে—কারণ, বৃহদারণ্যকেই শেষে আত্মরূপ পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত 'আর্ত্তম্' অর্থাৎ নশ্বর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। (বৃ-৩. ৭২৩)। জগতের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন চক্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই সত্য মানিয়া লইয়া তাহার অভ্যন্তরে অন্য কোন্ সূক্ষ্ম সত্য লুকায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরূপ দেখা গেল যে, যে দৃশ্য জগতের রূপকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা আসলে নশ্বর এবং তাহার অভ্যন্তরে কোন অবিনশ্বর বা অমৃত তত্ত্ব আছে। দুয়ের মধ্যে এই ভেদ যেমন যেমন অধিক ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই অনুসারে 'সত্য' ও 'অমৃত' এই দুই শব্দের স্থানে 'অবিদ্যা' ও 'বিদ্যা' এবং পরিশেষে 'মায়া ও সত্য' কিংবা 'মিথ্যা ও সত্য' এই পরিভাষা প্রচলিত হইল। কারণ, 'সত্য' শব্দের ধাত্বর্থ 'নিত্যস্থায়ী' হওয়া প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর নামরূপকে সত্য বলা উত্তরোত্তর অধিকতর অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এই প্রকারে 'মায়া' কিংবা 'মিথ্যা' এই দুই শব্দ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তুর বাহ্য আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্য; এবং তাহার মূলস্থিত 'তাত্ত্বিক দ্রব্য'ই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (১. ১৬৪. ৪৬ ও ১০. ১১৪. ৫)—যাহা মূলে এক ও নিত্য (সৎ) তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাতা) বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—অর্থাৎ এক সত্য বস্তুই নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন হয় প্রতীত এইরূপ কথিত হইয়াছে। "এক রূপের অনেক রূপ করিয়া দেখান" এই অর্থে ঋগ্বেদেও 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বারা অনেক রূপ ধারণ করেন (ঋ. ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক স্থলে (তৈ. সং. ৩. ১. ১১) এই অর্থেই 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই 'মায়া' শব্দ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়াশব্দ নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কাল অবধিই প্রচলিত হইলেও ইহা তো নির্ব্বিবাদ যে, নামরূপ অনিত্য কিংবা অসত্য এই কল্পনা উহার পূর্ব্বের, 'মায়া' শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই কল্পনা নূতন বাহির করেন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় যাঁহাদের নামরূপাত্মক জগৎ-স্বরূপকে 'মিথ্যা' নাম দিবার সাহস হয় না, অথবা গীতায় যেমন ভগবান ঐ অর্থে মায়া শব্দের উপযোগ করিয়াছেন, তাহা করিতেও যাঁহারা ভয় পান, তাঁহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'সত্য' ও 'অমৃত' শব্দের স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। যাই বলনা কেন, নামরূপ 'নশ্বর' এবং নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্ত্ব 'অমৃত' বা 'অবিনশ্বর' এবং এই ভেদ প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধা হয় না।

যাক্। নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মায় উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার মূলে এবং আত্মার ন্যায় বাহ্য-জগতের নানা পদার্থের মূলে 'কোন-না-কোন কিছু' এক মূলীভূত নিত্য পদার্থ থাকা চাই, নচেৎ এই জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা স্থির করিলেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের কাজ শেষ হয় না। বাহ্য পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য বস্তুকেই বেদান্তী 'ব্রহ্ম' বলেন; এবং সম্ভব হইলে এই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করাও আবশ্যক। সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য তত্ত্ব অব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত তাহার স্বরূপ নামরূপাত্মক পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত ও স্থূল (জড়) হইতে পারে না, ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ব্যক্ত ও স্থূল পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও, মন, স্মৃতি, বাসনা, প্রাণ ও জ্ঞান প্রভৃতি স্থূল নহে এমন অনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, পরব্রহ্মও তাহাদেরই মধ্যে কোন-না-কোন রূপে একটির স্বরূপ বিশিষ্ট কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণের ও পরব্রহ্মের স্বরূপ একই। জর্ম্মন পণ্ডিত শোপেনহর পরব্রহ্ম বাসনাত্মক স্থির করিয়াছেন। বাসনা মনের ধর্ম্ম হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রহ্মকে মনোময় বলা যাইতে পারে (তৈ. ৩৪)। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐ. ৩. ৩), কিংবা 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' (তৈ. ৩. ৫)—জড়জগতের অন্তর্ভূত নানাত্বের যে জ্ঞান এক স্বরূপ হইতে হয় তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই। কিন্তু উপনিষদে চিদ্রূপী জ্ঞানের ন্যায়ই সৎকে (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম্ম বা সত্তাসামান্যকে) এবং আনন্দকেও ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছে, ওঁকার। ইহার উপপত্তি এইরূপ;—প্রথমে সমস্ত অনাদি বেদ ওঁকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; এবং উহা বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শব্দ

হইতেই পরে ব্রহ্মদেব যেহেতু সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিলেন (গী. ১৭. ২৩; মভা. শাং. ২৩১. ৫৭. ৫৮)। সেই হেতু ওঁকার ব্যতীত মূলারম্ভে অন্য কিছু ছিল না এইরূপ সিদ্ধ হয়। এবং এই জন্যই ওঁকারই প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ (মাণ্ডুক্য. ১; তৈত্তি. ১.৮)। কিন্তু শুধু অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রহ্মের এই সমস্ত স্বরূপ ন্যূনাধিক নামরূপাত্মক হইয়া পড়ে। কারণ, এই সমস্ত স্বরূপ মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এই প্রকারে যাহা জানে তাহা নামরূপের গণ্ডীর মধ্যেই পড়িয়া যায়। তবে, এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাদি, অন্তর-বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ত্ব (গী. ১৩, ১২-১৭) তাহার বাস্তব স্বরূপের নির্ণয় কি করিয়া হইবে? অনেক অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হউক না, এই তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় থাকিবেই; ক্যান্ট তো এই প্রশ্নের বিচার করাই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেইরূপ আবার উপনিষদেও "নেতি নেতি"—অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে ইহা নহে; তাহা ব্রহ্ম ইহারও অতীত, তাহা চক্ষুর অদৃশ্য; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্যমনের অগোচর—এই প্রকারে পরব্রহ্মের অজ্ঞেয় স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের একপ্রকার নির্ণয় করিতে পারে, ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্র স্থির করিয়াছে। বাসনা, স্মৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা হইয়াছে তন্মধ্যে অতিশয় ব্যাপক কিম্বা শ্রেষ্ঠ কে তাহার বিচার করিয়া এই সকলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারিত হইবে তাহাকেই পরব্রহ্মের স্বরূপ মানিতে হইবে। কারণ, সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ এই বিষয়টি নির্ব্বিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্মৃতি, বাসনা, ধৃতি ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; এবং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; এবং শেষে বুদ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (গী. ৩. ৪২)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণে ইহার বিচার করা হইয়াছে। বাসনা, মন, প্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে যদি আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরব্রহ্মের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে ইহা স্বতই নিষ্পন্ন হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই যুক্তিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন যে, বাক্য অপেক্ষা মন অধিক যোগ্য (ভূয়স্), মন অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার ক্রমশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আত্মা যখন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূয়স্) তখন আত্মাই পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায় তাহা এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব। গ্রীণ বলেন যে, ইন্দ্রিয়াদির যোগে আমাদের মনের উপর বাহ্য নামরূপের যে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের একীকরণ করিয়া আমাদের আত্মার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার অনুরূপ বাহ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মূলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোন প্রকার বস্তু থাকা চাই; নচেৎ আত্মার একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বকপোলকল্পিত ও নিরাধার হইয়া বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া পড়িবে এইরূপ গ্রীন্ বলেন। এই 'কোন এক' বস্তুকে আমরা ব্রহ্ম বলি। কিন্তু কান্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়া গ্রীণ তাহাকে বস্তুতত্ত্ব বলেন—ইহাই ভেদ; যাহাই বলনা কেন, বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) ও আত্মা এই পরস্পরের অনুরূপ দুই পদার্থই শেষে অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে 'আত্মা,' মন ও বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, নিজের প্রতীতিকে প্রমাণ মানিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি যে, এই আত্মা জড় নহে,—ইহা চিৎ-রূপী কিংবা চৈতন্যরূপী। আত্মার স্বরূপ এইরূপ নির্দ্ধারিত করিলে পর, বাহ্য জগতের অন্তর্গত ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই ব্রহ্ম বা বস্তুতত্ত্ব (১) আত্মস্বরূপাত্মক কিংবা (২) আত্মা হইতে ভিন্ন স্বরূপাত্মক এই বিষয়ে দুইটী মাত্র পক্ষই সম্ভব। কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা ব্যতীত তৃতীয় বস্তুই অবশিষ্ট নাই। কিন্তু সকলেই ইহা জানে যে, যদি কোনও দুই পদার্থ স্বরূপত ভিন্ন হইলেও তাহাদের পরিণাম কিংবা কার্য্যও অবশ্য ভিন্ন হইবে। তাই, পদার্থের পরিণাম হইতেই উক্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা একরূপ, তাহার নির্ণয় আমরা যে কোন শাস্ত্রে করিয়া থাকি। উদাহরণ যথা—দুই গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, ঐ দুইটী গাছ অথবা ভিন্ন। এই রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক-স্বরূপাত্মকই হইবে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের যে সংস্কার মনের উপর হয়, আত্মার ব্যাপার সমূহের মূলে যে একীকরণ সেই একীকরণ এবং এই ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম, উক্ত পদার্থসমূহের নানাত্ব ভাঙ্গিয়া যে একীকরণ করে সেই একীকরণ,—এই দুই মিলিয়া পরস্পরের অনুরূপ হওয়া চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক কি অন্যের সহিত মিলাইয়া একীকরণকারী তত্ত্ব দুই স্থানে হইলেও,

তাহা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না; অতএব ইহা স্বত-সিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রহ্মেরও রূপ।* সারকথা, যে কোন প্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, বাহ্য জগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামরূপাত্মক প্রকৃতির ন্যায় জড় তো নহে, পরন্তু বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোময় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, কিংবা ওঁকাররূপী শব্দব্রহ্ম, এই সমস্ত ব্রহ্ম পও নিম্নপদবীর এবং প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ, এইরূপ এক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই যে গীতারও সিদ্ধান্তও তাহাই; এইরূপ, এই সম্বন্ধে গীতার অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী. ২. ২০; ৭. ৫; ৮. ৪; ১৩. ৩১; ১৫. ৭. ৮ দেখ)। তথাপি ব্রহ্মের ও আত্মার স্বরূপ এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তিবাদেই আমাদের ঋষিরা যে প্রথমে বাহির করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না। কারণ, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কোন অনুমানই নিশ্চিত করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্ব্বদা আত্ম-প্রতীতির যোগ হওয়া চাই, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। তাছাড়া, আধিভৌতিক শাস্ত্রেও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর উপপত্তি জানা হয়, কিংবা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হয়, ইহা ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ন্যায় অনুসারে উপরি-প্রদত্ত ব্রহ্মাত্মৈক্যের বুদ্ধিগম্য উপপত্তি বাহির হইবার শত শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা "নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯; কঠ. ৪. ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ত্ব আছে (গী. ১৮. ২০) এইরূপ প্রথমে নির্ণয় করিয়া, শেষে বাহ্য জগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী তত্ত্ব এবং আমাদের শরীরান্তর্ভূত বুদ্ধির অতীত আত্মতত্ত্ব এই দুই একই অর্থাৎ একপদার্থ, অমর ও অব্যয় কিংবা যে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহতেই অবস্থিত, এই সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন; এবং ইহাই যাহা কিছু বেদান্তের রহস্য, এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে, গার্গী বারুণী প্রভৃতিকে এবং জনককে বলিয়াছেন (বৃ. ৩ ৫. ৮; ৪. ২-৪)। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম,—ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (বৃ. ১. ৪. ১০); ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর পিতা অদ্বৈতবেদান্তের এই তত্ত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "মাটীর এক গোলায় কি আছে তাহা জানিতে পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাত্মক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝা যায় সেইরূপ যে-এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সমস্ত বস্তুই জানা যায়, সেই বস্তু আমাকে বল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আমার নাই", অধ্যায়ে আরম্ভে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাঁহার পিতা তখন নদী, সমুদ্র, জলও লবণ ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, বাহ্যজগতের মূলে যে দ্রব্য আছে তাহা (তৎ) এবং তুমি (ত্বম্) অর্থাৎ তোমার দেহান্তর্গত আত্মা একই—"তত্ত্বমসি"; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে তাহা স্বতই তুমি জানিতে পারিবে। এইরূপ শ্বেতকেতুর পিতা, নূতন নূতন বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন; এবং প্রতিবারেই "তত্ত্ব-মসি"—তাহাই তুমি—এই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (ছাং. ৬. ৮-১৬)। "তত্ত্বমসি" ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মহাবাক্যগুলির মধ্যে মুখ্য বাক্য। "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" ইহা উহারই মারাঠী রূপান্তর।

(ক্রমশঃ)

---

* Green's *Prolegomena to Ethics* §§ 26-36.

সুরা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব)

ঋক্‌বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল—নবম—সোমরসের স্তুতিতে পূর্ণ; ইহা ব্যতীত অপরাপর মণ্ডলেও বহু উল্লেখ আছে। ঋক্‌-বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি দেবতার প্রতি স্তুতি-মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, স্থলেস্থলে এই চিত্তো-ন্মাদক পানীয়ের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইবার জন্য আবাহন করা হই-তেছে। দেবতাগণ অমরত্ব পাইবার জন্য এই সুখ-কর রস পান করিতেন। (৯।১০৬।৮)

ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে, যজ্ঞদেবতা সুরেশ্বর ইন্দ্র এত অধিক পরিমাণে সোমরস পান করিতেন যে তজ্জন্য তাঁহার উদরদেশ স্ফীত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার মুখে লালাস্রাবের বিরাম ছিল না।

(ঋক্ ১।৮৭)

ঋক্‌বেদে রহিয়াছে—"হে সোম, তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না। (৮।৪৮।১০)

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি আখ্যান আছে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ সোমযজ্ঞ করিতেছিলেন; যজ্ঞ করিতে করিতে এত বেশী সোমরস গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন যে বলির জন্য আনীত পশুগুলির গায়ের উপর হুড় হুড় করিয়া বমি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর আমরা যদি বলি, সোমরস সুরা বা মদ্যেরই প্রকারান্তর, তাহা হইলে কি বড় দোষের কথা হইবে?

সুরাপানের ফল কি, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সোমপানের ফল কিরূপ তাহার আভাস পাইলাম। তবে স্মৃতি পুরাণের সুরারই উপর এত আক্রোশের কারণ কি? অমৃত যদি হয় সোম, এবং সোমের যদি সুরার সহিত এত সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে অমৃতের ও সুরার সম্পর্কটাও কি নিকট হইয়া দাঁড়াইতেছে না? রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয় রাজার সুরাপানের যে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রে সুরাকে সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যার্থে সোম শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—

"সম্বিদা সেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি।"

(উৎপত্তি তন্ত্র)

এখানে 'সম্বিদা' অর্থে ভাঙ্, এবং সোম অর্থে সুরা। বেদে সোম ও সুরা উভয়েরই উল্লেখ আছে; উভয়ই পীত হইত সন্দেহ নাই।

বৈদিক শাস্ত্রে সুরাপানের বিধিও রহিয়াছে—'সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ'—সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরাপান করিবে—ইহা শ্রৌতবিধি। *

শ্রৌত সূত্র মধ্যেও মাধ্বীক (মহুয়া মদ), গৌড়ী (তাড়ী রস) প্রভৃতি মদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চলন ছিল বলিয়াই ত উল্লেখ।

বৃহস্পতি দেবগুরু। বৃহস্পতিসংহিতাতে রহিয়াছে—

"সৌত্রামণ্যাং তথা মদ্যং শ্রুতৌ ভক্ষ্যমুদাহৃতম্।"

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ বৌধায়ন ও কাত্যায়ন সূত্রমধ্যে সৌত্রামণি ও রাজসূয় যজ্ঞে দেবতার ভোগ্য সুরা প্রস্তুতের প্রণালী ও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

* শ্রী.ভাগবতে এই বৈদিক বিধির উপর কলম চালানো আছে—"যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তঃ।" স্বামীজীর টীকা,—যস্মাৎ সুরায় ঘ্রাণভক্ষঃ অবঘ্রাণং স এব বিহিতঃ ন পানং। পান নাই, ঘ্রাণ আছে।

বৈদিক সৌত্রামণী ও রাজসূয় যজ্ঞে সুরা অঙ্গ—একটি প্রধান উপকরণ।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় মন্ত্র আছে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে সেই দূর বৈদিক কালেও শৌণ্ডিকালয় ছিল; চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে (কুপায়?) সুরা রক্ষিত হইত এবং সাধারণ্যে বিক্রীত হইত। (১।১৯১।১০।

অতএব সপ্রমাণ হইল, সেকালে দেবতা-ব্রাহ্মণেও সুরাপান করিতেন। দেবতারা যজ্ঞে খাইতেন, ঋষিরা ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ পাইতেন।

শুধু যজ্ঞে কেন, মুনিঋষিরা অন্য সময়েও খাইতেন। সুরার প্রতি শুক্রশাপ-বিবরণ হইতে বুঝা যায়, অগাধপণ্ডিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্য নিত্য এত মদ খাইতেন, খাইয়া এমন অসামাল হইয়া পড়িতেন যে একদা মদ্যের সহিত স্বশিষ্য বৃহস্পতিপুত্র কচকে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(মহাভারত, আদি ৭৬; মৎস্যপুরাণ।

শাস্ত্রে দেখা যায়, দেবপত্নীগণও সুরাপানে বিরত ছিলেন না। হিন্দুর নিত্য-পূজ্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, সুরনরবন্দ্যা মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভগবতী মহামায়া ধনাধিপের নিকট হইতে অফুরন্ত সুরাপান-পাত্র পাইয়াছিলেন—"অশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং"। মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ঘন ঘন সুরাপান করতঃ শ্রান্তি দূর করিতেছেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মহিষাসুরের গর্জ্জন শুনিয়া তিনিও হুঙ্কার ছাড়িতেছেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।"

(৩।৩৬)। বহু পুরাণেও এই উল্লেখ আছে।

মহাভারত বিরাটপর্ব্বে যে দুর্গা-স্তোত্র আছে, তন্মধ্যে দেবী দুর্গার একটি বিশেষণ—"সীধুপশুমাংসপ্রিয়া।"

দেখা যাইতেছে, দেবীরা পর্য্যন্ত সুরার স্ফূর্ত্তিকারক বলকারক গুণ অনবগত ছিলেন না। শুধুই কি দেবীরা?

কোন কোন পুরাণে স্থানে স্থানে রাজমহিষী বা বিশিষ্টা রমণীর বারুণী বা মাধ্বীক আসবে রতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তাহার কুফল প্রদর্শনই উদ্দেশ্য মনে হয়; সকল স্থলে নহে।

রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই,—অযোধ্যা রাজধানীতে অশোকবন নামে এক রম্য রাজোদ্যান ছিল; লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজাধিরাজ রামচন্দ্র এই অশোকবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন।

উত্তর। ৫২

"সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি
পায়য়ামাস"——

তথায় নৃত্যগীতবিশারদা রূপবতী রমণীরা পান-বশীভূতা হইয়া রামসন্নিধানে নাচ-গান দেখাইতে-ছিল—"স্ত্রিয়ঃ পানবশঙ্গতাঃ",

ত্রেতাযুগে সাধারণ স্ত্রীলোক এবং রাজরাণীরা পর্য্যন্ত মদ্য পান করিতেন। *

বশিষ্ঠ একজন বৈদিক ঋষি, বিশ্বামিত্রও একজন বৈদিক ঋষি। রামায়ণে দেখা যায়,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠ-আশ্রমে অতিথি হন, মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন বিশিষ্ঠ অতিথিকে নানা ভোজ্যভোজ্য-চর্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা সৎকার করিয়াছিলেন; তাহার ভিতর মৈরেয় সুরা বাদ পড়ে নাই।

"ইক্ষুন্মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।"
রামায়ণে রহিয়াছে—

ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিতে চিত্রকূট যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি সসৈন্যসামন্তানুচর ভরদ্বাজ ঋষির আতিথ্য গ্রহণ করেন; ইনিও একজন প্রখ্যাত বৈদিক ঋষি, তিনি অতিথি সৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নানা উপভোগ-সামগ্রীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—প্রচুর সুরা, মৈরেয় মদ্য—মদ্যের দীর্ঘিকা পর্য্যন্ত ছিল—"বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ।" নানাবিধ সুরা সেবন করিয়া সৈন্যসামন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল; সে স্থান হইতে নড়িতে চাহে নাই।

(অযোধ্যা ৯১।

রামায়ণের সময় সুরা যে সাধারণ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল এবং দেবনৈবেদ্যরূপে উপকল্পিত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

ভরত যখন রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইতে অক্ষম হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রাজধানীর শ্রীহীনতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ॥"

(অযোধ্যা ১১৪।

রামের বিরহে অযোধ্যা নগরীতে বারুণীমদগন্ধ মাল্যগন্ধ, চন্দনঅগুরুগন্ধ কৈ আর চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে না?

ভরত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—মদ্যপানের অবসানে ভগ্নপাত্র-পরিবৃত, মদ্যপায়ী-বিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পানভূমির যাদৃশ দশা ঘটিয়া থাকে, রাম-বিহনে অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে—

"ক্ষীণপানোত্তমৈ র্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্॥

(অ ১১৪।

সীতাদেবী রামের সহিত বনগমন কালে যখন গঙ্গা পার হইতেছেন, তখন ভাগীরথী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"দেবী প্রসন্না হউন, যখন আমরা ফিরিয়া আসিব, তখন সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিব।"—

"সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।"

(অযো ৫২।

সীতাদেবী যমুনা উত্তরণ কালে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে দেবি, অযোধ্যা নগরীতে আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইলে আমি আপনাকে সহস্র গো ও সুরাপূর্ণ একশত কলস দ্বারা পূজা করিব।"

"যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।"

(অ ৫৫।

রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজেরও পানভূমি ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার পথ সকল সুরাগন্ধে আমোদিত থাকিত—

• "মৈরেয়াণাং মধুনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্।"

(কিঃ)

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব ও বানররাজমহিষী

---

* বহু পণ্ডিত লোকের মত,—রামায়ণ হইতে বুঝা যায়, বাল্মীকি ছয় কাণ্ডে গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন। উত্তর কাণ্ড পরে সংযোজিত। তাহা যদি হয়, সীতাদেবীর সুরাপান আসল রামায়ণে নাই ধরিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্মীকিরামায়ণ মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত কথাও আছে, যথা রামায়ণে বুদ্ধদেবের উল্লেখ। (অযোধ্যা ১১১।৩৪।

তারাকে মদ্যপানে মাতাল দেখিয়াছিলেন—"সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী" (ঐ)

লঙ্কার পানভূমির সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে, মনোরম। "তথায় কোথাও স্বর্ণকলস, কোথাও মণিময় ও স্ফটিক পানপাত্র, ঐ সমস্ত সুরায় পূর্ণ; কোথাও কামিনীগণ অতিপানে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছে.........।" ইত্যাদি, আর—

"দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি।
শর্করাসব-মাধ্বীকাঃ পুষ্পাসব-ফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈঃ সৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্।"

(সু ১১)

নানান্ রকম সুরা।

দেখা যাইতেছে, রামায়ণের সময় (রামরাজত্বের কালে?) মদের খুব রেওয়াজ ছিল। প্রজাসাধারণের ত কথাই নাই, (নদী) দেবতা, বড় বড় মুনি ঋষি রাজা রাণী রাক্ষস বানর স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুরাভক্ত ছিলেন।

এক স্থলে সুরাপানের নিন্দা আছে, দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে মাতাল দেখিয়া তিরস্কার করত বলিয়াছিলেন—

"ন হি ধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেব প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে॥ (কি ৩৩)

ধর্ম্ম ও অর্থ সিদ্ধিবিষয়ে, সুরাপান প্রশস্ত নহে; যেহেতু সুরাপানে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে।

রামায়ণে এ উপদেশ অরণ্যে রোদন।

মহাভারতের দিকে চক্ষু মিলাইলে আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতের প্রধান চরিত্র দুইটি—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই সুরাপান করিতেন, এমন কি মাতাল হইয়া পড়িতেন। মহাভারতে রহিয়াছে—

'সঞ্জয় কহিলেন,—আমি সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলাম, বাসুদেব ও অর্জ্জুন উভয়ে মধুপানে মত্ত; চন্দনচর্চ্চিত এবং মালা, উত্তম বস্ত্র ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া, অনেক-রত্ন-শোভিত, বিবিধ আস্তরণ-মণ্ডিত, কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া আছেন; এবং কেশবের চরণযুগল অর্জ্জুনের উৎসঙ্গে এবং অর্জ্জুনের এক চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে ও অন্যচরণ সত্যভামার অঙ্কে আরোপিত আছে—

"উভৌ মধ্বাসবক্ষিপ্তৌ উভৌ চন্দন-চর্চ্চিতৌ।
উভৌ পর্য্যঙ্ক-রথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ॥*

উদ্যোগযানসন্ধি। ৫৮

মহাভারতের সময়ে স্ত্রীলোকেও যে মদ্য পান করিতেন, তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাইঃ—

বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণা কীচককে কহিলেন,—"তুমি পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত রাখিও; আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সৈরিন্ধ্রীকে প্রেরণ করিব"......সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "সৈরিন্ধ্রী, আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি কীচকের ভবনে গমন করিয়া সত্বর পানীয় আনয়ন কর".........দ্রৌপদী কীচককে কহিলেন, "রাজমহিষী আমাকে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন".........কীচক কহিল—"আমি তোমার নিমিত্ত এক রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল এক্ষণে তথায় গিয়া আমরা মধুপান করি।"

(বিরাট। কীচকবধ ১৫-১৬)

যেরূপভাবে বিরাটমহিষী সুরা চাহিয়াছেন এবং দ্রৌপদী আনিতে ছুটিয়াছেন, দেখিলে মনে হয়, সুরাপান রাজরাণীদিগের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত ছিল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যে সুরাত্যাগী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে;—দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের গৌরব বর্ণনা করিতে করিতে হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, মাতুল শকুনিকে বলিতেছেন,—"অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল।" (সভা ৪৮)

ইহা রাজসূয়যজ্ঞের একটা নিয়মপালন মাত্র হইতে পারে।

ভীমসেন যে সুরাভক্ত ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মধ্যম পাণ্ডব পাতালপুরী নাগভবনে গিয়া যে আট আট কুণ্ড রস পান করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সুরা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? (আদি ১২৮)

* মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাহার "শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে" এই ঘটনা প্রক্ষিপ্ত (মহাভারতে) বলিয়াছেন। তাহাই সম্ভব, কিন্তু আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। ভিন্ন পাঠে—উভৌ মধ্বাসবাক্ষবাবুভৌ চন্দনরুষিতৌ। স্রগ্বিণৌ বরবস্ত্রৌ তু দিব্যাভরণভূষিতৌ। ৫৯।৫

আরও দেখা যায়, ভীমসেন যুদ্ধযাত্রাকালে "অর্চ্চিত সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক 'কৈরাতক' মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। "পীত্বা কৈরাতকং মধু·········মদবিহ্বললোচনঃ।"

(দ্রোণ ১২৭)

এখানে মদ্যপানই যেন নিত্যকর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বে শান্তি।

(শ্রীপঞ্চানন রায়—১৩ বৎসরের বালক)

(১)

আজি দিয়েছে অভয়া
এ ধরাবাসীরে
শান্তি-সুধাধারা ঢালিয়ে।
আজি নব হর্ষামোদে
বিশ্ববাসী তাই
মাতৃপ্রেমে আছে মাতিয়ে।
গত চতুর্বর্ষ যে প্রেম-বিহনে
দিয়ে বিসর্জ্জন নিজ পরিজনে
সহি নানা ক্লেশ ছিল ক্ষুণ্নমনে
নীরবে জননী স্মরিয়ে।
আজি দিয়েছে অভয়া
এ ধরাবাসীরে
শান্তি সুধা ধারা ঢালিয়ে।

(২)

আজি মহাকালরূপী
সে ভীষণরণ
গেছে কোন্ দেশে পালিয়ে।
আজি পলায়নে তার
ধরা অধিবাসী
আনন্দেতে আছে মাতিয়ে।
ধরা এবে হবে শান্তির আগার
ভুঞ্জিবে মানব আনন্দ অপার
ধরামাঝে হবে সুখ শান্তি সার
অশান্তি যাইবে ঘুচিয়ে।
আজি মহাকালরূপী
সে ভীষণ রণ
গেছে কোন দেশে পালিয়ে।

(৩)

আজি মহাবিশ্ব-বক্ষে
প্রলয়ের ঝড়
গিয়াছে নির্ব্বাণ হইয়ে।
আজি বীর দর্পে বুঝি
ন্যায় ধর্ম্ম দেছে
অন্যায়ের দর্প দলিয়ে।
যাদের ব্যগ্র লোলুপরসনা
জেগেছিল বিশ্বে লয়ে উত্তেজনা
বিশ্বে সম্মিলিত ন্যায়বাদী জনা
দিয়াছে তা শান্ত করিয়ে।
আজি মহাবিশ্ব-বক্ষে
প্রলয়ের ঝড়
গিয়াছে নির্ব্বাণ হইয়ে।

(৪)

আজি ধন্য বিশ্বমাঝে
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক!
দাও ধর্ম্ম বিশ্বে ছড়ায়ে।
আজি টুটে যাক্ বিশ্বে
অধর্ম্ম শৃঙ্খল
ধর্ম্মে দাও বিশ্ব ভরায়ে।
ধন্য ভগবান অধর্ম্মের অরি
বাজুক এ বিশ্বে ধর্ম্মের বাঁশরী
ধন্য তুমি মাত বিশ্বব্যথাহারী
দাও বিশ্বব্যথা ঘুচায়ে।
আজি ধন্য বিশ্বমাঝে
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক!
দাও ধর্ম্ম বিশ্বে ছড়ায়ে॥

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সোলাপুরে পীড়িত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

১৮৯৩ অব্দে যখন আমরা সোলাপুর-পরিদর্শনে যাত্রা করিলাম, তখন প্রথম আড্ডা হইল মাটিতে। দুই তিন দিবস সেখানে ছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে একটা বক্তৃতা দিবার জন্য সেখানকার কতকগুলি লোক আসিয়া আগ্রহ জানাইল। উনি 'হাঁ' বলিয়া দ্বিতীয় দিনে মাটিতে প্রায় ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন; সেখান হইতে আমরা সোলাপুরে গেলাম। সেখানেও এই ক্ষেপে লোকেরা বক্তৃতা দিবার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ কেন

প্রকাশ করিলেন কে জানে! সেই সময় কি লইয়া আন্দোলন হইতেছিল এবং লোকের দৃষ্টি কোন্ বিষয়ের দিকে ছিল তাহা আমার ঠিক মনে নাই; ভারতের শিল্প-উদ্যমের প্রগতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর বোধ হয় সেই সময় লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল মনে হয়। কারণ সোলাপুরের খোলা ময়দানে তিন দিন ঘণ্টা-তিনেক বক্তৃতা চলিয়াছিল ও শেষদিনে এই বক্তৃতা দুই ঘণ্টা সওয়া দুই ঘণ্টা সমান আবেগের সহিত হইয়াছিল। শেষ দিনের বক্তৃতা হইয়া গেলে, সেই রাত্রেই খানিকটা নিদ্রা হইবার পর ওঁর পেটে কি একটা ব্যথা ধরিল; আমি গরম জল ভরা থলে দিয়া পেটে শেক দিতে লাগিলাম, গা টিপিয়া দিলাম, আর সচরাচর যে সব ঔষধ জানা ছিল সেই সব ঔষধ দিলাম, তবু পেটের ব্যথা গেল না। ব্যথাটা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভোর চারিটা পর্য্যন্ত খুবই কষ্ট হইয়াছিল। সকালে ডাক্তার কিলোস্করকে ডাকাইলাম। তিনি আসিয়া ঔষধাদি দিবার পর ব্যথাটা একটু কমিল, কিন্তু একেবারে থামিল না; তথাপি একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অসহ্য পেটের ব্যথায় শরীর ও প্রাণ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শ্রান্তির দরুন একটা ক্লান্তি আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটু নিদ্রাও আসিল, তাই, অল্প কাঁজি খাইতে দিয়া ও ঔষধ দিয়া আমি সেই-খানেই আস্তে আস্তে ওঁর গা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং "এখন ঘুমটা যতই বেশী হয় ততই ভাল, কারণ বিশ্রামের খুবই দরকার, কোন গোলমাল না করে চুপ-চাপ থাকতে দেও, আমি ঘুমের ঔষধ দিয়েছি, ঘুম আসলে আর কোন ভাবনার কারণ নাই। বিশ্রাম করতে দেও।" এইরূপ আমাকে বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেই অনুসারে উনি সমস্ত দিনই খুব বিশ্রাম পাইলেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শুধু একটু কাঁজি ও ঔষধ দিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া রাত্রে বেশ নিদ্রাও হইল, সমস্ত দিন গায়ে যে একটু জ্বর ছিল, তাও শেষ রাত্রে ২।৩টার সময় চলিয়া গেল—যত আলো হইতে লাগিল ততই বেশ ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তথাপি উঠিয়া বাহিরে যাইবার শক্তি ছিল না; তাই নিকটেই পরদা লাগান হইয়াছিল। সেখানে মুখমার্জ্জনাদি সমা-পন করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বসিতেন। আমি একটু দুধসাবু ও ঔষধ দিবার পর, নিকটে যে হাবলদার দাঁড়াইয়াছিল তাকে 'উনি' বলিলেন, "সিরেস্তাদারকে ডাকাও ও কালকের সহির কাগজ চেয়ে পাঠাও। তদনু-সারে সে কার্য্য সম্পাদন করিল। সিরেস্তাদার ও অন্য কেরাণী সহির জন্য আপন আপন কাগজ লইয়া আসিল। সেই সমস্ত কাগজের উপর উনি নিত্যানুসারে সহি করি-লেন, এবং "টাইমস্" খুলিয়া টেলিগ্রাম পড়িলেন। সকালে ভাল আছেন মনে করিয়া পাঁচটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত যে শ্রম করিলেন তাহা সহিল না। পেট ব্যথা করিতে লাগিল। পায়ের গুল্ফ বাঁকিয়া যাইতে লাগিল এবং একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। সেইজন্য গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া চুপচাপ করিয়া থাকিতে হইল। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইবার পর খুব জোরে ১০৫.৬ ডিগ্রী জ্বর আসিল। সে জ্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আর নামিল না। ইতিমধ্যে দুইটার সময়, বোম্বাই হাইকোর্টের জজের পদে ওঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এইরূপ গভর্ণর সাহে-বের নিকট হইতে সিলমোহর করা পত্র আসিল; সিরে-স্তাদার সেই পত্র খুলিয়া আমার নিকট আনিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইল এবং এই সংবাদ ওঁকে দিবে মনে করিয়া দুই তিনবার পরদার ভিতর দিয়া উঁকি মারিল; কিন্তু আমি তাকে বারণ করিয়া হাতের ইসারা করিলাম। আমার ভয় হইল, এই আনন্দের সংবাদ জানিতে পারিলে, আনন্দের আবেগে হয়ত জ্বরটা আরো জোরে আসিবে। তাই আমি ঐ হুকুমনামা না দেখাইয়া রাখিয়া দিতে বলিলাম; তারপর রাত্রি ১১টার সময় জ্বরটা ছাড়িয়া গেল এবং বেশ নিদ্রা আসিল। সকালবেলা জাগিয়া ভাল বোধহইতে লাগিল; তখন শিরেস্তাদারকে ঐ হুকুমনামা ওঁকে দেখাইতে বলিলাম। হুকুমনামা দেখিয়া ওঁর মনের কোন ভাবান্তর হইল বলিয়া মনে হইল না। খুব সহজ ভাবে শিরেস্তাদারের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে দেখছি, এখানকার কাজ সেরে শীঘ্রই পুণায় যেতে হবে।" শিরেস্তাদার প্রস্থান করিলে, আমার সহিত ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। ইহা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আগের দিনের ভয়ের কথা মনে করিয়া আমার হাসি পাইতে লাগিল। আমি কি পাগল! অনেক বৎসর দিবারাত্রি নিকটে থাকিয়াও ওঁর স্বভাব এবং তাতে যে সকল সদ্গুণ আছে সেই সকল সদ্গুণ আমি অবগত হইতে পারিলাম না! এবং আমি এইরূপ ক্ষুদ্র ভীতি অনুভব করিয়াছিলাম। দুঃখের পর্ব্বত মাথার উপর পড়িলেও যে ব্যক্তিকে টলাইতে পারে না, কিংবা সুখের তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিলেও যাঁহার হর্ষাতিশয্য হয় না, শুধু কাছের লোকই তাঁর দুঃখ ও আনন্দ সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারে; অন্য লোকের তাহা নজরে পড়ে না; এইরূপ যখন তাঁহার স্বভাব, এই স্বভাব আমি জানিয়াও এই সময়ে কেন এইরূপ পাগলামি করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম কে জানে।

যাক; দুই দিন পরে, আমরা সোলাপুর হইতে পুণায় আসা স্থির করিলাম। তার পর দিনও সোলা-পুরের লোকেরা আসিয়া বলিল যে, আমাদের সহরে এই নিয়োগের হুকুম আসিয়াছে, অতএব এই সম্বন্ধে পান-সুপারী করিবার সম্মান আমাদের সহরের প্রথম প্রাপ্য। পানসুপারী গ্রহণ না করিলে আমরা যাইতে দিব না। উনি পীড়িত থাকায় এই কথা তাঁরা আমাকে বলিলেন এবং "কোন সময়ে সুযোগ পাইলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের জানাইবেন"—এইরূপ বলিয়া গেলেন। সেই সময় আমি ওঁকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উনি বলিলেন "আমি এখনও বসিতে পারি না এবং আমার কথা কহিবার শক্তি নাই—এখন আমি পানসুপারী লইতে পারিব না।" এই কথা আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু তবু তাঁরা নিজের জেদ্ ছাড়িলেন না। তাঁরা বলিলেন—আমরা তাঁকে কথা কহিবার শ্রম করিতে দিব না। ষ্টেশনে যখন আমরা তাঁকে পৌঁছাইয়া দিতে যাইব সেই সময় রেল-গাড়ী ছাড়িবার আগেই আমরা প্রথম মালাটি তাঁর গলায় পরাইয়া দিব—তাহা হইলেই হইবে। সেইরূপই তাঁরা করিলেন। সঙ্গে তাঁরা মালা, খিলি, চুবড়ী ভরিয়া আনিয়াছিলেন। উনি এসব কিছুই জানিতেন না। উনি সেকণ্ড ক্লাসে নিশ্চিন্তভাবে আরামে শুইয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার দুই মিনিট আগে

শ্রীমন্ত অন্নাসাহেব বারব, নাগপুরের উকীল, ডাক্তার কির্দোস্কর প্রভৃতি ভদ্রলোক গাড়ীর কাম্‌রায় ভিতর আসলেন ও পানের খিলি সামনে রাখিয়া, ওঁর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময়, "আমরা চলিলাম" এই কথা বলিয়া তাঁরা গাড়ীর কামরা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন—ঠিক্ সেই সময় শিটি দিল এবং তাঁরা ঝুড়ি হইতে ফুল লইয়া কাম্‌রার ভিতরে নিঃক্ষেপ করিলেন ও ওঁর নাম ধরিয়া তিনবার জয়োচ্চারণ করিলেন। গাড়ী ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

বোম্বায়ে বদ্‌লী ১৮৯৩।

বোম্বাই-হাইকোর্টের জজের পদে ওঁর নিয়োগ।

সোলাপুর হইতে পুণার আসিবার পর, দশদিন পর্য্যন্ত "উহাঁর" শরীর অত্যন্ত অশক্ত থাকায়, ঘরেই পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল, উনি বাহিরে কোথাও যাইতে পারেন নাই। তথাপি লোকের ভীড় সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট হইতই হইত এবং এই বোম্বায়ে বদলীর দরুন, পুণার লোকেরা কি কি করিবেন সেই সম্বন্ধে উনি কিছু না শুনিতে পান আমরা চুপি চুপি আপনাদের মধ্যে স্থির করিলাম। এই পুণার লোকদিগের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল এবং ওঁর এই পদগৌরব তাঁরা যেন নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। উহার সম্বন্ধে তাঁদের এইরূপ ঐক্যমত এবং উহাঁর প্রতি এতই প্রবল অনুরাগ ছিল। উনি একটু ভাল বোধ করিলে, একদিন সকালে ১৫।২০ জন ভদ্রলোক "ডেপুটেশনের হিসাবে আসিলেন এবং কাল হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত পানসুপারী প্রভৃতি তাঁরা নিজের মনের মতন করিবেন বলিয়া অনুমতি চাহিলেন। "এই সময় আমরা আমাদের ইচ্ছামত করিব এবং এই কাজ হইবে না এই কথা বলিলে চলিবে না, আমরা যাহা করিব তাহাতে আপনার সম্মতি দিতে হইবে, এই আমাদের অনুরোধ;"—এই সব কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"তোমরা ৮ দিনের কার্য্যক্রম কি স্থির করেছ, একবার আমাকে বলো—তার পর দেখা যাবে।" তাঁহারা বলিলেন;—"এই সম্বন্ধে আপনাকে কিছুই দেখাইব না, জিজ্ঞাসাও করিব না, এইরূপ আমরা স্থির করিয়াছি। একেবারে কিছুই না জানাইলে চলিবে না বলিয়া আমরা জানাইতে আসিয়াছি"। "উনি" আবার বলিলেন, —"আমাকে কিছুই দেখিও না, আমার জানবার জন্য কিছু আগ্রহ নাই। কিন্তু তোমরা পুণার লোক, আমার ভয় হয়, তোমরা যাই করবে তাই বাড়াবাড়ি করবে; তাতে তোমাদের বিচার-বিবেচনা থাকে না, তা ভালই হোক মন্দই হোক। যদি একবার বলো করবে, তা না করে' ছাড়বে না। তা আমার ভাল লাগে না। এখন যা তোমাদের করতে হবে তা বেশ বিবেচনা করে—বিচার করে' কর শুধু এই কথা আমি বল্‌ছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তাই করা যাবে", এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। তার পর দিন হইতে, এই পানসুপারী ও আতিথ্যসৎকার আরম্ভ হইল। সর্ব্বাপেক্ষা হীরাবাগের উৎসব অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানো প্রভৃতিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ওঁর পছন্দ হয় নাই; কারণ, উহাঁর মতে এইরূপ ব্যয় অর্থের অপব্যয়। আরও কিছু দিন এখানে থাকিলে, পুণার লোকেরা আরও বেশী বেশী অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে, তাই যত শীঘ্র হয় বোম্বায়ে চলিয়া যাওয়াই ভাল, এইরূপ উনি স্থির করিলেন, এবং আমরা সোমবারে রাত্রির গাড়ীতেই বোম্বাই যাত্রা করিলাম। পুণার লোকদিগের কার্য্যক্রম অনুসারে আমাদের যাত্রার দিন বুধবার স্থির হইয়াছিল এবং সেই দিন, ষ্টেশন ও প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর ফুলের রাস্তা করিয়া শহরের সমস্ত জাতির লোক একত্র সমবেত হইয়া, ব্যাণ্ড-বাজনা প্রভৃতি আনাইয়া খুব ধুমধামের সহিত ষ্টেশনে উহাঁকে পৌছাইয়া দিতে হইবে—এইরূপে পুণার লোকেরা স্থির করিয়াছিল। এই কথা ওঁর কাণে আসিয়া থাকিবে; তাই হঠাৎ উনি সোমবারে যাইবেন বলিয়া মনে করিলেন। সন্ধ্যাকালে বাহিরে যাইবার সময় বলিলেন, "দুই একটা বাক্সে যত জিনিসপত্র যেতে পারে শুধু তাই সঙ্গে নেও এবং আজ রাত্রে ১১ টার গাড়ীতে যাবার জন্য সব ঠিক্‌ঠাক্ কর। বেশী কোন উদ্যোগ একেবারেই করবে না। আমি ক্লব থেকে আহার করে ফিরে এলে পর ষ্টেশনে যাওয়া যাবে, অবশিষ্ট জিনিসপত্র ও বাক্স কাল কেউ নিয়ে যাবে।" তদনুসারে আমরা সব ঠিক্‌ঠাক্ করিলাম এবং সেই রাত্রেই ১১টার সময় ষ্টেশনে গেলাম। কিন্তু তবু ঠিক্ সেই সময় ৪০ জন ভদ্রলোক ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন এবং তাঁরা ফুল, মালা প্রভৃতি আনিয়া যতটা সম্ভব ধুমধাম করিয়াছিলেন, আমাদের আফিসের লোক আমাদিগকে পৌছিয়া দিতে আসিয়াছিল। বিদায় লইবার সময় তাহাদের খারাপ লাগিয়াছিল, আমাদেরও কষ্ট হইয়াছিল। এই সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সেই সময়ের জ্ঞানপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খানে বলা আবশ্যক যে, বোম্বায়ে যাইবার সময় পুণার ও অন্য স্থানের দেশীয় রাজ্যকে সাহায্য করিবার জন্য উনি ২৫০০০৲টাকা বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যবস্থার ভার বযোস্ত নগরকর ও আবাসাহেব সাঠের হাতে দিয়াছিলেন। যাক্; আমরা বোম্বাই যাইবার পর প্রথম মাসে সমস্ত পুরাতন ও নূতন মিত্রমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এবং ঘরকন্নার ব্যবস্থা করিবার জন্য উনি বাহির হইলেন। তারপর জানোয়ারীর শেষে ওঁর পুরাতন প্রাণেরবন্ধু বা. ব. শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত পীড়িত হওয়ায়, স্ত্রীপুত্রের সহিত সোরবন্দর হইতে বোম্বায়ে ঔষধোপচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বোম্বায়ের ডাক্তারেরা তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ৫।৬ মাস ছুটি লইয়া এইখানেই থাকিয়া উহাঁর ঔষধোপচার করা উচিত। তাই বোম্বায়ে থাকা স্থির করিয়া পণ্ডিত একটা বাঙ্গলার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনটাই পছন্দ হইল না। একদিন সকালে এইরূপ দুই একটা বাঙ্গলা দেখিয়া তিনি আমাদের বাড়ী আসিলেন এবং বলিলেন যে, "আমি গত সপ্তাহে অনেক বাঙ্গলা দেখেছি, কিন্তু সুবিধাজনক ও আপনাদের নিকটবর্ত্তী কোন বাঙ্গালাই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, তাই অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্চে। বোম্বায়ে থেকে আপনাদের হইতে দূরে থাকা আমার ভাল লাগে না, দিনের মধ্যে নিদেন দুই একবারও আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হয় এইরকম নিকটে কোন বাঙ্গলা পেলে, আমি পৃথক্ বাসায় থাকৃতে পারি; নৈলে আমার লোকজন নিয়ে এসে এই খানেই থাকৃব।

এই বাঙ্গলাটা খুব বড়"। এই কথা শুনিয়া "উনি" বলিলেন যে,—"বাঃ! এ রকম হলে, ত ভালই হয়। আমিও তোমার কাছে এই কথা পাড়ব বলে অনেকবার মনে করেছিলুম" কিন্তু "উনি" তারপর আবার বলিলেনঃ —"আমাদের মত সব কাজে বিলম্ব করা কিংবা একটু বাধাবিঘ্ন সহ্য করা তোমার কখনই অভ্যাস নাই। প্রথম থেকেই সমস্ত বিষয় সুনিয়মে ও ঠিক্ সময়মত হওয়া চাই,—এই রকম তোমার অভ্যাস। আজ পর্য্যন্ত তুমি স্বাধীনভাবে চলত; তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাকৃতে বল্লে, তুমি হয়ত আমাদের কথা ঠেল্‌তে না পেরে "হাঁ" বল্‌বে কিন্তু তোমার লোকজনদের তা কতটা ভাল লাগবে কে জানে,—এই রকম আমার মনে হওয়াতেই আমি এখনো পর্য্যন্ত তোমাকে কিছু বলি নি।" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন যে, "না না, সে রকম কিছুই না, আমার লোকজন অনেক। আপনাদের কষ্ট হবে বলেই আমি অন্য বাড়ী দেখছিলুম। এখন আমি মন স্থির করেছি। আমি কালই এখানে এসে থাকব।" এইরূপ বলিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং তিন চার দিনের মধ্যেই ছেলে পিলে ও বৌদিদিকে সঙ্গে করিয়া এখানে থাকিতে আসিলেন। আমাদের বাড়ী আসা অবধি সকাল সন্ধ্যায় 'উনি' পণ্ডিতের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার সময় পাইয়াছিলেন। এই জন্য পণ্ডিত বেশ স্ফূর্ত্তিতে ছিলেন মনে হয়; কিন্তু এই স্ফূর্ত্তি কেবল মনেরই স্ফূর্ত্তি। শরীরের ভিতর যে রোগরূপ ভীমরুল গর্ত্ত কাটিতেছিল. তাহার কাজ সজোরেই চলিতেছিল। তাহার সামূনে এই মনের স্ফূর্ত্তি আর কত দিন টিকিবে? ভিতরকার রোগের যন্ত্রণা বাড়িতে থাকায়, তিনি অধিক দুর্ব্বল ও অশক্ত হইয়া পড়িলেন ও মনেও অধিক অসোয়াস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন তিনি একলা থাকিতেন সেই সময় এই রোগের যন্ত্রণায় গোঁগুরাইতেন ও একেবারেই অধীর হইয়া পড়িতেন; কিন্তু পণ্ডিতের কাছে আসিয়া 'ওঁর' বসিবার সময় উপস্থিত হইলেই, পণ্ডিত চাঙ্গা হইয়া উঠিতেন। ওঁর সহিত কথা কহিবার সময়, তাঁর যে কোন রোগ আছে সে স্মরণ পর্য্যন্তও তাঁর নাই বলিয়া মনে হইত। কেবল 'ওঁর' অবস্থা শুধু একেবারেই উল্টা হইয়াছিল। পণ্ডিতের সহিত কথা কহিবার সময় উনি খুব ধীরভাবে বলিতেন, কিন্তু তাঁর নিকট হইতে উঠিয়া নিজের কামরায় আসিবার পর সমস্ত ক্ষণ তাঁর শরীর সম্বন্ধে ভাবিতেন। বাড়ীতে সরকারী কাজ করিবার সময়, খাওয়াদাওয়ার সময়েও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন এবং উদাসভাবে "রাম-রাম" উচ্চারণ করিতেছেন—বারংবার শুনিতে পাওয়া যাইত। রাত্রিতে কতক্ষণ ধরিয়া আমাদের মধ্যে কেবলই তাঁহার কথা হইত। এই সময়ে কখন কখন উনি উঠিয়া পণ্ডিতের ঘরে গিয়া, পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কি না, আজ তাঁর শরীর কেমন আছে, ইত্যাদি চুপি চুপি দেখিয়া আসিতেন; কখন কখন এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ওঁর নিদ্রা আসিত না। এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে—এমন সময় ১৮ই মার্চ্চ ১৮৯৪ তারিখে সকাল বেলায় ৬টার সময় তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল! বেচারী উঁবা-বাইর উপর সমস্ত দুঃখের পর্ব্বত চাপিয়া পড়ায় তাঁর শোকের তো সীমা ছিল না! কিন্তু এই পণ্ডিতের বিয়োগে, নিজের পুত্রবিয়োগ বা ভ্রাতৃবিয়োগের মতোই ওঁর শোক হইয়াছিল! পণ্ডিতের মতো মানী, তেজস্বী বুদ্ধিমান ও নিরলস ব্যক্তি মেলা খুবই দুর্ঘট, ওঁর মুখ হইতে বারংবার এইরূপ উচ্ছ্বাস-বাক্য বাহির হইত। ওঁর উপর পণ্ডিতের এরূপ অপরিসীম প্রীতি ছিল যে অনেক দিনের পর ওঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, প্রীতি সহকারে, আদুরে ছেলের মতো ওঁর সহিত ব্যবহার করিতেন। যখন দীর্ঘকালের জন্য আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, যতদিন থাকিতেন, দুজনের মধ্যে ছোট বড় কত কথাই হইত, জিজ্ঞাসাবাদ হইত—এবং ইহাতেই মত্ত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। যখন তাঁরা দুজনে বসিতেন, আমি সেই স্থান হইতে, কোন কাজে চলিয়া গেলে পণ্ডিতের ভাল লাগিত না। এই সম্বন্ধে কখন কখন ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "লোকে বলে, দুজনেরই সমান স্বভাব না হইলে ভালবাসা জন্মে না; তবে তোমার সহিত পণ্ডিতের কি করিয়া এতটা বন্ধুত্ব হইল? দুজনের স্বভাবের মধ্যে তো আগুন জলের পার্থক্য। পণ্ডিতের মুখের বোল এই ছিল—I shall better like to breake than to bend। এবং তোমার তত্ত্ববাক্য ও আচরণ, পণ্ডিতের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।" তাতে উনি বলিলেন, "এই দরুণই তাঁকে অধিক ভাল বলে মনে করতে হবে। ভাল লোকদের মধ্যেই তেজস্বিতা বেশী দেখা যায়। তোমরা টীকাকার যাই টীকা করনা কেন—কিন্তু আমরা দুজনে 'শিবস্য হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে শিবঃ' এইরূপ পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। এই মার্চ্চমাসে ১৩ই মাঘেই চিরঞ্জীব নাম্বর পুণায় জন্ম হইল।

(ক্রমশঃ)

নানা-কথা।

জনৈক ব্রাহ্ম বন্ধুর পত্র। "আপনার ২৫ তারিখের (জানুয়ারির) পত্রে আপনার সাদর আলিঙ্গন আমাকে বড় প্রীতি প্রদান করিল। আপনাদিগকে স্মরণ করিব না, তবে কাহাকে স্মরণ করিব। রাজা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ স্থাপন করিয়া বৈরাগ্য এবং সত্যেতে বঙ্গবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গেলে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে কোন প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেবের আবির্ভাবে নিরাকার ঈশ্বরই যে সত্যভাবে দর্শন করা যায় তাহা আবির্ভূত হইল। ঈশ্বর-উপাসনা আজ যা ব্রাহ্মসমাজে চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। যার যার সাধনার ক্রমে তাঁহাদের উপযোগী (ঈশ্বরালোকে) করিয়া লইয়াছেন এইমাত্র প্রভেদ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিরই শিষ্যরূপে—অধ্যাত্মপুত্ররূপে সেই ধর্ম্মকে প্রচার করিয়াছেন। * * * মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে আছে তিনি কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্ম পান নাই। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে আলোকিত করিয়াছেন। "ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"! শেষ জীবনে মহর্ষিদেব এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র মধ্যে যে পত্রাপত্রি হয় তাহাতে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে যে ব্রহ্মানন্দ

চির দিন মহর্ষিদেবকে পিতা বলিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি মহর্ষিদেবেরই অধ্যাত্মপুত্র। আমি ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত মফঃস্বলবাসী ছিলাম। ১৮৬২ সন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করি, তখন আদিসমাজ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মহর্ষি-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে যে উপাসনাপদ্ধতি আছে যা আদিসমাজে এখনও প্রচলিত সেই পদ্ধতি মুখস্থ করিয়া উপাসনা করিয়াছি এবং তখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের শাখাতে যোগ দিতেন। কালে ব্রহ্মানন্দ-সংশ্রবে সাধনভজনে তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হই। * * * তৎপূর্ব্বেও আমি জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতাম, যখনই বিষয়-কার্য্য হইতে অবকাশ পাইতাম। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের উপাসনাপদ্ধতিই প্রথম লোককে অবলম্বন করিতে বলিয়া থাকি। * * * আমার বয়স এখন ৭২ বৎসর, জ্যেষ্ঠ ৭২ আরম্ভ। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। নচেৎ আমি বুধবারে বুধবারে কলিকাতায় আদিসমাজেই উপাসনায় পূর্ব্বে যেমন যোগ দিতাম এখনও সেইরূপ দিতাম।

আপনি যে ভিন্ন সমাজ মিলিয়ে উপাসনার যাহা করিযাছেন তাহাতে আমি বড় প্রীত। আমি আদিসমজের উপাসনায় সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারি; কারণ এইখানে আমার জন্ম। জন্মগত জিনিষ চিরদিন ভাল। আমি ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য ১৮৮০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত করিয়াছি, এবং বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজে কয়েক বৎসর সময়ে সময়ে প্রচার করিয়াছি। এই দুই সমাজে যাহাতে আদিসমাজের প্রচারক যেয়ে উপাসনা আদিসমাজের মতে বুধবারে করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখনও আমার প্রাণ চায় যে মহর্ষি যে পন্থায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন আমি যতদূর পারি তাহার সহায়তা করি।

আদিসমাজের উপাসনালয়টী বিক্রয় হইবে—শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। হায়! রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যেখানে উপাসনা করিতেন; বিশেষতঃ রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাবযোগ যেখানে,—সেই মহাতীর্থ স্থানটি আজ বিলুপ্ত হইতে চলিল।

শব্দের শক্তি।—বাইবেলে লিখিত আছে যে, জেরিকোর প্রাচীর য়িহুদীগণের জয়ধ্বনিতে এবং সাত জন পুরোহিতের শিঙ্গা-রবে তাহাদের সম্মুখে ভূতলশায়ী হইয়াছিল। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সকল কথা স্বীকার করিতে চান না বটে কিন্তু এখন শব্দবিজ্ঞানের আলোচনা ও আবিষ্কারের দ্বারা জানা যাইতেছে যে বাইবেলের এই ঘটনার সত্যতা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রমাণিত হইতে পারে। শব্দগতি হইতে কত প্রকার কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কথিত আছে যে ক্যারিউশো মৌলিক গদে গান গাহিয়া মদের গ্লাস ভাঙ্গিতে পারেন। শুনা যায় যে মধুর সঙ্গীতে বাঁশীর প্রধান সুর স্থান ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলিয়া থাকে যে যখন নায়াগারায় ঝুলান সেতু প্রস্তুত হইতেছিল তখন ইহার কারিকরগণ কোন বৃদ্ধ বেহালা-বাদককে রাগান্বিত করিয়াছিল বলিয়া বেহালা-বাদক সেতু ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল, ইহাতে কারিকরেরা তাহাকে খুব উপহাস করায় বেহালাবাদক সেতুর অতি নিকটে উপবেশন করিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন বেহালায় সুর আসিল, তখন সে তন্ময় হইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে সেতুর তারগুলি খসিয়া যাইতে লাগিল এবং সকলে আশ্চর্য্য ও ভয়সহকারে দেখিল যে সেতু ভাসিয়া যাইতে উদ্যত। তখন যদি তাহার বেহালাবাদ্য না থামান হইত তাহা হইলে তাহার কথা কার্য্যে পরিণত হইত। ইহার পরে সেতু-নির্ম্মাণস্থানে যাহাতে শব্দ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছিল।

সম্মিলনী ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

মিসরে আবিষ্কার।—দানিনস পাশা মিসরের অন্যতর প্রাচীনতম নগর ক্যানোপস (Canopus) আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। অলেকজান্দ্রিয়া স্থাপনের বহু পূর্ব্বে ইহাই বাণিজ্যে দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। নিম্ন মিশরে ইহাই ধর্ম্মপ্রচারের অন্যতর মুখ্য কেন্দ্র ছিল। এই নগরে টলেমির সময়ের একটী সুবৃহৎ স্নানাগার, বিভিন্ন গৃহে টলেমিবংশীয়দিগের শবমূর্ত্তির নিকটে পিত্তলের মুদ্রা ও ছোট ছোট মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটী চীনেম্যানের মূর্ত্তি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে অতি পুরাকালে চীনের সহিত মিশরের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। ভারতের সঙ্গে যে ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে?

"শ্রীভগবৎ কথা" ও "মা"। এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথিতনামা জনৈক বন্ধু একটী পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আশা এই যে, তৎপাঠে অপর কাহারও প্রাণে ঐ দুইটী গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে এবং পাঠ করিয়া ভগবানে মতি দৃঢ় হইবে;—

* * * আপনার ন্যায় সরল সহজ ভাষায় সহজপ্রণালীতে শ্রীভগবানের কথা মনের ভিতর প্রবেশ করাইবার চেষ্টা ও তাহাতে সফলতা আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বিদেশে অনেকগুলি বই লইয়া আসা সুবিধা হয় না; আমার সঙ্গে এখানে যে সকল বই লইয়া আসিয়াছি, আপনার "শ্রীভগবৎকথা" তাহাদের মধ্যে একখানি; তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন বইখানিকে আমি কত ভাল বাসিয়াছি।

আপনার "মা" ও পাঠ করিলাম। তিনি মা ও আমরা ছেলে, এই সম্বন্ধ এই বইখানিতে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার অতি সহজ উপায়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভক্তিপথ বড় সোজা। মার নাম করিব আর দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিবে; এ পথে মানুষ সহজে পৌঁছাইতে পারে বলিয়া আমার বোধ হয় না। আপনি আপনার মনকে যে সুরে চড়াইয়া মার নাম গাহিয়াছেন, যদি আমিও কখন সেই সুরে চড়াইতে পারি, তাহা হইলেই বুঝিব যে ভক্তিপথের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

একটি নিজের কথা বলিব। আপনি ৭এর পাতায় যা বলিয়াছেন, আমাকে তিন বার তাহা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাকে অনেকটা চিনিতে শিখিয়াছি। ১৭ বৎসরের বালক তিন দিন ধরিয়া এক মনে মাকে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল—মার কোলে গেল, ইহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১৪ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

"শুভ মুহূর্ত্ত"।

অতি দূর সীমাহীন দিগন্তের কোলে
কেন আজি ছুটে যেতে চাহে মোর প্রাণ—
কাহার আহ্বান বাণী পশিছে মরমে আজি
ভাবপূর্ণ ভাষাহীন নীরব মহান্ ?
নৈশ আকাশের তলে কোন্ দেবদূত
আছে মোরে অপেখিয়া নীরব নিশ্চল !
অস্ফুট হেরিছে নেত্র সে রূপমাধুরী,
অস্পষ্ট পশিছে কর্ণে সে গীত তরল
বাঁশরীর ক্ষীণ তানে মৃদু সমীরণে ;
কি সৌরভ ! কি সঙ্গীত ! আকুল পরাণ
ছুটিছে সসীম হতে অসীমে মিশিতে—
ঘুচে গেছে সব বাধা সব ব্যবধান।

উদ্বোধন।

(কোজাগর পূর্ণিমা উপলক্ষে)

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে লক্ষ্মী আসিয়া প্রত্যেক লোকের দুয়োর ঠেলে দেখেন। যদি কোন গৃহস্থ ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলে সে গৃহ ছেড়ে লক্ষ্মী পালিয়ে যান। আর যে গৃহস্থ লক্ষ্মীদেবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেগে থাকেন, তাঁহার গৃহ তিনি ধনধান্যে পূর্ণ করে দেন। এই প্রবাদের ভিতর যে-কোন সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে থাক, আমরা কিন্তু তার ভিতর থেকে এই একটী মহান্ সত্য পাচ্ছি যে ইষ্ট দেবতাকে লাভ করতে চাইলে, তাঁর প্রসাদ অনুভব করতে চাইলে জেগে থাকা চাই। ধন চাও, বিদ্যা চাও, পৃথিবীতে ঐহিক যা কিছু চাও, যে কোন জিনিষকে পেতে চাও, তারই জন্য তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। ঘুমিয়ে সময় কাটালে তুমি তা পাবে না। অন্য লোক যদি জেগে থাকে, তবে তারাই তাদের পরিশ্রমের ধন লাভ করে উন্নতির দিকে চলতে থাকবে, আর তুমি জেগে উঠে তাদের উন্নতি দেখে নিরাশ-হৃদয়ে কেবল হাহুতাশ করতে থাকবে। ঐহিক জিনিষ আর অধ্যাত্ম জিনিসের পার্থক্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, ঐহিক জিনিষের জন্যই যদি আমাদের জেগে থাকতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, তবে অধ্যাত্ম জিনিষ লাভ করবার জন্য তার চেয়ে শতগুণ পরিশ্রম করতে হবে। সর্ব্বদাই সজাগ থাকতে হবে, প্রতি মুহূর্ত্তে অধ্যাত্ম বিষয় লাভের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে আশাপথ চেয়ে থাকতে হবে। এক মুহূর্ত্তও ঘুমোলে চলবে না। হয়তো তুমি যে মুহূর্ত্তে মনে করছ যে এখনও পাবার অবসর হয় নি, আর সেই ভেবে নিরাশ মনে জেগে থাকা অনাবশ্যক মনে করলে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগবান জ্যোতির্ম্ময়রূপে তোমার সামনে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু তুমি তখন নিদ্রিত—তাঁকে তুমি দেখতে পেলে না। এটা মনে কোরো

না যে, এবার তো ঘুমোলুম, আর একবার সজাগ থাকব, তখন ভগবানকে দেখতে পাব। যে বার ভগবান যে মূর্ত্তিতে দেখা দিতে আসেন, সে মূর্ত্তিতে তাঁকে আর দেখা যায় কি না সন্দেহ। যেমন এই ব্রহ্মাচক্র এই মুহূর্ত্তে যে পথ দিয়া চলে গেল, সে পথ দিয়ে আর কখনও চলবে কিনা, কেহ বলতে পারে না, তেমনি ভগবানের আবির্ভাব প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন নবনব ভাবে হচ্ছে, তখন একবার যে মূর্ত্তিতে তিনি দেখা দেবেন, আর কখনও সে মূর্ত্তিতে দেখা দেবেন কি না বলা যায় না। বোধ হয় এই ভাবেই আমাদের ঋষিরা বলেছেন সকৃৎ বিভাত্যেষ ব্রহ্মালোকঃ—এই ব্রহ্মালোক একবারই প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশের সময় যিনি তাঁকে হৃদয়ে ধরতে পারলেন, তিনিই তাঁকে সেই মূর্ত্তিতে ধরতে পারলেন।

ঘুমিয়ে থাকবার আর অবসর নেই। ভগবানের জন্য সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করে থাক। হৃদয়ের অন্ধকার গৃহের দুয়োর খুলে দাও। এই পবিত্র স্থানে পবিত্র সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁকে পাবার জন্য কি ভাবে প্রতীক্ষা করব, কি উপায় অবলম্বন করলে সমস্ত জীবন জেগে থাকতে পারব, সেইটী জানবার জন্য এসেছি। আজ আমাদের সেই উপায়টী জেনে যেতে হবে। সে উপায়টী আর কিছুই নয়—হৃদয়ের দুয়োর খুলে রেখো; প্রাণটাকে বন্ধ করে রেখো না। অন্ধকার গৃহে এতটুকু আলো পেলেও সেটুকু সঞ্চিত করে রাখতে হবে। সেই অরূপরূপী জননী বড়ই নিঃশব্দে এসে হৃদয় অধিকার করেন। সন্ধ্যার শিশিরের মত তাঁর আবির্ভাব বোঝা যায়। কিন্তু তিনি এসে যদি দুয়োর ভেজানো দেখেন, দেখে যদি ফিরে যান, সে দোষ কার উপর ফেলব, সে দোষ তো আমাদের। তিনি যখন আসবেন, তখন আকাশে গ্রহচন্দ্র নক্ষত্রসূর্য্য সকলেই আনন্দে হাসতে থাকবে। তখন ফুলফল গাছপালা সমস্তই প্রফুল্ল হয়ে উঠবে, নদী সাগর সমস্তই প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করবে; আর, আমাদের হৃদয়ে আনন্দধ্বনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। এর পরেও যদি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তাঁর দেখা না পাই, তবে সে দোষ তো আমাদের নিজেরই। এই উপাসনামন্দিরে যদি আমরা সকলে মিলিতকণ্ঠে প্রাণের সঙ্গে এখনি মা—মা—বলে ডাকি, তবে তিনি তো এখনই এখানেই আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবার জন্য আসতে বাধ্য। সে আনন্দকলরবে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কে?

তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের ভিতর দেখতে চাইলে হৃদয়ের দুয়োর খোলা রাখতে হবে, প্রাণ-মন সমুদয় সজাগ রাখতে হবে। আলস্যকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থান দেবে না। এই আলস্যই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ঐ যে একটা কথা আছে ব্রহ্মের রূপকল্পনা সাধকদের হিতের জন্য, এটার ভিতর খুব সত্য থাকলেও আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, আজকাল সাধারণে উহার অর্থ যে ভাবে গ্রহণ করেন তাহা কখনই ঠিক হতে পারে না। মায়ের কাছে ছেলে যাবে, মাকে ছেলে হৃদয়ের পূজা দেবে, তার জন্য রূপকল্পনা, মূর্ত্তিস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা এত ঘনঘটা এত রকমের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? সরল প্রাণে সরল পথ ধরে তাঁর কাছে চল, তাঁকে হৃদয়ের পূজা দাও, হৃদয়ের গুহা অন্ধকার রেখো না, জ্ঞানের আলো জ্বেলে দাও, তখন বুঝতে পারবে যে, ব্রহ্মের রূপকল্পনার দোহাই দিয়ে যে আলস্যের প্রশ্রয় দিয়েছিলুম, সেই আলস্য আমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছে—মায়ের কাছ থেকে আমাদের কত দূরে রেখেছে।

জননীর জয়গানে সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত করে তোলো। অন্য সমস্ত কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অরূপ রূপের কথাই বল, সেইটীই হৃদয়ে অনুভব কর, তখন দেখবে এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁকে দেখতে পাবে; তখন আর রূপকল্পনার জন্য রাশি রাশি মূর্ত্তি গড়ে পূজার কথা মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে স্থান পাবে না। তখন জননীর যে জ্যোতির্ম্ময় রূপের আভাসমাত্রে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য আলোকে বিভাসিত হয়েছে, যাঁর জ্ঞানজ্যোতির ইঙ্গিতে-মাত্র আমাদের আত্মা প্রভাতসমীরণে শুভ্র শত-দলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি আমাদের সমুদয় হৃদয় অধিকার করবে। এসো, আজ এই শুভমুহূর্ত্তে তাঁর সেই অরূপরূপের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে প্রাণকে শীতল করি।

প্রকৃত শিক্ষা।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী)

আমাদের দেশে পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন শিক্ষা তাহার নিজের অবলম্বনে দাঁড়াইত অন্য কোনও বস্তুর মুখাপেক্ষী তাহাকে হইতে হইত না। বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখিতেন শুধু বিদ্যারই নিমিত্ত—বিদ্যাই ছিল তাঁহাদের আরাধনার দ্রব্য। তখন দেশের অবস্থা অন্যরূপ—অন্নের হাহাকার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান কালের মত বাজিয়া উঠে নাই, বিলাসিতার বিষ তখন দেশের অঙ্গ জর্জ্জরিত করে নাই—লোকে অন্নে সন্তুষ্ট হইত, জীবন অপেক্ষাকৃত সরস ছিল। মামলা, মোকদ্দমা, অশন, আসন, বসন, ভূষণের চেষ্টায় বাঙ্গালী তখন এতটা ব্যতিব্যস্ত ছিল না। তখন গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নাই; প্লেগ কলেরা বসন্তের রক্তচক্ষু দেশবাসীগণকে এরূপ বিব্রত করিয়া তুলে নাই; সমুদ্রপার হইতে বিলাতী বিলাসী দ্রব্যের সঙ্গে নিত্যনূতন রোগের বীজ দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেশের বায়ুকে এমন করিয়া কলুষিত করে নাই; সর্ব্বোপরি অকাল মৃত্যুর বিজয়ভেরী এখনকার মত চতুর্দ্দিকে তাহার জয়ডঙ্কা নিনাদিত করে নাই। মানুষ ছিল বহুভোগী এবং দীর্ঘজীবী। সে সময়ে বিদ্যার্থী গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া পাঁচ বৎসর কাল ব্যাকরণ, সাত বৎসর কাব্য, দশ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নে অসঙ্কুচিতভাবে ব্যয় করিতেন। বিদ্যায় অর্থ ব্যয় হইত না—গুরুগৃহে বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেন, গুরু অন্নদানে কাতর ছিলেন না। দেশের জমিদারগণ ভূমি এবং বৃত্তি দান করিয়া সেই সকল অধ্যাপকগণের মহৎকার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

জীবন তখন তাহার স্বাভাবিক গতিতে চলিয়াছিল—কোনরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উহার গতিশক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইত না। এখন জীবনের গতিশক্তি অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানকালে জীবনে আমাদের বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখাপড়া সাঙ্গ করিতে পারিলে তবে রাজকার্য্য পাওয়া যাইবে। কে বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদান করিতে হইবে—অধ্যাপক এবং শিক্ষক কোন একটি বিশিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দিবেন—ঠিক এক ঘণ্টা বা পঞ্চাশ কিম্বা কোন কোন স্থলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে—বিদ্যার সাধনা, যাহা আদৌ সময়মুখাপেক্ষী নহে। তাহাকে এইরূপে বৎসর, মাস ও দিনের কঠোর কাঠগড়ায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার সমস্ত রস নিংড়াইয়া ফেলা হইতেছে। পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ফলে বিদ্যার সাধনা যথেষ্টপরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে, গভীরত্ব নষ্ট হইয়াছে। চেয়ার, টেবিল, টুল, তক্তাপোষে গৃহ পূর্ণ হইল—কিন্তু ফলভারাবনত বৃক্ষের অভাব; শিক্ষার বহিশ্চাকচিক্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, নাই কেবল তাহার স্নিগ্ধ শ্যামলতা যাহা জীবনের রসে অভিষিক্ত।

বর্ত্তমানকালে জীবনযাত্রা যে বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তবে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে। এই সকল অভাব অভিযোগ দূর করিবার নিমিত্ত সকলকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত জীবনে আমাদিগকে বস্তুসংগ্রহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় আমাদের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছে। কি প্রাথমিক কি উচ্চশ্রেণীর উভয়বিধ শিক্ষায় নীরস বস্তুর দিকে ছাত্রগণকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। জীবনযাপনের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; জীবন বিকশিত হইলে বহুপ্রকার অভিনব উপায়ে সে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে গোড়া হইতে তাহাকে একটা বাঁধা পথ দেখাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। জীবনকে গঠিত করিয়া তোলা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ছেলেদের practical করিবার চেষ্টায় প্রথম হইতে কেবল পাশ্চাত্য অনুকল্প শিক্ষা দিলে তাহাদের সমস্ত শিল্পশিক্ষা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। যে সকল উপকরণে তাহাদের চিত্তের বিকাশ হইবে তাহাই শুধু শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উন্মুখ চিত্ত যখন আপন স্বাভাবিক বৃত্তি লইয়া

নিজের বিশিষ্টতার পথে অগ্রসর হইবে সেই সময়ে সেই বিশেষ শিল্প, কলা বা সাহিত্য তাহার শিক্ষার বিষয় করিলে যথেষ্ট উপকার হওয়া সম্ভব। আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "বিজ্ঞান-রিডার" নামধেয় একখানি পুস্তক ছেলেদের পড়ান হয়—কথামালা পড়িবার পরেই সম্ভবতঃ ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠশালায় পড়ান হইয়া থাকে। উহাতে নানা বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, কৃষি, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা আছে। আবার ইংরাজী বিজ্ঞানে যে সকল বড় বড় নাম প্রচলিত আছে—বালকদিগের পাঠ্য সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও সেই সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শিক্ষা বালকগণকে যখন দেওয়া হয় তাহাদের চিত্ত উহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত থাকে না—উদজান, যবক্ষারজান, মাধ্যাকার্ষণ, তাপমান যন্ত্র ইত্যাতি সকল কথাই উহাতে আছে। শিক্ষাটীকে প্রয়োজনমূলক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রবল চেষ্টা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লক্ষিত হইয়াছে—কিন্তু এমন ব্যর্থচেষ্টাও বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখা যায় না। বিজ্ঞান, শিল্প বা সাহিত্যের প্রতি ছাত্রগণের অনুরাগ জন্মিবার পূর্ব্বে যে চিত্তের একটী সাধারণ বিকাশের প্রয়োজন আছে তাহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে যদি বিজ্ঞান-রীড়ার পড়াইতে পারি-তবেই বুঝি একদিনেই বাঙ্গালা দেশের উদ্যানে বিজ্ঞানের পারিজাত ফুল ফুটিবে।

এ তো গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা; কালেজে বি, এস, সি, এম, এস, সি, পাশ করিয়াই বা কি হয়! উক্ত পরীক্ষায় যাঁহারা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই বলিতে শুনিয়াছি—"এর চেয়ে বি, এ; এম, এ, পাশ করিলেই ভাল হইত; ওকালতী পক্ষে খানিকটা সুবিধা হইত"; ইণ্টারমিডিয়েট হইতে ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ হওয়ায় ইংরাজীতে লিখন কথন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাদের বরং কিছু কিছু অসুবিধা হয়। বিজ্ঞানে অনুরাগ স্থাপিত হইল কৈ? শিল্পবিদ্যা সুপ্রচলিত হইয়া দেশের অভাব মিটাইল কই? দৈন্য হাহাকার প্রশমিত হইল কৈ? বিদেশী ভাষায় বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রাণহীন অনুকরণ এমনই ব্যর্থ হয় বটে! বিলাতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান যাহা আলোচিত হইয়া ইয়ুরোপ-খণ্ডকে উন্নত করিয়াছে তাহা সেখানকার জীবনের অভিব্যক্তি। আমরা এখানে যদি ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ অনুকরণ করি তাহা হইলে কেমন করিয়া আমাদের সুফল লাভ হইবে? আমাদের স্বকীয় অভিব্যক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া উহা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে তবেই উহা এ দেশে সার্থক হইয়া উঠিবে—নতুবা স্তূপীকৃত বস্তুর অনুকরণ তাসের ঘরের মত একদিন আপনার ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইয়ুরোপ হইতে যাহা আসিবে তাহার ক্ষেত্র এ দেশের মাটীতে প্রস্তুত না করিলে টবে শোভিত বিলাতী ফুলগাছের মত এ শিক্ষা দু' একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ড্রয়িং রুমের শোভাবর্দ্ধন করিবে মাত্র—ফুল, ফল ও ছায়াদানে দেশের সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিবে না।

আমি জানি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনেক ছাত্র ইতিহাস না পড়িয়া "মেকানিক্স" পড়িতে চায়। গণিতবিজ্ঞানে তাহাদের অনুরাগ অধিকতর বলিয়া যে ইহা ঘটে তাহা নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়—"ইতিহাসে বেশী নম্বর পাইবার সম্ভাবনা নাই—মেকানিক্সে অনেকে পূর্ণ সংখ্যা পাইয়া থাকে।" বিদ্যালয়ে দেখা যায় যে সকল ছাত্রের মেধা অল্প তাহারাই ইতিহাস গ্রহণ করে—কারণ তাহাদের পক্ষে "নান্যঃপন্থা"—কোনও রূপে মুখস্থ করিয়া পাশ করিবে। ছাত্রেরা সর্ব্ববিধ নোট মুখস্থ করিতেছে, পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে পেন্সিল দ্বারা নানা প্রকার চিত্র করিয়া দরকারী প্রশ্নসমূহ চিহ্নিত করিয়াছে—এই প্রকারে "পাশ-ফোভিয়া" চক্ষুরোগের ন্যায় বিদ্যার্থীর একটী বিশিষ্ট ব্যাধিস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এই পাশ-রোগ সংক্রামক; সর্ব্বত্রই ইহার প্রবল প্রকোপ দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত-শিক্ষা—যাহা লোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যই শিখিয়া থাকে তাহাতেও সর্ব্বত্র এই পাশ-পাশ। বেদান্তের মায়াবাদ-পাঠীগণও এই পাশের মায়াপাশে আবদ্ধ!

যে পাশ পাশ করিয়া আমাদের শিক্ষা কলুষিত হইল, বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিল—সেই পাশের কি মর্য্যাদা আছে তাহা একবার লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। general line এ পাশ করিয়া হয় চাকরী না হয় ওকালতী। তাহাও যে কতপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। বি, এ ও এম, এ, চাকরী বাজারে ২৫৲।৩০৲ টাকায় বিকাইতেছে। সমস্ত আদালতেই মক্কেল ও মোকদ্দমার সংখ্যা একত্র করিলে উকীল মোক্তারের সংখ্যার সমকক্ষ হইতে পারে না।

যে জীবন প্রাণের রসধারায় নিষিক্ত—অভাব-অভিযোগের সম্মুখে সে সঙ্কুচিত হয় না, বিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইবার শক্তি তাহার আছে। সম্মুখে সমুদ্র দেখিয়া তীরে বসিয়া সে লহর গণনা করে না—লম্ফ দিয়া তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাহার নিমিত্ত নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহার চলিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা নাই—সে আপনার পথ আপনি তৈয়ার করিয়া লইবে। বিদেশীয় অনুকরণের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে কোন শিক্ষাই কার্য্যকরী হইবে না। আমদের প্রভূত ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন ব্যর্থ হইবে, যদি বাঙ্গালা সাহিত্যকে আদর করিতে না শিখি; ভারতবর্ষের বীজে যে দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার সহিত যোগধারা না রাখিয়া আমরা যে বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি অনেক স্থলেই তাহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এ কথা বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যাহার নিজের মর্য্যাদা বোধ আছে সেই অপরের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া থাকে। যে দেশের স্বকীয় বিশিষ্ট সাহিত্য ও সভ্যতা আছে সেই দেশই অপর দেশের সাহিত্য ও সভ্যতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশীয় সাহিত্য এবং সভ্যতাকে একেবারে বর্জ্জন করিলে বিদেশী সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের গলগ্রহস্বরূপ হইয়া উঠিবে। উহা আমাদের জাতীয় জীবনের বন্ধন মোচন না করিয়া কঠোর হইতে কঠোরতর বন্ধনে প্রতিদিন আমাদিগকে বাঁধিতে থাকিবে। জাতীয়

তার বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের দেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক জীবনধর্ম্মাবলম্বী নহে; তাহা একটী প্রকাণ্ড কারখানার মত দেশের মধ্যস্থলে বসিয়া আছে—সমস্ত দেশের হৃৎপিণ্ড, শিরা, উপশিরার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই; এই কারণে সে যাহা তৈয়ার করিতেছে তাহা খাঁটী মানুষ না হইয়া অনেকটা কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কলের পুতুলের ন্যায় বসি দাঁড়াই, একটা বিধিবদ্ধ কাজে লাগাইয়া দিলে সে কাজ বেশ করিয়া যাইতে পারি; কিন্তু জীবনযাত্রার নিমিত্ত যে প্রাণময়ী উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। আমাদের শিক্ষা আমাদের জীবনের সহায় হইতে পারে নাই, জীবনের সহিত উহার বিশেষ সংশ্রবও নাই। আমাদের গৃহের সহিত আমাদের শিক্ষার কোন নিকট সম্বন্ধই নাই। সেই জন্য পাশ করা হইয়া গেলেই আমাদের শিক্ষা শেষ হইয়া আসে; জ্ঞানচর্চ্চা জীবনব্যাপী সাধনা হইয়া দাঁড়ায় না।

এ দেশে যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন হয় তখন অল্প বেতনে কেরাণী সংগ্রহ করা ইংরাজগণের উদ্দেশ্য ছিল। তারপর হঠাৎ এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা কেরাণী, উকিল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার অনেক পরিমাণে পাইয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের জীবনের সাধনা সার্থক হইয়া উঠে নাই। তবে একটী শুভলক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা প্রকৃত পন্থা অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। দুঃখ, দৈন্য, অভাব ও মর্ম্মবেদনার দুঃসহ ব্যথায় পীড়িত হইয়া জাতীয় জীবনের মুক্তিদ্বার খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছি। বিধাতার বিধানে আমরা সে সত্য পথ পাইব মনে এমন আশা হইতেছে।

সেই ভুল সব চেয়ে সাংঘাতিক যাহা আমাদিগকে জানিতে দেয় না যে আমরা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষাসমস্যাপ্রসঙ্গে সেরূপ কোনও মারাত্মক ভুল আজ আর নাই। আমাদের শিক্ষা বিধানের মধ্যে কোথায় যে একটী কণ্টক রহিয়াছে—যাহা পথটাকে সুগম হইতে দেয় নাই, সে কথাটী আজ দেশের বরেণ্য মনীষিবৃন্দ সুস্পষ্ট বুঝিতে

পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা হইয়াছে কেমন করিয়া এ সমস্যা মীমাংসিত হইয়া শিক্ষা দেশের বাস্তব কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চালিত হইয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় প্রথানুসারে শিক্ষিত হইয়াও আমরা যে এখনও জীবনহীন হই নাই, তাহার নিদর্শন আছে। এমন অবস্থায়ও আমরা যে জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পাইয়াছি—তাহা অল্প গৌরবের কথা নহে। অবশ্য কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে, ইহাঁদের প্রতিভা এতটা ফুটিয়া উঠিত না; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় ভাবের পরিপোষণের পরিবর্ত্তে বরং ঐ ভাব বিনষ্ট করিয়া থাকে। দেশীয় ভাষা এখানে অনাদৃত। বর্ত্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সেখানে বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার প্রকৃত সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাঙ্গালায় কোনও কাব্য পুস্তক নাই, শুধু অনুবাদ ও রচনা পরীক্ষার বিষয়। পরীক্ষার্থীগণ বাঙ্গালা ভাষা আদৌ আলোচনা করেন না; নিজেদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যে প্রশ্ন থাকে তাহার উত্তর করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য—যাহাতে প্রাচীন ও নবীন যুগভেদে বঙ্গসাহিত্যের অন্ততঃ পনর আনা অংশ নিবদ্ধ, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবহির্ভূত। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কেতকাদাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস ও বৈষ্ণব মহাজনগণের কাব্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নামের সহিতও অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটের পরিচয় হয় না। ইংরাজী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য পাঠকালে দেশীয় কবিগণের ভাবসম্পদ-ভাণ্ডারের দিকে যাঁহাদের চিত্ত বিপুল আগ্রহে আকৃষ্ট না হয়, তাঁহাদের কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা। দর্শনশাস্ত্রে ক্যাণ্ট, হেগেল, হেকেলের মতবাদ মুখস্থ করা হইল কিন্তু বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কপিল প্রভৃতির মতবাদ তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গেল। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস স্কুলে পড়ান হইয়া থাকে, তাহাতে ইংরাজশাসনকালের পূর্ব্বে এ দেশের যথার্থ চিত্রের সহিত ছাত্রগণের আদৌ পরিচয় হয় না। কেমন করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং কোন্ উপায়ে আবার তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া ভারতের নবজীবনের পথ আলোকিত হইতে পারে, বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাহার আভাস ত নাই, বরঞ্চ এমন অনেক মিথ্যা সংবাদ উহাতে আছে যাহাতে আমাদের আত্মসম্মান ক্রমশঃ লোপ পায়।

জাতীয় ভাব এবং ভাষা হইতে বঞ্চিত হইয়া এমনি ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে আমাদের জীবন কেমন করিয়া গঠিত হইবে? জীবন স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে, দাসত্ব ও অনুকরণ হইয়াছে তাহার একমাত্র অবলম্বন। দেশে দেশে নব জাগরণের সুবাতাস বহিতেছে, প্রত্যেক দেশের লোক প্রাণশক্তির অনুপ্রাণনে স্ব স্ব জাতীয় জীবনকে নূতন করিয়া অনুভব করিতেছে, আমরা শুধু অনুচিকীর্ষুর বৃত্তি অবলম্বনে পরমুখাপেক্ষী হইয়া জগতের গলগ্রহস্বরূপ দণ্ডায়মান। জগতের লোক আমাদিগকে কৃপা করিয়া যেন জগতে বাস করিতে দিয়াছে। এখানে আমরা শুধু যেন অনুগ্রহ লাভের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া থাকিব, আমাদের নিজের অধিকার যেন কিছুই নাই।

যে শিক্ষা এই দৈন্য, অবসাদ, আত্মাবমাননা প্রভৃতি কুসংস্কারসমূহকে আত্মজ্ঞানের পবিত্র অনলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, যে শিক্ষা দাসত্বের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাবলম্বনের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবে, যাহা এক হাত দিয়া প্রাচ্য জ্ঞানমন্দিরের বহুযুগরুদ্ধ দুয়ার বিশ্বজনের নিমিত্ত উন্মুক্ত করিবে এবং অন্য হস্ত দিয়া দেশবিদেশের বস্তুজ্ঞান নিজের দেশে সংগ্রহ করিবে; যাহাতে অনুকরণ নাই প্রাণ আছে; উপকরণের আড়ম্বর নাই, আছে সত্যের নিমিত্ত প্রাণপূর্ণ একাগ্র সাধনা সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। ইহা পাইবার পথে আমাদের যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে; কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট আমাদিগকে নিরুৎসাহিত এবং উপহসিত হইতে

হইবে, কিন্তু উহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। আমাদিগকে মনঃপ্রাণ এক করিয়া, সমগ্র দেশবাসীগণের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে—"ইহাই আমাদের চাই"। প্রার্থনা ঐকান্তিক হইলে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা সম্পূরণের বিধান করেন। আমরা আশা করি আমাদের ঐকান্তিকতা সফল হইবে।

ছোট আর বড়।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা যাকে ইতিহাস বলি, সে ইতিহাস নিজের ইচ্ছামত কাউকে ছোট, কাউকে বড় বলে' ঠিক করে, আর আমরাও চর্ব্বিতচর্ব্বণের মতো সেই ইতিহাসের অনুযায়ী মত প্রকাশ করে' নিজেদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করি। ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে কয়জন বড় বড় কাজের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ জানেন বা জানবার চেষ্টা করেন? একজনও করেন কিনা অথবা করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আসলে ধরতে গেলে আমরা যত ভুল ইতিহাস পড়ি, আর সেই ইতিহাসের উপর দাঁড়িয়ে নিজে-দের মতামত তৈরি করি, কাউকে ছোট মনে করি, কাউকে বা বড় মনে করি।

কিন্তু আমরা কাকে ছোট বলি আর কাকে বড় বলি? কাউকে ছোট বলবার অথবা কাউকে বড় বলবার আমাদের অধিকার কি? আমার নিজের বিশ্বাস, প্রত্যেকেই আপনাপন ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড়। বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র পাঠ করতে করতে বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাপক (বর্ত্তমানে সার) জগদীশ-চন্দ্রের কাছে যখন উপদেশ পেলুম যে ধুলো না থাকলে আমরা দেখতেই পেতুম না, তখনই আমার মনে এই কথাটি সব প্রথম জেগে উঠেছিল যে, সকলেই যখন ভগবান থেকে এসেছে, তখন কাউকে বড় আর কাউকে ছোট বলবার অধিকার আমাদের নেই। তারপর আবার যখন দেখলুম যে কোন একটী পরমাণু বা শক্তি বিনাশ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তখনই সেই পরমাণুর আর শক্তির মহত্ব দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম—আমার প্রাণের কথায় খুব সায় পেলুম।

কাউকে বড়, কাউকে ছোট, আমরা কি হিসেবে বলতে পারি? আমি নিজেকে মনে করি যে, ধুলোর চেয়ে আমি খুব উচু, খুব বড়; কিন্তু ধুলোর দ্বারা যে সমস্ত কাজ হয়, সে সব কাজ কি আমার দ্বারা হোতে পারে? ধুলোর অভাবে আমি কি জীবজন্তুকে দেখবার শক্তি দিতে পারি? তা যখন পারি নে, তখন ধুলোকে ছোট, আর নিজেকে বড় বলে দেখবার বলবার আমার অধিকার কি? কাউকে ছোট বা বড় বলবার অধিকার সত্যিই আমাদের নেই। কি করেই বা থাকবে? একই মহাশক্তি যে সকলেতে বিকশিত। বৃহত্তম সূর্য্য থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত সকলই যে একই মহাশক্তির বিকাশ। মহত্তম মানবাত্মা থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণপঙ্কের মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত, সকলই যে একই মহান্ অগ্নি থেকে নিঃসৃত বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সকলেতেই যে মহাশক্তি ভগবান আছেন। কাজেই আমি বড় তুমি ছোট বলবার অধিকার আমার নেই। তাই আসলে ধরলে তুমি আমি একই। তাই আমরা সকলেই প্রেমের একই বন্ধনে বাঁধা। কোথায় ছায়াপথের অনন্ত নক্ষত্র, আর কোথায় আমার মতো একটী ক্ষুদ্র প্রাণী—সকলেই এক আশ্চর্য্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

সকলের মধ্যে এই মহাশক্তির বিকাশ, এই প্রেমের বাঁধন যে গ্রন্থে প্রকাশ করা হবে, যত খুলে বলা হবে, বুঝিয়ে দেওয়া হবে, সেই গ্রন্থই ইতিহাস নামের তত বেশী দাবী করতে পারবে। কেবল কতগুলো লোক মারা গেল, তার বিবরণ থাকলেই কোন গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যায় না। পাশ্চাত্য-গণ অবশ্য বাহিরের ছোটবড়কে নিয়েই ইতিহাস গড়ে তুলতে চান—ভিতরের কথা তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। আমরাও আজকাল পাশ্চাত্যদেশের নকলে বলতে শিখেছি যে খুব পুরাকালে আমাদের কোনই ইতি-হাস ছিল না; আমাদের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণগুলো ইতিহাস নামেরই উপযুক্ত নয়। যে সমস্ত গ্রন্থে লেখা আছে যে, এতগুলো লোক অমুক যুদ্ধে মরেছে, এতগুলো গ্রামনগর ধ্বংস হয়েছে, অমুক রাজাকে অমুক প্রজা অমুক দিনে খুন করেছে, এখন আমরা পাশ্চাত্যদের

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক স্বয়ং দায়ী।

নকলে সেই সমস্ত গ্রন্থকেই খুব বড় ইতিহাস নাম দিয়ে নিজেদের জ্ঞানপনার পরিচয় দিয়ে গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করতে থাকি।

কিন্তু এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে প্রভেদ। আমাদের মন যে কারণেই হোক, দর্শনের দিকে একটু বেশী ঝোঁকে—বাহিরের ঘটনার দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চাষাভুষোর মতো তাকিয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত হয় না; কিন্তু ঘটনাগুলোর নীচে কি আছে, কিসের জোরে ঘটনাগুলোর উদ্ভব হোল, সেইটি আমরা দেখতে চাই। এইভাবে দেখতে অভ্যাস করেছি বলে, আমরা কাউকে আসলে ছোটবড় করে দেখতে চাইনে। আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুরাণ মহাভারত দেখ। তাতে ছোটবড় ভেদাভেদ অলভ্যরূপে দেখানো হয় নি। মহাভারত ভাল করে আলোচনা করে দেখলে বোঝাই যায় না যে সত্যি সত্যি কে বড় আর কে ছোট। দেখা যায় যে, মহাভারতে সমস্ত পাত্রপাত্রীর ভিতর দিয়ে মিলিতভাবে এক মহাশক্তির বিকাশ দেখানো হয়েছে। পাছে পাত্রপাত্রীর মধ্যে কাউকে ছোট আর কাউকে বড় বলে মনে বসে যায়, তাই প্রথমেই তাঁদের সকলকে হয় জগতের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের অংশে অবতীর্ণ অথবা নিজের নিজের কর্ম্মফলে নূতন করে জন্মলাভ করেছেন বলে বলা হয়েছে। কাজেই সে অবস্থায় পাত্রপাত্রীদের কাউকেই ছোট বা বড় বলবার অবসরই পাওয়া যায় না।

কিন্তু পাশ্চাত্যদের ইতিহাস অহংভাবে পূর্ণ বলে নিজেকে বড় করে, আর নিজেকে ছেড়ে অন্য সকলকে ছোট করে দেখতে শেখায়। তাই পাশ্চাত্যেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমানেরই উপর প্রয়োগ করতে চায়—অতীতের সঙ্গে বা ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগ রাখবার একটা তীব্র আশঙ্কা বড় একটা দেখা যায় না। এই ভাব থেকেই ঘটনাগুলো লিখে রাখাকেই ইতিহাস নাম দেবার ভাব তাদের মাথায় জেগে উঠেছে মনে হয়। নেপোলিয়নের জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেই লেখক মনে করলেন যে, মস্ত একটা ইতিহাস লেখা হোয়ে গেল। এ রকম ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করা যে ইতিহাসের এক অংশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটাই ইতিহাসের সমস্ত নয়। এ রকম ইতিহাসে একটা সত্যিকার জীবন পাওয়া না। তাই এ রকম নির্জীব ইতিহাস লিখে বড়াই করা প্রাচ্য পুরাণকারেরা পছন্দ করতেন না। তাই তাঁরা নিজেরা অজ্ঞাতনামা থেকেও সজীব ইতিহাস লিখে নিজেদের ডাকনামেই বিখ্যাত হতে পেরেছেন। সমস্ত জগতে যে একই মহাশক্তি নিজের লীলায় আপনাকে বিকাশ করছেন, নির্জীব ইতিহাসে তাঁরা সে কথার কোন পরিচয় পান না। কিন্তু তাঁরা জগতের ইতিহাসে সেই বিকাশই দেখতে চান, আর দেখাতে চান। তাঁরা জগতের বিভিন্ন লোকের কাজে বাহ্যিক ছোটবড়র ভাব দেখতে পেলেও তাঁরা বেশ জানতেন যে ছোটবড় বলে আসলে কিছু নেই, আসলে কোন লোককে ছোট বা কোন লোককে বড় বলা যায় না। সেই ভাবটাই তাঁরা তাঁদের পুরাণ-ইতিহাসেও দেখাতে সচেষ্ট। তাই প্রত্যেক পুরাণেরই গ্রন্থকার বেদব্যাস—যিনি জগতের জ্ঞানের প্রারম্ভ অবধি সমসময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভগবৎ-লীলা দেখাতে অগ্রসর। প্রত্যেক পুরাণকার "বেদব্যাস" নাম ধরে অনাদ্যনন্ত মহাশক্তির অনাদি ও অনন্ত লীলায় আপনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের ছোটবড়র ভাব আসলে স্বীকার করতে চান না বলে প্রত্যেক পুরাণে পরব্রহ্মের মহাশক্তির জাগরণ অবধি আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনাকে সেই মহাশক্তির লীলারূপে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন; আবার ভবিষ্যতেও সেই মহাশক্তিরই লীলাস্বরূপে কি রকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা হোতে পারে, তারও দিকে অল্পাধিক উঁকিঝুঁকি মেরেছেন। এই জন্যই আমাদের পুরাণ, আমাদের তন্ত্র, বলতে গেলে আমাদের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রকেই সমস্ত কাল ও জীবনের সমস্ত কাজ ধরে রচনা করবার চেষ্টা হয়েছে।

অদ্বৈতবাদ আর পূর্ব্বজন্মবাদ হয়তো ছোটবড় ভাব নির্ম্মূল করবার মূল। কিন্তু এটা আমাদের ধারণা যে, এই ছোটবড়র অভাবজ্ঞান, সমস্ত জগত সংসারকে একই মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র বলে মনে করবার ভাবই আবার সেই অদ্বৈতবাদ আর কর্ম্মফলবাদ বা পূর্ব্বজন্মবাদের মূল আমাদের দেশে খুব

গভীর করে নামিয়ে দিয়েছে। সমস্ত জগত-সংসারকে যখন সেই বিরাট মহাশক্তির বিকাশভূমি বলে মনে করি, তখন তো আমার নিজেরও জ্ঞানের সীমা দেখতে পাই নে, আর জগতসংসারেরও সীমা দেখতে পাই নে—তখন আর ছোটবড়র ছোটখাটো সীমা থাকে না, অসীমে অসীম মিশে যায়—থাকেন কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং, এক মহান অদ্বৈতভাব। সংসারে নেমে এসে দেখি, এখানে দ্বৈতবাদ তোমার আমার ভিতর কার্য্যক্ষেত্রে ছোটবড় এনে দিয়ে একটা কাটাছাঁটা সীমা এনে দেয়।

মহান বিশাল অদ্বৈতভাব আমাদের প্রেমেতে, জ্ঞানেতে, আনন্দে শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সঙ্গে এক ও অবিচ্ছিন্ন বলে দাঁড় করিয়ে, আমাদের ক্রমাগত বড় বলে বলে, আমাদের ছোট হোতে দিতে জানে না—বড়র দিকে লক্ষ্যটা স্থির রাখিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারে দ্বৈতভাব আমাদের বড় আদর্শ ঠিকমত দেখাতে পারে কি না সন্দেহ। এই দ্বৈতভাব আমাদের ক্রমাগত ছোট বলতে বলতে আমাদের আদর্শকে বোধ হয় কতকটা সত্যিই ছোট করে দেয়। দ্বৈতবাদ বাহ্যিক ফল দেখে যা তার মনে হয় তাই সে বলতে পারে। সে কাজেই বলে যে, এটা ছোট, ওটা বড়। সংসারের অনেক কাজ গায়ের জোরে হয়, দ্বৈতবাদেরও ছোটবড় সেই রকম গায়ের জোরে হয়। দ্বৈতবাদ বলে বটে যে, তুমি ছোট থাকলেও চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা আমার সমান বড় হোতে পার, কিন্তু কি করে যে বড় হোতে পারি তার ভিতরকার তত্ত্বটুকু সে বলতে পারে না। রোগ নির্ণয় হোলে তবে তো তার ওষুধ বেরোয়। দ্বৈতবাদ গায়ের জোরে ছোটবড় ধরে লওয়া ছাড়া বলতে তো পারে না যে কেন আমরা ছোট বড় হলুম ; কাজেই ছোট কি করে বড় হোতে পারে তার ভিতরকার তত্ত্বটুকুও বলতে পারে না। দ্বৈতবাদ ছোটবড় হবার একটা কৈফিয়ৎ এই দেয় যে, তোমার বাপমায়ের দোষে তুমি ছোট হয়ে জন্মেছ। কিন্তু কেন তুমি ছোট বাপমা থেকে জন্ম পেয়ে ছোট হোলে, সে কথার বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট উত্তর দ্বৈতবাদ থেকে পাই বলে মনে হয় না। এই সব প্রশ্ন আর তাদের ঠিকমত উত্তরে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। কাজেই এসব বিষয়ে কতকগুলো হ-য-ব-র-ল গোছের মনকে প্রবোধ দেবার মতো উত্তর দিলে তো চলবে না। অদ্বৈতবাদ জোরের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের যে সমাধান করে, সেটা কেবল মন বুঝানো গোছের নয়, কিন্তু সেই সমাধান আমাদের প্রাণের ভিতর থেকেও সায় পায়।

যে বিশাল অদ্বৈতবাদের কথা আমরা ইঙ্গিত করে এসেছি, সেই অদ্বৈতবাদ বলে যে, প্রকৃতিতে আসলে ছোটবড় বলে কোন কিছু নেই। সেই মহাশক্তির শক্তির বিকাশের গতিতেই আমরা কাউকে বা ছোট, আর কাউকে বা বড় বলে মনে করি। যাকে আজ তুমি ছোট বলে মনে করেছ, সেও যদি স্থানে আর কালে মহাশক্তির বিকাশ-সূত্রে তোমার স্থান অধিকার করত, তবে আর তাকে তুমি ছোট বলে মনে করতে পারতে না। অদ্বৈতবাদ বলে যে, আসলে ছোটবড় বলে কোন কিছু নেই—আমরা প্রত্যেকে, জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অণুপরমাণু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সব চেয়ে উপযুক্ত ও সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড়। অদ্বৈত-বাদের মূল কথা এই যে, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর আর এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রত্যেক শক্তিকণা সেই মহাশক্তির শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ।

সমস্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির প্রত্যেক অংশ সেই মহাশক্তির শক্তির বিকাশক্ষেত্র বলেই সমস্ত জগতে তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের অধিকতর বিকাশেই জগ-তের উন্নতি, আর সঙ্গে আমাদেরও উন্নতি। অধিকতর বিকাশের অর্থ কি ? তাঁরই তো বিকাশ সব স্থানে আর সব সময়ে ? তবে কোন স্থানে বা কোন সময়ে তাঁর অধিকতর বিকাশের অর্থ কি ? এই তত্ত্বটি বুঝতে গিয়ে বুদ্ধি কথা সমস্তই হার মানে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের এ এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। তাঁরই শক্তির বিকাশে আমরা হয়েছি, আবার তাঁর সেই শক্তির বিকাশেরই ফলে আমা-দের মধ্যে তাঁর আরও বেশী বিকাশ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই বিকাশ জাগিয়ে তোলবার মোটামুটি ভাব এই যে, বিশ্বজগতের যেখানে যে কেহ বা যা কিছু আছে, প্রত্যেকের জ্ঞানে সেই বিকা-শের বেশী করে উপলব্ধি হওয়া। সেই মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের এই এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে আমরা

তাঁরই শক্তির বিকাশের পরিণাম হোলেও আমরা তাঁর শক্তির বিকাশ উপলব্ধিও করতে পারি, আর যতই উপলব্ধি করি, ততই সেই উপলব্ধির সীমাও খুঁজে পাইনে। সেই সঙ্গে আমরা এক আশ্চর্য্য শক্তির বলে বুঝতে পারি যে সেই মহাশক্তির জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ কোন্ দিকে। সেই বিকাশের গতি যেদিকে, সেইদিকে তারই অনুসরণে আমাদেরও জ্ঞান ও শক্তিকে চালিয়ে দিলেই আমরাও সেই মহাশক্তিকে বেশী করে উপলব্ধি করতে পারি, আর সেইরকম উপলব্ধি যত বেশী করতে পারব ততই বেশী আমাদের উন্নতি হয়েছে বলে বুঝতে পারব। আবার আমাদের নিজেকে যেমন উন্নতির পথে চালাতে গেলে আমাদের কোনমতে নিজেদের জ্ঞান ও শক্তিকে সেই মহাশক্তির উপলব্ধির অনুকূল করবার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি আমদের সমাজকেও উন্নতির পথে চালাতে ইচ্ছা করলে সমাজের আইনকানুন প্রভৃতিকেও সেই পথেরই অনুকূল করবার চেষ্টা করতে হবে। যে গ্রন্থ ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে জগতের সকল ঘটনার ভিতর উন্নতির এই মূলমন্ত্র যে:পরিমাণে দেখাতে পারবে, সমস্ত ঘটনাকে মহাশক্তিকেন্দ্রক করে বোঝাতে পারবে, সেই গ্রন্থই সেই পরিমাণে ইতিহাস নামের যোগ্য হবে।

অদ্বৈতবাদের মতো কর্ম্মফলবাদ বা পূর্ব্বজন্মবাদেরও ভিতরকার কথা এই যে, সমস্ত বিশ্বচরাচরে আসলে ছোটবড় বলে কিছুই নেই। পাশ্চাত্য-ধারার ইতিহাসগুলো চোখের সামনে যেটুকু পায় সেইটুকু ধরেই কর্ম্মফল দেখাতে চায়। কিন্তু আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সেটুকু দেখিয়েই থামতে চায় না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বোঝাতে চায় যে প্রকৃতিতে আসলে ছোটবড় নেই, কিন্তু এই যে কোন-কিছু তোমার চোখে ছোট আমার চোখে বড় বলে মনে হয়, এটা মূলে সেই মহাশক্তি ভগবানের জ্ঞান ও শক্তির বিকাশসূত্রে অতীতের যুগ যুগান্তরের শত সহস্র লক্ষ কোটী বৎসরের কর্ম্মের ফল। কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল হোল, সেটা বলতে গিয়ে আমাদের ঋষিরা অনেক ভুল করতে পারেন সত্য, কিন্তু ঐ যে মূল কথা যে, একই মহাশক্তির শক্তি-বিকাশসূত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্মের পরিণামেই প্রকৃতির প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বস্তুর জন্ম—এ বিষয়ে সকল ঋষিই যেন একমত বলে মনে হয়। আজকালকার দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সকলই সপ্রমাণ করেছে যে, জগতের একটা ঘটনাও দৈবাৎ বা আকস্মিক হোতে পারে না। ঋষিদের কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাঁরা এই সত্য সেই সুদূর অতীতকালেও অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের রচিত গ্রন্থে আবশ্যক হোলে ইহলোক ছেড়ে পরলোক থেকে এই সত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বিরত হতেন না। এই সত্যের উপর দাঁড়িয়েই তাঁরা পূর্ব্বজন্মেও কর্ম্মের ফলাফল নির্ণয়ের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এইজন্যই আমাদের দেশে অতীতের উপর এত শ্রদ্ধা। আধুনিক ইতিহাস, নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করলেন বলেই তাঁর জীবনী আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোন পুরাণকার ঋষি অত বড় একটা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণকে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো ধরে চলতে পারতেন না। তাঁরা এই ঘটনারও একটা কার্য্যকারণ-মূলক তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতেন। আমাদের দেশে পুরাণকার প্রভৃতি পুরাকালের ঐতিহাসিকেরা কাজেই এই কর্ম্মফলবাদের উপর দাঁড়িয়ে জগতে ছোটবড়র বস্তুত অস্তিত্ব স্বীকার করবার অবসরই পেতেন না। তাঁদের মত যা সংক্ষেপে বুঝেছি তা এই যে—অবস্থাবিশেষে, স্থান-বিশেষে বা কালবিশেষে পড়ে আমি আপাতত যাকে ছোট বলি তুমি তাই হয়েছ, কিন্তু তুমিও আবার যথাযুক্ত কাজ করলে আমার স্থান অধিকার করে আমি যাকে বড় বলি তাই হোতে পার। এই ছোট-বড় না দেখা বিষয়ে অদ্বৈতভাব আর কর্ম্মফলবাদ উভয়েরই মূলমন্ত্র একই বলে আমাদের দেশে অদ্বৈত-বাদের সঙ্গে কর্ম্মফলবাদ ও পূর্ব্বজন্মবাদের এত মেশামেশি হয়ে গেছে।

আমাদের ঋষিমুনিরা অদ্বৈতবাদ আর কর্ম্মফল-বাদের উপর দাঁড়িয়ে কাউকে ছোটবড় মনে করতে চাইতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে আমরা সেই দুটো মতেরই উপর দাঁড়িয়ে ঠিক তার উল্টোদিকে ব্যাখ্যা করে ঐ দুটো মতকে, লোককে ছোটবড় দেখার মূল বংশগত জাতিভেদের সপক্ষ প্রমাণ বলে দাঁড় করাই।

বর্ত্তমানে আমরা আমাদের ধর্ম্মের—কেবল আমাদের কেন, জগতের সমস্ত সত্যধর্ম্মের মূলভাব ছেড়ে দিয়ে কেবল ধর্ম্মের খোসা নিয়ে মারামারি করি বলে সেই মূলভাব ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি ধর্ম্মটাকে ছেড়ে দিয়ে বসেছি। তার বদলে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি একরাশ ধর্ম্মের বহিরাবরণ মতবাদ সংগ্রহ করে তারই চাপে মারা যাবার জোগাড়ে আছি। এসব মতবাদ নিয়ে তর্ক করার বিশেষ কি ফল তা বুঝিনে। অদ্বৈতবাদ—তুমি হাহুতাশ করে বলবে—এ সমস্তই মিথ্যা মায়া মরীচিকা—এক অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মই সত্য; এ কথার ভাব তোমার উপলব্ধি হোক বা না-ই হোক, তুমি এর সপক্ষে খুব জোরে তর্ক করতে প্রস্তুত—কেননা, তুমি অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন। কিন্তু যেই তুমি ঐ কথা বল্লে, অমনি দ্বৈতবাদী তেড়ে এসে বল্লেন—এ সব কখনই মিথ্যামায়া হোতেই পারে না; আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখছি যে তুমি আমি সমস্তই পৃথক পৃথক, তখন কেবল অনির্দ্দেশ্য এক পরব্রহ্মই আছেন, আর আমরা কেউ কোথাও নেই, আমরা সমস্তই মায়া, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি নে। তখন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এসে ঝগড়া থামাবার উদ্দেশ্যে বল্লেন—না হে তা নয়, অদ্বৈতবাদীরও কথা ঠিক নয়, আর দ্বৈতবাদীরও কথা ঠিক নয়; আসল কথা হচ্ছে এই যে আমরা সকলই পৃথক পৃথক বটে, কিন্তু আমরা সকলই সেই একই মহাশক্তির শক্তিবিকাশ। আমার মনে হয় যে দ্বৈতাদ্বৈত মূলে ঠিক হোলেও ব্যক্ত করবার প্রণালীর দোষে আমাদের জ্ঞানে তার বক্তব্যের উল্টো ভাবই জেগে ওঠে। দ্বৈত অর্থাৎ এই যে সব আমরা পৃথক পৃথক, এটা গোড়ায় দ্বৈতাদ্বৈত আমাদের বলে না। আমাদের বোধ হয় যে, দ্বৈতাদ্বৈতকে উল্টো করে অদ্বৈতদ্বৈত বল্লে যে ভাবটা প্রকাশ পায় সেইটেই ঠিক আর সেইটেই দ্বৈতাদ্বৈত আসলে বলতে চায়। গোড়ায় ভগবানকে ধরা চাই-ই। ভগবানকে মূলে রেখে তাঁরই শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ বলে এই বিশ্বচরাচরকে ধরতে হবে। তা ধরলে আমরা আসলে কাউকে ছোট আর কাউকে বড় মনে করতে পারব না।

অদ্বৈত হোল সেই মহাশক্তি ভগবানের অব্যক্ত আকার। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেই অব্যক্ত আকার নিয়ে আমরা দিনরাত থাকতে পারি নে—তাহলে তো আমরাই এক একটা অদ্বৈত হোয়ে সেই অদ্বৈতের সঙ্গে মিশে যেতুম—তাহলে তো জগতের অস্তিত্বই থাকত না। দ্বৈত হোল সেই অব্যক্তের ব্যক্ত আকার। এই দ্বৈত নিয়েই সংসারে আমাদের চলতেই হবে—মাথার উপরে অদ্বৈতকে স্থির লক্ষ্যরূপে রেখে দ্বৈত ধরে চলতে হবে। যা কিছু ঘটনা দেখি—যা কিছু হচ্ছে—সমুদয়ই সেই অব্যক্ত মহাশক্তির মহাধ্যানের ব্যক্ত আকার। কাজেই আমরা এই অদ্বৈতকে মূলে রেখে দ্বৈতক্ষেত্রে বিচরণ করতে বাধ্য এবং সে ভাবে বিচরণ করলে আমরা কাউকে ছোট আর কাউকে বড় বলতে পারব না। শতদল যখন ফুটে ওঠে, তখন তার কোন্‌টাকে তুচ্ছ আর কোন্‌টাকে আদরের বলতে পারি? এক মহান সৌন্দর্য্য সমস্ত শতদলটাকে নিয়ে ফুটে বেরোয়। তার নীচের সবুজ পাতাটা তুচ্ছ বলে ছিঁড়ে ফেল, উপরের গোলাপীপাতা, পাঁপড়ী সমস্ত খসে পড়বার উপক্রম করবে। প্রকৃতিতেও আমরা যাকে ছোট বলি আর আমরা যাকে বড় বলি, সমস্তটা নিয়েই আজ প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে ঢল-ঢল।

যাক্; এখন শেষ কথা এই যে, আমরা যদি সত্যিসত্যি ভগবানকে প্রাণের মধ্যে আনতে চাই, যদি তাঁর মহাশক্তির মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে চাই, তাহলে আমরা মস্ত বড়লোক, আমাদের শক্তি অতুলনীয়, এই ভেবে জাঁকে ফুলে উঠলে চলবে না। যে ধুলো সমস্ত প্রাণীদের দেখতে পাবার অপরিহার্য্য সহায়, নিজেদের সেই ধুলোর সঙ্গে এক করে নিতে হবে। কাউকে ছোট মনে করতে পারব না। তাই সাধকপ্রবর বৈষ্ণবচূড়ামণি বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ভাস্করবর্ম্মা।

৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মৌখরী বংশীয় ঈশান বর্ম্মা, সর্ব্ববর্ম্মা, সুস্থিত-বর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মা রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর কনোজের বর্দ্ধনবংশীয় প্রভাকর বর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) ৫৮৫-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদলাভ করেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জকে (Kanauj) উত্তর ভারতের রাজধানী করেন। ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মা (নামান্তর মৃগাঙ্কে)র পুত্র ভাস্করবর্ম্মা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের একজন করদ (tributery) রাজা ছিলেন। প্রয়াগ অর্থাৎ আধুনিক আলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে একটী বালুকাময় সমতল ভূমির উপর প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এক উৎসবে সমবেত হইতেন। মহারাজ হর্ষ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ঠিক এই সময়ে উক্তস্থানে একটী বিরাট উৎসবের আয়োজন করিতেন। উহা মহোৎসব নামে পরিজ্ঞাত। এই উৎসবকালে তিনি নানারূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দীন দরিদ্রদিগকে অজস্র পরিমাণ দান করিতেন। খ্রীষ্টীয় ৬৪৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসবের (sixth quenquennial assembly) অধিবেশন হয়। ইতঃপূর্ব্বে এই স্বনামধন্য ধর্ম্মপরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ (Hiuen Sang) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বশেষ (extreme) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ বলভীরাজ "২য় দূর্ভাসেন" * ও সর্ব্ব পূর্ব্বদেশস্থ কামরূপরাজ (ভাস্করবর্ম্মা) প্রভৃতি লইয়া পঁচিশ জন করদ রাজাকে এই মহোৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

হুয়েন সাঙ্গের পরিচয়।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সুবিখ্যাত পরিব্রাজকের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক। যাঁহাকে আমরা সাধারণতঃ "হুয়েন সাঙ্গ", "হুয়েন্থ সাঙ" হিউএনথ সাঙ্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাঁহার প্রকৃত নাম "যুয়ন্—চুয়ঙ" (Yuan Chwang)। হুয়েন সাঙ্গ খ্রীষ্টীয় ৬০৩ অব্দে চীন দেশের "চীন-লিউ" নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই স্থান এক প্রকার সহরতলী (suberb) বলিলেই হয়। স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে তাঁহার সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হওয়ায় মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য খ্রীষ্টীয় ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার জন্য তিনি যে অটল সাহস, বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম ও অভাবনীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মানবমাত্রেরই যুগপৎ নিরতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। এই স্বনামধন্য ধর্ম্মবীর কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিবার পর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এ দেশ হইতে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৪৭ খানি গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। ভারত হইতে সংগৃহীত সংস্কৃত পুথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬৬৪ অব্দে এই মহাপুরুষ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নালন্দা হইতে হুয়েন সাঙ্গের কামরূপে নিমন্ত্রণ।

কি শুভক্ষণে ধর্ম্মবীর হুয়েন সাঙ্গ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে কামরূপেশ্বর ভাস্করবর্ম্মার বিদ্যাগৌরব, ধর্ম্মানুরাগ ও তৎকালীন অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ রাজা ভাস্করবর্ম্মা মহাপণ্ডিত চাণক্যের "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই বাক্যের প্রতিপোষকতা করিতেন। হুয়েন সাঙ যখন মগধের অন্তর্গত বিশ্ববিশ্রুত নালন্দার † সন্ন্যাসীমঠে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতেছিলেন তৎকালে

* বলভীরাজ ২য় দূর্ভাসেন বা বালাদিত্য মহারাজা খড়গরাহার পুত্র। মহারাজ ভার্ত্তক এই বংশের আদিপুরুষ।

† নালন্দার অপর একটী অর্থ আছে; যথা—ন+আলম+দা—নালন্দা। ইহার অর্থ—অধিক কিছুই প্রদান করিবার নাই। অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ যাহা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দান করিয়াছেন তাহাই দান করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত প্রাপ্ত হইতে বা দান করিতে হইলে বিশেষ সাধনা আবশ্যক।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা সেখানে কতিপয় দূত প্রেরণ করতঃ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে (গৌহাটীতে) আমন্ত্রণ করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। মহারাজ শিলাদিত্য ৬০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতাবস্থা ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল যে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ই শিক্ষণীয় ছিল তাহা নহে। ভারতের সমগ্র বিদ্যার অধ্যয়ন এবং পর্য্যালোচনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য বহুস্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ আগমন করিতেন। এখানে সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইত; কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অপরের ক্ষতি করিত না। এ-কারণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদৃশী উন্নতি হইয়াছিল। হিউএন্ সাঙ্গ পাঁচবৎসর কাল নালন্দার মঠে থাকিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দায় কামরূপ-রাজের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া প্রথমে সেখানে যাইতে অস্বীকৃত হন। এখানে তাঁহার শাস্ত্রাধ্যাপক "শীলভদ্র" কামরূপ গমনে তাঁহার অনিচ্ছা অবগত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "রাজা ভাস্করবর্ম্মা ধর্ম্মবিরোধী (heretic) গণের উপদেশে মনোনযোগী। যাহাতে এই সত্যধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার উপায় বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য। কামরূপ রাজ্যে গমনার্থ এক্ষণে তিনি দূতগণ দ্বারা সাদরে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তদীয় নিমন্ত্রণপত্র উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার এরূপ সুযোগ পরিহার করা নিতান্ত অবিধেয়। শাস্ত্রাধ্যাপকের উপদেশে হুয়েন সাঙ নালন্দা হইতে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন।

কামরূপের বিবরণ।

সুবিখ্যাত হুয়েন সাঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার চীনদেশে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃঃ অব্দে রাজা ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে কামরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপকে "কিয়া—মো—লু—পো" বলিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের নাম "সি—ইউ—কি" (Si-yu-ki) বা পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত। তাঁহার কামরূপের বর্ণনায় জানা যায় যে তিনি কলোটু বা করতোয়া নদী পার হইয়া* তৎপরে ব্রহ্মপুত্রের তীরদেশ দিয়া কামরূপের তৎকালীন রাজধানী "গৌহাটী"তে উপস্থিত হন। তৎকালে ভাস্করবর্ম্মা নামক জনৈক রাজা সেখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি "কুমার" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই রাজা নরনারায়ণের বংশধর। হাজার পুরুষ যাবৎ ইহাঁরা এই রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, (বরাহের পুত্র নরক, নরকের পুত্র ভগদত্ত)। পরিব্রাজক তখনও সেখানে একটীও বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "কামরূপের বিস্তৃতি ১০০০লী (প্রায় ১৭০০ মাইল) এবং ইহার প্রধান রাজধানী গৌহাটী প্রায় ৩০লী (৫ মাইল)। কামরূপের অধিবাসীগণ দেবপূজা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা ছিল না। রাজা ভাস্করবর্ম্মা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহারই অনুকরণে চলিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার কর্ম্মে প্রবেশ লাভের আশায় সুদূর প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজ্যে আগমন করিতেন। এই রাজা কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মতে কামরূপের অধিবাসীগণ অতিশয় কাঁঠাল ও নারিকেল ভক্ত ছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মার ধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত স্মিথ (V. A. Smith) সাহেব তাঁহার Early History of India নামক মূল্যবান গ্রন্থে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—He belonged to a very ancient dynasty which claimed to have existed for thousand generations and almost certainly he must have been a Hinduised Kuch aborigin. রাজা ভাস্করবর্ম্মা যে কোচবংশ সম্ভূত, ইহা তাঁহার নিজস্ব মত। কুত্রাপি ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত ব্যাডেনের (B. H. Baden) মতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ

* Walter's Yuan Chwang, Vol II, P. 187

শ্রীযুক্ত Alex. Cunningham তাঁহার Ancient Geography of India নামক পুস্তকে (P.531) লিখিয়াছেন :—He (Bhaskara Varma)was a staunch Buddhist and accompanied Harsha vardana in is religious procession from Pataliputtra.কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তিনি আবার ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে Jour. A.S. of Bengal নামক পত্রিকায়(পৃঃ ৪০) *Kia—mew—Pho* নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "The people of the country were unconverted and had built no monasteries" এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা কি দূষণীয় নহে ?

ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার পরিচয় বাণভট্টের হর্ষচরিত কাব্যে ও চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গের গ্রন্থে এতাবৎকাল কেবলমাত্র অবগত হওয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে বিগত ১৯১২ সালে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত "নিধানপুর" গ্রামের জনৈক মুসলমান তাহার মহিষগুলি রাখিবার জন্য একটী চালা (shade) নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে মৃৎপিণ্ড চূর্ণ করিবার কালে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই তাম্রশাসন দৃষ্টে ঐ ব্যক্তির ধারণা জন্মে উহাতে কোন স্থানে দৈব ধনের কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর ঐ মুসলমানটী স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত পবিত্রনাথ দাস মহাশয়কে উহা প্রদান করে। তৎকালে জমিদার মহাশয় উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনার্থ গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলে তিনি প্রায় একমাস পরে জনসমাজে উহার বিবরণ প্রকাশ করেন। স্বয়ং ভাস্করবর্ম্মা এই তাম্রশাসনের প্রচারক। শ্রীহট্টের পঞ্চ খণ্ডের অন্তর্গত নিধানপুর গ্রামে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলেও শ্রীহট্টদেশ তৎকালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বড়ই সুকঠিন। কারণ কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বারাণসীর অদূরস্থ "কমৌলী" গ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও বারাণসী কস্মিন্‌কালে কামরূপের অন্তর্গত অথবা কোন কামরূপাধিপতির অধিকৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

স্ত্রীস্বাধীনতা। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম অবধি বঙ্গদেশে যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যে স্বাধীনতা দেখা যায়, পুরুষে পুরুষে যে স্বাধীনতা দেখা যায়, আমরা বরাবরই চাহিয়া আসিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই রকম একটা মুক্ত প্রাণের খোলা স্বাধীনতা জাগিয়া উঠুক। পুরুষ ও স্ত্রীলোক হইলেই যে "স্ত্রীসংগ্রহ" বা ইয়ারকির ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকিলেই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য—মানবের পূর্ণতাসাধন—সফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, বঙ্গদেশের আবহাওয়ার গুণেই হউক বা বিলাতবাসীদের অন্যায় অনুকরণের—পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহার নাম দিয়াছিলেন হনুকরণ—কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর স্ত্রীস্বাধীনতা কতকটা বক্রপথগামী হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—"স্ত্রীসংগ্রহ"ই অনেকটা স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ভাব দূর করিবার একটী প্রধান উপায় হইতেছে ভারতবাসীদের মধ্যে বিবাহাদি উপায়ে অন্তঃপ্রাদেশিক সম্মিলন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে যদি বোম্বাইবাসীদের বিবাহসম্বন্ধ হইতে থাকে, তবেই বাঙ্গালীরা বোম্বাইবাসীদের সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া আপনাদের দেশেও স্বাভাবিকভাবে প্রবর্ত্তিত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বিবাহ দূরে থাক্‌, সাধারণ মেলামেশা হইতে থাকিলেও স্ত্রীস্বাধীনতাসম্বন্ধে নানা সঙ্কীর্ণভাব কাটিয়া যাইবে। সম্প্রতি আমাদের কোন বন্ধু বোম্বাই অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া তথাকার ঐ সরল ও সবল স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া যে মুগ্ধ-পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"এ দেশের female libertyর কথা আগে শোনা ছিল কিন্তু চোখে না দেখলে ধারণা হয় না। পুণায় যে বন্ধুটির বাড়ীতে ছিলাম, তিনিও একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ীর বাহিরভিতর নাই তাঁর স্ত্রী সকল স্থানেই ঘুরচেন। আমার সঙ্গে অতি সরল ও innocentভাবে প্রথমেই আলাপ করেন। মেয়ে পুরুষে যে আমাদের দেশে একটা ভেদ-বিচার আছে, মেয়েদের privacyর জন্য আমরা ও মেয়েরা যেমন আমাদের দেশে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এদেশে সে জিনিষ একেবারেই নাই। মেয়েও যেমন পুরুষও তেমন। এই ভাবটি আমার বড় সুন্দর লেগেছে।

তোমার আমার এতকালের বন্ধুতা—কৈ তোমার বাড়ীতে আমি গিয়ে, কি তুমি আমাদের বাড়ীতে এসে সেরূপ freedom কোথাও পাও বা পাই? আমরা মেয়েদের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, মেয়েরা আমাদের লজ্জায় সর্ব্বদাই আকুল। এ ভাব যদি থাকত তাহলে তোমার বাড়ীতে থাকা আমার আদবে মুস্কিল হতো না। কোলাপুরে যে বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম, তারা মারহাটী। বেশী গোঁড়া গোছের। সেখানেও ঐ ভাব। বন্ধুর বাড়ীতে নাইতে গেলুম, বন্ধুর স্ত্রী এসে গরম জল দিয়ে গেল। বন্ধু একজন উকিল। ব্রাহ্মসমাজ এই ভাবটী নেবার চেষ্টা করেছিল বটে নিতে পারে নাই। এক ঘরে মেয়ে পুরুষে সরলভাবে আলোচনা আমাদের দেশে ভয়ানক কথা। বোধহয় আমাদের মন বড় কলুষিত।"

পাঠ্যপুস্তক কমিটি। গবর্ণমেণ্ট পাঠ্যপুস্তক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কমিটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদেরই মনের মতো ছুচারিটা কথা শুনিতে পাইবেন—আসল সত্য কথা কোন সভ্য সাহস করিয়া বলিতে অগ্রসর হইবেন কি না সন্দেহ। আমাদের মতে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের মতামত পাইবার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। সভ্যদিগের নিকটে স্বভাবতই অনেক গ্রন্থকার স্বরচিত গ্রন্থ পাঠাইবেন। কিন্তু সভ্যদিগের কেবল সেইগুলি দেখিলে চলিবে না! বড় বড় গ্রন্থপ্রকাশকদিগের নিকট হইতে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের সন্ধান লওয়া উচিত যে কি কি নূতন ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং সেই সকল গ্রন্থেরও মধ্য হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে সন্নিবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক সভ্যের অন্তরে দেশের মঙ্গলকে মূলমন্ত্ররূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সেই মূল মন্ত্রের উপরে আমাদের প্রত্যেকের কার্য্য করা উচিত।

জমীদার ও প্রজা। আইনকানুনের বাঁধনছাঁদনে বর্ত্তমানে জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ আর পূর্ব্বেকার পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নাই—একটা ব্যবসাদারী সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমরা ইহার জন্য কেবল আইনকানুনকে দায়ী করিতে পারি না। জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই দোষে বর্ত্তমান প্রচলিত আইনকানুন আমাদের অদৃষ্টে জুটিয়াছে। যদি জমীদারেরা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, এবং প্রজারা জমীদারকে পিতার চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে আজ দেশের অন্য শ্রী দেখিতাম। যাই হোক, আইনকানুনের কঠোর বন্ধন সত্ত্বেও এখনো জমীদার ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের যথেষ্ট অবসর আছে। সে অবসর আর হেলায় হারাইবার সময় নাই। পুণ্যাহ উপলক্ষে জমীদারেরা যদি প্রজাদের দুঃখ স্বকর্ণে শোনেন ও দেখেন, তাহা হইলে যে সুফল উৎপন্ন হইবে তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা জানি সরিকানি প্রভৃতি নানা কারণে অনেক জমীদার ইচ্ছা থাকিলেও প্রজাদের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হন না। কিন্তু এমনো অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা নিজের মঙ্গলসাধনের অবসরের সদ্ব্যবহার করেন না। জমীদার ও প্রজাসকলের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা সকলেই পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া, আদালতে গিয়া পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। আমরা গত আষাঢ়ের আল্ এস্লাম নামক মুসলমান সমাজের মুখপত্রে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শেখ আবদুল গফুর জালালী প্রকৃত মুসলমানোচিত অসাম্প্রদায়িক ভাবের উপর দাঁড়াইয়া অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রকৃত মাতৃভাষা। এ বিষয়ে যে তর্ক ও সন্দেহ উঠে ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা বাঙ্গালী নহি, আরব পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা এদেশে আসিয়াছি; সুতরাং বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা আরবী পারসী না হইলেও নিশ্চয়ই উর্দ্দু। এই শ্রেণীর লোক উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার জন্য বিরাট চীৎকার করিয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেহ পুষ্ট করিয়া যাঁহারা মাতৃঅঙ্ক হইতেই বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং মাতৃস্তন পানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা কথা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাই আবার বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার কল্পনা জল্পনা আঁটিতেছেন, তাঁহাদের এই উদ্ভট কল্পনা আলাউদ্দীনের বিচিত্র প্রদীপ অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ বটে। বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকুঞ্জবেষ্টিত শান্তিনিকেতনে বাস করিয়াও যাঁহারা এখনও বোখারা, ছমরকন্দ, সিরাজ, তেহ্‌রান, কায়রো ও বাগ্‌দাদের খোরমা ও আখরোট তরু এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের শীতল ছায়ায় বিচরণশীলা পারসী ও উর্দ্দু গজলভাষিণী হুরীগণের বিচিত্র নর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা খুব বুদ্ধিমান (?) এবং বিচিত্র কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন বটে, কিন্তু জানি না, তাঁহাদের সেই বুদ্ধি ও কল্পনা বাস্তব জগতের কার্য্যে কপর্দ্দক মূল্যেও গৃহীত হইবার যোগ্য কিনা"!

দেবোত্তর ও সেবায়ত। আমরা অনেকস্থলেই দেখিতে পাই যে বড় বড় জমীদারেরা তাঁহাদের বিষয়-সকল দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া যান—উদ্দেশ্য এই যে, দেবতার নামে যৎকিঞ্চিৎ ভোগাদি প্রদান করিয়া সম্পত্তির আয়ের অধিকাংশ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায়। দেবতার নামে যাহা উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহার আয় হইতে দেবতার নামেই নিজের উদরপোষণ না করিয়া তাহা নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত। ঐরূপ আয় হইতে আপনার উদরপোষণের ব্যবস্থা হয় বলিয়াই দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা প্রায়ই আপনাদিগকে সৎপথে ঠিক রাখিতে পারেন না; তাঁহারা যত পারেন টাকা ধার করেন, জানেন যে দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় করা বড় সহজ নয়। দেবোত্তর সম্পত্তির দুর্দ্দশার একটী দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমাদের চক্ষের সমক্ষে পড়িয়াছে। কোন সুপ্রসিদ্ধ জমীদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ দুইটী বিগ্রহের সেবা প্রভৃতির জন্য একটা সম্পত্তিকে দেবোত্তর করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী ও সেবায়ৎ দেবোত্তর সম্পত্তির বিরুদ্ধে একটী ডিক্রী জারী করিয়া তাহার এক অংশ নিজের ছেলের বেনামীতে কিনিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার অন্যতর সরিক হাইকোর্টে উক্ত সেবায়তের বিরুদ্ধে একটী মকদ্দমা রুজু করাইয়া দিয়া তাঁহাকে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়তের পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই অংশ ক্রয় নাকচ করাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই ন্যায় বিচারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। দেবোত্তরের সেবায়ৎগণ মনে করেন যে তাঁহারাই সেই সম্পত্তির কর্ত্তা—সম্পত্তি লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা জানি যে অনেকস্থলে সেবায়ৎগণ এইপ্রকার ভাব লইয়া দেবোত্তর সম্পত্তিকে নানা প্রকারে ছারখার করিয়া নিজেদেরও অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আশা করি, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর সেবায়ৎগণ দেবোত্তর সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতে নিরস্ত থাকিবেন।

অনশন। দেশের লোক অনশনে মরিতেছে কি না, এই একটা মহা প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাদের দেশেই কেবল ইহা সম্ভব যে, যাহা চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে বিষয়েও জোর করিয়া আমাদিগের অবিশ্বাস করিতে হইবে—যেহেতু গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে তোমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেছ—উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহারও যে একটা দিক নাই তাহা নহে। হয়তো একটা লোক আজই খাইবার কিছু পাইল না, আর সদ্যসদ্যই মরিয়া গেল, একথা ঠিক নহে। কিন্তু একথা কেহই কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, লোকে না খাইতে পাইয়া জীর্ণ হইতে হইতে হঠাৎ একদিন একটুকু জ্বর হইল আর মরিয়া গেল। নাম হইল বটে যে জ্বরে মরিয়াছে, কিন্তু আসল কথাটা কি এই নহে যে, সেই লোকটী অনাহারেই মরিল? গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের মন বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য অবশ্য বলিতে পারেন যে অমুক লোক জ্বরে মরিয়াছে—বলিলেও সত্যের অপলাপ হইবে না। কিন্তু সেই লোকের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা কি শতকণ্ঠে বলিবে না যে, সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট কথা মাত্রার একচক্ষু হরিণের মত চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলিবে না; মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় কি সর্ব্বনাশই না করিতে পারে—তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাই আমরা শতবার বলিব যে গবর্ণমেণ্ট আহার্য্যের অভাব সম্বন্ধে কমিউনিক প্রচার করা ছাড়িয়া দিন—কারণ সত্য কথা বলিতে কি, আমরা যতদূর জানি, মুখে না বলিলেও বর্ত্তমানে অধিকাংশ ভারতবাসীই এ সমস্ত কমিউনিক এক বিন্দুও বিশ্বাস করে না। গবর্ণমেণ্টের পারিব না বলিলে চলিবে না—গবর্ণমেণ্ট নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাহিলে, লোকে যাহাতে দুবেলা দুমুটো ভাত খাইতে পায় এবং লজ্জানিবারণের বস্ত্র পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সম্প্রতি বড়লাটের সভায় বলা হইয়াছে যে যেহেতু এবারে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সংরক্ষণ কার্য্য relief works খোলা হইলেও পাঁচ ছয় লক্ষের অধিক লোক সেই কার্য্যের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই এবং যেহেতু গত দুর্ভিক্ষের সময়ে ১০ লক্ষ লোকেরও অধিক লোক ঐ প্রকার সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল, অতএব—অতএব আমাদিগের বুঝিতে হইবে যে এই দরিদ্রতম ভারতভূমি, এই কবির সোনার ভারতভূমি আজ সত্য সত্যই সোনারূপায় একেবারে টলটল করিতেছে। যদিও লাটসভা হইতে এই কথা বাহির হইয়াছে, তথাপি এই কথার উপর আমাদের কিছুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। ভারতবাসীদের অনেকের ধারণা এই যে, পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের সময়ে ভারতবাসীরা স্বয়ং দলবদ্ধ ভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতে শিক্ষা করে নাই; বর্ত্তমান সময়ে রামকৃষ্ণমিশন, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির পক্ষ হইতে লোকেরা দলে দলে organised ভাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছে, তাই অনেক গৃহস্থের বাহিরে গিয়া relief works এর সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু relief works এ কম লোক গিয়াছে বলিয়াই যে ভারতবাসী একেবারে ধনী হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা শুনিলে আমাদের কেবল হাসিই পায়; আমরা জানি যে এরকম কথা statistics রূপ আশ্চর্য্য যন্ত্রধারী গভর্ণমেণ্টের মুখে শোভা পায়।

ভারতের দারিদ্র্য ও আমাদের কর্ত্তব্য।

ভারতবাসী দরিদ্র, একথা আমাদের বলিবার জো নাই। কারণ, কতকগুলি বিবকুম্ভ পয়োমুখ ইঙ্গভারত খবরের কাগজ মহা চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে ভারতবাসী দরিদ্র নহে! এই সকল কাগজওয়ালারা গবর্ণমেণ্টের কমিউনিকগুলিকে তাঁহাদের উক্তির ভিত্তি করেন, আর গবর্ণমেণ্টের কমিউনিকের ভিত্তি হইল তাঁহাদের আশ্চর্য্য statistics যন্ত্র। আমরা গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে এই সমস্ত statistics যথারীতি সংগৃহীত হয় না। সর্ব্বনিম্নস্তরে এগুলি সংগ্রহ করিবার ভার আসলে পড়ে অলস ও অশিক্ষিত চৌকীদার শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের উপর। তাহারা উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ কিরূপ সংবাদে সন্তুষ্ট হইবেন তাহার বেশ সন্ধান রাখে এবং তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য তাঁহাদের মনের মতো সংবাদ দেয়। প্রজাদের অবস্থা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সংবাদসংগ্রহের ভার দেওয়া উচিত শিক্ষিত কর্ম্মচারীদের উপর এবং তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া এবং বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহাদের নিকটে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রত্যাশা করা হয়, মন-যোগানো কথা কেহ চাহে না। যাই হোক, দেশের অবস্থা আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কি গবর্ণমেণ্টের কমিউনিক, কি খবরের কাগজের কথা, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা শতমুখে বলিব, ভারতবাসী দরিদ্র—অনেকের পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না। আর যদি আমাদের উপর নিষেধবিধি আসে যে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া নীরবে প্রাণের ভিতর নিশ্চয়ই বলিব এবং গোপনে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করিব, কারণ ইহা স্বাভাবিক। সুখের বিষয় যে ইংরাজদিগের ভিতরেও এখন অনেকে বুঝিতেছেন যে ভারতবাসী সত্যই দরিদ্র এবং সেই সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। এই রকম সত্য কথা বলিয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট "দেশের কথা" গ্রন্থ proscribed করিলেন, কারণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হইলেও গবর্ণমেণ্টের ভয় হইল যে সেই সমস্ত কথা পড়িয়া দেশের লোক বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাঁহাদের স্বজাতি এবং তাঁহাদেরই কর্ম্মচারী যে এখন দেশের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে ভারতবাসী সত্যই বড় দরিদ্র—এখন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, আর আমরা তো স্বীকার করিবই। গত ২৩শে শ্রাবণের "হিন্দুস্থান" লক্ষ্ণৌয়ের মেথডিষ্ট খৃষ্টানদিগের মুখপত্র Indian Witness হইতে এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সার ওমূর ক্রে সাহেবের Indian Studies হইতে যে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই ভারতের দারিদ্র্যের গভীরতা বিষয়ে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। Indian Witness বলেন—"ভারতবর্ষের লোকের দৈনিক আয় গড়ে চারি পয়সা হইতে ছয় পয়সা। এই চারি পয়সা বা ছয় পয়সায় কি পরিমাণ আহার্য্য সামগ্রী এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায় না কি? সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকায় আহারের জন্য গম ও কাপড়চোপড়ের জন্য তুলা খরিদ করা যেমন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, ভারতেও ঠিক তাই। ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ বৎসর অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এই ভারতবর্ষ—এখানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নাই, এখানে কোটি কোটি লোকের পায়ে জুতা নাই, নগ্নতা নিবারণের উপযোগী বস্ত্র নাই, অতি নিকৃষ্ট খাদ্যও এখানকার অধিবাসীদের এক বেলা বৈ দুই বেলা জুটে না; এদেশের দারিদ্র্যের তুলনা নাই।"

সার ওমূর ক্রে বলেন—"ভারতে সামান্য দুটী পেটের ভাতের জন্য পরিবারের সমস্ত লোককে দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়। এ বৎসরের ফসল পাকিতে না পাকিতে গত বৎসরের ফসল শেষ হইয়া যায়। তাহার পর লোকদিগকে ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক সুজন্মার সময়েও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।"

এখন বোধ হয় আর কেহই বলিতে সাহস করিবেন না যে ভারতবাসী দরিদ্র নহে, ভারতবর্ষ সোনা-রূপার সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে। এইবার আমাদের কর্ত্তব্য কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং বলা বাহুল্য যে ভারতবাসীর পক্ষে কৃষিই প্রধানত অবলম্বনীয় এবং কৃষির উন্নতিসাধনই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে বুঝিতে হইবে যে, আর সেকালের মতো জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে না; এখন সভ্য জগতের প্রায় সকল দেশই শ্রমশিল্পবিষয়ে ভারতবর্ষকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন জগতের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া নাই, সমস্ত জগতের সঙ্গে নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই ভারতবর্ষের কেবল কৃষি লইয়া থাকিলে চলিবে না, শ্রমশিল্প বা Industry বিষয়েও ভারতের অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমশিল্পবিষয়ে অগ্রসর হইবার বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান উপায় উহার বিভিন্ন বিভাগে যৌথ কারবার খোলা। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহারথীদিগের

উদ্যোগে বঙ্গদেশও যে শ্রমশিল্পবিষয়ে অগ্রণী হইতে চলিয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের চিহ্ন। প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় আমরাও দেশবাসীকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা ওকালতী চাকরী প্রভৃতির আশা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কৃষি এবং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব সকলকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত করুন। দেশের শ্রী ফিরিবে। স্বীকার করি এ বিষয়ে উন্নতি করিতে গেলেই অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেই যে উন্নতি।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুস্থানের নক্‌সা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

একদিন আমাদের পাচকের রান্না ভাত কাঁচা ছিল বলিয়া তাহার অযত্নের দরুন আমি তাকে খুব বকিয়াছিলাম ও রাগ করিয়াছিলাম, ইহা শুনিয়া আঁচাইবার সময় 'উনি' আমার রাগ তাড়াইবার জন্য ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"আঃ! ভাত কিংবা পুরী একটু কাঁচা রইল বোলে পাচককে এত ধম্‌কাচ্চ কেন? শুধু কাঁচা ধান খেয়ে যাদের হজম হয় সেই আমাদের ভাত কিংবা পুরী একটু কাঁচা থাকলে কি কিছু আট্‌কায়! আমরা লড়াকে মানুষ। হাতে কাঁচা নেবু ঘসে শুধু তাই খেয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছি! সেই আমাদের ভাত পুরী একটু কাঁচা থাকলই বা, তাতে কিসের পরোয়া? তুমি যখন পাচককে বক্‌ছিলে তখনই আমি বলতুম; কিন্তু তুমি গোড়াতেই রেগে উঠ্‌লে। গৃহকর্ত্রীর হিসেবে তুমি তাকে বক্‌ছিলে, তখন আমি তার মধ্যে কোন কথা কয়ে তোমাকে বিরক্ত করব না মনে করে' সেই সময় আমি কিছু বলিনি। আসল কথা রান্না খারাপ হলে রাঁধুনীর দোষ দেওয়া অপেক্ষা, আহারের সমস্ত ব্যবস্থার যিনি তত্ত্বাবধান করেন আমি তাঁরই বেশী দোষ মনে করি। চাকরদের কাজ এই রকমই হয়ে থাকে। তাদের কাজ যারা তত্ত্বাবধান করে, এই বিষয়ে তাদেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।"—ইত্যাদি কথা আমি নীরবে শুনিয়া গেলাম। কিন্তু "নেবু খেয়ে দিন কাটাই, আমরা লড়াকা মানুষ"—এইরূপ বলায় আমি বলিলাম, "রোজের খাওয়ার এক গ্রাস যদি অধিক হল ত অমনি দূরে সরিয়ে রাখা হবে, যে ওজন করে আহার করে সে আবার লড়াই করবে কি করে'!! এখন লড়াই কলমেতেই এসে ঠেকেচে। কলম ছাড়া আর কিসে লড়াই হবে? হাতিয়ারের ত বন্দোবস্ত আছেই, এখন একটা ছড়ি ব্যবহার করতে পেলেও ভাগ্যি বলে মান্‌তে হবে। তাও কিছু দিন পরে সরকার কোন পুরাণো আইন কানুনের নূতন সংস্কার করে বন্ধ করে দিলেই কাজ শেষ হবে! সত্যি সত্যিই যদি লড়াই বাধে তখন সবাই কি মুস্কিলেই পড়বে! বুকে ব্যথা হলে তার উপর রাইসর্ষে বেটে লাগালে কিংবা টর্পেণটাইন ঘস্‌লে সেই জায়গা পুড়ে যায় ও ফোস্‌কা হয়, সেই শরীরে লড়ায়ের জখম সইবে কি করে!!" তাতে উনি বলিলেন;—"সইবে কি করে' স্থানে স্থানে জখমের চিহ্ন আছে! এই দেখ কাঁধের উপর জখম!! বুকের উপরে ত এত জখম আছে যে সে সমস্ত জখমের আঁচড়ে এক হিন্দুস্থানের নক্‌সাই তৈরি হয়ে যায়। আমি কিছুই মিথ্যে বলচি নে; ভাল করে দেখে বল দিকি একথা সত্যি কি না"। আমি হাসিতে হাসিতে কেবল ঠাট্টা করিবার ভাবেই নিকটে গিয়া খুব ঠিক্ করিয়া দেখিলাম (পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি ততটা লক্ষ্য করিনি) ওঁর বুকের বামভাগে, বুকের আঁচড়-কাটা দাগের আকৃতি হুবহু হিন্দুস্থানের নক্‌সার মতো। এই আঁচড়-কাটাগুলা পূর্ব্বে-হওয়া কোন জখমের মতো দেখিতে নয়, ঠিক্ যেন মসৃণ কাগজের উপর waterline রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বাহিরে যদিও এ সমস্ত আমি ঠাট্টা বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু আমার মনের উপর একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব পরিণাম ঘটিল. সেই পরিণাম কি যদিও এখন আমি তাহা ঠিক্ শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না. কিন্তু মনে মনে আমি অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম।

উপাসনা ভাল হল কি না?

প্রার্থনাসমাজে "উনি" যে দিন উপাসনা করিবেন, সেই দিন আমিও ওঁর সঙ্গে থাকি,—ওঁর খুবই ইচ্ছা; এবং সত্য কথা বলিতে গেলে ওঁর এই উপাসনার সময়েই, আমার কোন বিশেষ কাজ থাকিলে, আমি অবসর করিয়া লইয়া প্রার্থনাসমাজে যাইতাম। অন্য কাহারও দ্বারা নির্ব্বাহিত উপাসনা আমার ততটা ভাল লাগিত না। এই সম্বন্ধে আমার মৈত্রিণী কতবার ঠাট্টা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন:—"প্রতি রবিবারের উপাসনায়,—কোন একটা বাধা পড়ায় তোমার আস্‌তে সুবিধা হয় না, কিন্তু আজ ত বেশ সুবিধা হয়েছে। ভাল, এ দিনে ত তোমার বাড়ীতে কোন অতিথি-অভ্যাগত আসে নি, কোন ছোটখাটো কাজের বাধাও পড়ে নি"—উপাসনা হইয়া গেলে বাড়ী ফি'রবার সময়, আমরা গাড়ীতে উঠিলে উনি জিজ্ঞাসা করিতেন "আজ সমস্ত কথা কি রকম বুঝ্‌লে বলো"; উপাসনার সময় যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম ঠিক্ সেই সমস্ত বলিলাম। তখন

উনি বলিলেন, "তাহলে আমার মনে হয় আজকের উপাসনা ভাল হয়েছিল"। কোন কোন বার, উপাসনায় সময় উনি যাহা বলিতেন, তাহা কঠিন হইলে আমি বলিতে পারিতাম না। তাতে উনি বলিতেন, "তাহলে আজকের উপাসনা ভাল হয় নি বলতে হবে; উপাসনা-সম্বন্ধে আমি এই প্রমাণ ঠিক করেছি যে, তুমি যে উপাসনা বুঝতে পেরেচ সেই উপাসনাই ভাল, আর তুমি যা বুঝতে পার নি সে উপাসনা ভাল হয় নি; আমার বিশ্বাস সে উপাসনা দুর্ব্বোধ্য হয়েছে"। উনি যাই বলুন না কেন, সত্য কথা বলিতে গেলে—ওঁর নির্ব্বাহিত উপাসনা এরূপ অর্থগর্ভ, প্রেমপূর্ণ ও গভীর হইত যে, শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য মনে করিত; কিয়ৎক্ষণের জন্য দেহের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইত; ঈশ্বরের সম্মুখে আমি সাক্ষাৎ কথা কহিতেছি, এবং আমার প্রার্থনা তিনি শুনিতেছেন এইরূপ তাহাদের মনে হইত, তাহাদের চিত্তবৃত্তি তন্ময় হইয়া যাইত। কখন কখন ওঁর সেই শান্ত ও ভক্তিপরিপ্লুত মুখমণ্ডলে যে একপ্রকার তেজ প্রকাশ পাইত, সেই তেজোদীপ্ত মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকিতাম, দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতাম না। আশপাশের লোকেরা না জানি কি মনে করিবে!—এইরূপ কচিৎ মনে হইলে চোখ নীচু করিতাম, কিন্তু আবার তখনি উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঐ কাজেই নিযুক্ত হইতাম। এখন আমার এই সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থাতেও তখনকার সেই মুখশ্রী মনে আসলে, আমার এই দীনাবস্থা বিস্মৃত হইয়া সেই সময়কার মনোভাব উপলব্ধি করিতেছি মনে করিয়া ক্ষণেকের জন্যও আনন্দ হয় এবং কতবার সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াই মনে একটু শান্তিলাভ করিয়া থাকি। কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হইলে, কি যেন করিতে চুকিয়াছি, এইরূপ সমস্ত দিন আমার মনে তোলপাড় হইতে থাকে।

বোম্বায়ে অবস্থিতিকালে নিত্যনিয়মিত কার্য্যক্রম।

প্রতিদিন রাত্রিতে আহারান্তে বাড়ীর ছেলেদের পাঠাভ্যাসের তত্ত্বাবধান করিতাম; সেইরূপ আবার বয়স্ক লোকদিগের সঙ্গে এক আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পর দোতালায় যাইতাম এবং কোন কিছু পাঠ করিতে আরম্ভ করিতাম। পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইত। ইহা ভিন্ন নিদ্রা আসিত না; এইরূপ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সাড়ে দশটা কিংবা এগারটায় নিদ্রা আসিলে তিন, সওয়া তিন বাজিলেই নিদ্রা পূরা হইত। তাহার পর বিছানাতেই পড়িয়া পড়িয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার বা মনন চলিত। ইহার পর বিছানাতেই উঠিয়া বসিয়া ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আমি ও 'উনি' তুকারামের অভঙ্গ আওড়াইয়া, হাতের তালি দিয়া কিংবা তুড়ি দিয়া ভজন করিতাম। তার মধ্যে, অত্যন্ত ভক্তিপর ও ঈশ্বরের সহিত যাহাতে আত্মৈকপনা ও ঘনিষ্ঠতা ব্যক্ত হইয়াছে সেই সব নামদেবের অভঙ্গ একটার পর একটা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতাম। অনেক সময় আবৃত্তি করিতাম, অনেক সময় আবৃত্তি করিতে করিতে কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিত। এই সময়ে মুখের কথা বন্ধ হইয়া কেবল অশ্রুধারা চলিতে থাকিত। কখন কখন, আপনার মধ্যে তল্লীন হইয়া, অভঙ্গ বলিবার সময়, যে অভঙ্গটি আবৃত্তি করিতেছি তাহার দ্বিতীয় চরণ যুক্ত হইয়াছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না। প্রথমে এক অভঙ্গের চরণ আবৃত্তি করা হইত এবং অন্য আর এক সময়ে দ্বিতীয় চরণ বলা হইত। এই অভঙ্গটি গাথার মধ্যে না থাকিলে, আপন মনের অবস্থা অনুসারে ঐরূপ একটা জুড়িয়া দিয়া আবৃত্তি করা হইত। ইহার যমক যোজিত হইল কি না সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না। এই সময় আমার বড় হাসি পাইত এবং আমি বলিতাম,—এই সমস্ত নূতন অভঙ্গের এক গাথা তৈরী করিয়া রাখো। আমি কল্যাণ শিষ্যের মতো লিখিবার ভার লইয়া এই সমস্ত অভঙ্গ যদি লিখিয়া রাখি ত বেশ হয়। ইহা শুনিয়া উনি উত্তর করিতেন,—আমরা সাদাসিধা লোক, আমাদের যমক, তালসুরের জ্ঞান নেই ও তার জন্য গরজও নেই। যাদের জন্য ঐ সব অভঙ্গ বলি, তারা সবাই ঐ সমস্ত বুঝতে পারে। এই সব বিষয়ে তাদের কখনই লক্ষ্য থাকে না।" এইরূপ ৫টা পর্য্যন্ত অভঙ্গ ও ভজন হইবার পর, সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্র আওড়াইয়া ৫৷৷০টার সময় বিছানা হইতে উঠিয়া মুখমার্জ্জনাদি প্রাতঃকৃত্য আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিয়া ৬টার সময় বৈঠকখানায় আপন কোচের উপর বসিয়া উনি কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন। প্রথমে দৈনিক পত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার পর ডাকের কাগজ-পত্র দেখিতেন এবং তদনন্তর ৯৷৷০টার সময় স্নান করিতে উঠিতেন। স্নানাহার হইয়া গেলে প্রায় ১৫ মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে বসিতেন, তাহার পর উঠিয়া পোষাক পরিয়া ১০৷৷০টার সময় কোর্টে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিতেন। ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হাই-কোর্টের কাজ চলিত। ইহার মধ্যে যে সময় জলখাবার ছুটি হইত সেই সময় বাড়ী হইতে জলখাবার লইয়া রেল-গাড়ীতে "বজাবা" ব্রাহ্মণ সময়মত যাইত ও ডিবা হইতে গরম গরম জিনিস বাহির করিয়া খাইতে দিত। তাহা হইতে অল্প কিছু খাইয়া জল পান করিয়া সেইখানেই আরাম-কেদারায় একটু বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতেন। ৫টার সময় কাজ শেষ করিয়া উঠিবার পর গাড়ী কেবল সঙ্গে রাখিয়া ২।৩ মাইল পায়ে হাঁটিয়া চলিতেন অর্থাৎ ইহাতে করিয়া

আমার বেড়াইতে যাইবার কাজটা বাঁচিয়া যাইত। ৬টার সময় বাড়ী আসিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা কহিয়া, আবার নিজের নিত্যকর্ম্ম—অর্থাৎ সকালে-আসা ডাকের চিঠিপত্রের উত্তর লেখা ও তাহার পর বই পড়া আরম্ভ হইত। রোজকার চিঠিপত্রের উত্তর যাহাতে সেই দিনই পাঠান হয় সেইদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকিত। ছুটির দিনে সকালে ও কখন কখন দুপুর বেলায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া জমিত। যে রকমের লোক আসিত তাহাদের সহিত ঠিক্ সেই রকমই জিজ্ঞাসা-বাদ করিতেন, কথা বলিতেন, এবং যে কাজ যাহার দ্বারা হওয়া সম্ভব তাহার দ্বারা সেই কাজ করিয়া লইতেন। কোন বড় ঘরের প্রাচীনতন্ত্রের লোক, ব্রাহ্মণ, মরাঠা, গুজরাটী, ভাট প্রভৃতি যে কোন পদবীরই গৃহস্থ আসিত তাহার সহিত পদোচিত সসম্ভ্রমে কথা কহিতেন। তাহার দ্বারা ও তাহার মার্ফতে কোন সার্ব্বজনিক লোকোপযোগী কাজ সাধিত হইলে, তাহার গৌরব করিতেন, যাহাতে তাহার উৎসাহ ও বেশী উত্তেজনা হয় এইরূপ কথায় তাহার প্রশংসা করিতেন। এই সব দেখিয়া কখন কখন আমার হাসি পাইত ও আমোদও বোধ হইত। এই সকল ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিবার সময় তাহাদের গ্রামে বা জাতের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের অভাব হইত, "সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তোমরা আপনারা অগ্রসর হইয়া স্থাপন কর ও তোমাদের ন্যায় কোন উৎসাহী লোকের নামে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দেও। তাহা হইলে অনায়াসে স্মারক-স্বরূপ হইয়া এই প্রতিষ্ঠান লোকোপযোগী হইবে", —এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ শব্দের দ্বারা তাহাদের মনের উপর এই কথা মুদ্রিত করিয়া দিতেন। যাইবার সময় এই সব লোক,—একটা নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছে মনে করিয়া, খুব উল্লাসের সহিত যাইত ও কাজে প্রবৃত্ত হইত। এই সব লোক উঠিয়া গেলে পর, আমি বৈঠকখানায় গিয়া ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম—"আজকের লোকদের উপর কি কি কাজের ভার দেওয়া হল"? বেশ নিপুণতার সহিত কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য এই, যাহাদের উপর কাজের ভার দেওয়া যায়, তাহারা তাহার দরুন বিরক্ত হয় না, উল্টা,—আজ আমরা একটা বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি—এইরূপ মনে করে।

মহাবলেশ্বরে যাত্রা। ১৮৯৫।

দুইটা বিছা

কিংবা সৃষ্টিসৌন্দর্য্য দর্শনে দেহের অস্তিত্বজ্ঞানের লোপ।

জুন ১৮৯৫ অব্দে আমরা মহাবলেশ্বর হইতে "ওয়াঠা"রে আসিবার সময় "বাঈ"র আগে ও ওয়াঠারের পরে বড় ভোগির এক ঘাট আছে সেই ঘাটের নিকট আমরা আসিলাম। পূর্ব্ব-যাত্রার ফিরিবার সময় ওঁর এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রোজ বারো ক্রোশের উপর বয়েল কিংবা ঘোড়াদের খাটাইতেন না এবং পথের মধ্যে ঘাট (শৈলমালা) আসিয়া পড়িলে সেই ঘাট শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উনি হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ীতে উঠিতেন না এবং ঘোড়াদিগকে আস্তে আস্তে পৌঁছে চরাইয়া আনো—এইরূপ কোচম্যানকে তাগিদ হুকুম দিতেন। এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাড়াগাড়ী হইলেও, ঘাটের নিকট আসিবামাত্র 'উনি' নীচে নামিয়া পায়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চিরঞ্জীব মধু ও নানু এই দুই ছেলের বয়স সাত ও আড়াই বৎসর ছিল। এই দুইটিকে গাড়ীতে রাখিয়া ও সিপাইকে তাদের নিকটে বসাইয়া, "গাড়ী নিয়ে এসো" এইরূপ কোচম্যানকে হুকুম দিয়া, আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিবার জন্য নীচে নামিলাম; কিন্তু "আমরা তোমার সঙ্গে চলব" এইরূপ দুই ছেলেই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল এবং নীচে নামিবার জন্য গোলযোগ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া আমি অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ১০ মিনিট অতীত হইল। উনি গাড়ী হইতে নামিয়াই চলিতে আরম্ভ করায়, এখান হইতে নজর পৌঁছোয় না এতটা দূরে তখন চলিয়া গিয়াছেন; তাই শীঘ্র গিয়া ওঁকে ধরিবার জন্য যতটা পারি দ্রুত চলিতে লাগিলাম এবং রাস্তার যখন লোক না থাকবে তখন মধ্যে মধ্যে একটু দৌড়িয়াও যাইতাম। এত ত্বরা করিবার কারণ—সন্ধ্যা বেলায় উনি খুব কমই দেখিতে পাইতেন, সঙ্গে কোন লোক নাই, এই অবস্থায় সম্মুখে কোন গাড়ী আসিয়া পড়িলে, হয়ত ওঁর গায়ে গাড়ীর ধাক্কা লাগিতে পারে,—এই ভয়ে আমি এইরূপ ত্বরা করিতাম। আমি নিকটে আসিয়া পড়িলে, আমার চলার গতিটা একটু মন্থর হইল। স্বভাবত উনি বেশ লম্বা বলিয়া উনি লম্বা লম্বা পা ফেলিতেন, এবং আমি বেঁটে মানুষ, ওঁর সঙ্গে যাইবার জন্য যতই তাড়াতাড়ি চলি না কেন কিছুতেই পারিয়া উঠিতাম না, আমাদের দুজনের মধ্যে একটু অন্তর থাকিয়াই যাইত।

যাহা সর্ব্বদা দেখিয়া আসিয়াছি সেইরূপ এখনও দেখিতে পাই, আমাদের দুজনের মধ্যে স্বভাবতই ১০।১২ পদ অন্তর থাকিয়া যায়। নতুবা, আমি কাছে আসিয়াছি দেখিয়া রোজকার মতো দাঁড়াইয়া আমার জন্য আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিতেন কিন্তু আজিকার মনোভাব ভিন্ন ছিল। এইরূপ গম্ভীর সময়ে "ঐ সে ভাগ্য বাঈ লাহতা হোঈন। অবঘে দেখে জন ব্রহ্মরূপ" অর্থাৎ এমন ভাগ্য লাভ কার হবে, যে দেখে সমস্তই ব্রহ্ম-

রূপ,—এই অভঙ্গ সম্পূর্ণ তল্লীনতাসহকারে ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়া যাইতেছেন—আমরা পরস্পরের মধ্যে একটু অন্তর রাখিয়া চলিতে চলিতে ঘাটের মাথায় আসিয়া পড়িলাম। সেখানে এক পুলের নিকটেই দুইটা বড় বড় বিছা প্রায় ৪।০-৪॥০ ইঞ্চি লম্বা ও এক-দেড় ইঞ্চি গোল হইবে। বিছা দুইটার দাঁড়া পিঠের দিকে ঝুলিতেছিল—কড়ে আঙ্গুলের মতো মোটা। তার রং গুড়ের পাক করা রসের মত। ঐ দুইটা বিছা ইচ্ছাসুখে পরস্পরের পিছনে চলিতেছিল। ওঁর পায়ের দিকে আমার নজর পড়ায়, ঐ বিছা দুটা আমি দেখিতে পাইলাম। আর দুই তিন পা চলিলেই ঐ বিছার উপর ওঁর পা পড়িবে এইরূপ মনে করিয়া আমার ভয় হইল, আমি সম্ভবতঃ সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কি হইল কে জানে, বিছার উপর পা পড়িবার পূর্ব্বেই আমি গিয়া পড়িব এবং হাত দিয়া সরাইয়া দিব এই উদ্দেশে আমি খুব দৌড়িয়া গেলাম; কিন্তু সেখান পর্য্যন্ত গিয়া পৌছি-বার পূর্ব্বেই, সেই বিছা যে পংক্তি ধরিয়া চলিতেছিল তার দুই তিন পা আগে উনি চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ লিখিতে ৮।১০ মিনিট লাগিয়াছে, কিন্তু এই ঘটনাটা হইতে ৮।১০ সেকেণ্ডও লাগে নাই। দৌড়াইয়া যাইবার সময় পথে বিছা আছে তার উপর পা পড়িতে পারে এই কথা হাঁক দিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিতে পারিলাম না। এদিকে, বিছার উপর পা পড়িতে পারে এইরূপ মনে করিয়া আমার বুক ধড়ফড় করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে আমার চোখ আপনাপনি মুদিত হইল। কিন্তু তারপরেই চোখ খুলিয়া দেখি যে বিছার লাইন হইতে আগে চলিয়া গিয়া উনি পূর্ব্ববৎ সজোরে পদক্ষেপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং এই একটা বড় অরিষ্ট এড়ান গেল বলিয়া আমি ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম; এই সমস্ত ব্যাপার কত সময়ের মধ্যে ঘটিল তাহা এখন বলা কঠিন। আমি ওঁর নিকট গিয়া ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম ওঁর পায়ে কোন কিছু ঠেকিয়াছে কিনা। এই কথা জিজ্ঞাসা করায় উনি একটু আশ্চর্য্য হইলেন এবং তখনই থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি? কি জিজ্ঞাসা করচ? কি হয়েছে? এত হাঁপিয়ে গেছ কেন? গাড়ী কোথায়?" প্রভৃতি একটার পর একটা প্রশ্ন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন। গাড়ীর কোন কিছু বিপদ হইয়াছে কিংবা ঘোড়া ভাগিয়াছে এইরূপ কোন কিছু আশঙ্কা ওঁর মনে হওয়ায় বোধ হয় এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; "কিছু হয় নি, গাড়ী নিরাপদে আসচে, আমি একটু তাড়াতাড়ি চলছিলুম, ও চড়াই বলে হাঁপিয়ে পড়েছি। একটু বসা যাক। যতক্ষণ না গাড়ী আসে। এখন চড়াই সমস্ত শেষ হয়েছে এই সমস্ত বলিলেও উনি নীচে বসিলেন না। তখন আমি একটু কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলাম," একটু নীচে বসবেন না কি? একটু হাঁপ লেগেছে।" তখন উনি বলিলেন:—"কার হাঁপ লেগেছে? আমার? আমার একটুও হাঁপ লাগেনি। বেটা ছেলেরা শ্রম ও কষ্ট করতেই জন্মেছে। আমার হাঁপ লাগলে চলবে কি করে? বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে আমরা বেড়িয়ে বেড়াই; তোমার হাঁপ লেগেছে বলে তুমি কাকুতি মিনতি করচ। তোমার হাঁপ লেগেছে এই কথা স্পষ্ট করে বল, তাহলে তোমার জন্য আমি নীচে বসচি।" আমি তখনি বলিলাম, "হাঁ সত্যই হাঁপ লেগেছে। আমার জন্যই না হয় হল। এখন নীচে বসা যাক। রাস্তার ধারে সারি সারি সাদা পাথর বসান ছিল তার উপরেই আমরা দুজনে বসিলাম। গাড়ী আসা পর্য্যন্ত অনেকটা অবকাশ পাওয়া গিয়াছিল; তাই সেই বিছা দুটার কথা আমি বলিলাম। তাহা শুনিয়া উনি বলিলেন, "তখন তোমার ভয় পাওয়া আওয়াজ ও ভয় পাবার ভঙ্গী দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম ও গাড়ীর সম্বন্ধে আমার ভাবনা হয়েছিল।" আমি বলি-লাম, "কি বিপদই এড়ান গেছে? বিছে দুইটা পায়ের স্পর্শমাত্রই দংশন করত। এই রকম ঠিক ত্রিসন্ধ্যার সময় উজাড় মাঠের মধ্যে ঔষধ কোথায় পাওয়া যেত? এই সময় কে সহায় হত?" এইরূপ বলিতে বলিতে আমার বুক আবেগে ভরিয়া উঠিল,—এমন কি, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন উনি কিয়ৎক্ষণ একেবারে স্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর আমাকে বলিলেন—"এখন বিপদটা কেটে গেছে ত? এখন আর ভয় কিসের? এথেকে দেখ, পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে আছেন। এবং পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন। বিছাটা আমার পায়ে না পড়ে, আমার পা সহজেই বিছার বাহিরে পড়েছিল এই রকম তোমার মনে হয়েছে; সে যাইহোক্ যোজ-নাটা সেই রকমই হয়েছে বটে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদি রক্ষা করবেন মনে করেন ত কিছুতেই বিপদ হতে পারে না। কেবল আমাদের ঐরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। এটা কি শেখ্‌বার মতো নয়? তুকারাম বাবার একটা অভঙ্গ আছে। "যেথাই যাই তুমি মোর সঙ্গী। চালাইছ আমার ধরিয়া হাত'। এই অভঙ্গ কতটা সত্য খুবই সত্য নয় কি? ধন্য সেই পুরুষ এবং তাঁর অপরি-সীম ভক্তি ও বিশ্বাস। যখন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তখনই এই উক্তিটা খাটে। আমরা দুর্ব্বল মানুষ, ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করা খুব একটা সামর্থ্যের কথা, এবং তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে"। এই রকম উনি বলিতেছেন এমন সময় গাড়ী আসিয়া পৌছিল। রাত্রি ৮ টায় পুণার গাড়ী ধরা চাই, তাই আমরা গাড়ী করিয়া ওয়াঠারে আসিলাম ও সেখান হইতে রেল-পথে পুণায় আসিয়া পৌছিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রথমা প্রভৃতি বিভক্তিগুলি এবং ক্রিয়াপদ-গুলি প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য। এই নিয়মানুসারে বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব বিভক্তিরও ক্রিয়াপদসম্পত্তির অল্পতা অনুভূত হয় না। কারণ সংস্কৃত হইতে যে সমস্ত প্রাকৃত-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে পালিভাষাই বোধ হয় সংস্কৃতের অনন্তর এবং অন্যান্য প্রাকৃত প্রত্যনন্তর নামে উল্লেখ যোগ্য।

"কচ্চা অন"কৃত পালিব্যাকরণে কথিত সপ্ত-বিভক্তির আকার এইরূপ,—

১। দ ২। দ ৩। দ ৪। দ ৫। দ
সি ও অং ও না হি স ণ স্মা হি

৬। দ ৭। দ
স ণ স্মি সু

প্রাকৃতভাষায় অকারের পরবর্ত্তী প্রথমা বিভক্তি 'সু'স্থানেও হয়, এবং জসের লোপ ও পূর্ব্ব অকারের স্থানে আকার হয়; সুতরাং সাধারণতঃ অকারান্ত শব্দের পর ও এবং আ এই দুই বিভক্তিই যথাক্রমে এক বচনে ও বহু বচনে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বাদি এবং ইগন্ত শব্দের পরবর্ত্তী বিভক্তির রূপ স্বতন্ত্র হয়। প্রাকৃত ভাষার চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার নাই; চতুর্থীর পরিবর্ত্তে ষষ্ঠী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় চতুর্থীর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়া বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়।

বাঙ্গালায় প্রথমা বিভক্তির একবচনে মানুষ বহুবচনে মানুষেরা ইত্যাদিরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কৃতভাষার বা প্রাকৃতভাষার বিভক্তির সহিত উহার দূরসম্পর্কও পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিঘটিত পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসু পাঠক মহোদয়গণ প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

মুখ্য ক্রিয়াপদে কোন কোন স্থলে সংস্কৃতভব প্রাকৃতের চিহ্ন দৃষ্ট হইলেও স্থলবিশেষে কিছুমাত্রও সাদৃশ্য অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে কয়টি উদাহরণ উপন্যস্ত হইতেছে, "সংস্কৃত পঠতি, প্রাকৃত পঢ়ই পঢ়এ, বাঙ্গালা পড়ে; কর্ম্মবাচ্যে সং-পঠ্যতে প্রা-পঢ়িঅই, বাঙ্গালা পড়া হইতেছে। সং-করিষ্যামি, প্রা-কাহং বাঙ্গালা; করিবো। সং-দাস্যামি, প্রা-দাহং, বাঙ্গালা দিবো। সং-শ্রোষ্যামি, প্রা-সোচ্ছং, বাঙ্গালা-শুনিবো। সংবক্ষ্যামি, প্রা-বোচ্ছং, বাঙ্গালা বলিবো। সং-যাস্যামি, প্রা, যাচ্ছং-বাঙ্গালা যাবো। সং-রোদিষ্যামি, প্রা-রোচ্ছং, বাঙ্গালা-রোদন করিব। সং-দ্রক্ষ্যামি, প্রা-দচ্ছং, বাঙ্গালা-দেখিবো। সং-বেৎস্যামি, প্রা-বেচ্ছং, বাঙ্গালা-বুঝিবো। ইত্যাদি।

দৃশধাতুর অর্থে দেখধাতু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে পেক্খ আদেশ হইয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ক্ত্বা প্রত্যয়ের স্থানে প্রাকৃতে তুম, অৎ, তূণ, তু আণ এই চারিপ্রকার আদেশ হয়। যথা—সং-দৃষ্ট্বা, প্রা-দটুং, বাঙ্গালা-দেখিয়া। সং-পীত্বা, প্রা পাউন, বাঙ্গালা-পিয়া। সং-গৃহীত্বা, প্রা-ঘেত্তুন, বাঙ্গালা-গ্রহণ করিয়া। সং-কৃত্বা, প্রা-কাউন, বাঙ্গালা-করিয়া। সং-ভিত্ত্বা, প্রা-ভেত্তুআন, বাঙ্গালা-ভেদিয়া। সুতরাং ক্ত্বা প্রত্যয়ার্থে "ইয়া" প্রত্যয় বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুজাতের নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত নিজস্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত গৃহ শব্দ হইতে প্রাকৃত ঘর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; ঘর শব্দ প্রাকৃত হইতে অথবা সাক্ষাৎ সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালাভাষার প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ঘর নির্ম্মাণের উপাদান ও অবয়ব এতদুভয়ের বাচ্যে প্রায় সমস্ত শব্দই বাঙ্গালা ভাষার নিখুৎ নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। চালশব্দটা একসময়ে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব ছিল, অমরকোষের পরবর্ত্তিকালে উহাকে সংস্কৃতের জ্ঞাতি করিয়া লওয়া হইয়াছে। চালের রুয়া, সাঁড়ক, ছাঁটন, পাইড়, আড়া, টুই (টুয়া), আন্ধারিয়া, ডাব, ঢুকনা, বাতা, ছেঁচা, দড়ী বা দড়া, শুতলী, তোঁয়াল্ ও খুঁটি, পালা, পেলা প্রভৃতি বাঙ্গালার নিজস্ব। ঘরের ভিতরে পাকের স্থান "হেঁসেল" বাহিরে চালের জল পড়ার স্থান "ছাঁইচ" উঠানামার পদক্ষেপ স্থান, পৈঠা, উঠান, চান্দড়, আদাড়, (আবর্জনা ফেলিবার স্থান) উহা বিক্রমপুর প্রদেশে ছিঠাল, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ও শ্রীহট্টে "আঁঠাল" মালদহপ্রদেশে আস্তল, সম্মার্জ্জনীর অর্থে ঝাড়ুন, ঢাকাপ্রদেশে পীছা, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ও শ্রীহট্টে সাছুন বা হাছুন, (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে হকারের কিয়দংশ চাঁছিয়া ফেলা দরকার) মেয়েদের মসল্লা রাখিবার জন্য ঝাইল নামক বাঁশের একটা জিনিস ছিল, পোর্ট্‌মেণ্টের আবির্ভাবে সংপ্রতি উহার তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু শব্দটা এখনও একেবারে মরে নাই। ঘরকন্নার উপযোগী পাতিল, হাতা, বাউলী, বগুণা, বাসন, বিড়া, কুলো, ধামা, কাঠা, চুঙা, ছালা, খৈলা প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

জলবহুল বাঙ্গালাদেশবাসীর নৌকার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নৌকা শব্দ সংস্কৃত, উহার অপভ্রংশে নাও শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার অবয়ব বাচক এবং ইহার সহিত সংসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের বাচক শব্দগুলি বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব। যথা—গলই, গোরা, ডহর, ভওরা, বা ভরা, ছই (ছদি হইতেও হইতে পারে) মাস্তুল, পাল, বৈঠা, দাঁড়, হাইল, লগী, ধাপার, ছ্যাপুণ, সেঁঅৎ বা সেউতী, চালকের নাম মাঝী মাল্লা ইত্যাদি। দাঁড়া (গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ রাস্তা) প্রাকৃত ভাষায় যদিও দাঁড়া শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অর্থ দাঁত।

মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর মৎস্য ধরিবার উপযোগী যন্ত্রগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালীর নিজের উদ্ভাবিত; সুতরাং এইগুলির নামও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

যথা—টেঁটা, কোঁচ, ভাইড়, দুয়ারী খলুসুন্ বা খর-সোন, সাগ্‌ড়া হুঁচা, খরা, কাঁঠা, মাছ রাখিবার পাত্র—খ্লালই চুপ্‌ড়ী ইত্যাদি।

চাষাদিগের চাষসংক্রান্ত অনেক কথা আছে, যাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে পরিচিত নহে। যেমন—একহর (প্রথমচাষ) দোহর, তেহর নিড়ান, জাবর সামাল ইত্যাদি।

পশুর নামও বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। যেমন—পাঁঠা পাঁঠী আবাল্, বল্‌দন, (বলদ) এঁড়ে বা আঁইড়া। বাক্যালঙ্কার বা নিরর্থক শব্দ ভাষার মৌলিকতার পরিচায়ক এবং নিজস্ব। যেমন সংস্কৃতভাষায় যাবৎ, তাবৎ, খলু প্রভৃতি শব্দ; সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্ববর্ণের পরিবর্ত্তে টকার যুক্ত পাল্‌টা শব্দ অলঙ্কাররূপে চল্‌তি ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা—মানুষ টানুষ, গাছ টাছ, মাছ টাছ, কলা টলা, গরু টরু ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে নিরর্থক অন্য শব্দও ব্যবহৃত হয়, যেমন—যাবো অনে, যাবোখন, যাবোএখন, খাবোঅনে, করবোক্ষনে বাসন কোসন ইত্যাদি।

ভাব বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতুজ সংস্কৃত শব্দের পর "কর" শব্দযোগে বাঙ্গালাভাষায় অনেক ধাতু কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন,—গমন কর, গ্রহণ কর, প্রস্থান কর, শয়ন কর, আহার কর, পাঠ কর ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃতভাষার গন্ধরহিত বাঙ্গালা-ভাষার নিজস্ব ধাতু সম্পত্তি নেহাৎ কম বলিয়া মনে হয় না। যথা—কথন অর্থে "বল"ধাতু, যাচ্ঞার্থে ও দর্শনার্থে "চাহ"ধাতু, সঙ্কোচনার্থে "আঁট" পরি-ধানার্থে "পিন্ধ" তক্ষণার্থে "চাঁচ" আকর্ষণার্থে "টান" উপবেশনার্থে "বস" হ্রসনার্থে "কম" বর্দ্ধ-নার্থে "বাড়" প্রবেশনার্থে "শেন্ধ" দর্শনার্থে "তাক" স্পর্শনার্থে "ছুঁয়" অগ্রগমনার্থে "আগ" পশ্চাদ্-গমনার্থে "পাছ" বা "পিছু" নিদ্রার্থে "ঘুম" উপ-লালনার্থে "বুল" (যেমন হাত বুলাও) উৎপবনার্থে "ছাঁক" স্থিতি অর্থে "থাক" পাকান অর্থে "পাক" (দড়ী পাকান ইত্যাদি) মোচড়ান, নিংড়ান ইত্যাদি। বাঙ্গালাভাষার ক্রিয়া বিশেষণ ও অধিকাংশই তাহার নিজস্ব। যেমন—"সাপ্টাইয়া" (পদ্যে সাপুটিয়া) "ঝাপ্টাইয়া" "গোছাইয়া" জুইৎ করিয়া ইত্যাদি।

ক্রিয়াব্যতিহারে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যাও বাঙ্গালাভাষায় নিতান্ত অল্প বলিয়া মনে হয় না, এই গুলিতে ভাষান্তরের দাবীদাওয়া আছে বলিয়াও বোধ হয় না। যথা—"কাটাকাটি" "মারামারি" "হুড়াহুড়ি" "পাঁড়াপাড়ি" "খাওয়া-খাওয়ি" "লাথা-লাথি" "গুতাগুতি" "চড়াচড়ি" "কিলাকিলি" "বকাবকি" "মুখামুখি বা মুখোমুখি" "রোখারোখি" "জড়াজড়ি" ইত্যাদি।

সম্বন্ধবাচক দাদা, কাকা প্রভৃতি শব্দও বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব। প্রাকৃত ভাষায় "পিউসা মাউসা" শব্দ পিসি মাসি অর্থে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালায় পিসি মাসি শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংস বলিয়া ধরা হয়, এবং পিসা মাউসা শব্দ পিসিমাসির পতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অর্থান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঐ গুলিকে বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ উহাদের উভয় ভাষাগত অর্থের কোনও সাম্য প্রতিভাত হয় না। যেমন—বাঙ্গালায় গৌরবার্থে সম্ভ্রম শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ত্বরা অর্থে উহার ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃতে নিপুনার্থে অভিযুক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন "অভিযুক্তাঃ পঠন্তি" কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়, যাহার উপর কোনরূপ দোষারোপ হয়, তাদৃশ মানবই অভিযুক্ত শব্দে অভিহিত হয়।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। তন্মধ্যে সংস্কৃত ও পারসিক শব্দের সংখ্যাই অধিক। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাভাষায় পঁহুছিয়াছে, আর কতক-গুলি অবিকৃতভাবে, ও কতক কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষার প্রত্যয়ভাগ সম্পূর্ণরূপেই নিজস্ব। যদিও কতকগুলি প্রত্যয়ে সংস্কৃতের ছাঁচ দেখা যায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার প্রত্যয়ের সহিত তাহাদের অর্থের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। যেমন—আমি "করিতাম" এই তাম্ প্রত্যয় বাঙ্গা-লায় অতীতকালে উত্তম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু সংস্কৃতের "তাম্" প্রত্যয় অতীতা-ভিধায়ী বিভক্তির প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে এবং অনুজ্ঞাদিবোধক লোট বিভক্তির পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে ও আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ অনেক স্থলেই অর্থের অত্যন্ত পার্থক্য উপলব্ধ হয়।

যে সকল প্রকৃত শব্দ বাঙ্গালাভাষায় মিশি-য়াছে; তাহাতে ব্যাকরণ শুদ্ধ প্রাকৃতের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে দেশান্তরাগত আর্য্যজাতির সমাগমের পূর্ব্বে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই আর্য্যবংশীয় নৃপতি-গণের অধিকার সময়ে রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ বিশুদ্ধ প্রাকৃত ভাষার সহিত মিলিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবত ঐ সময়েই শিক্ষিত রাজপুরুষজুষ্ট সংস্কৃত শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ে কতকটা নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায়। আলঙ্কা-রিকদিগের মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। রাজসাহী প্রদেশে বাঙ্গালার

অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেকগুলি বিশুদ্ধ প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়। যেমন,—"বোর" "মোর" "সেজ্জা" ইত্যাদি। বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে "ধরই" দক্ষিণ-ভাগে "কুল" শব্দ ব্যবহৃত হয়, ময়ূর শব্দ অবিকৃত ভাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতব্যাকরণানুসারে শয্যা-শব্দের স্থানে "সেজ্জা" হয়। রাজসাহী প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সেজ্জা শব্দের ব্যবহার করে।

হিন্দুনৃপতিবৃন্দের রাজত্বাবসানে মুসলমান শাসনকালে রাজকীয় কার্য্যে যে সকল যাবনিক শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা অদ্যাপি বাঙ্গালাভাষায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই সকল নবাগত শব্দের আবির্ভাবই রাজকার্য্যোপযোগী পুরাতন শব্দের তিরোধানের কারণ বলিয়া মনে হয়।

নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ পুরাতন ভাষার অনেকটা বজায় রাখিয়াছে; কেবল যে যে বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক, সেই সেই বিষয়েই আর্য্যজুষ্ট ভাষা গ্রহণ করিয়া, প্রাচীন ভাষার সহিত অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাঝিমাল্লার মুখে লাও ও নৌকা এই দুইটি শব্দই সমভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার মধ্যে লাও শব্দটা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-জুষ্ট এবং নৌকাশব্দ ভদ্র আরোহীর মুখ হইতে অভ্যস্ত, গোরাভরার সহিত ভদ্র আরোহীর বড় বেশী পরিচয় নাই; সুতরাং সেই সকল শব্দ অদ্যাপি অবিকৃতরূপে দেশ্যভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, জাহাজের খালাসিগণ সাহেবদিগের মুখে শুনিয়া শুনিয়া লগির দরকার হইলে "বাম্বু বাম্বু" বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু ঝাড়ের বাঁশকে বেম্বু বলিতে তাহারা অদ্যাপি শিখে নাই। দেশ্যপ্রাকৃতের সহিত পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব নির্ণয়াভিলাষী ইদানীন্তন মনীষীদিগের সুদৃঢ় গবেষণার ফলে যে সকল প্রাচীন প্রশস্তি তাম্রশাসন এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুজ্ঞেয় অতীত অবস্থার সাক্ষ্যপ্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইতেছে, তাহাদিগের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, দেশ্য প্রাকৃতের অর্থ নির্ণয় নিতান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে। উমাপতিধরের লিখিত প্রশস্তিতে তল্লশব্দের উল্লেখ আছে।' বৃহজ্জলাশয় বাচক এই তল্ল শব্দ "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" "গল্লৌ লাবণ্যতল্লৌতে" ইত্যাদি শ্লোকে দেশ্য প্রাকৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কণ্ঠাভরণকার ভোজদেব এই শব্দদ্বয়ের অর্থকথনে প্রয়াসী হন নাই। অন্যান্য শব্দের অর্থ টীকায় কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুইটি শব্দের দুজ্ঞেয়তা নিবন্ধন সমগ্রকবিতাটিই অর্থ প্রকাশের অযোগ্য অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। সংপ্রতি বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে নানাশ্রেণীর প্রাকৃত ভাষার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার ফলে, গল্ল তল্লশব্দের যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধ হয়, সমগ্র কবিতাটির অর্থ এইরূপ হইবে—

"গল্লৌ লাবণ্যতল্লৌতে লড়হৌ মড়হৌ গুজৌ।
নেত্রে বোসট্টকন্দোট্ট-মোট্টায়িত্ত-সখে সখি॥"

টীকাকারদিগের মতে লড়হ-মনোহর, মড়হ-কৃশ, বোসট্ট নীলোৎপল, মোট্টায়িত্ত-বিলাস, গল্লতাল্লর কোনও অর্থ লিখিত হয় নাই। "তল্ল" কৃত্রিম বৃহজ্জলাশয়, এবং গল্ল অর্থ গাল। এই কবিতাটিতে কোনও রূপসীর প্রতি তাহার সখি বলিয়াছেন, হে সখি! তোমার গাল দুখানা লাবণ্যের তালস্বরূপ (সরোবর) বাহু দুখানা মনোহর অথচ কৃশ, চক্ষু দুটি বিকসিত নীলোৎপলের বিলাস অর্থাৎ স্ফুরণের সদৃশ।

প্রদর্শিত কবিতাটি প্রাকৃতভাষার কবিতা নহে। কয়টি সংস্কৃতশব্দে ও কয়টি দেশ্য প্রাকৃতশব্দে সংস্কৃতভাষার বিভক্তিযোগে ইহা রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতসাহিত্যে এইরূপ দেশ্য প্রাকৃত শব্দ দীর্ঘকাল হইতেই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। মীমাংসাদর্শনের ম্লেচ্ছাধিকরণে বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অবিরুদ্ধ ম্লেচ্ছশব্দ (অর্থাৎ দেশ্য প্রাকৃত) আর্য্যগণ ব্যবহার করিতে পারেন। উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "পিক" "তামরস" প্রভৃতি অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় স্থান পাইয়াছে।

পুরাতন দেশ্য প্রাকৃত শব্দ হইতে বাঙ্গালাভাষার নিখাত রীতির অনুসারে, গল্ল হইতে "গাল", তল্ল হইতে "তাল" গচ্ছ হইতে "গাছ" বপ্প হইতে "বাপ" ইত্যাদি রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রমে বাপ হইতে বাপা, পরে বর্ত্তমান সময়ে "বাবা" অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। খনার বচনে "যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বের হও বাপা" প্রভৃতি স্থলে বাপা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পত্রে স্থলবিশেষে "বাপাজীউ, বাপাজীবন দীর্ঘজীবেষু" ইত্যাকার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেশ্যশব্দের অনমুশীলনের ফল বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কবিতার অর্থ নির্ণয়ে অনেক স্থলেই অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। অনেক স্থানেই দেখা যায়, চণ্ডী কাটিয়া আণ্ডী করিবার প্রবাদ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। একটি শব্দ বিভিন্ন ভাষায় তেজস্তিমিরবৎ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন মামী শব্দ বাঙ্গালাভাষায় মাতুলানী অর্থে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু প্রাচীন দেশ্য প্রাকৃতে ইহার অর্থ "সখী"। যথা—

"কৈঅবরহিতং পিম্মং নচ্চিচ্চিঅ মামি? মানসে লোএ অহ পিম্মং কোবিরহো কোজী এই" (সিদ্ধহৈম) ইহার অর্থ:—হে সখী! কৈতব (ছল) রহিত প্রেম মনুষ্য লোকে নাই, যদি সেই অকপট প্রেম কখনও ঘটে, তবে বিরহ হয় না, যদি তাহাতেও বিরহ ঘটে, তবে কে বাঁচে? অর্থাৎ প্রেমিক মরিয়া যায়। (ক্রমশঃ)
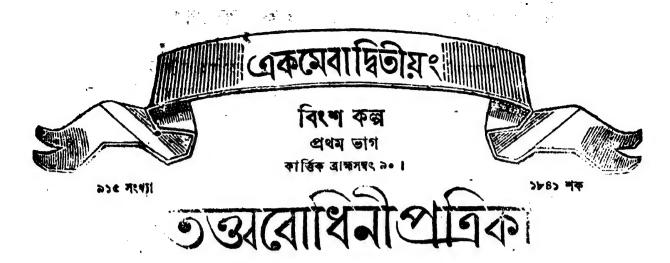
একমেবাদ্বিতীয়ং
বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।
৯১৫ সংখ্যা
১৮৪১ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

৺আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় প্রার্থনা।

পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার সারাংশ :—

আমার প্রিয় সুহৃৎ পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, যিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন—যাঁর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে কতশত যুবক [illegible] অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সমাজের কার্য্যে [illegible] উৎসর্গ করিয়াছেন—হায় তিনি আর নাই। আমি যেন তাঁকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে দিন তাঁর প্রেমোজ্জ্বল সহাস্য বদন দেখেছি—তাঁর সরল সরস মধুরালাপে মুগ্ধ হয়েছি আর এর মধ্যে তিনি কোথায় চলে গেলেন—আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি সেই পুণ্যধামে প্রস্থান করেছেন যেথান থেকে পথিক আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমরা তাঁর অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁর আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে ভগবানকে ডাকছি—বিনীত ভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি যে 'হে বিশ্ববিধাতা জগৎপিতা তুমি সেই পুণ্যাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-বিধান কর—তাঁর বিয়োগে যাঁরা শোকসন্তপ্ত তোমার মধুর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁদের শোকতাপ হরণ কর; তাঁর পবিত্র চরিত্রের উচ্চ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ কর—তাঁর সেই অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, তাঁর অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁর আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মভীরুতা ও ভগবদ্ভক্তি এই সমস্ত দৈব সম্পদ যেন আমাদের জীবনপথের পাথেয় হয়। হে দেব, হে পিতা যিনি তোমার চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন—তোমার কার্য্যে সমুদয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—যিনি তোমার প্রিয় কার্য্যসাধনে কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নি, কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলে গ্রাহ্য করেন নি, লোকের গ্লানি নিন্দা উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করেছেন, যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশ বিদেশে তোমার নাম প্রচার করে ধন্য হয়েছেন তিনি এক্ষণে ভয় হতে অভয়দ্বারে, মৃত্যু হতে অমৃতনিকেতনে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁকে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে তাঁর দুঃখতাপ দূর কর—তাঁর আত্মার শান্তি রক্ষা কর এই আমাদের প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর—এই সকল সাধু পুরুষদের দৃষ্টান্তে আমরা যেন দিন দিন তোমার নিকট-বর্ত্তী হতে পারি, তোমার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমাদিগকে সংসারের সম্পদ প্রেরণ কর আর বিপদেই আবৃত কর, তোমার দক্ষিণ মুখ—তোমার প্রেমদৃষ্টি যেন জীবনে মরণে সকল সময়ে আমাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করে রাখে। দেখ, বলতে বলতে এই বিশ্বেশ্বরের হস্ত হতে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধু নক্তমুতোষসোঃ
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতিঃ
মধুমানস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে—ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক—গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক, রাত্রি মধু হউক—উষা মধু হউক—দ্যুলোক, ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ—

আমাদের সেই প্রেমাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর জীবনের কার্য্য সমাধান করে নূতন অজানার দেশে প্রস্থান করেছেন,—যেথান হতে সকল পাপ্মা প্রতিনিবৃত্ত হয়, অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, যে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়—রাত্রি দিবসের ন্যায় আলোকিত, সেই সকৃদ্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মলোক।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ
ন জরা ন মৃত্যু র্ন শোকঃ ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং
সর্ব্বে পাপ্মানো ইতো নিবর্ত্তন্তে
অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্ব৷
অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি—
বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি
উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি
তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা নক্তমহরেবাভি-
নিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ

ইহাই সকৃৎ বিভাসিত ব্রহ্মলোক—হে বন্ধুগণ! ভক্তেরা যার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রতীক্ষা করছেন এই সেই ব্রহ্মলোক! আমরা কেনই বা শোক করব—যাঁর বিচ্ছেদে আমরা বিলাপ করছি তিনি সেই পুণ্যলোকে প্রস্থান করেছেন।

৺আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরলোকগত আচার্য্য আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, কাজেই তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। আমিও তাঁহাকে সেই চক্ষেই দেখিতাম। যৌবনে তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া অনেক উপকার পাইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সহিত যখন মিশিতাম, তখন তিনি আমাকে এমন সরলভাবে গ্রহণ করিতেন, আমার সহিত সমবয়স্কের ন্যায় এমন সহজভাবে মিশিতেন যে, বয়সের বিদ্যার আধ্যাত্মিকতার তারতম্যজনিত যে একটা "সমীহ" ভাব থাকা দরকার, সে ভাবটা থাকিত না, থাকিতে পারিত না। যুবকদিগের সহিত এইভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লওয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আমি তিনটী লোকে দেখিয়াছি—ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, পরম শ্রদ্ধাভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর এই গুণটী কি পরিমাণে ছিল, তাহা আমার মুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই; ভাই প্রতাপচন্দ্রের এই গুণ ছিল বলিয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদিগের মিলনস্থল Calcutta University Institute এর অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিয়াছিলেন; আর আচার্য্য শাস্ত্রীমহাশয়ের এই গুণ ছিল বলিয়াই যুবকবৃন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিজের দিকে টানিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই সাধনাশ্রমেই তাঁহার মনের ছায়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন এই সাধনাশ্রমে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। ব্রাহ্মদিগকে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করাইবার দিকেই বোধ হয় যেন তাঁহার একটু বেশী ঝোঁক ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে প্রিয়কার্য্যসাধনে মনোযোগ না দিলে ঈশ্বরপ্রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবার অবসর পায় না।

তাঁহার জীবনের শেষভাগে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপাসনার ভাব কমিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। আমার সঙ্গে

ইদানীং যখনই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিজের গৃহে তিনি নিত্য উপাসনার পূর্ব্বে কাহাকেও জলস্পর্শ করিতে দিতেন না। আজকাল অনেক ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা অনাবশ্যক, কতকগুলি বিদেশী পণ্ডিতের এই মত খুব আদরের সহিত গৃহীত হয়। অনেক ব্রাহ্মেরই ছেলেপিলেরা সপ্তাহে একবার ব্রহ্মমন্দিরে যান কি না সন্দেহ—সে দিন তাঁহাদের গৃহে বন্ধুসমাগমের বড়ই ধুম পড়িয়া যায়,—গৃহে তো উপাসনার নামগন্ধও করেন না। যাঁহারা উপাসনার প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তাঁহারা উপাসনার প্রকৃত তত্ত্বই জানেন না। এই উপাসনার অভাবের কারণে ব্রাহ্মসমাজ অবনতির দিকে দ্রুতপদে নামিয়া চলিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনে যিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই উপাসনার অভাব এবং সেই কারণে ব্রাহ্মসমাজের অবনতি দেখিলে তাঁহার প্রাণে যে অত্যন্ত ব্যথা লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

যাঁহারা উপাসনার প্রয়োজন অস্বীকার করেন, তাঁহাদের একটী প্রধান আপত্তি এই যে নিত্য উপাসনায় তাঁহারা নিত্য সরসতা অনুভব করেন না। এই আপত্তির উত্তরে শাস্ত্রীমহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথাটী আজ কয়েক মাস হইল তিনি আমার কাছেও পুনরুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলে অনেক নদীর গর্ভ গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় এবং সেই গর্ত্ত দিয়া কোথাও জলের ক্ষীণ স্রোত চলিতে থাকে এবং কোথাও বা কোন স্রোতই দেখা যায় না। এখন যদি এতটা জমী নষ্ট হইতেছে দেখিয়া কেহ মনে করেন যে সেই নদীগর্ভ পতিত রাখা আবশ্যক নাই এবং ইহা ভাবিয়া সেই নদীগর্ভ বুজাইয়া লয়েন, তাহা হইলে বর্ষা নামিলে সে জল বহিবার উপযুক্ত পথ না পাইয়া নগরপল্লী যে ভাসাইয়া দিবে, তাহাতে কতনা অনিষ্টের সম্ভাবনা। সেইরূপ যদি এখন হৃদয়ে সরস ভাব উঠিতেছে না বলিয়া উপাসনা দ্বারা হৃদয় নদীর পথ ঠিক করিয়া না রাখা যায়, তাহা হইলে সময়ে যখন ভগবানের করুণাধারার বর্ষা নামিবে, তখন সে বেগ সামলানো দুরূহ হইবে—সংসারের মঙ্গলভাব সকল কোথায় যে সেই বেগে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানাই থাকিবে না। তিনি এই ভাবের উপরে দাঁড়াইয়াই গৃহে সমস্ত কর্ম্মের বাধা সত্বেও উপাসনা কিছুতেই বন্ধ হইতে দেন নাই, এই কথা আমি তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। কথাটী আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে—এই কথাটী বর্ত্তমান কালের বড়ই উপযোগী। এই কথাটী পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের নিকট বলাতে তাহার উত্তরে তিনি শাস্ত্রীমহাশয়কে আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি মহর্ষিদেবের প্রচার-প্রণালী ভারতের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহার উপযোগিতাবিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করিতেছি না, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় আমার নিকট এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইদানীং তিনি বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে পাঠাদি করিতেন, একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে 'আমরা কি ভুলই করিয়াছি—আমি যতই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করি, ততই তাহাতে গভীর হইতে গভীরতর সত্য লাভ করিতে থাকি। আমার বিশ্বাস যে এই প্রকার উপনিষদাদির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিলে ভারতের হৃদয়ের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিবে না।' জীবনের শেষাশেষি তাঁহার মনে কিরূপ ভাব কার্য্য করিতেছিল, তাহা এই উক্তি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শেষজীবনে উপনিষদের সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রাণপ্রদ মন্ত্রের বিশেষভাবে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষিদেবের একটী কথা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। মহর্ষিদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি রকম ক'রে' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মন্ত্রটী পাঠ কর, তাহাতে হৃদয় খোলে না; কিন্তু যথাযথ বৈদিক সুরে ঐটী আবৃত্তি করিলে আমি উহাতে ভাবের অন্ত পাই না; যতই ডুবি, ততই ডুবিতে ইচ্ছা হয়।"

তাঁর হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট

হইয়াছিল বলিয়াই স্বদেশভক্তিও তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই স্বদেশভক্তির কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমরা তখন বিদ্যালয়ে পড়ি—যখন কি একটা আইন বিষয়ে বড়ই আন্দোলন হয়। উক্ত আইন সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের কোন একটি কার্য্য স্বদেশের অনিষ্টকর বলিয়া তদানীন্তন স্বদেশনেতাগণের নিকট উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই সেই সকল নেতৃবর্গ আমাদের বাড়ীতে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশভক্ত দুর্গামোহন দাস, প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু এবং আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই তিনজনকে অগ্রণীরূপে দেখিয়াছিলাম বেশ মনে পড়ে। তখন রাত্রি প্রায় ১০॥ টা। আমরা পাঠ সমাপন করিয়া ঘুমাইতে যাইবার জোগাড় করিতেছিলাম। এমন সময়ে তাঁহারা উপস্থিত। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদানীন্তন ব্রাহ্মসাধারণেরই "বড়দা" ছিলেন। দুর্গামোহন বসু প্রভৃতি বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতেই যে প্রাণস্পর্শী সুরে চীৎকার করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—'বড়দা—বড়দা—সর্ব্বনাশ হয়েছে'—সে সুর আজও আমার কানে বাজিতেছে। তাঁহাদের দেশভক্তিতে উজ্জ্বল সে মুখশ্রীও আমার চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আর শাস্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থসমূহে তো দেশভক্তির পরিচয় প্রতিপদেই পাওয়া যায়।

এখন আমি অন্তরের সঙ্গে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন শাস্ত্রীমহাশয়ের পবিত্র স্মৃতি অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি-সাধনের জন্য হৃদয়ে ইচ্ছা পোষণ করি এবং শক্তি সঞ্চয় করি। এইরূপ করিলেই পরলোকগত মহাত্মার যথার্থ তৃপ্তি সাধন হইবে। ভগবান আমাদের এই সদিচ্ছায় সহায় হউন। সমস্ত জগত মধুময় হউক। ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যা ও ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী—ইহা নির্ণয় হইল। কিন্তু আত্মা চিদ্রূপী বলিয়া ব্রহ্মও চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই, এখানে ব্রহ্মের ও সেই সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আত্মার সান্নিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধর্ম্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির এই ধর্ম্ম আত্মার উপর চাপানো উচিত নহে, অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আত্মার মূল স্বরূপকেও নির্গুণ ও অজ্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। তাই কাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী হইলেও এই উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বলা কিয়দংশে গৌণ। কেবল চিদ্রূপসম্বন্ধেই এই আপত্তি নহে; কিন্তু 'সৎ' এই বিশেষণও পরব্রহ্মের উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও ঐ সঙ্গে স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, সৎ ও অসৎ এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ দুই বিভিন্ন বস্তুর উদ্দেশেই বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আলোক কখনই দেখে নাই, সে আঁধারের কল্পনা করিতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, আলো ও আঁধার এই দুটি শব্দের দ্বন্দ্বও সে বুঝিতে পারিবে না। সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে এই ন্যায়ই উপযোগী। কোন কোন বস্তুর নাশ হইয়া থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি হইলে, আমরা সমস্ত বস্তুর অসৎ (নশ্বর) ও সৎ (অবিনশ্বর) এই দুই বর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; কিংবা সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দ বুঝিতে হইলে মনুষ্যের দৃষ্টির সম্মুখে দুই প্রকারের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসা আবশ্যক। কিন্তু মূলারম্ভে যদি একই বস্তু ছিল, তবে দ্বৈত উৎপন্ন হইলে পর দুই বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া যে সাপেক্ষ সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের প্রচার হইয়াছে, এই মূল বস্তুতে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে? কারণ, ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার জুড়ীর কোন অসৎ ছিল কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ না দিয়াই "জগতের আরম্ভে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, যাহা কিছু ছিল তাহা একই ছিল", ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে জগতের মূলতত্ত্বের এইরূপ বর্ণনা আছে (ঋ. ১০. ১২৯)। সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের যুগল (কিংবা দ্বন্দ্ব) পরে বাহির হইয়াছে; এবং সৎ ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে যাহার বুদ্ধি মুক্ত হইয়াছে সে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মপদে উপনীত হয়, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ২৮; ২. ৪৫)। অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার কিরূপ গভীর ও সূক্ষ্ম তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। কেবল তর্কদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রহ্মের কিংবা আত্মারও অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞেয় ও নির্গুণ অতএব ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও ইহা প্রতীতি হইতে পারে

যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীতি হওয়ায়, আমার নির্গুণ ও অনির্ব্বাচ্য আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমি জানিতে পারি তাহাই পর-ব্রহ্মেরও স্বরূপ সেইজন্য ব্রহ্ম ও আত্মা একস্বরূপী, এই সিদ্ধান্ত নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, "ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী' ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না; অবশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে স্বানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগম্য শাস্ত্রার প্রতিপাদনে যতদূর সম্ভব শব্দের দ্বারা খোলসা ব্যাখা করা আবশ্যক। তাই, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ব্যাপ্ত, অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বাচ্য হইলেও জড়জগতের ও আত্মস্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বের ভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আত্মার সন্নিধানে জড়প্রকৃতিতে চৈতন্যরূপী যে গুণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়া, অধ্যাত্মশাস্ত্র আত্মা ও ব্রহ্ম দুইকেই চিদ্‌রূপী কিংবা চৈতন্যরূপী বলিয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না করিলে আত্মা ও ব্রহ্ম দুই-ই নির্গুণ, নিরঞ্জন ও অনির্ব্বাচ্য হওয়ায় তাহাদের স্বরূপ বর্ণন একেবারেই বন্ধ করিতে হয়, কিংবা শব্দের দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করিতে হইলে "নেতি নেতি"। "এতস্মাদন্যৎপরমস্তি।"—ইহা নহে, ইহা (ব্রহ্ম) নহে, (ইহা নামরূপ), প্রকৃত ব্রহ্ম ইহার অতীত আর কিছু—এইরূপ নিয়ত "না"-"না"-ধারা পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই (বৃ. ২. ৩. ৬)। তাই, চিৎ (জ্ঞান), সৎ (সত্তামাত্রত্ব কিংবা অস্তিত্ব) ও আনন্দ—সাধারণত ব্রহ্মস্বরূপের এই লক্ষণ-গুলি বলিতে পারা যায়। এই লক্ষণগুলি অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশয় নাই। তথাপি শব্দের দ্বারা যতদূর হইতে পারে ব্রহ্মের স্বরূপ জানাইবার জন্য এই লক্ষণগুলি কথিত হইয়াছে; প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ হওয়ায় তাহার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশ্যক হয়, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই অনুভূতি কিরূপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত অতএব অনির্বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিরূপে ও কখন্ অনুভবে আইসে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার যে বিচার করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

ব্রহ্ম ও আত্মা এক—এই সমীকরণকেই মারাঠীতে "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে পর জ্ঞাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু ভিন্ন, এই ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, তবে ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ভিন্ন—এই ভেদ কি করিয়া চলিয়া যাইবে? এবং এই ভেদ না চলিয়া গেলে ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি কি করিয়া ঘটিবে? এইরূপ এক সংশয় আসিতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশয় সম্পূর্ণ অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়-গণ বাহ্য বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই করে এরূপ নহে। "চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা" (মভা. শাং ৩১১. ১৭) যে কোন বস্তু দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের (ও কান প্রভৃতির) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়; মন শূন্য থাকিলে অন্য কোন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিলে, বস্তু চোখের সম্মুখে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ঠিক্ থাকিলেও মনকে যদি তাহা হইতে বাহির করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বিষয়ের দ্বন্দ্ব বাহ্য জগতে থাকিলেও আমাদিগের নিকট না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল আত্মাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপী ব্রহ্মেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্মাত্মৈক্যের সাক্ষাৎ-কার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একান্ত উপাসনার দ্বারা, কিংবা অত্যন্ত ব্রহ্মবিচারাস্তে শেষে এই মান-সিক অবস্থা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, দৃশ্য জগতের দ্বন্দ্ব বা ভেদ তাহার নেত্রসম্মুখে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়; এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা উপাস্য ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ 'অন্য' এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র এই অবস্থা বিঘটিত হয় এবং মনুষ্য অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে আসিয়া পড়ে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। অধিক কি, এই অবস্থা আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহা বলাও মুস্কিল! কারণ, 'আমি' বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা মনে আসে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্য হইবার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হয়। এই কারণে "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি…জিঘ্রতি…শৃণোতি…বিজানাতি।…যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ…জিঘ্রেৎ…শৃণুয়াৎ … বিজানীয়াৎ। … বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি।"—দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই দ্বৈত যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় সে পর্য্যন্ত এক আর এককে দেখে, আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে,

এবং জানে; কিন্তু সমস্ত যখন আত্মময় হইয়া যায় (অর্থাৎ আত্ম-পর ভেদই থাকে না) তখন কে কাহাকে দেখিবে, আঘ্রাণ করিবে, শুনিবে বা জানিবে! ওরে! যে স্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথা হইতে আসিবে!—যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বৃ. ৪. ৫. ১৫; ৪. ৩. ২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মভূত কিংবা ব্রহ্মভূত হইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বও থাকিতে পারে না (ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে—আমা হইতে—ভিন্ন হওয়া চাই এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকার ভিন্নতার কোন অবকাশ থাকে না। এই দুঃখশোক-বিরহিত অবস্থাকেই 'আনন্দময়' এই নাম দিয়া এই আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৮; ৩. ৬)। কিন্তু এই বর্ণনাও গৌণ। কারণ, আনন্দের অনুভবকারী এখন থাকে কোথায়? তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেষ প্রকারের, এইরূপ বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৩. ৩২)। ব্রহ্মবর্ণনায় যে 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের গৌণত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অন্য স্থানে 'আনন্দ' শব্দ ছাঁকিয়া ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, "ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (বৃ. ৪. ৪. ২৫) কিংবা "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুং ৩. ২. ৯)—যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে (বৃ. ২. ৪. ১২; ছাং, ৬. ১৩)—লবণখণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়া গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত নহে এইরূপ ভেদ যেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মাত্মৈক্যের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। কিন্তু "তুকাচী বদে নিত্য বেদান্ত বাণী"—যিনি বলেন নিত্য বেদান্তের বাণী—সেই তুকারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টান্তের বদলে—

গোড়পণে জৈসা গুড়। তৈসা দেব ঝালা সকল॥
আতাঁ ভজো কোণেপরী। দেব সবাহ্য অন্তরী॥

অর্থাৎ—"গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিষ্টতা, সেইরূপ সমস্তের মধ্যেই ভগবান, এখন যে রকমেই ভজনা কর—ভগবান বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন"—এইরূপ গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণনা করিয়াছেন (তু. গা. ৩৬২৭। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বানুভবগম্য এইরূপ যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্যই এই। পরব্রহ্মের যে অজ্ঞেয়তা বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতী অবস্থাসম্বন্ধীয়, অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারের অবস্থা সম্বন্ধীয় নহে। আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই কর না কেন ব্রহ্মাত্মৈক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু নদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহার যেরূপ সমুদ্ররূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়া থাকে; এবং তাহার পর, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (গী. ৬. ২৯) সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপনি সর্ব্বভূতে—এইরূপ তাহার ব্রহ্মময় অবস্থা হইয়া পড়ে। পূর্ণ পরব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ কেবল স্বানুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং" (কেন. ২. ৩) আমি পরব্রহ্মকে জানি যাহারা বলে তাহারা তাঁহাকে জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরব্রহ্মকে জানিনা তাহারাই তাঁহাকে জানে, কেনোপনিষদে এইরূপ অতি সুন্দর পরব্রহ্মস্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ, পরব্রহ্মকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সময় আমি (জ্ঞাতা) ভিন্ন, এবং আমার জানা (জ্ঞেয়) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা কাঁচা কিংবা অপূর্ণই হইয়া থাকে। তাই, এইরূপ যে বলে সে প্রকৃত ব্রহ্মকে জানে না ইহা তাহার নিজের মুখেই সিদ্ধ হয়। উল্টাপক্ষে, 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দ্বৈতী ভেদ লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যের যখন পূর্ণ অনুভূতি আসে তখন "আমি তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানি" এই ভাষা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই, এই অবস্থায়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে ব্রহ্মকে জানিয়াছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দ্বৈতীভাবের এইরূপ সম্পূর্ণ লোপ হইয়া জ্ঞাতার সমস্তই ব্রহ্মেতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া যাওয়া, মাখামাখি হওয়া, 'মরিয়া' যাওয়া সাধারণতঃ দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই 'নির্ব্বাণ' অবস্থা দুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনুষ্যের শেষে সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনুভবের দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় বলিয়া আত্মনাশের এই এক প্রকারভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু এই অবস্থা অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না, তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত

সন্দেহ নির্ম্মূল হয় * ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ সাধুসন্তদিগের অনুভূতি। পূর্ব্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণনা রাখিয়া দেও; কিন্তু নিতান্ত আধুনিক ভগবদ্‌ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাবাও—

"আপুলেঁ মরণ পাহিলেঁ ম্যাঁ ঢোলাঁ। তো জালা সোহলা অনুপম।" অর্থাৎ নিজের মরণ নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক ভাষায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন (গা. ৩৫৮৯)। ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. ১. ৪. ১০)—আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়; তাহার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহার মধ্যে সে এরূপ নিমজ্জিত হয় যে, আমি কি অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অনুভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই যায় না। এই অবস্থায় জাগরণ বজায় থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা সুষুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পারা যায় না; যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে সাধারণত যে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে। তাই স্বপ্ন, সুষুপ্তি, (নিদ্রা) কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক চতুর্থ কিংবা তুরীয় অবস্থা এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ নাই এইরূপ সমাধিযোগে প্রবৃত্ত করানোই পাতঞ্জল যোগদৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই কারণেই গীতাতে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে মনুষ্য যেন অবহেলা না করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৬.২০-২৩)। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা। কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ একই হইয়া গেলে "অবিভক্তং বিভক্তেষু"—অনেকের একত্ব করা চাই গীতার জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্ঞান হইতে পারে না। সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভব আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মানুষের আপনা-আপনিই চুকিয়া যায়। কারণ, জন্মমরণ তো নামরূপেতেই আছে এবং ইহা তাহার অতীত। (গী. ৮. ২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে 'মরণের মরণ' এই নাম দিয়াছেন (গী. ৩৫৮৯)। এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা। এই অবস্থায় আকাশগমনাদি কতকগুলি অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্জল যোগসূত্রে এবং অন্যত্রও বর্ণিত আছে (পাতঞ্জল সূ. ৩. ১৬-৫৫); এবং এইজন্য কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসের সখ হইয়া থাকে। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্তি অনুসারে আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবন্মুক্ত পুরুষ এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাঁহার এই সিদ্ধি দেখাও যায় না (যো. ৫. ৮৯)। তাই, শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই। ইহা চমৎকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, এইরূপ বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। উহা কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরূপ আমরা বলি না। যাহা হৌক উহা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নহে এইটুকু নির্ব্বিবাদ। তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংবা তাহার ইচ্ছা বা আশাও না রাখিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা, ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষেই মনুষ্যের চেষ্টা ও প্রযত্ন করা চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রের উক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাদু অথবা ধোঁকা লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার শক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি হয় না শুধু নহে, ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যায় এক্ষণে মানুষও বিমানে করিয়া আকাশে উড়িয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া সেই মানুষকে কেহ ব্রহ্মবেত্তার মধ্যে গণনা করে না। এমন কি, আকাশগমনাদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্রূর ঘাতক পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

---

* ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত এই অদ্বৈতের কিম্বা অভেদভাবের অবস্থা nitrous oxide gas নামক একপ্রকার রাসায়নিক বায়ু আঘ্রাণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বায়ুকে 'লাফিং গ্যাস' বলে। *Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy* by William James, pp. 294. 298. কিন্তু এই অবস্থা কৃত্রিম। সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক। এই দুয়ের মধ্যে ইহাই গুরুতর প্রভেদ। তথাপি এই কৃত্রিম অবস্থার প্রমাণ হইতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকে না, তাই এইখানে উহার উল্লেখ করিয়াছি।

গীতা-স্তোত্র।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

তুমিই দেবাদিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার বস্তু হে তুমি,
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি॥

নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে॥—(ধুয়া)

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগতবন্দ্য গুরু গরীয়ান।
কেহনা সমান তব, অধিক কোথায়,
তোমার মহিমাভাতি ত্রিভুবনে ভায়॥
অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অরুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখারে যেমতি সখা, ক্ষমগো আমায়॥

নমো নমস্তেঽস্তু নমো নমস্তে॥—(ধুয়া

মিশ্র কেদারা—ঝাঁপতাল।

সংস্কৃত।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
II সা সা। -মা -া মা। মা -া। মা -া -া I মা মা। মা গা পা। পক্ষা ধপা।
ত্ব মা ০ ০ দি দে ০ ব ০ ০ পু রু ষ ০ পু রা০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। পমা -া -া I মা -া। মা -া মগা। পা -ক্ষা। ধা পা পা I ধা পা। মা -া মা।
ণ ০ ০ ত্ব ০ ম ০ স্য০ বি ০ শ্ব ০ স্য প র ং ০ নি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২
। মগা- পা I মমা -া -া I মা -া। মা -া মগা। পা ক্ষা। ধা পা পা I র্সা র্সা।
ধা ০ নম্ ০ ০ বে ০ ত্তা ০ সি বে ০ দ্যং ০ ঞ্চ প র

৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
। ধা র্সা র্সা। র্সর্রর্সনা র্সা। র্সা -া -া I মা মা। -া গা পা। পা -া। পা -ক্ষপা পা I
০ ০ ঞ্চ ধা০০০ ০ ম ০ ০ ত্ব য়া ০ ০ ত তং ০ বি ০০ শ্ব

২ ৩ ০ ১
I ধনা -র্সর্রা। র্সনর্সা ধা পা। মপমগা -মা। -গমা -রা সা I
ম০ ০০ ন০০ ০ ন্ত রূ০০০ ০ ০ ০ প

বাঙ্গলা।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I মা -া। ধা -া ধা। ধা পা। পক্ষা ধা পা I মা মা। মা গা পা। মা রা।
তু ০ মি ০ দে বা দি দে০ ০ ব পু ক ষ ০ পু রা ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
। সা -া -া I সা সা। রা -া গা। মা পা। পক্ষা ধা পা I মা মা। মা রা মা।
ণ ০ ০ নি খি ল ০ বি খে র তু০ ০ মি প র ম ০ নি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। রা -া। সা -া -া I সা -া। রা মা মা। পা পা। ধা পা পা I মা পা।
ধা ০ ন ০ ০ স ০ র্ব্ব ০ জ জা নি বা ০ র ব ০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। না র্সা র্সা। র্রা র্সা। র্সা -া -া I র্সা গা। পা মা ধা। পা মা। মা মা মা I
স্থ ০ হে তু ০ মি ০ ০ অ ন ন্ত ০ স্ব রূ পে ব্যা ০ প্ত

২´ ৩ ০ ১
I মা পা। মা গা মা। রা -া। সা -া -া I
স্ব র্গ ম ০ র্ত্ত্য তু ০ মি ০ ০

ধুয়া।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
I পা মা। র্সা -া র্সা। র্রা র্সা। র্সা নর্সা সা I সা -া। নর্সা র্রা র্রা। র্রা র্সা।
ন ০ মো ০ ন ম ০ স্তে ০ স্তু ন ০ মো০ ০ ন ম ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
। র্সা -া -া I মা -া। মা গা পা। পা ক্ষা। ধা পা পা I মা -া।
স্তে ০ ০ ন ০ মো ০ ন ম ০ স্তে ০ স্তু ন ০

৩ ০ ১
। মা গা পক্ষা। রা -া। সা -া -া I
মো ০ ন ম ০ স্তে ০ ০

সংস্কৃত।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা ক্ষা। ধা পা পা। র্সা -া। র্সা নর্সা র্সা I র্রা র্সা। না র্সা র্সা।
পি ০ তা ০ সি লো ০ ক ০ স্য চ রা ০ ০ চ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা না। র্সা -া র্সা I র্সা না। র্সা -া র্রা। র্গর্মা র্গর্মা। র্রা র্সা র্সা I
র ০ ০ ০ স্য ত্ব ০ ম ০ স্য পূ ০০ জ্য ০ শ্চ

২´ ৩ ০ ১
। নর্রা র্সা। নর্সা -া র্রা। র্সা নর্সা। ধা -া পা I
গু রু ০ র্গ রী ০ য়া ০ ন্
৩

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা -া। মা গা পা। পা ঝা। ধা পা পা I পা ঝা। ধা পা পা।
ম ০ বৎ ০ স মো ০ ত্য ০ ত্য ধি ০ ০ ০ কঃ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা ধা। র্সা র্মর্সা র্সা I সা ন্া। রা সা সা। মা মা। মগা পঝা পা I
কু ০ তো ০ ভো লো ০ ০ ০ ক ব রে ০০ ০০ প্য

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা। মা গা মা। পা মগা। মা রা সা I
প্র ভি ০ ০ ম প্র ভা০ ০ ০ ব

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I { সা -া। সা -া রা। রা -া। র্মা রা মা I মা মা। গমা পা পা।
ত ০ মাং ০ প্র ণ ০ মা ০ ০ প্র ণি ধা০ ০ ম

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা -া -া I মা পা। -া -া ধা। পা মা। মা গমা রা I
কা ০ য়ম্ ০ ০ প্র সা ০ ০ দ যে ০ ত্বা ০০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা রা। মরা মপা পা। মা রা। -া সা -া I } মা পা। না র্সা র্সা।
ম হ মী০ ০০ শ মী ০ ০ ড্যং ০ পি০ ০ তে ০ ব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্রা র্সা। র্সা র্মর্সা র্সা I র্রা র্সা। না র্সা র্সা। র্সা না। র্সা র্সা -া I
পু ০ ত্র ০ স্য স খে ০ ০ ব স ০ ০ খ্যুঃ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা সা। রা রা -া। মা রা। মা পা পপা I মা রা। সা সা -া।
প্রি য়ঃ প্রি য়া ০ য়া ০ ০ ০ র্হসি দে ০ ০ ব ০

০ ১
। রা ন্া। সা সা -া I
সো ০ ০ ঢুং ০

বাজালা।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। না -া না। র্সা -া। র্সনা র্সা র্সা I না র্সা। র্রা -া র্মা।
বো ০ ক ০ চ রা ০ চ০ ০ রে তু ০ মি ০ পি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্রা র্সা। র্সনা র্রা র্সা I র্মা র্রা। র্রা -া র্মা। র্রা র্রা। র্সনা র্সা র্সা I
তা র স০ ০ খান্ তু মি হে ০ অ গ ত বং ০ ধ্য

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সনা র্রা। র্রা র্সা র্রা। র্সা না। র্সা -া -া I ধা ধা। পা মা ধা।
শু০ ০ ক্র ০ র্গ রী ০ য়ান্ ০ ০ কেহ ০ না ০ স

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা মা। মা -া মা I মা মা। মগা পা পা। পা -া। মা -া -া I
মা ন ভ ০ ব অ ধি ক০ ০ কো থায় ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা সা। রা গা মা। পা পা। পক্সা ধা পা I মা মা। মা গা মা।
তো মা র ০ ম হি মা ভা০ ০ তি ত্রি ভু ব ০ নে

০ ১
। রা -া। সা -া -া I
তার ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা সা। সা -া সা। রা সা। সা ^নসা সা। রা পা। পা মা ধা।
অ ভ এ ০ ব ন মি দে ০ ব প্র ণ ত ০ শ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা মা। মা -া -া I মা মা। মা গা পা। পা পা। পক্সা ধা পা I
রী ০ রে ০ ০ তো মা র ০ প্র সা দ প্র০ ০ ভু

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। মা রা মা। রা সা। সা -া -া I } রা রা। মা -া মা।
মা গি অ ০ শ্র নী ০ রে ০ ০ পি তা পু ০ ত্রে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা পা। ধা পা পা I মা পা। না পা না। র্সা -া। -া -া -া I
স্ব মে ব ০ ধা প্র ণ মী ০ প্রি য়ায় ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্রা র্রা। র্রা -া র্মা। র্রা র্সা। র্সনা র্রা র্সা I র্সণা পা। মা রা মা।
স খা রে ০ যে ম তি স০ ০ খা স্ব০ ম গো ০ আ

০ ১
। রা -া। সা -া -া I
মায় ০ ০ ০ ০

(ধুয়া)—নমো নমস্তে ইত্যাদি।

কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

নিধনপুরে আবিষ্কৃত ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে (১) দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত তাম্রশাসন "কর্ণসুবর্ণবাস" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। উহাতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপের রাজগণের যে বংশ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

পুষ্যবর্ম্মা।

সমুদ্র বর্ম্মা	দত্তদেবী
বল বর্ম্মা	রত্নদেবী
কল্যাণ বর্ম্মা	গন্ধর্ব্ববতী
গণপতি বর্ম্মা	যজ্ঞবতী
মহেন্দ্র বর্ম্মা	সুব্রতা
নারায়ণ বর্ম্মা	দেবরবতী
মহাভূত বর্ম্মা	বিজ্ঞানবতী
চণ্ডমুখ বর্ম্মা	ভোগবতী
স্থিতি বর্ম্মা	নয়নদেবী
সুস্থিত বর্ম্মা (নামান্তর মৃগাঙ্ক)	শ্যামাদেবী

সুপতিষ্ঠিত বর্ম্মা ভাস্কর বর্ম্মা

ভাস্কর বর্ম্মার পরবর্ত্তী "ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতি ভগদত্তবংশীয় তিনজন নরপতির (২) কামরূপে রাজত্ব করিবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। রত্নপালের তাম্রশাসন পাঠে ভাস্কর বর্ম্মার লোকান্তরিত হইবার কিছুকাল পরে কামরূপে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা আভাস পাওয়া যায়। গৌহাটীতে মহারাজ ইন্দ্রপালের আবিষ্কৃত তাম্রশাসন (Journ. A. S. B. 1897. P. 113) হইতে ইহাঁদের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই শাসন ফলকের অক্ষরাদি দৃষ্টে প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হর্ণলি ইহার জন্মকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (J. A. S. B 1898, P. 102), তাহা হইলে মোটামুটীভাবে ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে "ব্রহ্মপাল" ১০০০ খ্রীঃ অব্দে কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। তাম্রশাসন—কামরূপের নরপতিগণের সর্ব্বশুদ্ধ ছয় খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা—
(১) বনমাল দেবের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol IX, P. 766)
(২) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol LXVI., P. 113)
(৩) বলবর্ম্মা দেবের তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXI, P. 285)
(৪) রত্নপালের ১নং তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXVII, P. 99)
(৫) রত্নপালের ২নং তাম্রশাসন (J. A. S. B., Vol. LXVII, P. 120)
(৬) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন (Epigraphica Indica, Vol II, P. 347)

২। ইহাঁরা "শ্রীদুর্জ্জয়" নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করত রাজত্ব করিতেন।

বঙ্গের প্রাচীনত্ব।

সুপ্রসিদ্ধ চৈণিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন (খ্রীঃ অঃ ৬২৯) তৎকালে বঙ্গ নামে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলে তিনি অবশ্য তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া যাইতেন। "মনুসংহিতা"তে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ নাই। গ্রীক, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিক ভ্রমণকারীরা বঙ্গের নাম উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানায় যে ভূখণ্ড সাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল তাহাই পরবর্ত্তী কালে "বঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই দেশের অধিকাংশ ভূমি * জলা ও সর্ব্বত্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন কালে ২৪।২৫ ফুট মৃত্তিকার নিম্নভাগে, আজিও ভাঙ্গা নৌকা, গাছের গুঁড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশ অত্যন্ত আধুনিক। ৩৫০ খ্রীঃ অব্দে লিখিত কালিদাসের রঘুবংশে যে বঙ্গের উল্লেখ আছে তদন্তর্গত আধুনিক পাটনা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি স্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশ "বঙ্গ" নামে পরিচিত, তাহা হুয়েন সাঙ্গের সময়ে পাঁচটী স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের নাম যথা :— (১) কামরূপ রাজ্য, (২) সমতট, (৩) কর্ণসুবর্ণ, (৪) পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ, ও (৫) তাম্রলিপ্ত।

* সমুদ্র পশ্চিম দিক হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছে এবং ঐ অপসরণহেতু এ অঞ্চলের অনেক গ্রামই ক্রমে জল হইতে উত্থিত হইয়াছে—Revision of the Boundary Commissioner's Lists of villages in the Province of Bengal.

চার্ব্বাক, কাপালিক, অগ্নিবাদী, চণ্ডালক, বৈখানস, পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি। তৎকালে এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম লোফ পাইতে বসিয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই সকল সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের কামরূপ রাজ্যে গমন।

ভগবান "শঙ্করাচার্য্য" যখন আপনার বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন, তৎকালে সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, শাস্তিরাম, গণপতি, আনন্দ গিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণ শঙ্কাচার্য্যের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তৎকালে "অভিনব গুপ্ত" নামে যে এক প্রোথিত নামা পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন। শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ তিনি শঙ্কর দেবের প্রাণ সংহারে কৃত-সংকল্প হন। এইরূপ জনশ্রুতি—অভিনব গুপ্ত তদ্বিষয়ে নিষ্ফল মনোরথ হওয়ায়, স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ অভিচার দ্বারা শঙ্কর দেবের উৎকট ভগন্দর রোগ উৎপন্ন করাইয়া দেন। এই সময়ে সনন্দন নামক তাঁহার জনৈক প্রধান শিষ্য "সিদ্ধ মন্ত্র" যপ করিয়া তাঁহাকে এই ভোগান্তিক রোগ হইতে মুক্ত করেন।

হিমালয়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ কেদারনাথ তীর্থে এই মহাপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তিনি ৩২ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কদাপি বেদের কোন মনগড়া অর্থ করেন নাই। তাঁহার প্রধান রচনা মোহমুদ্গর। ইহা সংসারে মোহনাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ।

জিতারী বংশ।

প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা "উত্তর কূল" ও "দক্ষিণ কূল" এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এই নদের উত্তরাংশ উত্তর কূল ও দক্ষিণাংশ দক্ষিণ কূল নামে অভিহিত হইত। গৌহাটী হইতে আরম্ভ করিয়া মিরি, মিসমিং জাতিদিগের আবাস ভূমি পর্য্যন্ত উত্তর কূলের সীমা ছিল, আর দক্ষিণ কূলের সীমা ছিল শদীয়া হইতে শ্রীনগরের পাহাড় পর্য্যন্ত। কাশ্মীর রাজ "ললিতাদিত্য" যিনি ৭১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তিনিই এই প্রাচীন কামরূপের "উত্তর কূল" রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন (Calcutta review 1867, P. 521). অসম বুরুঞ্জীতে তিনি কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য নামের পরিবর্ত্তে "পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রীয় জিতারী" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

বহির্জগতে ঈশ্বরজ্ঞানের অভিব্যক্তি।

(ডাক্তার সর্ গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রণীত "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লেখা ও ব্যাখ্যান" নামক মরাঠীগ্রন্থ হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

শ্বেতাশ্বতর, ১.১।

"হে ব্রহ্মবেত্তাগণ, এই সমস্ত বিশ্বের কারণ কি, আমরা কাহা হইতে হইয়াছি, কাহার দ্বারা আমরা জীবিত আছি, আমাদের প্রতিষ্ঠাভূমি কে, এবং সুখদুঃখসম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা আছে তাহা আমরা কাহা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইতেছি।"

শ্বেতাশ্বতর নামক এক উপনিষদের আরম্ভেই এই বাক্যটি আছে। যে কোন রাষ্ট্রমধ্যে যখন মনুষ্যের বিচারালোচনা করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, বুদ্ধির বিকাশ হইয়া মনোমধ্যে নানা প্রকার বিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনেক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়া তাহার পূর্ণ মীমাংসা করিতে মনুষ্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় এই বড় প্রশ্নটি সকলের আগে মনুষ্যের মনে স্বভাবতই উৎপন্ন হয়; এবং আপন-আপন বুদ্ধি অনুসারে উহার বিচার করিয়া তাহারা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের কোন কোন উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।

সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর, ১.২।

"কেহ বলে, কালই কারণ; কেহ বলে, যাহা চলিতেছে সে সমস্ত আপন স্বভাবের দ্বারাই চলিতেছে; কেহ বলে, ভবিতব্যতা বলিয়া এক অবশ্যস্থাবী নিয়ম আছে, তাহাতে করিয়া বিশ্ব চলিতেছে; কাহারও মতে, সমস্ত বস্তু আকস্মিক, অতএব আকস্মিকতাই কারণ; কাহারও মতে,—পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি ভূতই কারণ; কেহ বলে, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাই কারণ। অতএব এই বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। উহা হইতে জীবাত্মাকে এক পাশে রাখিয়া, অন্যগুলির মধ্যে এক একটি স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইতে পারে না। এই বিশ্বের মধ্যে কর্তৃত্বশক্তি, জ্ঞানশক্তি থাকিলেও সেই জীবাত্মাতেই আছে, অন্য কারণের মধ্যে নাই। আচ্ছা, জীবাত্মাকেই সকলের কারণ যদি বল, তবে ঐ জীবাত্মা দুর্ব্বল; কেননা, জীবাত্মা কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রাপ্ত হয়; এইজন্য জীবাত্মা স্বতন্ত্র নহে।" তবে বিশ্বের কারণ কি?

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর, ১.৩।

"তারপর, ঋষি ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন,—দেবরূপ যে আত্মা, সেই আত্মার বহির্দৃশ্য যে সমস্ত কার্য্য, তাহারই অভ্যন্তরে গূঢ় রহিয়াছে এক শক্তি, এবং আরও দেখিতে পাইলেন, কাল ও জীবাত্মা সমেত যে সকল কারণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, সেই সকল কারণের এক অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্যবস্থাসংস্থাপক আছেন"। ইহাই এই উপনিষদের অন্য স্থানেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথাহন্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর, ৬. ১।

"পরিমুহ্যমান্ কোন কোন পণ্ডিত,—স্বভাবই কারণ এইরূপ বলেন; আবার অন্য লোকে বলে, কালই কারণ। পরন্তু, এই যে ব্রহ্মচক্র সতত ভ্রমণ করিতেছে, তাহা দেবের মহিমাতেই ভ্রমণ করিতেছে।"

আমাদের মন অন্য বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিলে, মনের মূল সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়া, সেই সকল বিষয়যোগে, মনের উপর ভ্রান্ত সংস্কারসকল আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত থাকায় অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হয়। মনের মূল স্বরূপের উপর কামক্রোধাদি বিকারের একটা ঘন আবরণ আসিয়া পড়ে। এইজন্য, অন্তঃকরণরূপ মলিনীকৃত আদর্শে অনন্ত যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইবার যে স্বাভাবিক সামর্থ্য তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর মানুষ, নানা প্রকার কুতর্ক অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত আপনা-আপনি চলিতেছে, সমস্তই আকস্মিক, ইহার শাস্তা কেহ নাই,—ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু বিষয় ও কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির প্রলেপ বিধৌত করিয়া মনুষ্য যদি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে অবশ্যই পরমেশ্বরের উন্নতস্বরূপ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং ঐ ঋষির উক্তি অনুসারে সে বলিতে থাকে যে, "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্", "বাদবিবাদকারী শাস্ত্রবেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেবের মহিমাতেই চলিতেছে।"

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

শ্বেতাশ্বতর, ১৭. ৪।

"সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা, মহান্ আত্মা এই দেব মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে সদা অবস্থিত।" তাই, এই বাহ্য জগতের কোন পদার্থের জ্ঞান কিংবা কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বরের সম্বন্ধীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। যেরূপ, বহু বৎসর পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট কোন বস্তুর সংস্কার আমাদের অন্তঃকরণে থাকে, কিন্তু সেই বস্তুর স্মরণ আমাদের সর্ব্বদা মনে হয় না; যখন সেই সংস্কারের অভিব্যঞ্জক ঘটনা, অর্থাৎ পুনরপি সেই সংস্কার জাগৃত কিংবা অভিব্যক্ত

নিম্নে এই রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

১। কামরূপরাজ্য—যোগিনী তন্ত্রে এই রাজ্যের যে সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ আছে, "ত্রিদশ যোজনম্ বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনং, কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুক্তমং"। যোগিনীতন্ত্রের জন্মকাল পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ১ম চন্দ্রগুপ্ত বা ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র "সমুদ্রগুপ্ত" (৩) যিনি পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এলাহাবাদে তদীয় প্রস্তরস্তম্ভ লিপি (Pillar stone inscription) তে কামরূপের নাম পাওয়া যায়:—সমতট, ডবাক (৪) কামরূপ, নেপাল কর্ত্তৃপুরাদি (৫) প্রত্যন্ত নৃপর্তিভি র্মালবার্জ্জুনায়ণ যোধেয় মাদ্রকাভির প্রার্জ্জুন সনকাকানিক কাক খরপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্ব করদানাজ্ঞাকরণ প্রণাম গমন। (Corpus. Ins. Indi :, Vol. III, P 8.)

২। সমতট—সমতট শব্দের অর্থ তীরবর্ত্তী বা সমতল দেশ। বর্ত্তমান সুন্দর বনের কিয়দংশ ও পূর্ব্ব বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান। হিন্দু-জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের "বৃহৎ-সংহিতা নামক গ্রন্থে সমতটের উল্লেখ দেখা যায়। "সি-ইউ-কি নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতটে গমন করিয়াছিলেন।" এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ লিপিতেও সমতটের উল্লেখ (উপরোক্ত স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য) রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু সমতটকে বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম অনুমান করিয়া (বাঙ্গালার ইতিহাস ৬ষ্ঠ পরি-পরিচ্ছেদ, ৪৮ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের ইহাই যে মত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। "সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্ত্তমান প্রোম) কমলাঙ্ক (বর্ত্তমান পেগু) ইত্যাদি" ইহা তিনি লিখিয়াছেন (বাঙ্গালার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৯৫ পৃঃ)। এই যে "প্রোম বিশেষতঃ পেগু" এগুলি কি কুমিল্লার পূর্ব্বে! অতএব তাঁহারই উক্তিতে "সমতট" কেমন করিয়া কুমিল্লা হইতে পারে? বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন সমুদ্রকুলবর্ত্তী তট-ভূমিতে কোথায়ও গাছ পালা জন্মিয়াছে, কোথাও বা জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়; এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল বলিয়াই সমতট নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

৩। কর্ণসুবর্ণ—পশ্চিম বঙ্গ। বর্ত্তমান হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত "রাঙ্গামাটী" কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ—বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের মতে সূর্য্যবংশীয় বলিরা ার অন্যতম পুত্র "পুণ্ড্র" এই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এ দেশের নাম "পৌণ্ড্র" দেশ হইয়াছে। ইহার প্রাচীনতম রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধণপুর। খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত "কল্পসূত্র" নামে সুপরিচিত জৈন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। চৈণিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গের আগমন কালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ দেশ চতুর্দ্দিকে ৪০০০ লি ও ইহার রাজধানী "পৌণ্ড্রবর্দ্ধণপুর" চতুর্দ্দিকে ৩০লি (প্রায় ৫ মাইল) ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। হর্ষচরিতে যে শশাঙ্কের* কথা উল্লেখ আছে তিনি গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে গৌড়ের অপর নাম

(৩) সমুদ্রগুপ্ত—ইহাঁর পত্নীর নাম "দত্তদেবী।" এই দত্তদেবীর গর্ভে "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি শ্রীমতী "ধ্রুব দেবী"র পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪) ডবাক—শ্রীযুক্ত স্মিথ (V. A. Smith) বগুড়া জেলার প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমান করেন।

(৫) কর্ত্তৃপুর—শ্রীযুক্ত স্মিথের মতে জালান্দার জেলার বর্ত্তমান কুমায়ণ, আলমোরা, গাড়োয়াল, কংগ্রা প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন "কর্ত্তৃপুর রাজ্য গঠিত ছিল।

* শশাঙ্ক—রাখাল বাবুর মতে "হুয়েন সাঙ্গ" শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথচ এই হুয়েন সাঙ্গ কথিত শশাঙ্ক সম্বন্ধে অপর কয়েকটী তথ্য (বাঙ্গালার ইতিহাস ৮২ পৃঃ) কর্ণসুবর্ণ ও হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস বিশ্বাস করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী নহে।

ছিল "পুণ্ড্রবর্দ্ধণ"। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এখানে "জয়ন্ত" নামে একজন পরাক্রমশালী নরপতি রাজত্ব করিতেন। তদীয় রূপ লাবণ্যবতী দুহিতা "কল্যাণ দেবী"র সহিত কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ রাজা জয়াদিত্যের বিবাহ হইয়াছিল।

৫। তাম্রলিপ্ত—বর্ত্তমান মেদনীপুর প্রভৃতি জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল। তাম্রলিপ্ত এক্ষণে "তমোলুক" নামে পরিচিত। এই তমলুকের বহুসংখ্যক প্রাচীন নাম পাওয়া যায়ঃ—(১) তাম্রলিপ্ত (ইতি মহাভারতম্), (২) তামলিপ্তী, (ইতি ভারতকোষ), (৩) বেলাকুলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা (ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ) (৪) দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং (ইতি হেমচন্দ্রঃ), (৫) তমোলিপ্তী (ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ), (৬) তমোলিপ্ত (ইতি রত্নাকরবলী) প্রভৃতি।

চতুর্থ বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালা ও আসাম আক্রমণ।

চালুক্যরাজ জয়সিংহের পুত্র "১ম সোমেশ্বর সিংহ" যিনি বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের "কল্যাণী" নগরে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তর করতঃ ১০৪৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৬৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপুত্র "৪র্থ বিক্রমাদিত্য" তাঁহার জীবদ্দশায় চোলারাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন। পিতার লোকান্তর গমনে তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা "সোমেশ্বর সিংহং" সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। তদীয় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি এরূপ একজন অমিত পরাক্রমশালী নৃপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন যে "বঙ্গ ও আসাম" প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

এই ভারত ভূমিতে আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটীত হইতে দেখা যায়। এখানে যত সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোন অংশে তত আছে কি না সন্দেহ। পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের বিলোপ সাধনার্থ কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উত্থান হইল, কিন্তু এই ধর্ম্মের সংঘর্ষণে কোন ধর্ম্মই অস্তিত্ব রক্ষণে সমর্থ হইল না। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্ম (৬) ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ও বেদদ্বেষী ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের আবির্ভাব হইল। হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্রেও বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম লোফ পাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নানাধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখা দিল। তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত কালাদি (ক্যালদি) গ্রামে ভগবান শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই ক্যালাদি গ্রাম পূর্ণ নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে তিনি ৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে আবির্ভূত হন। কিন্তু বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৭) নাম্বুরী বংশে তাঁহার জন্ম হয়, এইজন্য নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশ গরিমায় গরিয়াণ। শঙ্করাচার্য্যের পিতার নাম "শিবগুরু," মাতার নাম "সতী দেবী" মতান্তরে সুভদ্রা। শঙ্কর বিজয় সংগ্রহ (পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত) অনুসারে শঙ্করের পিতার নাম "বিশ্বজিৎ", মাতার নাম "বিশিষ্টা"। শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ মত ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মত খণ্ডন করায় ভারতে পুনর্ব্বার বৈদিক মত ও সাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। দাক্ষিণাত্যের "চেলা"-গণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিতে সক্ষম হন। কাঞ্চি চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টিয় ষষ্ট শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাঞ্চী নগর শাস্ত্র চর্চ্চা ও বিদ্যা বিষয়ক গৌরবের জন্য ভারতের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী দিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই সকল সম্প্রদায়ের নাম যথাঃ—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন্য, সৌর, গাণপত্য, শূন্যবাদী (৮) নাস্তিক,

(৬) বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার বেদবিহিত নহে; তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না; বর্ণাশ্রম বিধানও তাঁহারা পালন করেন না।

(৭) সাহিত্য ১৩০৬ চৈত্র সংখ্যা "শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৮) শূন্যবাদী বলেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে একাধারে শূন্য ছিল। ঈশ্বর ছিলেন না, তাঁহাকে কিছুই সৃষ্টি করিতে হয় নাই। ইঁহাদের মতে কিছুরই সত্বা ছিল না"।

করে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে, তখনই স্মরণ হয়; সেইরূপ মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে স্বভাবতই পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের সংস্কার আছে; কিন্তু সেই সংস্কার, বাহ্যজগতের জ্ঞান কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ কোন মানসিক বস্তুর জ্ঞান হইলে তবেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, ঐ বস্তু সেই সংস্কারের অভিব্যঞ্জক। বাহ্যজগৎ অর্থাৎ আধিভৌতিক বিষয় হইতে ঈশ্বর-বিষয়ক সংস্কার কিরূপে অভিব্যক্ত হয়, প্রথমে সেই বিষয়ে আমরা বিচার করিব।

জগতের মধ্যে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার দ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের প্রত্যয় না জন্মে। সকলের মধ্যেই আশ্চর্য্য রচনা আশ্চর্য্য যোজনা, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। কোন রমণীয় পুষ্পদর্শনে কতই গম্ভীর চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হয়! কিন্তু মনুষ্যের স্বভাবই এই, কোন পদার্থের অতিপরিচয় হইলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ লক্ষ্য করা যায় না। সেই বিষয়ে মনুষ্য অন্ধই থাকে। সেই পদার্থ হইতে মনের উপর যে ছাপ পড়িবার কথা, তাহা পড়ে না। কিন্তু এই জগতের মধ্যে এমন কতকগুলি বড় বড় পদার্থ আছে, এরূপ দৃশ্য আছে যে, অতিপরিচয়েও তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে অন্ধতা উৎপন্ন হয় না কিংবা তাহাদের অতিপরিচয় আদৌ হয়ই না। যখন তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তখন অন্তঃকরণের মধ্যে উন্নত চিন্তা সমুদিত হইয়া, আমাদের মনোবৃত্তি বিস্মিত ও সমুৎসুক হয়।

কোন মনুষ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে যদি দৃষ্টিপাত করে এবং দেখিতে পায়—যতদূর দৃষ্টি যায় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ সমান চলিয়া গিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে কিংবা অতি উচ্চ খাড়া খাদ সম্মুখে কিংবা নীচে বৃহৎ গভীর উপত্যকা রহিয়াছে কিংবা এক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এক বড় নদী উপত্যকার মধ্যে অতিশয় বেগে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাহার পথরোধী বৃক্ষপাষাণাদি সহসা উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে; অথবা, সমুদ্রের নিকটস্থ এক পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া যদি দেখে, সূর্য্যের উদয়ে সমুদ্রের সমস্ত জল তরল রজতের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে, কিংবা নৌকাতে যাইবার সময় দেখিতে পায় সমুদ্রের তরঙ্গরাজি খুব জোরে শিলার উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, কিংবা অনেক দূরে গিয়া জমি দেখা যাইতেছে না, কেবলই জল, জলের আর অন্ত নাই, অথবা সূর্য্য নিজ দেদীপ্যমান প্রখর তেজে সমস্ত পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিতেছে, কিংবা বর্ষাকালে সমস্ত বায়ুমণ্ডল ক্ষুব্ধ হইতেছে, প্রচণ্ড বায়ু নিজ বেগে গাছপালা উপড়াইয়া ফেলিতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তৎসহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন হইতেছে, অথবা রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শান্ত কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে,—এই সমস্ত দৃশ্য দেখিলে, বিস্ময়, ঔৎসুক্য, আনন্দ, শান্তি, পূজ্যত্ব-বুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভাব তাহার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শান্তি, অনন্ত গাম্ভীর্য্য, অনন্ত মহিমার জ্ঞান স্পষ্টরূপে ও সহজভাবে উদিত বা অভিব্যক্ত করিবে এবং পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপও তাহার নেত্রসমক্ষে আবির্ভূত হইবে। সেইরূপ আবার, সমস্ত জগতের মধ্যে যে আশ্চর্য্য যোজনা চারিদিকে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা দেখিয়া কোন মনুষ্যের সহজেই বিশ্বাস হইবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা অনন্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। এই ব্রহ্মচক্র এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই চলিতেছে। সমস্ত ঘটনা হইতেই কোন-না-কোন প্রকার ভাল পরিণাম উৎপন্ন হইতেছে, সেই সব ঘটনা আকস্মিক নহে। সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের উপর জলের বাষ্প জন্মিয়া, তাহা বায়ুমণ্ডলে গিয়া অদৃশ্য হইতেছে। কিয়ৎকালের মধ্যে, শীতল বায়ুর সমাগমে আবার উহা জলের রূপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং উহাই মেঘ হইয়া বায়ুতে তরঙ্গিত হইতেছে। এই মেঘ বায়ুযোগে সমুদ্র হইতে দূরে যাইতেছে; তার পর, বৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে। ঐ বৃষ্টির জল মাটিতে মিশিয়া গেলে মাটি ও জলের এমন একটা অবস্থা হয় যে, মাটিতে যে বীজ থাকে মাটি ও জল উভয়ই তাহার পোষক হয়, এবং সেই বীজ হইতে পরম গুহ্য অপরিজ্ঞেয়রূপে অঙ্কুর জন্মে; তার পর জল ও মাটি ঐ অঙ্কুরকে

আপন যোগ্য রূপ দিয়া থাকে; কেন ও কি শক্তি অবলম্বন করিয়া এরূপ হয় তাহা গুহ্য; এবং অঙ্কুর হইতে চারা হয়। এইরূপে চারা বড় হইয়া তাহাতে ফুল হয় এবং তাহার মধ্যে ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই ধান্য কিংবা সেই চারার অন্য অবয়ব মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর উদরস্থ হইলে উহা আর এক আশ্চর্য্য রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই পদার্থ হইতে রক্ত হইয়া ঐ রক্ত সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া তাহা হইতে অস্থি মজ্জা স্নায়ু ইত্যাদি শরীরের যে সকল অংশ, তাহার বৃদ্ধি হয় এবং সেই প্রাণীদিগের দেহ বর্দ্ধিত হয়। এবং ঐ ধান্যকে কিংবা তৃণকে রূপ দিবার জন্য সেই প্রাণীদিগের উদরে কতই যোজনা আছে! প্রথমতঃ মুখের মধ্যে লালা বলিয়া যে পদার্থ আছে তাহার যোগে সেই অন্ন নরম হয়। তার পর জঠরের মধ্যে, পিত্তাশয়ের মধ্যে এবং অন্য অবয়বের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইয়া সেই অন্নে মিশ্রিত হয় এবং উহা হইতে সেই অন্ন যোগ্য রূপ প্রাপ্ত হইলে জঠর ও যন্ত্রাদি তাহা শোষণ করে। এইরূপ অনেক চমৎকার প্রকরণ আছে। প্রাণীদিগের দেহমধ্যে যে সমস্ত অবয়ব আছে তাহারা পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ এবং সমস্ত মিলিয়া পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে; এবং শাস্ত্রবেত্তারা বলেন, এই প্রকার যোজনা সমস্ত জগতেই দেখা যায়। এই বিষয়ের বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জাগতিক শক্তির একজন যোজক বা প্রয়োগকর্ত্তা আছেন, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আজকাল, পৃথিবীর পূর্ব্ব-অবস্থা সম্বন্ধে ও আকাশের গ্রহনক্ষত্রসম্বন্ধে মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা এই শক্তির অচিন্ত্যনীয়তা এবং এই যোজনাসম্বন্ধে দূরদর্শিতা অধিক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া মনুষ্যের বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর উপর বনস্পতি ও প্রাণীর সৃষ্টি হয় নাই। তখন পৃথিবীর উদরে অগ্নি এখন অপেক্ষা অধিক প্রজ্বলিত ছিল, তাহারই যোগে সমস্ত ধাতু গলিয়া কতকটা বায়ুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর সেই বায়ু খুব জোরে পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরস উপরে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল এবং এইরূপ সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে শীতল হইয়া সেই ধাতুরস এক্ষণে পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর সেই অগ্নি যেমন যেমন নিবিতে লাগিল, তদনুসারে বনস্পতি ও প্রাণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রথমে প্রকাণ্ড শতহস্ত উচ্চ ও খুব চওড়া বৃক্ষ পৃথিবীর উপর ছিল। এক্ষণে খনির ভিতরে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা এই বৃক্ষই, কালক্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর নূতন স্তর পড়িয়া চাপা পড়িলে উহা হইতেই এই কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর, বড় বড় সর্পাকৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইল এবং এইরূপ ক্রম কোটি বৎসর চলিয়া তাহার পর মনুষ্যের সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত ভূমির উপর পৃথ্বী আদি যে মহাভূত ছিল তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, এই সমস্ত প্রকারভেদ সিদ্ধ হইল। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি বিষয় যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই যে, যে সকল নূতন রূপ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বরূপ অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ উত্তরোত্তর এই পৃথিবীতে চৈতন্য, সত্য, প্রভৃতির অধিক বিকাশ হইয়া জড়তা, তম প্রভৃতির হ্রাস হইতেছে। এইরূপ ক্রম চলিয়া, পরে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ মানবাদি কি আশ্চর্য্য রূপ প্রাপ্ত হইবে তাহা সর্ব্ব-সত্তাধার ভগবানই জানেন। এইটুকু মাত্র স্পষ্ট জানা যায় যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম সততই চলিতেছে। সেইরূপ আবার, যে পৃথিবীকে আমরা এত বড় বলিয়া মনে করি, তাহা অপেক্ষা বৃহস্পতি গ্রহ ১৪৩৬ গুণ বড় এবং সূর্য্য ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়! অচল তারা সকল এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের যে প্রায় ৯ কোটি বিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান আছে, তাহা প্রত্যেক তারার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এবং দূরস্থ অন্য যে সকল তারা আছে, তাহাদের বৃহত্ত্ব ইহাদের অপেক্ষাও বেশী। এইরূপ তারা অসংখ্য আছে। এবং পৃথিবী হইতে ইহাদের ব্যবধান পরার্দ্ধ মাইল অপেক্ষাও অধিক, গণনার মধ্যেই আনা যায় না এত বেশী। অতএব, এই বিশ্বজগৎ কি বিশাল, এই বিশ্বাধিপতি জগদীশ্বরের

কি শক্তি, কি অগম্য তাঁহার লীলা! এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী কি ক্ষুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রজলের এক বিন্দুর যেরূপ গণনা, বিশ্বজগতের মধ্যে পৃথিবীর সেইরূপ গণনা। তার পর, আমরা মানব কি ক্ষুদ্র! যুগযুগানুক্রমে সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে চলিয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, এবং ঐ উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকারেই শুভ; এই সমস্ত বিচার করিলে, পরমেশ্বরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বিস্ময় ও পূজ্যত্ব-বুদ্ধি আসিয়া অন্তঃকরণকে অধিকার করে; এবং মনুষ্যের অভিমান সর্ব্বথা শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

ভৌগোলিক পরিভাষা গঠনে পণ্ডিতদিগের অভিমত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

আজ প্রায় ৩৭ বৎসর হইল, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে সারস্বত-সমাজ নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের অগ্রণীমাত্রেই এই সভার সভ্য ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সভার ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনে উপস্থাপিত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তিনজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতামত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমানকালে সাধারণের কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে এবং বঙ্গের সাহিত্যিক জগতের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনায় প্রকাশ করিলাম।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত।

উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় "সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া" এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও তাহার নিম্নে তাঁহার স্বাক্ষর দেখিতে পাই না। উক্ত মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোলগ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরুমধ্যস্থান কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে "সঙ্কট" শব্দ, স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, Channel, Mountain-pass সমস্তই বুঝায়।

অনেক গ্রন্থকার Strait শব্দের স্থলে "প্রণালী" ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে জল-নির্গমপথ বুঝায়। প্রণালী—অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsula কে বাঙ্গলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপ বলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়। অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝা যায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত-সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখন এটা হয় কখন ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান্ বলিয়া থাকে। বিভক্তি শুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলার এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত, এবং কোন্ গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা-বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ-সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলা অনেকে হয়ত ইহার বিপরীতাচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলাগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ

করিতে হইলে তাহাকে White-mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White-mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলাগিরির অনুবাদ করিতে হইলে, তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়—অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটা নিয়ম স্থির না থাকিলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক শব্দের এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত—কিন্তু তাহার উপায় নাই—কারণ অনেক শব্দ এখনো প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারি জন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

স্বনামধন্য ৺রাজনারায়ণ বসুর অভিমত—

দেওঘর ৪ আষাঢ়, ৫৪।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত সমাজ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

আপনার প্রেরিত "ভৌগোলিক-পরিভাষা" বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ডবেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণ তন্ত্রের লোক; কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "irritabile vates trition"। আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা—উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অন্তরীপ, উদস্থান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই তিন খানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে—তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তাহারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম; Channel শব্দ কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়; তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বর সূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুনশ্চঃ উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের কথা উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতির শব্দও ভুক্ত থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

খিদিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ পজিটিভিষ্ট ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের অভিমত—

খিদিরপুর ৬ই জুলাই ১৮৮৩।

সবিনয় নিবেদন।

ভৌগোলিক-পরিভাষাবিষয়ক বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিবার যোগ্য নহি। বাস্তবিক আমি এখনকার গ্রন্থে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা জানি না। সুতরাং শব্দ নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে দুরূহ কার্য্য।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গভাষাতে Etymology সংক্রান্ত নিয়ম করিতে আমি ইচ্ছা করি না। লেখকেরা স্বভাবতঃই মনের কথা ব্যক্ত করিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অন্ততঃ আমার মত হতভাগ্য আরো দু-দশ জন আছে মনে করিয়া এই কথা বলিলাম। সুতরাং তাহাদের হাতে আরো হাতকড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সত্য কথা বলিলে মূর্খ বলিয়া যদি ঘৃণা না করেন তবে বলিতে

পারি যে বিজ্ঞাপনের ৩ পৃষ্ঠার নিয়মগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সভাপতি মহাশয়ের ইংরাজি পুস্তিকা একখানিতে ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম পড়িয়াছিলাম। তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি কি পর্য্যন্ত হইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালা বুঝিবার জন্য আমাকে ইংরাজ দোভাষির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ইহা মনে করিতেও কষ্ট বোধ হইল।

উদাহরণস্থলে বলিতে পারি যে "মানচিত্র" শব্দের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তথাচ আমার বয়সে মনে মনে কোন চিন্তা করিবার সময়ে কখনই যে "নকসা" ছাড়িয়া "মানচিত্র" শব্দ প্রয়োগ করিব তাহা সহসা মনে করিতে পারি না। "নকসা" শব্দের প্রতি অনেক আপত্তি আছে। তথাচ আমি যদি কাহাকেও কোন কথা বলিতে যাই, যথা—"২৪ পরগণার নকসাটা আন" তবে এইরূপ ব্যতীত বলিব না। লিখিবার সময়ে মনের কথা ভাষান্তরিত করিতে হইলে অনেক গুরুতর ক্ষতি হয়। "ছাড়া" শব্দ মনে করিয়া ব্যতীত শব্দ লেখা দোষের কিনা সন্দেহের স্থল; কিন্তু "নকসা" শব্দ মনে করিয়া "মানচিত্র" লিখিতে হইলে আমার আপত্তি থাকিবে!

আমার বিবেচনাতে সারস্বত সমাজ যদি একটি ফর্দ্দ ছাপাইয়া দেন যে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অমুক অমুক ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এই এইরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে তন্মধ্যে অমুক অমুক প্রতিশব্দ এই এই কারণে পরিত্যাজ্য——তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারিবে।

লেখকের ইচ্ছা শাসিত করা অসাধ্য; এবং বাঞ্ছনীয় কি না সন্দেহের স্থল। পরন্তু যে স্থলে লেখকের তেমন প্রবল ইচ্ছা থাকে না; লেখক কেবল শব্দ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন সেখানে তাঁহার সহকারীতা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত বটে এবং তন্নিমিত্ত একাধিক শব্দ যোগাইয়া দিলে কোন স্থায়ী ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ পরিভাষা বৃদ্ধি জন্য দোষ মনে হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের অভিরুচি অনুসারে শব্দ-নির্ব্বাচন-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইবে।

উপসংহারস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি বিজ্ঞাপনের লিখিত প্রতিশব্দ ধরিয়া আমাকে ভোট * দিতে হয় তবে প্রতি প্রস্তাবে কত amendment উপস্থিত হয় তাহা দেখা আবশ্যক হইবে। আর যদি সভাপতিমহাশয়ের নিজের নির্ব্বাচন বলিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় এই যে তাঁহার নাম দিয়া নির্ঘণ্টটী প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে যত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ পারদর্শী তাহা সকলেরই বিদিত আছে। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে শব্দ প্রয়োগ করিতে, বিশেষ কারণ ব্যতীত কাহারই আপত্তি থাকা সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু সারস্বত-সমাজের নির্ব্বাচন বলিয়া নির্ঘণ্টটী প্রকাশ করিলে অনেক কথা উঠিতে পারে এবং অন্ততঃ আমার মনে সভাপতিমহাশয়ের নামের গৌরব অনেক পরিমাণে dilute হইয়া যাইবে। নিবেদনমিতি—

বশম্বদ

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

* আমি সারস্বত-সমাজের ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া 'ভোট' শব্দ ব্যবহার করিলাম। কেহ যেন উপেক্ষা মনে না করেন।

এই সারস্বত সমাজ একসময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সমাজের উপরোক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

Brahma Dharma.

CHAPTER II.

1. In the beginning, before creation, there was only the one true Parabrahma, and naught else beside Him; even after creation, all things, animate and inanimate, exist by virtue of His protection; hence is He called the one without a second. He is the absolute One and only existent; He is conscious; He knows Himself; hence is He called the Soul. But that Soul is not finite like our souls; to explain this, it is again said that He is the Great soul, birthless, ageless, deathless, eternal, and without fear. From Him, and by His will, creature-souls are born with limited powers, and by His will they live under His protection, and will so live as long as He so wills— Not such is the nature of Parabrahma; He is self-born, self-poised, eternal, and perfect.

2. Before creation there was naught else but Parabrahma, hence He did not create, like a maker, with the help of any

other thing. He considered the act of creation, and after thus considering, He created all that there is. We can make a particular object with earth, stone, iron— or other things, but this cannot be called *creation.* Creation means evolving a thing out of one's own will, without the aid of anything else. Hence we do not possess the power of creating anything. To Parabrahma alone belongs the power of creation; He alone, by His natural faculty of wisdom has created this wonderful machine of the universe with all things animate and inanimate.

3. Water, air, and fire, together with all materials for making the universe;— life, mind, and all the senses,—these have all been created by the will of that Almighty and perfect Being.

4. In obedience to the will of the all-ruling supreme Lord, the fire gives heat, the sun shines, the clouds pour forth rain, the wind blows, and death stalks abroad. Nothing can escape His will and His sway: sun and moon, stars and planets, water and air, through fear of Him speed on their appointed tasks,—inanimate though they be.

বঙ্গসাহিত্যে বর্দ্ধমান।

(শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী)

মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজ নিম্নলিখিত একাদশটী কুসুমমালিকা বঙ্গভাষার শ্রীকণ্ঠে পরাইয়া বাণীর আরাধনা করিয়াছেন; (১) বিজয় গীতিকা (১ম ভাগ) (২) বিজয়গীতিকা (২য়) (৩) শুকদেব (৪) কমলাকান্ত (৫) চন্দ্রজিৎ (৬) একাদশী (৭) ত্রয়োদশী) (৮) পঞ্চদশী (৯) কতিপয় পত্র (১০) আবেগ (১১) বিজন বিজলী।

ইহাদের মধ্যে নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনাই আছে, আমরা স্থানাভাববশতঃ সকলগুলির বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকগুলির বহিঃসৌন্দর্য্য তাহাদের অন্তঃসৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ। চিত্রসম্পৎ সুবহুল, এবং তাহাদের মাধুর্য্যও' উপভোগ্য। পুস্তকগুলি প্রিয়জনকে উপহার দিবার এবং লাইব্রেরীতে রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এ কথা বিশেষভাবে বলা বাহুল্য। এই পুস্তকগুলির মুদ্রণকার্য্যে কে, ভি, সেন কোম্পানিও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদের কথা আমাদের দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত। কথাটার মূলে সত্য কিছু থাক আর নাই থাক, আমরা কিন্তু বাস্তব জগতে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহাদের উপর বাণীর করুণা বড় প্রকাশ পায় না, আবার যাঁহারা বাণীর প্রিয়পুত্র তাঁহাদের উপর লক্ষ্মীর সুদৃষ্টিরও সেইরূপ বড় অভাব; কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক এক জন সৌভাগ্যশালী পুরুষ দেখা যেন—যাঁহাদের নিকট হইতে পূজার পূত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই পরস্পরের বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন।

মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার সাধনমন্দিরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আরাধনা যুগপৎ তুল্যরূপেই করিতেছেন বলিয়া ইহাঁর উপর তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণেই পড়িয়াছে। মহারাজ যে সত্য সত্যই প্রগাঢ় হৃদয়ানুরাগের সহিতই বাণীর উপাসনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অভিনব সাহিত্যরচনার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই একটা নিজত্ব বেশ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল এইরূপ স্বতন্ত্রতার বড় অভাব। এখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু রচনা করিতে যাওয়া বড় শক্ত কাজ। বিশেষতঃ যাঁহারা কবিতা লেখেন তাঁহাদের বিপদ তো পদে পদে। কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাজ তাঁহার গদ্য বা পদ্য কোন রচনাতেই নিজের বিশেষত্বটুকু হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার কবিতাগুলির আর একটী বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে তাহার কোথাও অস্পষ্টতার একটু লেশও নাই; সর্ব্বই তাঁহার সরল প্রাণের সহজ সুন্দর উক্তি, কোথাও জ্ঞানে সমুন্নত

কোথাও বা ভক্তিতে গদগদ হইয়া আসিয়াছে। যখন তাঁহাকে ভগবানের উদ্দেশে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে শুনি, তখন সে কাতর প্রার্থনা আমাদেরও হৃদয়তন্ত্রীকে আসিয়া তেমনি ভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, কোথাও একটু বাধা পায় না।

যেটুকু বলিতে চাই সেটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারাই হইতেছে লেখকের একটা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। তিনি যদি অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়া বক্তব্যটুকুর সবখানি পাঠককে নিঃশেষে বুঝিতে না দেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের শক্তিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজ যে কয়েকটী পবিত্র কুসুমগুচ্ছে বঙ্গবাণীর চরণপদ্ম অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটীরই সুবাস অতি মনোরম; প্রত্যেক গ্রন্থই পবিত্র ভাবের উৎস; পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা বুঝি, আমাদের এই চিরপরিচিত রূপ-রস-গন্ধময়ী পৃথিবীর স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া উন্নত কোন্ জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্মলোকে ভ্রমণ করিতেছি। সাধনপথের, অধ্যাত্ম মার্গের এমন সব উচ্চ ভাব লইয়া গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে যে, এ গুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভিনব সম্পৎ বলা যাইতে পারে। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আর নাট্যসাহিত্যের প্লাবন আসিয়াছে বলিলে বোধ হয় বেশী কিছু বলা হয় না; কিন্তু তাহার মধ্যে কয়খানি পুস্তকে এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পাই? গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখক কেবল যে উপনিষদ বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সদ্ভাবগুলি প্রাণের মধ্যে মিশাইয়া লইতে পারিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে সেই প্রাচীনকাল হইতেই নানা কথা-কাটাকাটি হইয়া আসিতেছে; আজিও তাহার বিরাম হয় নাই; গ্রন্থকার কিন্তু এই দুরূহ মায়াবাদ একটী কথায় আমাদের বুঝাইয়া দিলেন,—

"মায়া কিরে? মায়া কেরে?
সে তো তাঁর ছায়াটারে।"

জ্ঞানের ভাস্বরতার সহিত ভক্তির স্নিগ্ধতার শুভ সম্মিলন যাঁহাতে না ঘটিয়াছে তিনি কখনই এরূপ জটিল দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা এত সহজে করিতে পারেন না।

ভক্ত কবি গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন,—

"করুণার তব কিনারা নাই।
প্রতিকাজে তাই তোমারে পাই॥"

যিনি সাংসারিক জীবনের পুঞ্জীভূত তুচ্ছ নীরস কর্ম্মরাশির মধ্যে ভগবানের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভ করিয়া সেই কর্ম্মরাশিকে সরস, শ্যামল, মহনীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই তো এই মরণশীলা পৃথিবীর বক্ষে অমৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। এই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তো জগতের এই মরণশীল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে একদিনের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাই তিনি "আমার কর্ত্তব্য" স্থির করিয়া বলিতে পারিয়াছেন,—

দেখহে দয়াল যেন কোন ত্রুটী নাহি করি।
কর্ত্তব্য পালন যেন সদা করে' যেতে পারি॥
দারা, সুত, দুহিতারে, স্বদেশ, আত্মীয়, পরে,
সকলে সেবিয়া যেন তব পুণ্য নাম স্মরি।
যে সুখ জীবনে নাই, সে সুখ আকাঙ্ক্ষা নাই,
কিছু নহে, কিছু নাই, তোমা শুধু চাই হরি॥

তাই তো অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে চির-লালিত হইয়াও তিনি যুক্তকরে ভগবানের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"শিখালে কেমনে মোরে ডাকিতে তোমার নাম।
শত প্রলোভন মাঝে যাচিতে হে মোক্ষধাম॥"

প্রকৃত ভক্ত ছাড়া এমন কথা আর কাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে? এই প্রকার ভক্ত লেখকের হস্ত হইতেই চন্দ্রজিৎ নাটক বাহির হইতে পারে। অতি সুন্দর ভাবে তিনি এই গ্রন্থে বলিদানের অযোগ্যতা এবং অহিংসা ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। এই নাটকখানির প্রকাশ্যভাবে অভিনয় দেখাইলে ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

গ্রন্থকারের কবিত্বের আর একটু নমুনা না দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি "সুখ ও দুঃখ" কবিতায় বলিতেছেন—

দুঃখ সুখ ভিন্ন ভাবি দুঃখ পাই অকারণ।
একেরই দুই দিকে দুটী নাম সংযোজন॥

আজি যাহা সুখকর, তাই কিছু দিনান্তর,
বোধ হয় বিষময়, ইহা দেখি অনুক্ষণ।
তুমি যারে তপ্ত বল, অন্যে ভাবে সুশীতল,
সুখ দুঃখ অবিকল, এইরূপ বিবেচন।
সুখ বলে যারে মানি, সেই আনে দুঃখ টানি,
বোধ-সূত্রে দুই ধারে, দুটীর আছে বন্ধন।
সুখ প্রতি অনুরাগী, বিচলিত দুঃখ লাগি.
কল্পনার কষ্টভাগী, এ নিখিল জীবগণ।

কি সুন্দর! কি সরল ভাষায় সুখ ও দুঃখের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে সকল কবিতা গুলিই আমাদের সমান ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার "একাদশী" গ্রন্থে কেমন বলের সহিত বলিয়াছেন,—

মোহের সাগরে, ডুবা'তে আমারে, অনায়াসে আর
পারিবে না।
নিষ্কাম করমে, গেঁথেছি মরমে, তায় বাধা কেহ
করিবে না॥
আমি তো দেখেছি, শিখেছি, বুঝেছি, মায়ার ধার তো
ধারিব না।
অন্তহীন হ'ব, অনন্তে মিশিব, আঁধারে তো আর
ডরিব না॥

নিজের সাধনের লক্ষ্য স্থির করিয়া কেমন সহজে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

অনন্ত সুষুপ্তে করিনা ভাবনা।
অনন্ত জাগ্রতে সদাই বাসনা॥
অনন্তের তরে, অনন্তের সুরে,
অনন্তের স্বরে, গাহিতে কামনা।
অনন্ত করমে, অনন্ত মরমে.
অনন্ত চরমে, এইত সাধনা॥

তাঁহার "আবেগ" গ্রন্থের বলিতে গেলে প্রত্যেক কবিতাই শান্ত গাম্ভীর্য্যে ও ধর্ম্মভাবের পবিত্রতায় মাখা। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে তাঁহার গুরুদত্ত "বিজয়ানন্দ" নাম লওয়া সার্থক হইয়াছে।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

বিলাতে ধর্ম্মঘট। বিলাতে নানাবিধ ধর্ম্মঘটে বিলাতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাত এখন একটা মহান ঘাতপ্রতিঘাতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই সেদিন মহাসমরের ভীষণ আঘাত গেল, আজ আবার ভীষণ ধর্ম্মঘটের আঘাত। এইরূপ আঘাতের পর আঘাতের বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমাদের ধারণা যে ভগবান বিলাতবাসীকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্যই এত আঘাত দিতেছেন। যে মহান উদ্দেশ্যে ভগবান কর্ম্মক্ষেত্র ইংলণ্ডকে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের সহিত রাজাপ্রজার পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আজ ইংলণ্ডকে এত আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। ইংরাজ জাতির কর্ত্তব্য যে তাহারা স্বার্থকে বলিদান করিয়া ভারতবর্ষকে এবং অন্যান্য অধীন ভূমিখণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া এবং স্বদেশেও ধনী নির্ধন সকলকে ন্যায়, সত্য প্রভৃতি চিরন্তন ভূমির উপর দাঁড়াইয়া শাসনের ব্যবস্থা করিয়া নিজেরা অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসুক। ইহাতে ইংরাজ জাতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের আশ্চর্য্য মঙ্গল সাধিত হইবে।

ভারতে কুষ্ঠরোগ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত টি, এস, কৃষ্ণমূর্ত্তি "ভারতে কুষ্ঠরোগ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে গত সেন্সসের সময়ে ১,১০,০০০ কুষ্ঠরোগী ছিল। তিনি অনুমান করেন, এতদ্ব্যতীত অপ্রকাশিত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ ছিল। কিন্তু এই যে কুষ্ঠরোগীরা ভারতের কুষ্ঠীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? স্বদেশবাসীরাই আমাদের মতে ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। স্বদেশী-প্রতিষ্ঠিত দুএকটী কুষ্ঠাশ্রম এখানে ওখানে টিমটিম করিতেছে, কিন্তু মিশনরিদিগের ন্যায় কয়জন স্বদেশী কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে? কৃষ্ণমূর্ত্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে কয়েকটী মিশন বিলাত হইতে যেটুকু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা দ্বারাই কুষ্ঠাশ্রমসমূহের যে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তদতিরিক্ত আর বিশেষ কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না। আমাদের তো নিত্যই প্রত্যক্ষ হয় যে, কত মিঠাইয়ের দোকানের পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী বসিয়া আছে, এবং কত শত মক্ষিকা উভয়েরই সমান সেবা করিয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশ বড়ই অদৃষ্টবাদী, তাই অনেক স্থলেই দেখিয়াছি যে আমাদের দেশবাসীগণ কুষ্ঠ প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগেরই বড় একটা "পরোয়া" করে না। ফলে হইতেছে যে আমাদের দেশের লোক ক্রমে নির্বীর্য্য হইতেছে এবং পরিণামে ধ্বংসের অভিমুখে দ্রুতগতি চলিয়াছে। এইখানেই শিক্ষার কথা আসে। দেশবাসীগণ যদি সাধারণত স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইত না। কেবল Primary শিক্ষাগ্রহণে দেশবাসীকে বাধ্য করিলে

চলিবে না, Secondary শিক্ষাগ্রহণেও বাধ্য করিতে হইবে। তবেই দেশের মুখ উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিবে।

আদিসমাজের প্রভাব। আমরা দেখিতেছি যে চতুর্দ্দিকেই আদিসমাজের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই যে ব্রাহ্মদিগের ভিতরে একটী সুদৃঢ় ভাব মনে জাগিয়াছে যে তাঁহারা বিবাহকালে আপনাদিগকে হিন্দু নয় বলিতে রাজী নহেন, ইহা আদিসমাজেরই প্রচারের ফল বলিয়া আমরা মনে করি। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে এবং প্রাণ খুলিয়া বিবেচনা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে নহে, সমস্ত হিন্দুসমাজেও আদিসমাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও হইবে। ইহার কারণ এই :যে আদিসমাজের মূলমন্ত্র প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতার উপর সংস্থাপিত। কেহ কেহ মনে করেন যে আদিসমাজ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ঠিক নহে। আদিসমাজের প্রায় সকল সভ্যই বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই অনিবার্য্যভাবে আদিসমাজ হিন্দুভাবের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাল যদি ইহার সভ্যগণের অধিকাংশ মুসলমান সমাজ হইতে আসেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আদিসমাজকে কোরাণসংপৃক্ত মুসলমানী ভাবের উপর দাঁড়াইতে হইবে। আসল কথা, আদিসমাজ নিজেকে ধর্ম্মবিষয়ে একান্তই অসাম্প্রদায়িক রাখিতে চাহেন। যদি কেহ জাতিভেদ ত্যাগ করেন, আদিসমাজ তাঁহাকেও যেমন ত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনি যদি কেহ জাতিভেদ মানিয়া চলেন, তাঁহাকেও তেমনি পরিত্যাগ করিবার অধিকার আদিসমাজের নাই। আর প্রকৃতই, আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা জাতিভেদের উপকারিতা স্বীকার করেন না এবং কার্য্যত মানিলেও মন্ত্রত জাতিভেদ মানিতে চাহেন না; আবার এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা জাতিভেদকে সমাজের উপকারী মনে করেন এবং কার্য্যত ও মন্ত্রত জাতিভেদ মানিয়া চলেন। হার্বার্ট স্পেন্সর যে বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে এসিয়াবাসীদিগের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার অন্তরে দুইটী জাতির স্বতন্ত্র ভেদজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। তাই বলিয়া তাঁহাকে কেহ ব্রহ্মোপাসক হইবার অনুপযুক্ত বলিতে সাহস করিবেন না। বিজ্ঞানসঙ্গত বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সামাজিক সকল প্রথারই সপক্ষ ও বিপক্ষ লোক থাকিবেই। সুতরাং তাহা লইয়া বিরোধ-বিবাদ অনিবার্য্য। কিন্তু বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে বিরোধ-বিবাদ হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এই মন্ত্র ধরিয়াই আদিসমাজ অক্ষুণ্ণভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পথে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে আদিসমাজের মূলভাবগুলি হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরসমূহে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব। আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে গত ১৫ই আশ্বিনের সঞ্জীবনীতে আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অধ্যক্ষসভা এ বিষয়ে সম্মত হইলেও আমরা তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে গৃহখানি ট্রষ্টডীড অনুসারে ট্রষ্টীদের সম্পত্তি হইলেও ইহা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত হইবার কারণে প্রকৃতপক্ষে কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর নিজস্ব। ইহা বিক্রয় করিতে গেলে আমাদের মতে সমস্ত ভারতবাসীর মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে গত ১৫ই আশ্বিন সংখ্যার সঞ্জীবনীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত তদুত্তর যাহা ৫ই কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভা হইয়া গিয়াছে। শত শত নরনারী তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। সিটি কলেজের ছাত্রাবাস রামমোহন রায়ের নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান রাধানগরে ভারতের নানাশ্রেণীর লোকের সাহায্যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। লাহোরে রামমোহন রায়ের নামে এক বালিকা হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি নামে বালকদের জন্য এক হাইস্কুল বহুদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদে রামমোহন রায় অনাথ আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে রামমোহন রায় আশ্রম গঠিত হইয়াছে; মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, বাঁকিপুর এবং বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে রামমোহন রায়ের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু এদিকে রামমোহন রায়ের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত, যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজগৃহ বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহাদের হস্তে ঐ ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়িয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যদি তাঁহাদের বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধা থাকিত তবে কখনও তাঁহারা এমন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। যে সমাজ-ভবন রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যেখানে তিনি স্বয়ং উপাসনা করিতেন, যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়া বহুলোকের প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছেন, সেই পবিত্র স্থান বিক্রয় করিতে যাঁহারা সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ভারত-বাসীর ধিক্কারের পাত্র হইবেন।

আমরা অবগত হইয়াছি, ৯০৫০০৲ টাকাতে আদি-সমাজগৃহ বিক্রয় করা হইবে। রামমোহন ও দেবেন্দ্র-নাথের আত্মা এই দুরাচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন, তাহা আদি সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি একবার চিন্তা করিয়াছেন?

যাঁহারা আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রষ্টিরূপে সমাজগৃহ বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আইনসঙ্গত-রূপে ট্রষ্টি হইয়াছেন কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ট্রষ্টিরা উপাসনাগৃহ বিক্রয় করিতে পারেন কিনা তাহাও জানিতে হইবে। যাহাতে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বিক্রয় হইতে না পারে, তৎপক্ষে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

যেরূপেই হউক মাড়োয়ারীর হস্ত হইতে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি ট্রষ্টিরা বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহীগণ মিলিত হইয়া উহা ক্রয় করিবার উদ্যোগ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

রামমোহন রায়ের প্রধান কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, ইহা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণ রামমোহনের ও তাঁহাদের পিতার প্রিয় ব্রহ্ম-মন্দির বিক্রয়ে বাধা দিবেন, আমরা এইরূপ আশা করি।

সঞ্জীবনী ১৫ই আশ্বিন ১২২৬।

ওঁ

৬।১, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
পূর্ব্বদ্বার যোড়াসাঁকো
কলিকাতা ৩. ১০. ১৯।

শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

মহাশয়, গত ১৫ই আশ্বিনের সঞ্জীবনীতে আদিব্রাহ্ম-সমাজগৃহ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আপনি সবল প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আদি-সমাজের গৃহ এখনও বিক্রয় হয় নাই—হইবার প্রস্তাব হইয়াছে মাত্র। আপনাদের ন্যায় আমিও আশা ও ইচ্ছা করি, যে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ গৃহবিক্রয়ে নিরস্ত হউন। বিক্রয়প্রস্তাবের উৎপত্তির কারণ এই যে, পল্লী খারাপ এবং সেই কারণে আদিসমাজের অনেক সভ্য ইচ্ছা থাকিলেও উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না—সপরিবারে আসা তো দূরের কথা। এই একটী মহান্ বাধা সত্বেও ব্যক্তিগত হিসাবে আমি এবং আমার ন্যায় আদিসমাজের আরও অনেক সভ্য এই প্রস্তাবের বিরোধী। আমার মতে যদি নূতন কোন একটী উপযুক্ত স্থানে উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে তাহা করা হউক, কিন্তু রামমোহন রায়ের আদিম স্মৃতি বজায় রাখিয়া। অধিকন্তু আমার মতে আদিসমাজ গৃহের আশেপাশের জমী ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গৃহকে সুন্দর-রূপে পুনর্নির্ম্মিত করিয়া ইহাকে রামমোহন রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত করা হউক। এরূপ করিলেই বিক্রয়প্রস্তাবকদিগের প্রধান আপত্তি খণ্ডিত হইবে। এ বিষয়ে আমি যথা-সাধ্য প্রতিবাদও করিয়াছিলাম। কিন্তু অধ্যক্ষসভার এক অধিবেশনে যখন দেখা গেল যে আদিসমাজগৃহকে পুনর্নির্ম্মিত করিবার মত অর্থসংগ্রহ সম্ভব হইবে না এবং গৃহবিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে একটী নূতন সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে এবং ভাল পল্লীতে ঐরূপ নূতন সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইলে আদি-সমাজের সভ্যগণের সপরিবারে উপাসনায় যোগদান সম্ভব হইবে, তখন কাজেই অধ্যক্ষসভা বিক্রয়প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমার নিজের বিশ্বাস ও ধারণা এই যে আদিসমাজের ট্রষ্টিগণ, সভাপতিমহোদয়গণ এবং পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলে এবং সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে সাধারণ দেশবাসীর সাহায্যে রামমোহন রায়ের এবং দেবেন্দ্রনাথের এই পুণ্যস্মৃতি স্থিরতর রাখিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে অন্যত্রও আর একটী সমাজগৃহ স্থাপন করিতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার এই পত্র আপনার সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিতে পারেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহম্মদীয় শব্দে আপত্তি। আজ কয়েক মাস হইল একজন মুসলমান ভদ্রলোক সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ টাইমস পত্রে লিখিয়াছিলেন যে 'মুসল-মানগণের মহম্মদীয় (Mahomedan) বলিয়া পরিচয় দেওয়া অনুচিত। মহম্মদীয় শব্দের অর্থ মহম্মদের শিষ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহম্মদ মুসলমানদিগের এক-মাত্র নেতা নহেন। মোজেস, এব্রাহাম প্রভৃতি পয়গ-ম্বরগণও মহম্মদের পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করি-য়াছেন। মহম্মদ সেই ধর্ম্মের অন্যতর প্রচারক মাত্র। মুসলমান ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের অর্থাৎ আদ-মের সময় হইতে প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্ম একমাত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করে। ইহাতে মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যকতা নাই। মহম্মদ কখনও আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও প্রচার করেন নাই। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান মহম্মদীয় বলিয়া পরি-চিত হইতে আপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিবে নিঃ-সন্দেহ।' উক্ত পত্রের দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চিন্তালহরী।

ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম্মের দুইটী মূলমন্ত্র—ভগ-বানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। এই প্রত্যেক মন্ত্রের আবার দুইটী দিক আছে—অন্বয় ও ব্যতিরেক। অন্বয় দিক দিয়া দেখিলে বুঝি যে ভগবানকেই একমাত্র প্রীতি করিতে হইবে, তাঁহাকেই পিতা-মাতা, সখা প্রভৃতি যে ভাবে যাহার সুবিধা হয় তাহার সেই-ভাবেই প্রাণের ভিতর ধরিয়া পূজা করিতে হইবে। ব্যতিরেক দিক দিয়া দেখিলে বুঝি যে, ভগবান ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তুমনুষ্য কাহাকেও ভগবান বলিয়া পূজা করা উচিত নয়; হৃদয়ের আসনে তাঁহার স্থানে আর কাহাকেও বসানো উচিত নয়।

তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন বিষয়েও অন্বয়দিক দিয়া

দেখিলে বুঝি যে, তাঁহার সৃষ্ট জীবজন্তু যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেরই প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। ভগবানকে ভালবাসার পরিচয়ই হইল তাঁহার জীবগণকে ভালবাসা। এইজন্যই জীবগণের কষ্টে দুঃখে আমাদের সহানুভূতি জাগিয়া উঠা আমাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবে নিহিত আছে। ব্যতিরেকের দিকে দেখিলে বুঝি যে, ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবকে শরীর, মন বা কথায় কোন প্রকারে কষ্ট দিবে না। ধর্ম্মের এই দুইটী মূলমন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কবে আমরা এই মূল সত্যধর্ম্মকে নিজেদের জীবনে সংসিদ্ধ করিতে পারিব?

ধর্ম্মের আড়ম্বর। পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায় যে, এক একটা নীচু স্থানকে চারিধারে উঁচু বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখে, বাহিরের জল আসিবার জন্য একটা স্থান খোলা থাকে। সেই খোলা স্থান দিয়া যতটুকু সম্ভব জল আসিল এবং সেই জল যতদিন না শুকাইয়া যায়, ততদিন সেই জলের দ্বারাই স্থানীয় লোকদের পিপাসা দূর হয় এবং কাজকর্ম্ম চলিতে থাকে। আলস্যের কারণেই হোক বা ঐ প্রকার অন্য যে কারণেই হৌক, লোকেরা অধিক নীচে খুঁড়িয়া জলের উৎস বাহির করিতে সম্মত হয় না। তাহার ফলে বাহির হইতে আগত জল গ্রীষ্মকালে যখন শুকাইয়া যায়, তখন একেবারে জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া যায়। তখন যে জলাশয়ে নিজের উৎস হইতে জল দিবানিশি বাহির হইতেছে, যাহার জল শুকাইয়া যায় না, লোকেরা সেই জলাশয়ের দিকেই পিপাসা দূর করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। সেই প্রকার, যে মনুষ্য আত্মার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের উৎস সকল না খুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাছে আসিয়া লোকসকল চিরকাল ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে পারে না। তিনি বাহিরের পড়া বা শোনা বিদ্যা চর্ব্বিতচর্ব্বণরূপে আওড়াইয়া বাঁধের জলের মত কিছুকালের জন্য লোকদের পিপাসা মিটাইয়া বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু সময়ে যখন সেই বিদ্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের উপযুক্ত বিদ্যার জন্য হাহুতাশ করিতে হইবে, আর লোকেরাও তাঁহার নিকটে গিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া হাহুতাশ করিতে থাকিবে। যে বাঁধের নিকট হইতে জল না পাইয়া লোকেরা ফিরিয়া যায়, সেই বাঁধ সংস্কারের অভাবে শীঘ্রই মাটিতে ভরিয়া যায়, ক্রমে ক্রমে তাহা সাধারণ জমীর সমান হওয়াতে আর একটুও জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা রাখে না; সেইরূপ যে মনুষ্য অন্তরের উৎস না খুলিয়া কেবল বাহিরের বিদ্যা দ্বারাই নিজের আত্মাকে ভরিয়া রাখেন, তাঁহার নিকটে তৃষ্ণার উপযুক্ত উপদেশাদি না পাইয়া যতই লোকেরা ফিরিয়া যায়, ততই তাঁহার অন্তর শুষ্ক হইতে হইতে সমস্ত মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের আত্মার গভীর অন্তস্তলে নিহিত ধর্ম্মের উৎস সকল খুলিয়া দিতে হইবে; তাহার উপর যদি বাহিরের বিদ্যাপ্রভৃতি আত্মাতে সঞ্চিত করিয়া রাখো, সে তো ভাল কথা।

ব্রহ্মচক্রে ব্রহ্মশক্তি। এই সমগ্র ব্রহ্মচক্রে একটী মহান্ জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। যে কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, যে কিছু ইচ্ছা হইতেছে, যে কিছু জ্ঞান জগতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে সমস্তই সেই মহাজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ মাত্র। জ্ঞানের ধর্ম্মই হইল প্রকাশ। তাই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রকাশ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে, আর সেই মহাজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে এই ব্রহ্মচক্রের বিকাশে। ফুলের পাপড়িগুলি যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে হইতে একটা সুগন্ধ ও সুদৃশ্য পুষ্পে পরিণত হয়, সেই প্রকার মহাজ্ঞান মহাশক্তি সৃষ্টিতে ছড়াইয়া থাকায় সৃষ্টির পাপড়িগুলি ক্রমেই ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া শতদলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই পূর্ণ পুষ্পের যে কবে পরিণতি হইবে, তাহা আমরা জানিও না এবং সম্ভবত কখনই জানিতে পারিব না। যখন সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইবে, তখনই বলিতে গেলে তাহার মুক্তি বা লয়, কারণ মহাজ্ঞান ব্রহ্মশক্তিই মূলে, ব্রহ্মশক্তিই মধ্যে এবং ব্রহ্মশক্তিই অন্তে। এইজন্য ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তি বলিতে সাহস করিয়াছেন যে নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব—সমস্ত জলের যেমন আসল গতি সমুদ্রের অভিমুখে, সেইরূপ সকল মনুষ্যের আসল গতি সেই ব্রহ্মশক্তির অভিমুখে।

গ্রন্থ পরিচয়।

দাস আমি। শ্রীহরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, প্রভাকর লাইব্রেরী। ৪ নং রামমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাবড়া। মূল্য ॥০ আনা।

"দাস আমি" একটী দার্শনিক প্রবন্ধ। গ্রন্থকার তিনটী খণ্ডে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে "আমি" অর্থাৎ জীব ভগবানের দাস। তিনি "আমির" জন্মলাভ, যৌবনকাল, এবং শেষ জীবন, এই তিন ভাবে আত্মার তিন অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকিলেও লেখক সরল ও সহজ ভাষায় তত্ত্বগুলিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া লেখক এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইল না; তিনি আপন সুবিধামত বিভিন্ন দার্শনিক মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ণযোগ। প্রকাশক শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস, বোড়াই চণ্ডীতলা; চন্দননগর। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই।

পূর্ণযোগ পূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধের আকারে প্রবর্ত্তকে বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সে গুলিকে একত্র করিয়া গ্রন্থকার পূর্ণযোগকে পূর্ণমূর্ত্তিতেই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। অতীত যুগে, প্রাচীন ভারতে যে কয়টী সাধন পথ প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকার ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের দোষগুণ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়াছেন। তিনি হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, এবং তান্ত্রিকযোগ পর্য্যন্ত যোগমার্গের কোথায় কতটুকু সার্থকতা, কোথায় বা কতটুকু ত্রুটি ঘটিয়াছে

তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; অবশেষে দোষত্রুটিগুলি বাদ দিয়া মার্গগুলির পরস্পর সামঞ্জস্যে লেখক এক নবতর সাধন পথের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহারই নাম "পূর্ণযোগ"। বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে তাহাতে কেবল ব্যষ্টিজীবনের সিদ্ধি বা মুক্তিই আর আমাদের পরমার্থ নয়, তাহার সহিত চাই এখন সমষ্টিজীবনের সিদ্ধি—নিখিল মানবজাতির সিদ্ধি। ইহাতে সেই নিখিল মানবজাতির সাধনার কথাই বলা হইয়াছে। ভাষা অতি সহজ, সরস, শ্রীপ্রিময়ী; গ্রন্থকারের আপনার শক্তির উপর আস্থা লেখার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ভাবের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখা যায়। এই ভাব না থাকিলেই ভাল হইত। আমরা প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্য দেখিতে চাই।

কাব্যসাহিত্যে "আমি"র কথা। শ্রীরামনারায়ণ কর, বি-এ কর্ত্তৃক প্রণীত প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ৩।১ নং কলেজষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

লেখক এই পুস্তকখানিতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্যসাহিত্যের একটা দিক ধরিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের অহংভাবমূলক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে তিনি অতি নিপুণতার সহিত পর পর সাজাইয়া সরলভাবে কবিত্বের ভাষায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক কবিতার অপরিস্ফুট ভাব তাঁহার এই ব্যাখ্যায় সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে; লেখক অবশ্য এ বিষয়ে অগ্রণী নহেন। আরও দুই একজনকে এ পথে আসিতে দেখিয়াছি। ইনি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অহংরূপী জীব, নানাবিচিত্রতাময়ী এই ধরণীর বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, জীবনের পথ বাহিয়া, সাধনার পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে অবশেষে একদিন কেমন করিয়া ব্রহ্মানন্দে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে, ইহারই একটা ধারাবাহিক চিত্রে লেখক আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। যত দূর দেখিলাম তাহাতে মনে হয় যে লেখক কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের মধ্যে "আমি"র কথার অনুসন্ধান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত কোন যোগ না রাখিয়া এইরূপ ব্যাপকভাবে গ্রন্থের নামকরণ করিবার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না।

প্রাপ্তিস্বীকার। নববিধান সমাজ হইতে তীর্থযাত্রা, নববৃন্দাবন, নববিধান ট্রাষ্ট, মণ্ডলীগঠন প্রভৃতি কয়েকখণ্ড পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বাইওকেমিক্ চিকিৎসা বিধান, বাইওকেমিক্ মেটিরিয়া মেডিকা এবং বাইওকেমিক্ গার্হস্থ চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইউ, এম্, সামন্ত এল্, এম্, এস্ বাইওকেমিষ্ট, কর্ত্তৃক প্রণীত। ২৮ নং আপার চিৎপুর রোড, সামন্ত বাইওকেমিক ফার্ম্মেসী হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সামন্ত এল, এম, এস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাইওকেমিক্ বা জৈব রসায়ন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের এক অভিনব চিকিৎসাবিধান। জার্ম্মনদেশীয় প্রতিভাশালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেডি শুস্লার মহোদয় এই নব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিনব মত হইতেছে এই যে, যে কয়েকটী পদার্থ দ্বারা আমাদের এই স্থূল শরীর গঠিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কোনটীর অভাব বা অল্পতা হইলে বাহিরে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় চিকিৎসা-বিদ্যার ভাষায় তাহারই নাম হইতেছে পীড়া, আর দেহের মধ্যে যে পদার্থটীর যতটুকু অভাব হইয়াছে বাহির হইতে তাহার পরিপূরণ করিয়া দেওয়ার নামই হইতেছে চিকিৎসা। এই মতে ধাতব লবণ হইতে প্রস্তুত দ্বাদশটী মাত্র ঔষধের দ্বারাই সমস্ত রোগ আরাম করা যায়; তাই গ্রন্থকার মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—"এই চিকিৎসা অতি সরল, সুন্দর, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত; এইজন্য ইহা সকল প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইউ, এম্, সামন্ত মহাশয় নানা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে এই অভিনব চিকিৎসা-বিধান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি বিপুলায়তন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা দেশের চিকিৎসাবিষয়ক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন নিঃসন্দেহ।

কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকদিগের এই চিকিৎসাবিধান পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহার ফল যথাবর্ণিত হইলে কত সহজে যে রোগ হইতে মুক্তিলাভের উপায় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। পরমভক্ত নরোত্তমদাস ঠাকুর বিরচিত। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থখানিতে ভাগবত প্রেম ও ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরম ভগবদ্ভক্ত নরোত্তমদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় বস্তু; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে এতদিন পর্য্যন্ত ইহার একখানিও পরিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির হয় নাই। প্রকাশক এই প্রাচীন পুস্তকখানিকে বটতলার আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—বিশেষত ভক্তিপিপাসুগণের—বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। প্রকাশক তাঁহার সুদীর্ঘ মুখবন্ধের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, অবশেষে তিনি গ্রন্থকারের একটা জীবনী দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন; এবং পাদটীকা ও পরিশিষ্ট সংযোজনা করিয়া তিনি এই প্রাচীন পুস্তকখানি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয় তাহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন।

নিত্যসহচর। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৴৹ আনা।

সঙ্কলয়িতা তাঁহার এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তিকাখানিতে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে তাহার দিনচর্য্যা পর্ব্বাধ্যায়টী সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিক্ষাসঙ্কট ও স্বাস্থ্যহীনতার দিনে এরূপ প্রাচীন-

উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ সাধারণের উপকারে আসিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীদুর্গানামমালিকা। শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক বিরচিত; মূল্য /০ আনা।

পুস্তিকাখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহাতে দুর্গা-নামের মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে।

চণ্ডী-চরিতামৃত। শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন কর্ত্তৃক প্রণীত। ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৵০ পাঁচ আনা মাত্র।

ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ। অনুবাদটী সুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূল চণ্ডীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ববিজ্ঞান। পূর্ব্ব ও মধ্যখণ্ড শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ প্রণীত। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ইহার নামেতেই বুঝা যাইতেছে। পুস্তকের মূল্য কত অথবা কলিকাতার কোথায় পাওয়া যায়, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। তবে আমরা জানি যে গ্রন্থকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ বটকৃষ্ণ পালের সভাবাজারের কবিরাজী ঔষধালয়ের চিকিৎসক। সুতরাং ঐ স্থানে যে পাওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত। এই দুই খণ্ডে কবিরাজমহাশয় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় নানা তত্ত্ব পদ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা পদ্যে গভীর বিষয় লিখন সম্বন্ধে কবিরাজমহাশয় সিদ্ধহস্ত। আমাদের দেশ (কলিকাতা ও কয়েকটী সহর ছাড়িয়া) আজও পদ্যানুরাগী। তাই আমাদের মনে হয়, কবিরাজ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামে আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্বপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবে। আমরা কবিরাজ মহাশয়কে এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করি।

তপোবন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। গ্রন্থখানির সমালোচনা বোধ হয় এক কথায় করা যাইতে পারে—গ্রন্থের তপোবন নামটী সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বলিলেই গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না। তাই আরও দুচার কথায় আমাদের বক্তব্য বলিতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থের শেষ কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়া যে কয়েকটি পড়িয়াছি, তাহাতেই তপোবনের সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, পবিত্র-ভাব, এমন কি তপোবনের গাছপালা কুটীর এবং সৌম্য-মূর্ত্তি ঋষিমুনিদিগেরও চিত্র মনশ্চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কণ্বমুনির তপোবনে যেমন রাজা দুষ্মন্তের মাতঙ্গরাজি প্রবেশ করিয়া তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, আমাদেরও আলোচ্য এই গ্রন্থে তপোবনেরও শান্তি "জালিমসিংহ" প্রভৃতি শেষের কয়েকটী কবিতার প্রবেশে কতকটা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কবিতাগুলিতে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি শান্ত তপোবনে প্রবেশের অধিকার পাইবার উপযুক্ত নহে। গ্রন্থখানির প্রাপ্তিস্থান বোধ হয় গ্রন্থকারের চট্টগ্রামস্থ সাধনাকুঞ্জ। গ্রন্থের মূল্য লিখিত হয় নাই—তপোবনের কোন বস্তুরই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, অথচ তাহার প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য।

গান। (২য় উচ্ছ্বাস) শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত মূল্য ॥০ আনা।

রায় সাহেব বিহারী বাবু কেবল বঙ্গবাসীর সম্পাদক বলিয়া নহে, কিন্তু সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের গানগুলিও তাঁহার সে খ্যাতি হ্রাস করে নাই। সকল গানেরই ভিতর তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে।

আইন ও আদালত। শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বি, এল প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

আইন আদালত লইয়া যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ কাজে আসিবে, ইহা আমরা সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারি। গ্রন্থখানি যেমন সহজভাবে লিখিত হইয়াছে, ইহার বিষয়বিভাগও তেমনি সুন্দর-রূপে সংন্যস্ত হইয়াছে। যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে আইন আদালত সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই পরিত্যক্ত হয় নাই।

৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত। শ্রদ্ধেয় ৺শিবনাথ শাস্ত্রী নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নিজের একখানি জীবনী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুস্তকখানি প্রায় এক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, জীবনের নানা ঘটনার সমাবেশও তেমনি মনোজ্ঞ। পুস্তকখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। তিনি প্রাচীন বয়সে বাল্যের ঘটনাগুলি সমস্ত স্মরণ করিয়া খুঁটিনাটিসহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একদিকে উহা সুকোমল হইলেও তাঁহার ভিতরে যে একটা তেজ ছিল, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াও সত্যের প্রতি তাঁহার যে যে অটল নিষ্ঠা ছিল, নিজমত রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যে বিপুল অধ্যবসায় ছিল, তাহাই তাঁহার চিত্তকে অন্যদিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। বন্ধুসেবা যৌবনে যাহা তিনি অকাতরে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অপরের পক্ষে গল্পের কথা। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার অল্পদিনের যোগ। ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রথম আমলের নগর সংকীর্ত্তন তাঁহার হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিল। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে সমস্ত হৃদয়ের সহিত যোগ দিলেন। পরস্পরের মধ্যে কত ভাবের বাধ্যবাধকতা। কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বিবাদের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, বিবাহের পরেই শিবনাথ বাবুপ্রমুখ কয়েকজন বীরের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া আসিলেন। এই বিচ্ছেদের কারণ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার যথাযথ বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনীতে স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাবী ইতিহাস লেখকের নিকট তাহার মূল্য যাহাই থাক, অনেকের মতে কেশববাবু সম্বন্ধে সমালোচনাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য অতিরিক্ত মাত্রায় কঠোর ও তীব্র হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে শিবনাথ বাবু প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে একজন, কিন্তু তাহা হইলেও অসামান্য প্রতিভাশালী কেশব বাবু অনেক বিষয়ে তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। কেশব বাবুতে যে সমস্ত অসামান্য গুণের সমাবেশ ছিল, তাহা মুক্তহৃদয়ে স্বীকার করিতে

শিবনাথ বাবু সঙ্কুচিত হন নাই এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও বর্ণনায় আর একটু সংযম থাকিলে ভাল হইত। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের কথা বলিতে হইলে এরূপ অপ্রীতিকর সমালোচনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সে যাহা হউক শিবনাথ বাবু অমিতবিক্রমে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় বাহির হইলে কেমন করিয়া অযাচিত দান আসিয়া সাধুকার্য্যের সহায়তা করে। তাঁহার পরিচয় এই পুস্তকে সুব্যক্ত। তিনি ইউরোপ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সকল স্থানেই তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কখন লালায়িত ছিলেন না। তিনি ভগবানের আদেশ বহন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নিন্দা প্রশংসা তাঁহাকে একদিনের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। শেষ জীবনে মহর্ষির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বিদেশীয় ভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে হতাশ হইয়া পড়িতেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস (ইংরাজিতে) তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। শেষ অংশের জন্য কতক কতক সংগ্রহ করিয়াছিলেন; আমরাও তাঁহাকে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিলাম; জানি না তাহা প্রকাশিত হইবে কি না। শিবনাথ বাবু একাধারে কবি, বাগ্মী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ইতিহাস লেখক। ইংরাজি ও বাঙ্গালা রচনায় তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার স্থান সহজে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পূর্ণ হইবে না। শিবনাথ বাবু সমাজ-সংস্কারের দিকে অধিকাংশ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে আত্মচরিতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ছবি সেরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহর্ষির আত্মজীবনীতে। আমরা এই পুস্তকের প্রচার ও প্রসার কামনা করি। শ্রী:—

শোক-সংবাদ।

৺ব্রজগোপাল নিয়োগী।—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রেভারেণ্ড ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় গত ১০ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে কেবল নববিধান সমাজ নহে, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যে কয়জন উদারচেতা প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, ব্রজগোপাল বাবু তাঁহাদের অন্যতর। গতপূর্ব্ব ভাদ্রোৎসবে যখন ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার সম্মিলিত উপাসনার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন বেদীগ্রহণের জন্য নববিধান সমাজের কাহাকে আহ্বান করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে সকল শাখার লোকই ব্রজগোপাল বাবুর কথা বলিলেন। ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। ইহাই তাঁহার উদারতার পক্ষে সুদৃঢ় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি খুবই বিরল। ভগবান তাঁহার আত্মাকে সুখীতল-ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন।

৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।—কলিকাতা আর্য্যমিশন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য গত ৭ই ভাদ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাশীধামের প্রসিদ্ধ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এক সময়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে সমাকৃষ্ট করিয়াছিল এবং অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে তিনি বৈদ্যনাথে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্ত হইলাম।

৺ডাক্তার অমৃতলাল সরকার।—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সুযোগ্য পুত্র অমৃতবাবু বিগত ২১শে ভাদ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার জীবন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া আজীবন উক্ত সভার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বিজ্ঞান সভার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরিবে না। তিনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ, বিগত ১৩ই আশ্বিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক প্রতিষ্ঠাতা; বহুকাল ধরিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে করিতে তাঁহার শ্রান্তদেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া তিনি রোগভোগ করিতেছিলেন। এমন সুলেখক, সুবক্তা, ত্যাগী ও বীর পুরুষের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আজ বিপন্ন। তাঁহার মত আর কেহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ইদানীং তিনি ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যবিন্দু ছিলেন। তাঁহার উপাসনায় বিমুগ্ধ কে না হইত? ১১ই মাঘের প্রাতে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা উপভোগের সামগ্রী ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া আপনাকে ভুলিয়া সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ঠিক সেই এক সরল ও অটলভাবে নিজের মত পোষণ করা ও প্রচার করা তাঁহার মত আর কেহ পারিবে কি না জানি না। নিরহঙ্কারী মিষ্টভাষী সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একটি সুগভীর শূন্যতা প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমণ্ডলী পরলোকগত আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বিগত ২রা নবেম্বর বিশেষভাবে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে চির শান্তি দান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯০।

৯১৬ সংখ্যা ১৮৪১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
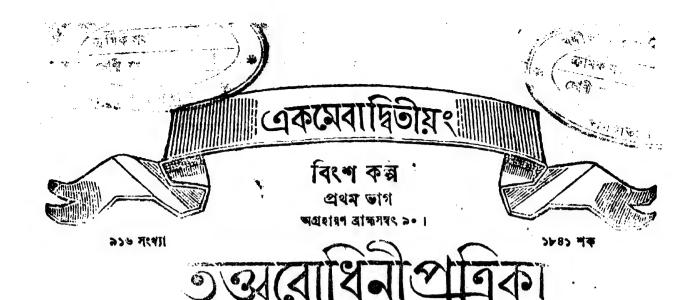
অন্তর্জগতে ব্রহ্মজ্ঞানে অভিব্যক্তি

(ডাক্তার সার ভাণ্ডারকার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

"আমি একলাই আছি, এরূপ যদি মনে কর তাহা ঠিক নহে; এই পুণ্যপাপদর্শী জ্ঞানী পুরুষ নিত্য তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন।"

মনুষ্যের অন্তর্যামী একপ্রকার বুদ্ধি আছে, তাহাতে করিয়া মনুষ্য কোন কাজ করিবার সময়, তাহা ভাল কি মন্দ, যোগ্য কি অযোগ্য এইপ্রকার জ্ঞান সে সহজভাবে লাভ করে। ভাল কিংবা যোগ্য হইলে তাহা করা আমাদের কর্ত্তব্য, মন্দ হইলে তাহা বর্জ্জন করা, তাহা হইতে দূরে থাকা আমাদের কর্ত্তব্য, এইরূপভাবে ঐ বুদ্ধি পরিণত হয়। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচক সাত্ত্বিক বুদ্ধি। সাধারণত যাহাকে আমরা বিবেক বলি তাহা ইহাই। অমুক কাজ যোগ্য, তাহা তুমি কর, এই বিবেকবুদ্ধি মনুষ্যকে এইরূপ আদেশ করে; অমুক অযোগ্য, তাহা তুমি করিও না, এইরূপ নিষেধ করে। ভালোর বিধানকর্ত্তা, মন্দের প্রতিষেধকর্ত্তা, এইরূপ এই বিবেকরূপ বুদ্ধি সর্ব্বদা মনুষ্যের অন্তঃকরণে, কোন কাজ করাইবার সময়, কিংবা করিবার পর, তখনই জাগৃত হয়। বিবেকযোগে, অমুক কাজ ভাল কিংবা মন্দ এইরূপ যে উপলব্ধি তাহা সর্ব্বথা অবাধিত। বিশ্বাসঘাতকতা করা, কাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব নাশ করা—ইহা অযোগ্য, ইহা মন্দ, এবং এই যে মন্দ ইহা মন্দই, কখনই কোন প্রসঙ্গেই তাহার মন্দত্ব দূর হইবার নহে, তাহা ভাল কখনই বলা যাইবে না, এই প্রকারের ঐ ধারণা। এবং এই সাত্ত্বিক বিবেকের আদেশও সেই অনুসারে অমুল্লঙ্ঘনীয়—এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমুক কাজ আমাদের কর্ত্তব্যই, তাহা কখনই এড়াইতে পারা যাইবে না, করিতেই হইবে; ঐ কর্ত্তব্য হইতে অমুক অমুক ফল হইবে বলিয়াই করিতে হইবে এরূপ নহে, উহা কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে,—তারপর ফল যাহাই হোক না কেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে এইরূপ এক কথা আছে যে, এক সময়ে দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ তাহার কোন ফলই নাই, উল্টা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসের দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবে কেন ধর্ম্মাচরণ কর?" তাহাতে ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন:—

"হে রাজপুত্রি, আমি ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে ফললাভ করিব এই উদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করি না; যাহারা দান করে, ঐ দান করাই কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়াই তাহারা দান করে। হে কৃষ্ণে, ফল লাভ হোক বা না হোক, কোন ব্যক্তির কিংবা গৃহস্থের যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই আমি যথাশক্তি করিয়া থাকি।" অতএব, এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক ইহার

আদেশ এইরূপই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, যোগ্য অযোগ্য,—এই বিষয়ে যে স্বাভাবিক ধারণা তাহা এই প্রকারের যে, যাহা ধর্ম্ম্য অথবা যোগ্য, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াই করিবে; যাহা অধর্ম্ম্য অথবা অযোগ্য তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়াই বর্জ্জন করিবে। এবং এই বিবেকের আদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে যোগ্যকে অবলম্বন করিয়া অযোগ্যকে পরিত্যাগ করিলে, আমাদের অন্তঃকরণ শান্ত হয়, আমরা শান্তি ও সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু ঐ আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে, অধর্ম্মের আচরণ করিলে, অযোগ্য কাজ করিলে এবং ধর্ম্ম্য ও যোগ্য কাজ পরিত্যাগ করিলে, মন অস্বস্থ হয়, শান্তি নাই সন্তোষ নাই—এইরূপ আমাদের অবস্থা হয়। এই প্রকার যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বাচনকারী, সর্ব্বথা অনুল্লঙ্ঘনীয় এইরূপ আদেশকারী এই যে বিবেক ইহা ঈশ্বরের বাণীরূপে আমাদের অন্তঃকরণে সমুদিত হয়। কখনই যাহার বাধা নাই এই প্রকারের সত্য যদি এই বিবেকবুদ্ধি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, আমরা মন্দ কাজ করিলে "হে জীব, তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তুমি নীচ ও দূষিত হইয়াছ, তোমাতে কলঙ্ক লাগিয়াছে"—এই বিবেকবুদ্ধি যদি আমাদিগকে এইরূপ ভর্ৎসনা করে, এবং ভাল কাজ করিলে, "যাহা ঠিক তাহাই হইয়াছে, তুমি যোগ্য কাজ করিয়াছ" এই বিবেকবুদ্ধি যদি এই প্রকারে আমাদিগকে সন্তোষ দেয় এবং এইরূপে আমাদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য যত্ন করে, তবে উহা বিবেক-বৎসল মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই বাণী—এইরূপ বলিতে হইবে। এই বাণীকে মানিয়া আমরা নিত্য চলিতেছি এরূপ নহে, নিত্য সত্বশীল হই এরূপ নহে; কিন্তু ঐভাবে না চলিলেও, ঐ বাণীর উক্তি কখনই বন্ধ হয় না। বিষয়প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যদি আমরা জীবনযাপন করি, তথাপি. পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে বাস করেন; আমাদের পুণ্যপাপের সাক্ষী নিয়ত থাকিয়া, "তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তুমি যোগ্য ব্যক্তি, তুমি নীচ ব্যক্তি" এই প্রকারের আপন বাণী বিবেক দ্বারা প্রকট করিয়া থাকেন।

তাই, ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন:—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

১৫-১৫।

ভগবান বলিতেছেন "সকলের অন্তঃকরণের মধ্যে আমি আছি, মনুষ্য বক্র পথে গমন করিলে, তাহাকে বিশুদ্ধ করি (মত্তঃ স্মৃতিঃ), তাহাকে ভাল মন্দ এবং অন্য কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া থাকি এবং মন্দ হইতে তাহাকে নিবৃত্তি করি"। সেইরূপ আবার—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এইরূপ,—অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহার আধার আমি এবং নিশ্চয়াত্মক যে সুখ তাহারও আধার আমি"। শাশ্বত ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সকল মনুষ্যেই প্রয়োগী হয়, সে যে বর্ণেরই হোক্ না কেন; সমস্ত আশ্রমেও প্রয়োগ হয়, ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান কোনও কালের দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আজ যাহা সত্য ও ন্যায্য তাহা ভূতকালেও সেইরূপ এবং ভবিষ্যকালেও সেইরূপ; তাই, শাশ্বত ধর্ম্মের অর্থ, ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা যাহাকে নীতি বলিয়া থাকি। তাহার আধার পরমেশ্বর; তাই, ঐ ধর্ম্ম পরমেশ্বরের ইচ্ছারই রূপ বা অভিব্যক্তি। অতএব ঐ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে পরমেশ্বরের ইচ্ছা উল্লঙ্ঘন করা হয়, তাহার সহিত বিরোধ করা হয়। তাই অন্যত্র গীতার মধ্যে "শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা" অর্থাৎ শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ভগবান শাশ্বতধর্ম্মকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যখন পাপ অর্থাৎ অসত্য, অন্যায়, দ্বেষ ইত্যাদি লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তখন ঈশ্বরের যোজনায় পাপ বিনষ্ট হইয়া পুণ্যের উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

অবিশ্বাস।

(শ্রীনির্ম্মল হাসিনী দেবী)

সুরম্য কানন মাঝে প্রমোদ প্রাসাদ
বড় সাধে রচেছিনু লতায় পাতায়;
সুসজ্জিত নানা চিত্রে কুসুম আসবে
রেখেছিনু আলোকিয়া শান্তি জ্যোছনায়,
করি সহচরী প্রিয় সখী কল্পনায়
রাখিয়ে এ ক্ষুদ্র মুখ তাহার বক্ষেতে

ভুলি জগতের সর্ব্ব দুঃখ-বেদনায়
রয়েছিনু আত্মহারা সুখ-স্বপনেতে ;
সংসারের কোলাহল পশেনি শ্রবণে
পশে নাই শোক-তাপ সুখের ভবনে
পূর্ণ বিশ্বাসের কোলে সুখে করি খেলা
কেটে যেত জীবনের সুমধুর বেলা।
কে তুইরে ভীমবেশে সহসা আমার
ভেঙ্গে দিলি নিমেষেতে সুখের স্বপন
পদাঘাতে চূর্ণ করি সুখের সংসার
জ্বেলে দিলি বক্ষমাঝে তীব্র হুতাশন
কেরে তুই নিরদয় পাষাণের প্রায়,
কোমল কুসুম আহা দলিলি চরণে ?
যে জন ভ্রমিতেছিল শান্তি পিপাসায়,
পোড়াইলি হৃদি তার অনলদহনে ?

প্রেম।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

তোমার চারদিকে সৌন্দর্য্য, চারিদিকে প্রেম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটী অনন্ত প্রেমপারাবার। ইহার অনন্ত জলরাশি, অগণিত সৈকতমালা, অসংখ্য ঊর্ম্মিনিচয়, আবর্ত্ত, বুদ্‌বুদ্‌ যাহা কিছু সমস্তই প্রেমে বিনির্ম্মিত। এই প্রেম পয়োনিধি তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তোমার চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ হইয়াছ ; ঐ প্রেমরাশি তোমাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে তাহা তুমি শুনিয়াও শুনিতেছ না, কর্ণ থাকিতেও তুমি বধির হইয়াছ। এই অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে তুমি নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছ কিন্তু তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। এই প্রেম-পারবার না থাকিলে তুমি একদিনও জীবিত থাকিতে না,—তোমার জীবনী শক্তিই ঐ প্রেমপারাবার। ঐ প্রেমই তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে ইহা তুমি জান ; কিন্তু তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তুমি জানিয়াও জানিতেছ না। তুমি কি চাও ? তুমি যাহা চাও তাহা কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই তাহা তুমি চাওনা। তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সুখে ও আনন্দে রাখিতে তোমাকে অনন্ত জীবন দিতে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই আছে, আছে বলিয়া তুমিও আছ নচেৎ থাকিতে না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাহার অনন্ত ভাণ্ডার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছে ; ইচ্ছা করিলে তুমি সমস্ত ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিতে পার, কিন্তু সমস্ত ভাণ্ডার তুমি চাও না, উহার গুটিকতক বস্তু লাভ করিয়াই তুমি যথেষ্ট মনে কর, তোমার তৃষ্ণা তাহাতেই মিটিয়া যায় আর অন্যগুলির প্রতি দৃক্‌পাতও কর না। তাই বলিতেছিলাম চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও তুমি বধির। এই অনন্ত ভাণ্ডার তোমা-রই জন্য ছড়ান রহিয়াছে এই অনন্ত প্রেম তোমা-কেই আহ্বান করিতেছে, শুনিতেছ কিন্তু তাহাতে মন দিতেছ না। তুমি কূপমণ্ডুকের ন্যায় স্বল্পজলে সন্তরণ করিতে শিখিয়াছ এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। অনন্ত জলে সন্তরণ করা যে কি সুখ তাহা তুমি জান না, কখনও তাহা আস্বাদন কর নাই তাই গুটিকতক বস্তু পাইয়াই আপনাকে সুখী ও ধন্য মনে কর।

ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি প্রকৃতই সুখী কিনা ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত তোমার হৃদয়টীও সেইরূপ অনন্ত। গুটিকতক বস্তুতে তোমার অনন্ত হৃদয় কদাচ ভরিতে পারে না। তুমি সুখী নও। তুমি সর্ব্বদাই অভাব অনুভব কর, তুমি আরও কিছু চাও। যাহা পাইয়াছ তাহাতে তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। আপন আপন অবস্থায় কেহই সুখী ও নিশ্চিন্ত নহে। ঐ কূপমণ্ডুক জানে না যে তাহার বাসস্থান কূপটীর বাহিরেও জগৎ আছে। জানে না বটে কিন্তু তাই বলিয়া যে সে কূপটীতে সুখী ও নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতেছে তাহা নহে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান না থাকিলেও বহির্জ্জগতের প্রতি তাহার প্রাণের টান আছে। সে যেন কিছু চায়—কি চায় সে তাহা জানে না। তাহার সন্তরণপ্রবৃত্তি সেই কূপটীর গায়ে গিয়া শেষ হয়, আর প্রসারিত হয় না ; এই অবস্থাটা তাহার সুখের অবস্থা নহে, তাহার আকাঙ্ক্ষা এইখানেই শেষ হয় না। আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না সত্য, কিন্তু কি উপায়ে সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে ইহাও সে জানে না। কূপের বাহিরে যে জগৎ আছে ইহা তাহার জানা নাই। ঐ মণ্ডুকের মত তুমিও জান না যে, যে গুটিকতক বস্তু লইয়া তুমি আপন

গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ আছ তাহা ছাড়া তোমার আপনার বলিবার আরও অনেক আছে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই অনন্তের প্রতি তোমার জ্ঞান ধাবিত হয় না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ধাবিত হয়। তোমার প্রাণটা সেইদিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। তুমি আমার বলিবার যতই পাইতেছ ততই চাহিতেছ, সুখী ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। অনন্তের পিপাসা কদাচ পরিমিত বস্তুতে মিটে না।

ঐ যে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সুনীল জলনিধি হাসিতেছে, নাচিতেছে, গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছে; ঐ যে শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিনিচয় নানা জাতীয় তরু-গুল্মলতায় শোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ যে নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারাগণ, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রগণ আপন আপন উজ্জ্বল কিরণমালায় মণ্ডিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, ঐ যে তটিনী, ঐ যে নির্ঝরিণী, ঐ যে শ্যামল শস্পবীথিশোভিত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাধবলিত নদীসৈকত; নানা বর্ণে রঞ্জিত মধুরঝঙ্কারকারী বিহঙ্গমবৃন্দ ও পতঙ্গগণ, ঐ যে অশেষ-রূপলাবণ্যবিশিষ্ট নর নারীগণ, ইহারা প্রত্যেকে কি তোমার চিত্ত আকর্ষণ করে না? ইহারা প্রত্যেকে কি সুন্দর নহে? ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতেও বৃহৎ সকলেই সুন্দর। প্রেমচক্ষে উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তোমার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে ইহাদের সহিত তোমার প্রাণের কি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। ইহারাই আনন্দের মলয়হিল্লোল উঠাইয়া তোমার প্রাণ-কুসুম ফুটাইয়া তুলে, এই হিল্লোলের অভাবে তোমার প্রাণকুসুম শুকাইয়া যায়, তুমি দুঃখময় মৃত্যুশয্যায় নিপতিত হও। নির্জ্জন কারাবাসের অন্ধকারময় বাসস্থান, অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন চিররজনী আমাদের এত অপ্রিয় ও দুঃখজনক কেন? সেই হিল্লোলের অভাব—পূর্ণ মাত্রায় অভাব নহে, আংশিক অভাব—তাই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, ষোল আনা অভাব হইলে কেহ বাঁচিতে পারিত না।

জগৎজননী তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি নানাভাবে নানা আকারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই রূপ—তাঁহারই প্রেমের উচ্ছ্বাস। তিনিই তরুতে আছেন, লতাতে আছেন, পর্ব্বতে আছেন, নদীতে আছেন, সমুদ্রে আছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশে আছেন, আকাশের অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রে আছেন। তাঁহারই শক্তি বায়ুরূপে বহিতেছে, অগ্নিরূপে জ্বলিতেছে, বিদ্যুতরূপে বিস্ফুরিত হইতেছে, জ্যোতিরূপে প্রকাশ করিতেছে। কুসুমকাননে অপূর্ব্ব শোভা, নরনারীগণের কমনীয় কান্তি, বিহঙ্গকুলের রমণীয়তা ও সুমধুর স্বরলহরী সমস্তেই তিনি। তিনিই দয়ারূপে, শান্তিরূপে, প্রীতিরূপে, প্রেমরূপে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই পিতারূপে সৃষ্টি করিতেছেন, মাতারূপে পালন করিতেছেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলে তিনিই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যদিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন নহে, সকলেই এক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত; ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গ মাত্র; পরস্পর পৃথক হইলেও সেই বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক নহে। তুমিও যাঁহার আমিও তাঁহার। তুমি যেখান হইতে আসিয়াছ আমিও সেখান হইতে আসিয়াছি; তুমিও যেদিকে যাইতেছ আমিও সেই দিকে যাইতেছি। পরস্পরের পন্থা বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান বিভিন্ন নহে। এই বিস্তীর্ণ প্রেমজলধির আমরা এক একটী তরঙ্গ তাহা হইতে উঠিতেছি। আবার তাহাতেই লয় হইয়া যাইতেছি। তবে কেন আমরা পরস্পর পৃথক মনে করি? কেন "আমার" "তোমার" এই সকল অপ্রকৃত ভাব হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া এই আনন্দের রাজ্যে দুঃখ আনয়ন করি? আমি কেন তোমার সহিত কলহ করি? রাম কেন শ্যামের বস্তু আপন আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে? শ্যাম কেন রামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়? হরি কেন মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্বোচ্চ মনে করে? জারমানি কেন ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতে এই ঘোর অশান্তি আনয়ন করে? ইহা আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, আমরা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা আমাদের ভালবাসা অপাত্রে প্রদান করিতে শিখিয়াছি। আমরা নিজেকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি; জগৎকে ভালবাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ; সেই

প্রেমের প্রকৃত পাত্র খুঁজিয়া না পাইয়া অপাত্রে সমর্পণ করিয়াছি। আমাকে এবং আমার বলিবার যাহা কিছু আছে তাহাকে ছাড়া আমরা অন্যকে ভালবাসিতে পারি না। 'আমি কে'? 'আমার কে'? বৃথা হাহা করিয়া মরি। এ ভালবাসায় কি সুখ আছে? শান্তি আছে? আনন্দ আছে? কখনও থাকিতে পারে না! মূলে 'আমি' বলিয়া কিছু নাই, তাহার উপরে কোন বস্তু স্থাপিত হইতে পারে না। আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে গেলে দুর্গ দাঁড়াইবে না, ক্রমশঃ পড়িতে থাকিবে, দুর্গকে আকাশে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য তুমি শত চেষ্টা করিবে চেষ্টা ফলবতী হইবে না, চেষ্টা করিতে গিয়া চিরজীবন দুঃখ, ক্লেশ, সন্তাপ ভোগ করিবে। তাহাই ত হইতেছে। আমরা কি করিতেছি? "আমি" "আমি" "আমার" "আমার" করিয়া চিরজীবন মরিতেছি, কত দুঃখ কত ক্লেশ পাইতেছি, আমিই বা কোথায় 'আমার'ই বা কোথায়? কেহই ত থাকে না। কাহাকেও ত রাখিতে পারি না; হাহাকার করিতে করিতে পরিশেষে মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া শান্তি লাভ করি! সব "আমি" "আমি" "আমার" "আমার" এইখানেই শেষ হইয়া যায়।

"আমি" একটী কাল্পনিক বস্তু। উহার কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদের সংস্কারলব্ধ। জগতের বস্তুগুলি মূলে অভিন্ন হইলেও আপাতবিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ঐ আপাত-প্রতীয়মান বিভিন্নতাকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া মনে করি এবং ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ মিথ্যা সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়। আমা হইতে অপরকে পৃথক জ্ঞান হয় এবং "আমি" এইরূপ কাল্পনিক মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

'আমি' হইতে 'আমার' উৎপন্ন হয়। আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার বিষয়, এই সকল জ্ঞান "আমি" আছে বলিয়া হয়। ইহারাও কাজেই মূলে কাল্পনিক। ইহাদের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নাই। দেহ, গেহ, পুত্র, পরিবার সবই আছে; কিন্তু সেগুলি যে আমার ইহা একটি মিথ্যা সংস্কার মাত্র! এই মিথ্যা সস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ঐ সকল বস্তুর সহিত "আমার" এই সম্বন্ধটী বজায় রাখিতে কত দুঃখে, কত ক্লেশে পড়ি তাহার আদি-অন্ত নাই। আজীবন ইহারই চিন্তা করি। জীবন এই চিন্তাতেই শেষ হইয়া যায়। কখনও উল্লাস, কখনও নৈরাশ্য, কখনও আনন্দ কখনও দুঃখ; আজ হাসি, কাল কাঁদি, আজ জন্মমহোৎসব, কাল প্রেতকৃত্য ও রোদন—এই ভাবে জীবন কাটে, 'আমার' কেহ হয় না। শত চেষ্টায়ও 'আমার' এই সম্বন্ধটী ঐ সকল বস্তুতে বজায় রাখিতে পারি না। 'তারা আসে তারা চলে যায়'। তাহারা নদীর স্রোতে সমুদ্রের পানে ধাবিত; ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে আসে আবার চলিয়া যায়। তাহারা চাঁদের আলো—কখনও পৌর্ণমাসী কখনও অমানিশা। তাহারা আমার নহে—চেষ্টা করিলে তাহারা আমার হইবে কেন? তাহারা আপন কাজে জীবনের অনন্তপথে চলিয়াছে। কর্ম্মসূত্রে দুদিনের জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হয়, কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইলে আর তোমার কাছে থাকে না। তুমি পাগল হইয়া তাহাদের পিছু পিছু ছোট কেন? ছুটিলে কি ধরিতে পারিবে? তোমার গতি কত দূর? তাহার পথ অনন্ত। এই পাগলামির জন্যই ত আজীবন কষ্ট পাও। এই ভ্রান্তিই ত তোমাকে প্রকৃত প্রেমানন্দে বঞ্চিত করিতেছে। তোমার 'আমি'র বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ অনন্তের পথে তুমিও ছুট দেখি; ঐ অনন্তে তোমার হৃদয়টী সমর্পণ কর দেখি, তখন তুমি তাহাদিগকে পাইবে। তাহারা তোমার নহে—তাহারা ঐ অনন্তের। তাহাদিগকে পাইতে হইলে তোমাকেও অনন্তে ছুটিতে হইবে। তখন তুমি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন তোমার শোক থাকিবে না, তাপ থাকিবে না, নৈরাশ্য, হাহাকার, মান, অভিমান কিছুই থাকিবে না, শুধুই প্রেম—প্রেমের সমুদ্র, তুমি তাহাতে সন্তরণ করিতে থাকিবে। এই প্রেমে তোমার হৃদয়টী পূর্ণ আছে, কিন্তু চাপা পড়িয়াছে। তোমার অলীক চিন্তায় উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ঐ শুভ্রফেন রাশিবিশোভিত, তরঙ্গমালাসঙ্কুল অনন্ত সমুদ্রের পানে যখন দৃষ্টিপাত কর, যখন ঐ পূর্ণ-শশধর-মণ্ডিত, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত নীল-

নভোমণ্ডলের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিপতিত হয়, যখন মলয়হিল্লোল তোমার চারিদিকে বহিয়া যায়, কুসুমরাশি ফুটিয়া উঠে, কোকিল কুহুরবে ঝঙ্কার করিতে থাকে, তখন ক্ষণকালের জন্য তোমার চিত্ত বিমোহিত হয়, তুমি অপার আনন্দ অনুভব কর; কিন্তু কতক্ষণ? তুমি কি ইহাতে ডুবিয়া যাইতে পার?—না। তোমার 'আমি' তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তোমাকে ডুবিয়া যাইতে দেয় না; পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করে, আবার তোমাকে গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আইসে। তখন কোথায় সেই সমুদ্র! কোথায় সেই নীলনভস্তল! "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে" সেই গৃহ, সেই পরিবার, সেই দুঃখ, সেই সন্তাপ চারিদিকে মক্ষিকা-রাশির ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে।

এই চিন্তাগুলি যদি পরিত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে অন্তরে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখন আনন্দময় হইয়া যাইবে, তখন দুটী চারটী বস্তু "আমার" বলিবার থাকিবে না, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড "আমার" হইয়া পড়িবে। কিংবা আমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হইয়া যাইব। তখন প্রেমের বস্তু আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, আশে পাশে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে; তখন প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া প্রেমের বস্তু রক্ষা করিতে হইবে না, তখন সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, শোণিতস্রোতে মেদিনী প্লাবিত করিয়া, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা আচরণ করিয়া নরনারীগণের হাহাকারে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করাইয়া প্রেমরস আস্বাদন করিতে হইবে না। প্রেম আমাদের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে তাহার জন্য চেষ্টা ও বলপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা যে পথে চলিয়াছি সে পথে প্রেম নাই, সে পথে দুঃখের সাগর। প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে প্রেম থাকে না, স্বার্থপরতা হয়। স্বার্থপরতাই সকল দুঃখের আকর।

দুই ব্যক্তি দাবা কি পাশা খেলিতে বসিয়াছে। নিজ পক্ষের ঘুঁটিগুলিকে প্রত্যেকে আপন মনে করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ঐ ঘুঁটিগুলির চিন্তায় তখন তাহারা নিমগ্ন, কারণ ঐ গুলির মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল, গৌরব, যাহা কিছু সমস্তই। এই খেলা লইয়া বালকের মত কখন কলহ করিতেছে, কখন বা হায় হায় করিকরিতেছে, কখনও বা উৎসাহে নৃত্য করিতেছে, আবার কখনও বা অভিমানে গরগর করিতেছে। কেন করিতেছে? অচেতন ঘুঁটিগুলির সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ? কটুতিক্তাদি কোন রসই ঘুঁটিতে নাই যে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। সৌন্দর্য্যও তেমন কিছু নাই যে নয়নরঞ্জন করিতে পারে। তবে কেন ঘুঁটি এত প্রিয়? তবে কেন ঘুঁটির গায়ে আঘাত নিজ গাত্রে আঘাতের মত লাগে? ঘুঁটি কি গুণে মোহিত করিয়াছে? ঘুঁটিগুলির সহিত ক্রীড়কদের প্রত্যেকের "আমার" এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই "আমার" সম্বন্ধ বজায় রাখাই প্রত্যেকের চেষ্টা। তাহাতেই আনন্দ, গৌরব, উৎসাহ, অহঙ্কার সমস্তই এবং তাহাতেই হাসি, হায়! হায়! বিবাদ কলহ ইত্যাদি। ভাবিয়া দেখ, এই "আমার" সম্বন্ধের মূলে কি আছে। কিছুই নাই। কল্পনা মাত্র। খেলা সাঙ্গ হইয়া গেলে আর কিছুই থাকে না। তখন আমার ঘুঁটি তোমার ঘুঁটি এক হইয়া যায়, সেই উৎসাহ সেই নৃত্য, সেই দুঃখ, সেই অভিমান কিছুই থাকে না।

সংসারটীও ঐরূপ একটী খেলা। আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার বিষয়, আমার সম্পদ, আমার জাতি, আমার দেশ, আমার রাজ্য এ সমস্তই ঐ খেলার ঘুঁটির মত কল্পনা। এই কল্পনা হইতে মায়া উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে অশেষ দুঃখে দুঃখিত করে। এই মায়ার প্ররোচনায় পড়িয়াই আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হই, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আচরণ করি। অপরকে পরাভব করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, অভিমানের বশবর্ত্তী হই, অন্যায়াচরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না এবং অনেক সময়ে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যও করিয়া থাকি। আমাদের যত কিছু শোক, তাপ, দুঃখ; জগতের যাহা কিছু হাহাকার দুর্দ্দশা সমস্তই এই মায়া-জনিত। জগতের লোক যেন পাগল হইয়া এই মায়াজালে আবদ্ধ হইতেছে এবং আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারা আনয়ন করিতেছে। ইহা হইতে সুখ আশা করিতেছে, পাইতেছে না। সুখ যে পথে আছে সে

পথে কেহ যাইতেছে না। জগতকে ভাল না বাসিয়া আপনাকে ভাল বাসিতেছে, জগতকে অগ্রাহ্য করিয়া, এমন কি উৎপীড়ন করিয়াও আপনার জয়ঢাক বাজাইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে। সুখী ত কেহ হইতেছে না, যাহার মূলে কিছু নাই তাহা হইতে সুখ কি প্রকারে আসিতে পারে?

ঐ আমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে সুখ খুঁজিলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ প্রেমে আছে ইহা সত্য, কিন্তু প্রেমকে যদি গুটিকতক বস্তুতে আবদ্ধ রাখিয়া সীমাবদ্ধ কর তাহা হইলে প্রেমের প্রেমত্ব থাকে না এবং তাহা হইতে সুখও পাওয়া যায় না। গুটি-কতক বস্তু আমার হইবে আমি তাহাদিগকেই ভালবাসিব এরূপ অবস্থায় দুঃখ ভিন্ন সুখ কদাপি হয় না।

ঐ বস্তু কয়েকটীকে "আমার" করিয়া রাখিতে গিয়া কষ্টই পাওয়া যায় সুখ পাওয়া যায় না; তাহারাও চিরদিন "আমার" হইয়া থাকে না। অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গ একটার পর একটা আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে; সকলেই তোমার মনোরঞ্জন করিতেছে, তুমি যদি কয়েকটী মাত্র তরঙ্গকে ভাল-বাস, অন্যগুলিকে চাওনা তাহা হইলে তুমি বঞ্চিত হইবে। সেই কয়েকটী তরঙ্গকে তুমি কি প্রকারে ধরিয়া রাখিবে? তাহারা আসিবে চলিয়া যাইবে, আবার নূতন একদল আসিবে। এই নূতন দলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিবে না? পুরাতন দলের জন্য বসিয়া বসিয়া কাঁদিবে? কয়েকটী মাত্র ফুল তুলিয়া আনিয়া তোড়া বাঁধিয়া তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া দিয়াছে। তুমি যদি কেবল ঐ তোড়ার ফুলগুলি-কেই ভালবাস, অন্য ফুলের দিকে ফিরিয়াও না দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে দিনকতক পরে তোড়ার ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, তোমার মনোরঞ্জন করিবার ফুল আর জগতে নাই—যদিও জগত ফুলে ভরা।

অনন্ত জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সকলই সুন্দর সকলকেই ভালবাসিতে শিখ; আমি, আমি, আমার আমার এই সকল কাল্পনিক চিন্তা দূর কর। সকলকে ভালবাসিতে পারিলে সকলই তোমার হইবে অথবা তুমিই সকলের হইয়া যাইবে। সর্ব্বদা আমিত্বের গণ্ডী মধ্যে থাকিয়া আমি, আমি, আমার, আমার, চিন্তা করিয়া তোমার মন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, মনটী সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন থাকে, কখনও ভয়, কখনও আশা, কখনও নৈরাশা, কখনও আনন্দ কখনও নিরানন্দ প্রভৃতি নানাপ্রকারের তরঙ্গে তোমার মনটী তরঙ্গায়িত থাকে, তুমি প্রাণ ভরিয়া কাহারও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পার না। তুমি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে পার না। একবার ঐ গণ্ডী হইতে সরিয়া যাও দেখি, তখন সকলেই তোমার আপনার হইবে, সকলের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিবে, সকলকেই পাইয়া পরম সুখী হইবে। তোমার দুনয়নে সর্ব্বদা প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে থাকিবে, যাহা দেখিবে, যাহা পাইবে, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক সমস্তই তোমার প্রেমের বস্তু হইবে, তুমি প্রেমসাগরে ভাসিতে থাকিবে। হাহাকার, দুঃখ, শোক, তাপ, নৈরাশ্য, মান, অভিমান, অহঙ্কার এ সকল কিছুই থাকিবে না। এই শিক্ষাই মনুষ্যজীবনের উচ্চ শিক্ষা এবং ইহাতেই আমাদের একমাত্র উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আসিবে, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অবস্থাটী মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থা লইয়াই মনুষ্য ধরাধামে আইসে কিন্তু আসিয়াই মায়াজালে আবদ্ধ হয়। জগতকে ভুলিয়া যায়, আত্ম-প্রেমে মত্ত হয়, প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা অবলম্বন করে, সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে!

পুত্রকলত্রাদিকে ভালবাসিতে হইবে না, তাহা-দের ভরণ-পোষণ, রক্ষাবেক্ষণ করিতে হইবে না, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হইবে, এ কথা কেহ বলিতেছে না। ঐ সকল তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভগবান তোমাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার কর্ত্তব্য তুমি অবশ্যই করিবে, তাহাদিগকে ভালবাসিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে আপনার মনে করিয়া মত্ত হইবে না। মায়ার বশীভূত হইবে না। সেগুলি তোমার সম্পদ ইহা কখনও মনে করিয়া অহঙ্কৃত হইবে না। উহারা তোমার সম্পদ নহে। তুমি তাহাদের রক্ষক মাত্র। যাঁহার সম্পদ তিনি পাঠা-ইয়াছেন, আবশ্যক হইলে আবার লইয়া যাইবেন। তুমি ভ্রান্ত হইয়া তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হও কেন?

ইহাতে তোমার দুঃখ বই সুখ নাই, ইহাতে তোমার হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম চলিয়া যায়, তোমাকে স্বার্থপর দাম্ভিক নীচাশয় করিয়া তুলে। তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর থাকে না। এই কুশিক্ষার বলে মনুষ্যসমাজ অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেমের সুধাভাণ্ডার হইতে সকলে বঞ্চিত হইয়াছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া সকলে দুঃখসাগরে ভাসিতেছে। ইহা কুশিক্ষা, ইহা ভ্রান্তি,—তুমি আমি এই কুশিক্ষা ও ভ্রান্তি দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যিনি মহান্, যিনি সকলের নিয়ন্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বঅন্তঃকরণে আছেন, যিনি সকল বুদ্ধির আকর, সকল জ্ঞানের আধারস্বরূপ যিনি সর্ব্বব্যাপক, যাঁহার শক্তিতে এই অনন্ত জগৎ চলিতেছে, সৃষ্ট হইতেছে, লয় প্রাপ্ত হইতেছে;—তিনি দেখিতে পান; তাই তিনি সময়ে সময়ে জগতের শিক্ষার্থ তদীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করেন। জগতকে এই বিশ্বজনীন প্রেমশিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, যীশু আসিয়াছিলেন, মহম্মদ আসিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব আসিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রেমের বাঁশরী লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, এবং সেই বংশীধ্বনিতে জগতকে মাতাইয়া তুলেন। সেই বংশী সমস্বরে এই গানই গাহিয়াছিল যে আত্মপর, মান অভিমান, উচ্চনীচ, ভেদাভেদ সব ভুলিয়া যাও। জগৎ তোমার—জগৎ তোমাকে বাহু তুলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য আসিতেছে, তুমি জগতকে আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ কর, প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন কর, প্রেমের সুবাতাস বহিতে থাকুক, নরনারী তাহা উপভোগ করিয়া অমরত্ব লাভ করুক। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের গহন কাননে বসিয়া এই বংশী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ব্রজবাসীগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের কুল, শীল, মান ও অভিমানের বাঁধন খসিয়া পড়িয়াছিল, মধুর বৃন্দাবন প্রেমময় হইয়াছিল; সেই প্রেমতরঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল।

ভগবান প্রেমময়, তিনি প্রেমের সাগর, আমরা সেই প্রেমসাগরের এক একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ—আমরা পরস্পর পৃথক্ নহি; আমরা সকলে এক প্রেম শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও, নিখিল বিশ্বকে প্রেমচক্ষে দেখ, শ্রীকৃষ্ণ জগতকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষামন্ত্র যখন বহুকাল পরে ভারতবাসী ভুলিয়া যাইতেছিল, তখন বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই অন্য প্রকারে জগতকে দিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি সাম্যমৈত্রীর ধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়া জগতকে আহ্বান করেন, ও জগতের লোক সেই ধ্বজার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। প্রাচ্য জগতে এই শিক্ষা বহুকাল যাবৎ চলে, কিন্তু কালের গতিতে সেই শিক্ষা যখন আবার লোপ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছিল তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আগমন করেন। তিনি প্রেমের তুমুল তুরীনিনাদে প্রাচ্যভূমিকে মাতাইয়া তুলেন, গৃহে গৃহে প্রেম বিতরণ করেন, ছোটবড় উচ্চনীচ তাঁহার নিকট কিছুই ছিল না। দুহাত তুলিয়া তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিতেন। প্রেমই আমাদের একমাত্র সাধ্য বস্তু, প্রেমই ভগবানের স্বরূপ; প্রেমকে পাওয়া গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। ইতরনির্ব্বিশেষে আমরা সকলে সকলকে প্রেমচক্ষে দেখিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব এবং প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিব, আত্মপর, উচ্চনীচ সমস্ত ভুলিয়া যাইব; জগতকে তিনি এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে শিক্ষার বীজ ভারতক্ষেত্রে বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করতেছে। ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার সহিত এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কালে যে ইহা ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বব্যাপী হইবে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি।

প্রাচ্যজগতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাপ্রভু চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতেও তেমনি যিশু, মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও জগতকে এই বিশ্বজনীন প্রেমই শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনুষ্য যে এক প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমই যে আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, জগতকে তাঁহারা ইহাই শিখাইয়াছিলেন।

পুনঃ পুনঃ এরূপ শিক্ষা পাইয়াও আবার আমরা উহা ভুলিয়া যাই, আবার আমরা স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হই, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই অবনতি আসিয়াছে। মনুষ্য-সমাজ পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া গিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া কাল্পনিক "আমি"র শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার ফলে অশান্তি হাহাকার যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হইতেছে। জগৎ এইপথে যতই অগ্রসর হইবে এই অশান্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাঁহার জগত তিনি রক্ষা করিবেন। এই কুশিক্ষাই সুশিক্ষা আনয়ন করিবে। কুশিক্ষাও জগতের মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই নাই। অন্ধকারে বাস না করিলে আলোকের জন্য আমাদের তীব্র তৃষ্ণা হয় না। অজ্ঞানবশতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলে জ্ঞানপিপাসা হইবে কেন? আবার জগতে সেই প্রেমের রাজ্য আসিবে, আবার আমরা দুবাহু তুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিব,জগতে দুঃখ থাকিবে না, শোক থাকিবে না, অশান্তি থাকিবে না, দ্বেষ, হিংসা নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান কিছুই থাকিবে না। আনন্দের ধ্বনিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইবে, প্রেমের ভাণ্ডার জগতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ব্রহ্মবাদী নিউম্যানের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রব্যবহার।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক হইলেন, তখন তাঁহার উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেবল ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেষ্টা ও ব্রাহ্মসমাজে বক্তার কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে তিনি ইংলণ্ডের নিউম্যান প্রভৃতি ব্রহ্মবাদীদিগের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করিয়া (১৮৬০ খৃঃ ৬ই জুলাই) উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজকে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচিত করিবার সূত্রপাত করিয়া দেন। তিনি নিজে নব্যবঙ্গের আদর্শ যুবক (typical Young Bengal) ছিলেন এবং তদানীন্তন নব্য-বঙ্গের যুবকদিগের হৃদয়ের ভাবটী বিলক্ষণ বুঝিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল কার্য্যেই তাঁহার সমসময় হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সমসময়ের ভাবটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। উভয়েরই উপযুক্ত মূল্য আছে বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই হয় যে, একজনের কাজের মূল্য লোকে যথাসময়ে ধরিতে পারে না, অপরের কাজের ন্যায্য মূল্য না ধরিয়া লোকে অতিরিক্ত মূল্য ধরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেশীয় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাবটী সে সময়ে জনসাধারণের হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করিল না, তাই সেই বিদ্যালয়গুলি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। সাধারণ বঙ্গযুবক তখন অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। ইংরাজজাতি তখন কিছু পূর্ব্বাবধি ভারত জয় করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছিল, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। কাজেই নব্যবঙ্গের প্রধান লক্ষ্য হইল ইংরাজদিগের সহিত আলাপপরিচয়ের উপযোগী, কথাবার্ত্তা চালাইবার উপযোগী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা। স্বদেশীয় ভাষায় দেশীয়ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে একটা স্বাধীনভাব রক্ষিত হইতে পারিত, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপর ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনের সক্ষমতার উপর এবং ইংরাজদিগের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশার উপর অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত বলিয়া নব্যবঙ্গের হৃদয়ে সেই প্রকৃত স্বাধীনভাব রক্ষিত হইতে পারিল না। আমাদের বিশ্বাস যে, সেই সময়ের ইংরাজী শিক্ষা ও বিপুল অর্থোপার্জ্জনে পক্ষপাত তদানীন্তন বঙ্গবাসী-দিগকে ক্রমশঃ আত্মচেষ্টাহীন ও পাশ্চাত্যদিগের

মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় অবধি আমরা কথায় কথায় দেখিতে চাহিলাম যে ইংরাজেরা কোন্ কাজ পছন্দ করেন, আমাদের কোন্ কাজ ইংরাজের চক্ষে সুন্দর লাগিবে, কোন্ কাজে আমরা পাশ্চাত্যদিগের নিকটে উৎসাহ পাইব। সেই যে নব্যবঙ্গে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে পরমুখাপেক্ষার তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেই তরঙ্গের আঘাত আজ আমাদের একালেরও দ্বারে আসিয়া লাগিতেছে।

নব্যবঙ্গের বলিতে গেলে প্রধানতম নেতা কেশবচন্দ্র তদানীন্তন যুবকদিগের অন্তর্নিহিত ভাব ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ যদি একবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হয়, তাহা হইলে ইহা নব্যযুবকদিগের হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিবে। প্রকৃতই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্যদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল, তেমনি স্বদেশীয়দিগেরও মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, ইহার ফলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যদিগের মুখাপেক্ষায় একটা প্রবল হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—পাশ্চাত্যদিগের ভালমন্দ বিচারকে আমাদেরও বিচারের ভিত্তি করিতে লাগিলাম। মহর্ষিদেব ও কেশবচন্দ্র, ইহাঁরা উভয়ে যদি সামঞ্জস্যসহকারে অবিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতেন, তবে এতদিনে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে এবং ভারতের মঙ্গলসাধক দেবমণ্ডলে জয়ধ্বনি পড়িয়া যাইত।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডীয় ব্রহ্মবাদীগণের সহিত পত্রব্যবহারের ফলে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব (F. W. Newman) ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভূতপরিমাণে জ্ঞান বিস্তার করিতে এবং তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে বিলাতে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। আমরা দেখি যে, উত্তরকালে এই ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছিল। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ভারতের সকল সমাজই পাশ্চাত্যদিগের দ্বারে সুবিধা পাইলেই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে দুইটী চিত্র তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। গ্রীসের অধিপতি আলেকজাণ্ডার যখন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া নিজেকে অতিমানব মনে করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন যে কোথায় এক যোগী বাস করিতেছেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীর দ্বারা তাঁহাকে গ্রীসে লইয়া যাইবার জন্য প্রভূত অর্থদানের প্রলোভন দেখাইয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজে সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে যোগীবর রৌদ্রের উত্তাপ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই রৌদ্র আটকাইয়া আলেকজাণ্ডর দাঁড়াইয়াছিলেন। তার পর যখন তিনি সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি চাহেন, তাহার উত্তরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। আর, আজ আমরা সমাজগৃহ স্থাপন করিব, বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিব, প্রতিপদে পাশ্চাত্যদিগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতেছি। এই ভিক্ষালব্ধ ধনে ধনবান হওয়াতে একদিকে আমাদের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইলে যেরূপ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারিতাম, তেমন স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে দেয় না; অপরদিকে যাহারা এরূপ ভিক্ষালব্ধ ধনের অভাবে দরিদ্রবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে কুণ্ঠিত হই না।

সম্ভবত নিউম্যান সাহেবের উপদেশের ফলে এই বৎসরেরই (১৭৮২ শকের) মাঝামাঝি, আমরা দেখি যে, কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি শিশুদেরও প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, শৈশবকালই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজবপনের সময়। শিশুদের জন্য একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিবার একটী কল্পনা যে উঠিয়াছিল, তাহা এই বৎসরের ভাদ্রমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাই না।

১৭০৩ শকের ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার কেশবচন্দ্র নিউম্যান সাহেবের সেই পূর্ব্বোক্ত পত্র অবলম্বনে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধনের বিহিত উপায় স্থির করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় তিনি তদানীন্তন বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালীর ফলে "কতকগুলি সত্য উদরস্থ করাইয়া দিবার" কুফল বর্ণনা করিয়া যাহাতে যুবকদের হৃদয়ে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ করানো হয়, যাহাতে দরিদ্রসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় এবং যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হয়, সেই সকল বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ সহজজ্ঞানে তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, ছাত্রের দল না পাইলে একটা মণ্ডলী গঠনের সুবিধা হইবে না। তাঁহার আহূত এই সভায় সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্যামাচরণ সরকার।

পরিচয়।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

যত দুখের বজ্র-লিখন
লিখছ তুমি আপন হাতে
আমার বুকের পাতে পাতে,
ততই ওগো হৃদি-রমণ!
সিক্ত হয়ে নয়নজলে
লুটছি তব চরণতলে!
ততই ওগো, বুঝছি ভাল
শুধুই তোমা আপন বলে!
চিতার আগুন যত জ্বাল
পারবে না আর যেতে ছলে!
যতই তুমি নিচ্ছ কেড়ে
স্নেহ আমায়-করত যারা
মুছিয়ে দিয়ে অশ্রুধারা,
ততই সখা, সবায় ছেড়ে
আমার সারা শূন্য-মনে
পাচ্ছি তোমা সংগোপনে!
ততই তোমা বাসছি ভাল
চাচ্ছি তোমা পরাণপণে!
তুমি আমার দুখের আলো
আঁধার-ঘেরা গহন-বনে!

শব্দব্রহ্ম।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভাষাকোলাহলময় বর্ত্তমান ভারতে আজকাল সকলেরই প্রাণ নিজ নিজ ভাষাসংস্কারের দিকে ছুটিয়াছে। বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; যেহেতু জাতির উন্নতি ভাষার উপরে প্রচুরপরিমাণে নির্ভর করে। আমরা যদি ভালরূপে কথা কহিতে না জানিলাম তবে আমাদের উন্নতি কোথায়? এক কথায় যুগ উল্টাইয়া যায়। কথার মাহাত্ম্য সকল দেশেই মানব বুঝিয়াছে। কথার যে কি মাহাত্ম্য আমাদের ভারতের বেদ তাহার সাক্ষী, খৃষ্টানদিগের বাইবেল তাহার সাক্ষী, এক কথায় সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থেরই প্রাণ কথা। কথাতেই সংসারে বার্ত্তা চলিতেছে। আমাদের ভাষায় আমরা কথার সঙ্গে বার্ত্তার যোগ না করিয়া থাকিতে পারি না। কথা না হইলে বার্ত্তা চলিতে পারে না। বার্ত্তা কথারই প্রকারান্তর, কথারই পুনরুক্তিমাত্র; ইহা ইংরাজী wordএর প্রাণ বা মূল। এই এক কথাতেই সমুদয় সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ কথাতেই বিবাহসংস্কার সিদ্ধ হয়। কথাতেই আইন। কথায় কথায় যুদ্ধ। কথায় কথায় সন্ধি স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক কথার কি মহিমা। তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কারণ পণ্ডিতেরা ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে কথা ভগবানেরই ধ্বনি। কথার মূলেই ভগবান। কথা আছে বলিয়াই শ্রুতি আছে, নহিলে শ্রুতির কোনও প্রয়োজন হইত না। ভগবান এই বিশ্বের মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগকে বিশ্বের ও বিশ্বাতীত ভাষায় উপদেশ দিতেছেন। এই দুই ভাষা বা কথার একটী অনাহত, অপরটি আহত। এই অনাহত ও আহত ভাবের প্রভাবে আমাদের ভাষা শ্রুতিসুখকর হয়; আমাদের শ্রুতিতে ছন্দের সঞ্চার হয়, আমরা স্বচ্ছন্দে ভাষাকে শ্রুতিসুখকর করিয়া তুলিতে সক্ষম হই, গীতিময়ী করিতে সমর্থ হই।

ভাষার মধ্যে এই আহত ও অনাহত ভাবের প্রভাব যে বিস্তৃত হয় তাহা সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই সংস্কৃত ভাষা যথার্থ সংস্কৃত হইয়া 'সংস্কৃত' আখ্যার উপযুক্তই হইয়াছে। এই দুই ভাব না বুঝিলে ভাষার সংস্কার-কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যেমন চিত্রে আলোছায়া বা দৃষ্ট-অদৃষ্টভাব, ভাষায় বা শব্দে সেইরূপ আহত বা অনাহত ধ্বনি।

আহত ও অনাহত ধ্বনি ভাষাকে চিত্র-বিচিত্র করিয়া তুলে; ভাষায় শ্রম ও বিশ্রম আনয়ন করিয়া তাহাকে musical করিয়া তুলে। তাহাতে ভাষায় এক নবতর আনন্দের সৃজন হয়। এই দুয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানবের ভাষা উন্নতি-গগনে উঠিতে পারে। দুয়ের মধ্যে একটীর অভাব হইলে তাহা উন্নত হইতে পারে না; তাহার সংস্কার-সাধন দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দুইয়ে মিলিয়াই বাস্তবিক কথা।

এই কথাই বাস্তবপক্ষে আমাদের অস্তিত্বের পরিচায়ক। কথাও যাহা, বস্তুতঃ ভাবও তাহাই। (ভূ-ধাতু) কথাতে আমাদের অভাব, ব্যক্ত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ভাবরূপে বিরাজ করিতেছে। ইংরাজী word শব্দেরও মূল আমাদের জর্ম্মন werden কথা মনে হয়; werden অর্থাৎ to be or to become। পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম কথার উপর কথা অর্থাৎ কথার স্রোত অনেকটা কথাবার্ত্তা। এই বার্ত্তারও মূল বর্ত্তন। এই বর্ত্তনের সঙ্গে werdenএর সাদৃশ্য আছে। তাই দেখিতেছি কথা অস্তিত্বের পরিচায়ক, কথা নাস্তিকতার বিরোধী। এক কথাতেই ঈশ্বর প্রকাশিত। কথাই অস্তিত্বের যেন সহচর—সহোদর। ঈশ্বর আছেন বলিয়াই ঈশ্বরের কথা। আমরা আছি বলিয়াই আমাদের কথা। না থাকিলে কথা থাকে না। ঈশ্বর চিরকাল থাকিবেন। তিনি নিত্য, তাই তাঁহার কথা চিরকাল থাকিবে। তাঁহার কথাও নিত্য। নিত্যের কথা নিত্য।" এই নিত্য, কথাই শব্দব্রহ্ম। এই নিত্য কথা শব্দব্রহ্ম—সকল কথার পরিস্ফোট হইতেছে এবং এই শব্দব্রহ্ম স্বয়ং আপন মহিমায় স্ফুটিত হইয়া আছে। এই হেতুই শাস্ত্রকারেরাও এই নিত্যশব্দকে 'স্ফোট' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। এবং বলিয়া গিয়াছেন "স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি"। ইংরাজী অভিধানে দেখিয়াছি word এক অর্থে Son of God, God অথবা Jesus Christকে বুঝায়।

এই কথা শিক্ষা দেয় বলিয়া সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ব্যাকরণকে বেদের বেদ-চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ইহাকে বেদের বেদরূপে সম্মানিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই ব্যাকরণই অব্যক্ত ভাবের একটা আকৃতি দেয় (বি+আ+কৃ), রহস্যকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাই ব্যাকরণের এত মান ভারতে; ভারতে কেন, আমার বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীতে।

আমাদের বঙ্গভাষার আকৃতি যখন বিশেষরূপে পুষ্ট হইয়া উঠিবে তখন আপনা হইতেই তাহার বিশেষ আকৃতি ফুটিয়া উঠিবে,—তাহার ব্যাকরণ: স্বাভাবিক ও সহজ হইবে। সংস্কৃত যখন রীতিমত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখনই তাহার ব্যাকরণের বা বিশেষ রূপ ও আকৃতি দিবার ব্যবস্থা আবশ্যক হইল। তাহা না হইলে পূর্ব্ব হইতে অপরিপুষ্ট ভাষাকে বিশেষ আকৃতিতে আবৃত করিয়া ফেলিলেই আর সে ভাষার শুদ্ধ ভাব দেখিতে পারিবে না। গোড়া হইতেই বাঁধিলেই সে কলমের চারাগাছের মত ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া যায়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ আনন্দময় অবস্থার অনির্ব্বাচ্য অনুভূতি অন্যকে পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বলিতে গেলে 'আমি-তুমি' এই দ্বৈতাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে যে বর্ণনা আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং এই বর্ণনা যদি গৌণ হয়, তবে জগতের উৎপত্তি, রচনা প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবার

অন্য কোন কোন স্থানে যে শুদ্ধ দ্বৈতী বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়, তাহাও গৌণ বলিয়াই মানিতে হইবে। উদাহরণ যথা.—আত্মস্বরূপী, শুদ্ধ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও অবিকারী ব্রহ্ম হইতেই পরে হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ পুরুষ অথবা অপ (জল) প্রভৃতি জগতের ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ সৃষ্টি করিয়া পরে জীবরূপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তৈ. ২. ৬; ছাং. ৬. ২. ৩; বৃ. ১. ৪. ৭), এইরূপ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা উপনিষদে করা হইয়াছে তাহা অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নির্গুণ পরমেশ্বরই যদি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন করিয়াছে এই কথাও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ লোককে জগৎ-রচনা বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতের ভাষাই একমাত্র সাধন হওয়ায়,ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি উক্ত বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতের যোগসূত্রটি বজায় আছে এবং এই প্রকার দ্বৈতের ব্যবহারিক ভাষা ব্যবহৃত হইলেও মূলে অদ্বৈতই সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। সূর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, সূর্য্য উদয় হইল কিংবা অস্ত হইল এই ভাষা যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মস্বরূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে অখণ্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্ধারণ হইলেও "পরব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে" এইরূপ ভাষা উপনিষদে প্রয়োগ হইয়া থাকে; এবং গীতাতেও সেইরূপ "আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও অজ" (গীতা. ৭. ২৫) এইরূপ উক্ত হইলেও "আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকি" (গী. ৪. ৯) এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহা শব্দশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত মত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বত্র একই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার বিনশ্বর সগুণ পদার্থ কিরূপে সৃষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, নামরূপাত্মক জগৎকে 'মায়া' বলিলেও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ মায়া উৎপন্ন হওয়া তর্কদৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ খণ্ড হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা সাংখ্যশাস্ত্রের উক্তি অনুসারে প্রকৃতির ন্যায় নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের কোন সগুণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া লৌহযন্ত্রের মধ্যে বাষ্পের ন্যায় তাহার অন্তর্যামী পরব্রহ্মরূপ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব থাকিতেছে, (বৃ. ৩. ৭), এবং দাড়িম ফলের মধ্যে তাহার দানার ন্যায় ঐক্য এই দুয়ের মধ্যে আছে এইরূপ মনে করা অধিক প্রশস্ত। কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদে কখন দ্বৈতী ও কখন শুদ্ধ অদ্বৈতী বর্ণনা থাকায় এই দুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে মুখ্য মানিয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হওয়া পর্য্যন্ত মায়িক দ্বৈতের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার মতন দেখায়,—এইরূপ মনে করিলে সমস্ত বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈতপক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা—"তৎ ত্বমসি" এই বাক্যান্তর্গত পদের অন্বয় দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক লাগে না। দ্বৈতীদিগের মনে ইহা একটা খটকা বলিয়া মনে হয় না এরূপ নহে। কিন্তু তত্ত্বম্-তস্য ত্বম্—অর্থাৎ তোমা হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন ব্যক্তি তাহার তুমি, সে তুমি নও—এইরূপ কোন রকমে এই মহাবাক্যের অর্থ করিয়া দ্বৈতী নিজের মনকে আশ্বাস দিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, যাঁহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই 'টানাবুনা' অর্থ সত্য নহে বলিয়া তখনই বুঝিতে পারিবেন। কৈবল্যোপনিষদে আবার "স ত্বমেব ত্বমেব তৎ" (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ "তৎ" ও "ত্বম্" শব্দ দুইটীকে উল্টাপাল্টা করিয়া উক্ত মহাবাক্যের অদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই দেখান হইয়াছে। আর অধিক কি বলিব? সমস্ত উপনিষদের অধিকাংশ কাটিয়া না ফেলিলে কিংবা জানিয়া বুঝিয়া তাহার প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন রহস্য আছে, এরূপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্তু এই বাদপ্রতিবাদ কখনই শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে আমি অধিক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাঁহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিতে পারেন। যে মহাত্মারা উপনিষদে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯; কঠ ৪. ১১)—এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে মূলে সমস্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাং. ৬. ২. ২), এইরূপ আপন প্রতীতি স্পষ্ট বলিয়া পরে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—এ জগতে যে নানাত্ব দেখে সে জন্মমরণের ফেরে পড়িয়া যায়—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে এরূপ আমার মনে হয় না। কিন্তু অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাকা প্রযুক্ত সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদা-

চিৎ যেরূপ কিছু অবকাশ পাওয়া যায়, গীতা-সম্বন্ধে সেরূপ নহে। গীতা একই গ্রন্থ হওয়ায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে; এবং সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে "সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও যে একই বজায় থাকে" (গী. ৮. ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ায়, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া সর্ব্বত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া আছে (গী. ১৩. ৩১,) এইরূপ অদ্বৈতমূলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না। অধিক কি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির যে নীতিতত্ত্ব গীতাতে বলা হইয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত অন্য প্রকারের বেদান্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়ে কিংবা তদুত্তরকালে অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক যে সকল যুক্তি অথবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে তাহার সমস্তই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই গীতা হইয়াছে; এবং সেইজন্য কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ তাহাতে হইতে পারে না, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেইজন্য গীতাতে যে বেদান্ত আছে তাহা সাধারণত শঙ্করসম্প্রদায়ের জ্ঞানানুরূপ অদ্বৈতী, দ্বৈতী নহে, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে গীতা ও শঙ্করসম্প্রদায় ইহাদের মধ্যে সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত। কিন্তু তাহার বিচার পরে করা যাইবে। এখনকার বিষয় তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয়; এবং এই তত্ত্বজ্ঞান গীতা ও শঙ্করসম্প্রদায় এই দুয়ের মধ্যেই একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইহাই এখানে বক্তব্য। অন্য সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্করভাষ্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণই এই।

সমস্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিতে একপাশে সরাইয়া রাখিবার পর, একই নির্ব্বিকার ও নির্গুণ তত্ত্ব থাকিয়া যায় এবং সেইজন্য পূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিচারান্তে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়—ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নির্গুণ ও অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ জগৎ কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদান্তদৃষ্টিতে তাহার স্পষ্টরূপ বিচার করা আবশ্যক। নির্গুণ পুরুষেরই সহিত ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যেরা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলে জগতের মূলতত্ত্ব দুই হওয়ায় অনেক কারণ হইতে উপরে পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত অদ্বৈতমতে বাধা পড়ে; এবং সগুণ প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে একই মূল নির্গুণ দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নির্গুণ হইতে সগুণ—অর্থাৎ যাহা কিছু নাই, তাহা হইতে অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না, এই সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে। এইজন্য, দুইদিক্ হইতেই বাধা। এখন, এই জটিল প্যাঁচ ঘুচিবে কি করিয়া? অদ্বৈতকে না ছাড়িয়া নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা বলিতে হইবে; এবং সৎকার্য্যবাদের দৃষ্টিতে উহা বন্ধ হইবার মতো দেখায়। পেঁচটা খুবই বড় সংগ; অধিক কি, অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিতে হইলে, কাহারও কাহারও মতে, ইহাই মুখ্য বাধা এবং এই জন্যই তাহারা দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতী পণ্ডিতেরা নিজ বুদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হইতে মুক্ত হইবারও এক সযুক্তিক ও অক্ষুণ্ণ মার্গ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, কার্য্য ও কারণ এই দুই-ই যখন একই গণ্ডীর মধ্যে কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই সৎকার্য্যবাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই জন্য সত্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সগুণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করিবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি তখনকারই যখন দুই পদার্থই সত্য; যেখানে এক পদার্থ সত্য ও অন্যটি শুধু তাহার অনুরূপ, সেখানে সৎকার্য্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিকেও স্বতন্ত্র ও সত্যপদার্থ বলিয়া সাংখ্য মানিয়া থাকেন। তাই সাংখ্য, নির্গুণ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকৃতির উৎপত্তির উপপত্তি, সৎকার্য্যবাদের অনুসারে করিতে পারে না। কিন্তু মায়া অনাদি হইলেও তাহা সত্য ও স্বতন্ত্র নহে, গীতার উক্তি অনুসারে তাহা 'মোহ' 'অজ্ঞান' কিংবা 'ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষয়', এইরূপ অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, সৎকার্য্যবাদ হইতে নিষ্পন্ন আপত্তি অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না। পিতা হইতে পুত্র হইলে পিতার গুণ-পরিণামের দ্বারা সে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ আমরা বলি; কিন্তু পিতা একই ব্যক্তি হইয়া তিনি যখন কখন বালকের, কখন যুবকের কখন বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন এই ব্যক্তির মূলে এবং তাঁহার অনেক রূপের মধ্যে গুণ-পরিণামরূপী কার্য্য-কারণভাব থাকে না, এইরূপ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, সূর্য্য একই ইহা নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর তাহার প্রতিবিম্ব একটা ভ্রম, গুণপরিণামপ্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য সূর্য্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ দূরবীণে কোন গ্রহের প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিলে পর, কেবল

চোখে দেখা সেই গ্রহের স্বরূপ চোখের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত উৎপন্ন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র স্পষ্ট বলে। যে কোন বিষয়ই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর হইলেই তাহাকে স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায় না—ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার পর, ঐ ন্যায়ই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রেও প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচক্ষুরূপ দূর্বীণের দ্বারা নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মই সত্য, এবং জ্ঞানশূন্য চর্ম্মচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরব্রহ্মের কার্য্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন শুধু একটা ভ্রম অর্থাৎ মোহা-ত্মক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না এই আপ-ত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, দুই বস্তু একই গণ্ডী-ভুক্ত নহে; একটি সত্য আর একটী শুধু প্রতীয়মান রূপ মাত্র; এবং মূলে একই সত্য বস্তু হইলেও দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অজ্ঞানে, দৃষ্টিবিভ্রমে সেই একই বস্তুর প্রতীয়-মান রূপ পরিবর্ত্তিত হয় এইরূপ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। উদাহরণ যথা—কানে শোনা শব্দ আর চোখে দেখা রং, এই দুই গুণ ধর। তন্মধ্যে কানে আমরা যে শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া শব্দ অর্থাৎ বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গতি এইরূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ আবার চোখে দেখা লাল, হল্‌দে, নীল প্রভৃতি রংও মূলে একই সূর্য্যালোকের বিকার, এবং সূর্য্যালোকও একপ্রকার গতি এইরূপ এক্ষণে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হই-য়াছে। 'গতি' মূলে একই হওয়ায় কান যদি তাহাকে শব্দ ও চোখ যদি তাহাকে রং বলিয়া ঠাওরায়, তবে এই ন্যায়ই অধিক ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নামরূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৎকার্য্যবাদের সহায়তা ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই প্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, মনুষ্যের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপনা-আপনিই এক নির্ব্বিকার বস্তুর উপরেই শব্দ-রূপাদি নামরূপাত্মক গুণসমূহের 'অধ্যারোপ' করিয়া নানাপ্রকার প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু মূলের একই বস্তুতে এই প্রতীয়মান রূপ, গুণ কিংবা এই নামরূপ থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এবং এই অর্থই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, অথবা চোখে আঙ্গুল দিলে এক বস্তুকে দুইটী দেখা, অথবা অনেক রংয়ের চসমা পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বেদান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি মনুষ্যকে কখনই ছাড়িয়া যায় না বলিয়া জগ-তের নামরূপ কিংবা গুণ সর্ব্বদাই তাহার নজরে পড়িবে ইহা সত্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক স্বরূপ দেখা যায়, তাহাই সেই জগ-তের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ এরূপ বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যদি সে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় তখনও যে সেইরূপ দেখা যাইবে এরূপ নহে। এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে তাহার নিত্য ও প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মূলতত্ত্ব নির্গুণ, কিন্তু মনুষ্যের নিকট উহা সগুণ দেখায়; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, মূল বস্তুর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েরই পরীক্ষা করিতে হয় বলিয়া এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উত্থিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত হন, কিংবা মনুষ্যের নিকট উহা অমুক প্রকার দেখায় বলিয়া তাহার ত্রিকাল-অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। তাই, জগতের মূলে অবস্থিত সত্যের মূলস্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহার বিচার করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষে বিচার করা আব-শ্যক হয়। এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত গুণ স্বতই চলিয়া গিয়া ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নির্গুণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ সিদ্ধ হয়। কিন্তু যে নির্গুণ তাহার বর্ণনা কে করিবে, আর কি প্রকারে করিবে? এইজন্য পরব্রহ্মের চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল নির্গুণ নহে, তাহা ছাড়া অনির্ব্বাচ্য; এবং এই নির্গুণ স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রিয়যোগে সগুণ রূপ দেখিতে পায়, অদ্বৈতবেদান্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণকে সগুণ করিবার এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্র ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন যে, মানবজ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হয়, এইজন্য ইহা ইন্দ্রিয়াদির অজ্ঞান এবং নির্গুণ পরব্রহ্মে সগুণ জগতের রূপ দেখা সেই অজ্ঞা-নের পরিণাম; কিংবা ইন্দ্রিয়াদিও পরমেশ্বরের জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সগুণ জগৎ (প্রকৃতি) নির্গুণ পরমেশ্বরেরই এক 'দৈবী মায়া' এইরূপ নিশ্চিত অনু-মান করিয়াই এই স্থানে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে হয় (গী. ৭. ১৪)। অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট পরমেশ্বর ব্যক্ত ও

সগুণ দৃষ্ট হইলেও পরমেশ্বরের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নির্গুণ হওয়ায় তাহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের চরমসীমা, ইত্যাদি গীতাতে যে বর্ণনা আছে (গী. ৭. ১৪, ২৫, ২৫) তাহার তত্ত্ব পাঠকের এক্ষণে উপলব্ধি হইবে। পরমেশ্বর মূলে নির্গুণ, তাহার মধ্যেই মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি সগুণ জগতের বিবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখিতে পায়, এইরূপ নির্ণয় করিলেও এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ কি বুঝাইবার জন্য আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যখন বায়ুতরঙ্গের উপর শব্দরূপাদি গুণের কিংবা শুক্তির উপর রজতের অধ্যারোপ করে তখন বায়ুতরঙ্গের মধ্যে শব্দরূপাদির কিংবা শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ থাকে না ইহা সত্য; কিন্তু অধ্যারোপিত গুণ তাহাতে না থাকিলেও উহা হইতে ভিন্ন গুণ মূল পদার্থের মধ্যে থাকিবেই না এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ না থাকিলেও রজতের গুণের অতিরিক্ত অন্য গুণ উহাতে থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইহা হইতে আপন অজ্ঞানে মূল ব্রহ্মের উপর ইন্দ্রিয়াদির অধ্যারোপিত গুণ এই ব্রহ্মের মধ্যে নাই বলিলেও অন্য গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে কি নাই, এবং যদি থাকে তবে তাহা নির্গুণ হয় কিরূপে, এইরূপ এক সংশয়ও এই স্থানে আসে। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মূল ব্রহ্মের মধ্যে অন্য গুণ আছে এরূপ স্বীকার করিলেও তাহা আমরা জানিব কিরূপে? মনুষ্য যে গুণ অবগত হয় তাহা নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অবগত হয়; এবং যে গুণ ইন্দ্রিয়গোচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই পারে না। সার কথা এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত যদি অন্য কোন গুণ পরব্রহ্মে থাকে, তাহা জানা আমাদের সাধ্য নহে, এবং তাহা পরব্রহ্মের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যায়শাস্ত্রদৃষ্টিতে ঠিক্ নহে। তাই গুণশব্দে "মনুষ্যের জ্ঞানগম্য গুণ" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম 'নির্গুণ' ইহা বেদান্তী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। মনুষ্যের অচিন্তনীয় এইরূপ গুণ কিংবা শক্তি মূল পরব্রহ্ম স্বরূপের মধ্যে আছে অদ্বৈত বেদান্তও এরূপ বলেন না, আর অপর কেহ তাহা বলিতে পারে না। অধিক কি, বেদান্তীগণও ইন্দ্রিয়াদির উপরি-উক্ত অজ্ঞান কিংবা মায়াকে সেই মূল পরব্রহ্মেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ত্রিগুণাত্মক মায়া কিংবা প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে; একপদার্থী নির্গুণ ব্রহ্মের উপর মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা অজ্ঞানবশত সগুণ প্রতীয়মান রূপের অধ্যারোপ করিয়া থাকে। এই মতকে 'বিবর্ত্তবাদ' বলে। নির্গুণ ব্রহ্ম একই মূলতত্ত্ব হওয়ায়, নানাবিধ সগুণ জগৎ প্রথমে কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল,—অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে ইহার এই উপপত্তি। কাণাদন্যায়শাস্ত্রে অসংখ্য পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইয়াছে; এবং নৈয়ায়িক এই পরমাণুকে সত্য বলিয়া মানে। তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ হইতে আরম্ভ হইলে পর, জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল, এইরূপ তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে, পরমাণুদের সংযোগ আরম্ভ হইলে পর জগৎসৃষ্ট হয়, তাই ইহাকে 'আরম্ভবাদ' বলে। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের অসংখ্য পরমাণুসম্বন্ধীয় মত স্বীকার না করিয়া "একপদার্থী, সত্য ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই" ইহাই জড়জগতের মূলকারণ, এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অন্তর্গত গুণবিকাশের দ্বারা কিংবা পরিণামের দ্বারা ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। এই মতকে 'গুণপরিণামবাদ' বলে। কারণ, এক মূল সগুণ প্রকৃতির গুণবিকাশের দ্বারা সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই মতবাদকে অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। পরমাণু অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত অদ্বৈতমতানুসারে উহা জগতের মূল হইতে পারে না; এবং প্রকৃতি এক হইলেও উহা পুরুষ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, এই দ্বৈতও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকারে এই দুই মতবাদকে ছাড়িয়া দিলে এক নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ, সৎকার্য্যবাদঅনুসারে নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে বেদান্তী বলেন যে, সৎকার্য্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কার্য্য ও কারণ এই দুই বস্তু যেখানে সত্য সেইখানেই খাটে। মূল বস্তু যেখানে একই এবং তাহার শুধু বাহ্যরূপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখা, ইহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম না হইয়া দ্রষ্টাপুরুষের দৃষ্টিভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।* এই ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ জগতের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, ব্রহ্ম নির্গুণ,—মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাহার মধ্যেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা বিবর্ত্তবাদ। একই মূল সত্য দ্রব্যকে

---

* ইংরাজীতে এই অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing in itself.

ধরিয়া তাহার উপরেই অনেক অসত্য অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, ইহাই বিবর্ত্তবাদের মত; এবং প্রথমেই দুই সত্য দ্রব্যকে ধরিয়া তন্মধ্যে একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানাগুণযুক্ত অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয় ইহাই গুণপরিণামবাদের মত। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়—ইহাই বিবর্ত্তবাদ; এবং নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি হওয়া কিংবা দুধের দই হওয়া ইহাই গুণপরিণাম। এই কারণবশতই বেদান্তসার গ্রন্থের এক সংস্করণে দুই মতবাদের এই লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

সতত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম উদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাভাবো বিবর্ত্তঃ স উদীরিতঃ॥

"কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্য অন্য প্রকারের বস্তু হয় তখন তাহাকে (গুণ-) 'পরিণাম' বলে; এবং সেরূপ না হইয়া মূল বস্তু যখন অসত্যরূপে (অতাত্ত্বিক) প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে" (বে. সা. ২১)। আরম্ভবাদ নৈয়ায়িকদিগের, গুণপরিণামবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্ত্তবাদ অদ্বৈতবেদান্তীদিগের। অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা প্রকৃতি এই দুই সগুণ বস্তুকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানেন না। কিন্তু আবার সৎকার্য্যবাদ অনুসারে নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব এই আপত্তি আসে। ইহা দূর করিবার জন্য বিবর্ত্তবাদ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে, কাহারও কাহারও যে ধারণা হইয়াছে যে, বেদান্তী গুণপরিণামকে কখনই স্বীকার করেন না, কিংবা করিবেন না, তাহা ভুল। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব এইরূপ অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের কিংবা অন্য দ্বৈতীদিগেরও যে মুখ্য আপত্তি তাহা অপরিহার্য্য নহে। একই নির্গুণ ব্রহ্মেতে মায়ার অনেক প্রতীয়মান বাহ্যরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে ইহাই দেখানো বিবর্ত্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখা যাইতে পারে, বিবর্ত্তবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তার গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদান্তশাস্ত্রের কোনও বাধা নাই। মূলপ্রকৃতি স্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সত্য নহে—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্য উক্তি। প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিয়া এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান রূপের গুণ, এইরূপ নানাগুণাত্মক রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ মানিতে অদ্বৈত বেদান্তের কোন বাধা নাই। তাই "প্রকৃতি আমারই মায়া" (গী. ৭. ১৪; ৪. ৬) এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিলেও ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত (গী. ৯. ১০) এই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তার "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গী. ৩. ২৮; ১৩. ২৩) এই নীতি অনুসারেই হইয়া থাকে, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, বিবর্ত্তবাদ অনুসারে মূল নির্গুণ পরব্রহ্মেতে একবার মায়ার ভ্রান্ত রূপ উৎপন্ন হইলে পর, এই মায়িক রূপের অর্থাৎ প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্য জগৎ এই মায়াত্মক রূপ বলিলে, এই রূপের যে রূপান্তর হইয়া থাকে তাহার জন্য গুণোৎকর্ষের ন্যায় কোন একটা নিয়ম চাই এইরূপ বলিতে হইবে এরূপ নহে। মায়াত্মক রূপের বিস্তারও নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে ইহা বেদান্তীরা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথাটা এই যে, মূলপ্রকৃতির ন্যায় এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মায়িক নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত; তাঁহার সত্তার দ্বারা এই নিয়মের নিয়মত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন করিবার সামর্থ্য, প্রতীয়মান-রূপবিশিষ্ট সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রকৃতির হইতে পারে না।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত লোকদিগের জন্য উৎকণ্ঠা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

যতই দূর আত্মীয় হউক, অথবা চাকর-বাকর হউক, বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তখনি ঐ পীড়িত ব্যক্তি যে কামরায় থাকে সেই কামরায় উনি গিয়া তাহার সমাচার লইতেন। "ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা তুমি নিজে দেখিয়া শুনিয়া কর, আর কাহারও উপর ভার দিবে না," এইরূপ আমাকে উনি আদেশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, "সেই ব্যক্তি বেশ ভাল হইয়া সম্মুখে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যতক্ষণ না বেড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুইবেলা খাইবার সময় খোঁজখবরও লইবে। বিস্মৃত হইবে না।" এই সব কথায় আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হইত এবং আমি কখন কখন বলিতাম যে, "এত কাজের মধ্যে এবং নানাপ্রকার চিন্তায় মন নিমগ্ন থাকায়, কখন কখন ঘরের লোকের সঙ্গেও কথা কহিবার তোমার ফুরসৎ হয় না, কিন্তু এইরূপ ছোটখাটো বিষয়সম্বন্ধে প্রতিদিন দুইবেলা খোঁজখবর করা আমার মনে

থাকে কি করে'? অমুক বিষয় করিতে হইবে—আমি স্মরণ করিয়া রাখিব মনে করিলেও ত আমার স্মরণে থাকে না। এই সম্বন্ধে আমারও কখন কখন রাগ হয়। তা ছাড়া, এই ভোলা-স্বভাবের দরুন রাগ হওয়া সে স্বতন্ত্র কথা। যে কাজ করিতে হইবে সেই কাজ কিংবা সেই মনুষ্যকে চোখের সামনে না দেখিলে আপনা-আপনি মনে পড়ে না।" তখন উনি বলিলেন যে, স্মরণ থাকা না থাকা—সেই কাজের ভাবনার উপর এবং আপনার জবাবদিহির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই দুই বিষয়-সম্বন্ধে মনের শিথিলতা থাকিলে প্রত্যেক কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়। যে বিষয় অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত পৌছোয় অর্থাৎ যার সম্বন্ধে ভাবনা হয়—তারই নাম উৎকণ্ঠা। সেরূপ কাজ প্রায় ভোলা যায় না। যখন নিজের মন বিশেষ দুঃখে, ভাবনায় কিংবা তীব্র বেদনায় ডুবিয়া থাকে তখনই ইহার ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু এইরূপ সময়েই কখন কখন ব্যতিক্রম হয়, এবং ব্যতিক্রম হইলেও দোষের হয় না।

১৮৯৬।৯৭ অব্দে যখন বোম্বায়ে প্রথম প্লেগ আরম্ভ হয়, তখন প্লেগ রোগের কথাও কেহ শুনে নাই। তখন তাহার এতটা উগ্র স্বরূপের কল্পনা কিরূপে আসিবে? প্রথম প্রথম এই রোগের কথা সত্য বলিয়াই মনে করিতাম না। নীলের চারা না পাইলে, এইরূপ কোনপ্রকার অদ্ভুত ও অসম্ভাব্য গুজব নীলের ব্যাপারীরা উঠাইত,—এই কথা পুরাতন বৃদ্ধ লোকেরা বলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া, "ঘাড়ভাঙ্গা", "হাঁটুভাঙ্গা" "হাঁকমারা" প্রভৃতি রোগসম্বন্ধে যে গুজব উঠে তাহার মধ্যে ইহাও এক, এইরূপ মনে হইত; কিন্তু টাইম্‌স্, গেজেট্, অ্যাড্‌ভোকেট্ পত্রে যখন এই রোগের উগ্রতাসম্বন্ধে স্তম্ভ-কে-স্তম্ভ ভরিয়া যাইতে লাগিল, তখন সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য গেল। তার কিছু দিনের পর, কোঠাঘরে, স্নানাগারে, নীচের তালার মুড়িতে, সেইরূপ আবার বহিরুদ্যানের খোলা জায়গায় বড় বড় ইন্দুর খামকা বাহিরে আসিয়া বসে এবং একটু ছাঁপ লাগিলেই সেইখানেই মরে,—এইরূপ তিন চার জন চাকর আসিয়া আমাকে বলিল। কিন্তু দৈনিক পত্রে এই বৃত্তান্ত যত দিন না পড়িয়াছিলাম ততদিন সে বিষয়ে কিছুই মনে হয় নাই এবং আমি—ওঁকেও এই বৃত্তান্ত বলি নাই। বরং চাকরদিগকে আমি বলিলাম, ইন্দুরগুলা আপনা-আপনি মরচে সে ভালই! আজকাল ইন্দুর চারিদিকেই বড় বেশী হয়েছে। ওদের মারবার জন্য কমিটির লোকেরা নর্দ্দামায় বিষ ঢেলে দিয়ে থাকবে, তাই খেয়ে মরচে।" এইরূপ ৭৮ দিন অতীত হইলে পর, একদিন টাইম্‌স্-পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছে দেখা গেল যে—প্লেগের বিষ কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার প্রধান চিহ্ন—ইন্দুর আপনা-আপনি মরিতেছে, এবং ইন্দুর এইরূপ মরিতে থাকিলে, সেই বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নহে। একেবারে সেই বাড়ী ছাড়িয়া অন্য স্থানে গিয়া থাকা আবশ্যক। এই লেখা উনি পড়িবামাত্র আমাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই লেখাটা পড়ে দেখে তুমি সতর্ক হয়ে থেকো। আমাদেরও কখন বাহিরে যেতে হবে তার ঠিক্ নেই"। আমি সমস্ত শুনিয়া চুপ্ করিয়া রহিলাম। সকাল বেলায় কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া আমি সংবাদপত্র দুফর বেলায় পড়িব মনে করিয়া উঠাইয়া রাখিলাম এবং দুফর বেলায় সুবিধা পাইলেই পড়িয়া দেখিলাম, এবং ঐ পত্রের লেখা অনুসারে প্লেগের বিষ আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে এইরূপ আমি লক্ষ্য করিলাম। অতএব এখন এই বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নহে, বাড়ী আসিলে এই বৃত্তান্ত ওঁর নিকট বলিয়া কালই অন্য কোথাও গিয়া থাকা যাইবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী আসিবামাত্র এই সমস্ত কথা আমি বলিলাম। তাহা শুনিয়া তাহার পর দিন সকালে বালকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, চৌপাটী প্রভৃতি স্থানে আমরা ৫।৬ টা বাড়ী দেখিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বাড়ীই আমাদের থাকিবার মতো নহে। প্লেগের প্রথম বৎসর হওয়ায় হাইকোর্টের উকীল লোকেরা কোর্টে এইরূপ দরখাস্ত করিল যে, প্লেগের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের আবশ্যক হইয়াছে এবং সেইজন্য কোর্টে ১১টার সময় হাজির হওয়া অসম্ভব হইবে। এইজন্য কোর্ট আমাদের জন্য কোনপ্রকার বন্দোবস্ত করিবেন। এই দরখাস্ত কোর্ট শুনিয়া ১১র বদলে ১২॥০ সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন কার্য্য চলিবে ও তিন দিন ছুটি হইবে এইরূপ স্থির করিলেন। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই চারদিন কোর্টের কাজ চলিবে। বৃহস্পতিবারে ২টা হইতে সোমবারে ১২টা পর্য্যন্ত ছুটি থাকায় বোম্বাই ছাড়িয়া যে সকল লোকদিগের বাহিরে থাকিবার জন্য যাইতে হইবে সেই সব লোকদিগের এই ছুটি খুব সুবিধার ও সুখের হইল। সে যাক্। আমরা বাড়ী না পাওয়ায় এখনও প্রথমবার বাঙ্গলাতেই ছিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া আমি নীচে আসিবামাত্র আমাদের পাচিকার মেয়েটি একটু খোঁড়াইয়া চলিতেছে এইরূপ আমার নজরে পড়িল। মেয়েটির বয়স ১৬।১৭ হইলেও স্বভাবে একেবারেই হাবলা রকমের ছিল। সে দুই ছেলের সঙ্গে খেলিতেছিল। তাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে কেশব খোঁড়াচ্ছিস কেন?" ইহা শুনিয়া সে বলিল, আমার জ্বর হয়নি, কোন অসুখ নেই," এই কথা

বলিয়া ভয়ের ভাবে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। তাহার এই দৃষ্টি ও ভয়ের ভঙ্গী দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল; এবং সখু ও মামু যে দুই ছেলে তাহার নিকটে ছিল উহাদিগকে উপরের ছাদে নিয়ে যা, ঐখানেই খেলা করতে দে, নীচে যেতে দিস্‌'নে; আর দেখ্, উপরের থর্ম্মমেটারটা এনে দে"—এই কথা আমি একজন চাকরকে বলিলাম। এই কথা অনুসারে সে ছেলেদিগকে লইয়া গেল এবং থর্ম্মমেটারটা নীচে আমার নিকট আনিয়া দিলে পর আমি তাহা কেশবের গায়ে লাগাইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কোথাও কি ব্যথা হয়েছে? কোথাও কি গাঁট ফুলেছে? সে স্পষ্ট 'না' বলিয়া, স্থানে স্থানে গাঁট টিপিয়া দেখাইল এবং গাঁট ফুলিয়া উঠে নাই—এইরূপ বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তার এই চেষ্টায় আমার সংশয় আরও বলবৎ হইল এবং সত্য কি না তাহা কোন ফিকিরে বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট হইতে থর্ম্মমেটর ফেরত লইয়া আমি দেখিলাম সেই পারা ১০২ ডিগ্রীর উপর চড়িয়াছিল। তখন থর্ম্মমেটারের পানে ও কেশবের পানে চাহিয়া দুই তিন মিনিট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কেশব ভয় পাইয়া আমাকে বলিল, "কি দেখছ? নাড়ীতে জরটর কিছু নেইত? তখন আমি তাহার দিকে তাকাইয়া তখনি বলিলাম,—কি কেশব? তুই বোকা, আমাকেও তুই ঠকাতে চাস! অরে মূর্খ, জর-ত-জর, তোর গাঁট ফুলেছে এই নাড়িতেই দেখা যাচ্ছে; আর তুই আমাকে বল্‌চিসনে? এইবার সে একেবারে কাঁদো-কাঁদো হইয়া ও ভয় খাইয়া আমাকে বলিল; হাঁ সত্যই একটা সুপারির মত গাঁট ফুলে উঠেছে, কিন্তু কোন ব্যথা নেই। "আমি কি জানি তোর নাড়িতে যা দেখছি তাই বলছি।" এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, ঠিক কি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া যদিও একটু ভাল মনে করিলাম তথাপি সবশুদ্ধ আমার ভয় ও ভাবনা খুবই হইল। "ঐ ওদিককার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্, বাহিরে আসিস্‌নে, আর বাড়ীময় ঘুরে বেড়াস্‌নে এইরূপ তাকে বলে পাঠিয়ে দিলাম এবং তারপর কি করা যাইবে তাই ভাবিতে লাগিলাম। রান্না সমস্তই হইয়া গিয়াছিল। আহার করিয়া কোর্টে যাইবার সময় হইয়াছিল। এই সময় এই কথা বলিব কি না, বলিলে উনি আর খাইবেন না ও উপবাস করিয়া থাকিবেন; কিন্তু না বলিলেও চলে না; কারণ সন্ধ্যাকালে এই বাঙ্গালাতে উনি খাইবেন না, শয়ন করিবেন না এইরূপ আমার মনে হইল। তাই, রোজকার জায়গায় পাত না পাড়িয়া বড় বৈঠকখানায় সমস্ত খিড়কি খুলিয়া দিয়া ও ফিনেল ছড়াইয়া তারপর পাত পাড়িলাম। রোজের চাইতে একটু দেরী হইয়াছিল, সেইজন্য খাবায় দিকে কিংবা আজ জায়গা কেন বদল হল এইদিকে প্রথমে উনি লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু পরে ভাত খাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ জায়গা কেন বদল হল?" তখন আমি বলিলাম,—আজ বাড়ীতে ইন্দুর বেরিয়েছে। সন্ধ্যাকাল—এখন কোথায় সুবিধা করা যাবে? তখন উনি বলিলেন, "আজ থেকে তিন দিন কোর্টের ছুটি আছে। দুপুরের গাড়ীতে আমরা লোণাবড়িতে যাব। শীঘ্র তুমি জিনিস ও ছেলেদের নিয়ে গেবীবন্দরে যাও। আমি কোর্টের ফির্ত্তি ষ্টেশনে যাব ও তার পর আমরা যাত্রা করব।" তিনটে পর্য্যন্ত আমি বাড়ীর সমস্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়া সেই রুগ্ন ছেলেকে ও তার মাকে হাসপাতালে পাঠাইলাম। পাহারাওয়ালা ও শিপাইকে, খোলা দেউড়ীতে যতটা পারিস সময় কাটাবি, বাসায় বড় একটা যাবিনে, সাম্‌লাবি মাত্র"—এইরূপ বলিয়া বাড়ীর বহুমূল্য জিনিসগুলা বাক্‌সোয় ভরিয়া সঙ্গে লইলাম। পাহারাওয়ালা ও শিপাই ব্যতীত ওঁর "রীডর," সখুর মাষ্টার ও ৪।৫ জন ছাত্র সমেত ৬।৭ জনের খাইবার শুইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত ৪।৫ দিনের জন্য আমাদের সম্মুখের শেট বীরচন্দ দীপচন্দ ইহাদের আস্তাবলের উপরতলায় করিয়া দিলাম এবং তাহাদের আবশ্যকীয় আসবাব আনিবার পয়সা দিয়া আমি ষ্টেশনে গেলাম, উনিও তখনি আসিয়া পড়িলেন এবং গাড়ীর সময় হইয়াছে বলিয়া আমরা সবাই গিয়া গাড়ীর কামরায় বসিলাম এবং দশটা রাত্রে লোনাওলীতে উপনীত হইলাম। এ দিকে বাঙ্গলায় পাহারা দিবার বিদেশী পাহারাওয়ালা, এবং আমরা লোনাওলীতে যে শিপাইকে আনিয়াছিলাম মাতাদীন নামক তাহার ভাই এই দুই জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বোম্বাই হইতে লোনাওলীতে আসিবার পর দিন ৯।১০ টার সময় তার আসিল। আমার যে ভাইপো লোনাওলীতে আসিয়াছিল তাহাকে ও দুর্গাপ্রসাদ শিপাইকে আমি বোম্বায়ে ফিরিয়া পাঠাইয়া সেথানকার বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। এই কথা ওঁকে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু ভাবনা হইয়াছে কিংবা ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এই ভাবের কোন কথাই বলিলেন না। এই দুজনকে কেবল আমি নিরালায় ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, "সাবধানে থাকিবে"। সেইখানে গিয়েই রোগীদিগকে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দেবে। মেজিষ্ট্রেটকে চিঠি দেওয়া হয়েছে; সেই অনুসারে তিনি পেন্‌সনর পুলিস পাঠাইবেন; তাকে বাঙ্গালার পাহারা দিতে বোলে তুমি বাহিরে যেখানে ছাত্রেরা থাকে সেই বাঙ্গলায় থাকবে।" এই সমস্ত ব্যবস্থা আমি ওঁকে না জানাইয়া পরস্পর করিতেছিলাম। ইহার কারণ, কাহারও পীড়া হইলে, উনি তদন্ত করিয়া তাহার ঠিক ব্যবস্থা

যতক্ষণ না করিতে পারিতেন, তাঁহার মন শান্ত হইত না,—এইরূপ তাঁহার স্বভাব ছিল। অন্য রোগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এই রোগ ছোঁয়াচে; ইহা হইতে উনি যতটা দূরে থাকিতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত; তাই পারতপক্ষে ওঁকে পীড়িত লোকদের কথা জানান উচিত নয়; আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে যত্নপূর্ব্বক উচিত বন্দোবস্ত করিলেই হইল; এই বিষয়ে অবহেলা করা ঠিক নয়, আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল এবং এইভাবেই আমি সমস্ত করিতেছিলাম। আমরা বোম্বাই হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমাদের পাচিকার মেয়ে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এই কথা ওঁর কানে আসিলে সেইদিন বাড়ী হইতে লোনাওলীতে শুধু যাওয়া হইত না নহে, হাসপাতালে পাঠাইবার সময় সে এত কান্নাকাটি করিত, এত কাকুতিমিনতি করিত যে উনি তাহা দেখিলে ছোঁয়াচে রোগের ভয় না করিয়া ঐ মা ও মেয়েকে "হাসপাতালে পাঠাইও না, বাড়ীতেই থাকিতে দেও", এইরূপ স্পষ্ট বলিতেন, এবং একবার এইরূপ বলিবার পর, ঐরূপ আমাদের করিতে হইত, এইরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় লোনাওলীতে পৌছিয়া তারপর দিন তারের খবর আসা পর্য্যন্ত এই সংবাদ ওঁকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তারের খবর আসিবার পর এই সমস্ত গুপ্ত কথা ফাঁসিয়া গেল এবং আমার উপর অত্যন্ত রাগ করিলেন; কিন্তু এই কথা জানিতে পারিলে উনি কতটা রাগ করিবেন ইহা পূর্ব্বেই আমি জানিতাম এবং সমস্ত কাজ আমি জানিয়া বুঝিয়া করায়, উনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার ততটা খারাপ লাগে নাই। এক্ষণে এই দুই ব্যক্তিকে (বাসুদেব ও দুর্গপ্রসাদ) পাঠাইবার ব্যবস্থা ওঁকে সাধারণ ভাবে জানানো হইয়া থাকিলেও উহারা বোম্বায়ে রওনা হইবার পর, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "এই সময় আমরা বোম্বায়ে থাকিতাম ত ভাল হইত," এইরূপ তিন চারবার আমার নিকটে উনি বলিলেন. ইহাতে আমার মনে হইল,—বাহির হইতে শান্তভাবে রোজকার মতো সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ দেখা গেলেও, ওঁর মনটা বোম্বায়েতে আছে। এদিকে, তাহারা দুজন বোম্বায়ে গিয়া ট্রামে উঠিল। তখন দুর্গাপ্রসাদ বলিল,—"বাসুদেব রাও, আমার কুচকিতে ব্যথা করচে ও শীত করচে"। এই কথা শুনিয়া বাসুদেব মনে করিল, বোম্বায়ে পাঠাইবার দরুন ভয় পাইয়া, এইরূপ মিথ্যা কল্পনা করিতেছে; এইরূপ মনে করিয়া উহার কথাটা বাসুদেব ঠাট্টা বলিয়া গ্রহণ করিল। বাড়ী যাইতে যাইতে বাসুদেব কমিটির গাড়ী ডাকাইল এবং বাজানায় যে দুইজন রোগী ছিল তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া ইহারা দুজন ছাত্রদের উপর-তলাতেই রহিল। যাহার কুচকীতে ব্যথা করিতেছিল সেই দুর্গাপ্রসাদ শিপাইয়ের সেই রাত্রেই ১২টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসিল ও ভোরের বেলা ৪॥টা পর্য্যন্ত তাহার দুই রগের নীচে বেলফলের মতো ফুলে উঠল। তৃতীয় দিন শনিবারে ১১টার সময় তারের খবর আসায় এই কথা জানা গেল। যখন ওঁর হাতে তার আসিয়া পড়ে, তখন খাবার সময় হইয়াছিল। কিন্তু তারের খবর পড়িয়াই উনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, ওঁর মুখ শুকাইয়া গেল;—উনি বলিলেন,—"আমি আজ দুটার গাড়ীতে বোম্বায়ে যাচ্চি; আর সেখানে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে' আসব।" "আমি বলিলাম, "সেখানে গিয়ে আর বেশী বন্দোবস্ত করবার কি আছে?" এই কথা শুনিয়া উনি বলিলেন—"এ রকম পাগলের মতো কেন জিজ্ঞাসা করচ? কি রকম সময় বুঝতে পারচ না কি? এই সময়ে অন্য ব্যবস্থা কি করবার আছে? একটা ভাল জায়গা দেখতে হবে, আর সেইখানে জিনিসপত্র ও ছাত্রদের রাখব বলে' আজই আমায় যেতে হবে।" এই সময় ভয়ভাবনা হইবারই কথা ও রাগ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা না হইয়া ওঁর কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। তখন আমি ভাত বাড়িতেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আমার যাইতে হইল। নচেৎ এই সময়ে আমার হাসি পাইয়াছে দেখিলে ওঁর খুবই রাগ হইত। এই সময় ওঁর কথায় হাসি পাবার কারণও ছিল। ওঁর স্বভাব অত্যন্ত মায়ালু ও উদ্বেগপ্রবণ হওয়ায়, এই পীড়িত লোকের সংবাদে ওঁর মন অতটা বিচলিত হইয়াছিল যে, আমরা যাহা করিব মনে করিয়াছি (আমাদের দ্বারা হইতে পারে এইরূপ ধরণের কাজ কিংবা ঘরের কোন কাজ) তাহা অ.জ পর্য্যন্ত আমরা ওঁকে অতিক্রম করিয়া কখন কি করিয়াছি? এই কথা ওঁর মনে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিল না, এইজন্যই আমার হাসি আসিয়াছিল। তথাপি আমি হাসি সম্বরণ করিয়া কোন উত্তর দিলাম না। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, উনি যাহা কিছু বলিলেন আমি চুপ করিয়া সব শুনিলাম এবং ওঁর খাওয়া হইয়া গেলে, সেই থালাতেই ভাত বাড়িয়া ওঁর কাছেই কিন্তু একটু বাহিরে আমি খাইতে বসিলাম। প্রায় ছুটির দিনে আমার খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মুখশুদ্ধি করিতে করিতে এবং এটা-ওটা কথা বলিতে বলিতে সেইখানেই বসিয়া থাকিতেন। তদনুসারে আমি খাইতে বসিলে পর, বোম্বায়ের কথা ওঠায় সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা ওঁর মন একটু শান্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ বোম্বাই সম্বন্ধে কি স্থির করলে?" উনি কোন উত্তর দিলেন না; এখনও চিন্তা করিতেছেন এইরূপ মনে হইল। তাই আবার আমি জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "আমাকে বল্লে আমি আগেই যাই। পূর্ব্বে যে সব কাজ করতে বলা হয়েছে, সেই সব কাজ আমিই করব। জায়গা দেখে বাসা বদলিয়ে ছাত্রদের ও আমাদের সকলকার বন্দোবস্ত করে দিয়ে রাতের গাড়ীতে ফিরে আসব, নৈলে তারে খবর দেব। কেবল ছেলেদের আমি নিয়ে যাব না। তাদের তোমার কাছেই রেখে দেও। তারা আসিলে আমার কাজের গোলমাল হয়ে তাদেরই কষ্ট হবে। কল্যাণে একটা জায়গা আছে, আর একটা ভাণ্ডুপায় আছে না? আমি দুই জায়গাতেই গিয়ে দেখব এবং ওর মধ্যে একটা পছন্দ করে তোমার ইচ্ছামত সমস্তই করব। তার জন্য কোন ভাবনা নেই। এ সব কাজ তুমি কখন কর নি, এ সব তোমার দ্বারা কি করে ভাল হবে? এর জন্য আমাকে বল, আমি যাই"। আমি এইরূপ আগ্রহের সহিত বলায়, উনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি যা বলচ তাই কর। কিন্তু তুমি একলা গিয়ে কি করবে? আর তোমাকে ছেড়ে ছেলেরা কি করে' থাকবে?" আমি বলিলাম, "তার আর উপায় কি? যা করা আবশ্যক তা আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া দুই জায়গাতেই আমাদের চেনাশুনা ভাল লোক আছে, তারাই সাহায্য করবে। ছেলেদের থাকা সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই। ওরা আমার চেয়ে তোমার কাছেই বেশী আনন্দে থাকবে।" এই কথা শুনিয়া দুইটার গাড়ীতে রওনা হইবার জন্য উনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

(ক্রমশঃ)

উৎকলে শক্তিপূজা।

হিন্দুর দেবদেবী তেত্রিশ কোটী। অধিকারী ভেদে ইষ্টদেবতার উপাসনার ভেদ হয়। দুইজন লোক কখনই একভাবে উপাসনা করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। আকাঙ্ক্ষা এবং মনোগত ভাব দুইজন লোকের কখনই এক হইতে পারে না। হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা এত অধিক হইলেও দেবতামাত্রেই সমান সমাদৃত হন না বা সকলেই পূজা পান না। আজকালকার হিন্দুধর্ম্মের চারিটি প্রধান শাখা আছে। রাম, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তি বর্ত্তমানযুগে ভারতবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও রামাবতারের উপাসক আজকাল পনের আনা লোকের উপর হইবে। শাক্তের সংখ্যা অন্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম নয়। শক্তির উপাসনা অতি প্রাচীন। শক্তির উপাসনা যে কৃষ্ণের উপাসনার সমসাময়িক তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখা যায়।

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তেনন্দগোকুলে॥
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

দশমঃ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ঃ।

বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই কংশের ভয়ে বসুদেব ইহাঁকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দের সদ্যজাতা কন্যা আনয়ন করেন। পরদিন প্রাতে কংস সেই কন্যাকে এক শিলাখণ্ডের উপর আছাড় দিয়া মারিবার উপক্রম করে। কিন্তু সেই সদ্যজাতা কন্যা তেজোরাশিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যান। তাঁহার নাম যোগমায়া। লোকে তাঁহাকে দুর্গা ও চণ্ডী নামে বলি দ্বারা পূজা করেন। সেই যোগমায়া সর্ব্বকামফলপ্রদা। কালিকা পুরাণে লেখা আছে—

নিহিতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ॥

কালিকাপুরাণের এই প্রমাণ সত্য হইলে ত্রেতাযুগে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিবপুরাণের জ্ঞান-সংহিতা এবং সনৎকুমার-সংহিতা পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে অসুরগণই শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। লিঙ্গপুরাণে অসুরদিগের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত আমাদের দেশের অনার্য্যগণের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। শিবের বরে অনুপ্রাণিত হইয়া অসুরগণ দেবতাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

বোধ হয়, এক সময়ে লিঙ্গ-উপাসনা অনার্য্য অসুর-দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে শাস্ত্রে শিবের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবের মন্দির, গ্রামের প্রান্তদেশে নির্ম্মাণ করিবার বিধি আজিও দেশাচার বলবৎ রাখিয়াছে। শিব-পূজার আর একটী বিশেষত্ব এই যে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিবের পূজা করিতে পারেন। অবশ্য অস্পৃশ্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। উড়িষ্যায় অনেক স্থানে আজিও মালীজাতি শিবের পূজা করে। অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণের অধিকার। শিবপূজায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতির অধিকার আছে। শিবের পূজা যে আর্য্যগণের মধ্যে অনেক পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক পূজার ধরাকাট শিবপূজায় নাই। বৈদিক যজ্ঞ বৈদিক পশুবলি শিবপূজায় নাই, শক্তিপূজায় আছে। কোন্ সময় শক্তিপূজার উৎপত্তি, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সন তারিখের নির্ঘণ্ট-ইতিহাস আমাদের দেশে কস্মিনকালেও ছিল না। অনেকের মতে অথর্ব্ববেদের মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি বিধি, সুদূর অতীতেও তন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

প্রকৃতং কথ্যতে দেবি শৃণু সাবহিতা ভব।
চতুর্ব্বেদময়ী প্রোক্তা শ্রীমহাভবতারিণী॥
অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকাপরা।
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্ব্বণো বিধিঃ কচিৎ॥
কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা।
গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব কালোত্তরা ভবেৎ॥
(শক্তিমঙ্গলতন্ত্রে উত্তর ভাগে ১ম খণ্ডে ৮ম পটলে)

কিন্তু তন্ত্রের মতে শিব ও শক্তি অভেদাত্মা। উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ভেদ নাই। শিবকে কেহ কেহ ইষ্টদেবতা বলিয়া উপাসনা করেন বলিয়াই শৈব ও শাক্তমত যে বিভিন্ন তাহা বলা যায় না। কুলচূড়ামণিনিগমে স্পষ্ট লেখা আছে, "শিবশক্তি সমাযোগাৎ জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।" তন্ত্রের মতে শিব ও শক্তি উভয়েই ব্রহ্মের বিকারবিশেষ। উভয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা। শক্তিই জগন্মাতা। সৃষ্টি শিবশক্তিময়। দেব, দেবী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি ভূচর খেচর মানসচর যত জীব আছে সকলেই সেই বিশ্বমাতৃকা, সর্ব্বজন্মদার পুত্র। এমন কি শিবও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই জগন্মাতার পুত্র বলিয়াই গণ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে শিব নিষ্কল। সৃষ্টির পরে সেই নিষ্কল শিব সকল ভাবেই প্রকাশ পান। তখন তিনি শক্তির পুত্র। তন্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শিবশক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শৈবপূজা প্রাচীন কি শক্তিপূজা প্রাচীন তাহার বিচার করা নিরর্থক।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের বিশেষত্ব কি? অধিকারীভেদ এবং ক্রমবিকাশ তন্ত্রের ভিত্তিমূল। ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম উপাসকের জন্য। তুমি যে স্তরেই থাক, তোমার বুদ্ধি ও ধারণা হাজার নীচ হোক্‌না কেন, তোমার পরিত্রাণের উপায় সর্ব্বদা তোমার হাতেই রহিয়াছে। তুমি কি, সর্ব্বাগ্রে তাহাই ধারণা কর। 'তুমি কি' জানিলে তোমার অধিকার কতদূর তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। তন্ত্র বলেন সাধনা সকলের জন্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা-বিধি। তোমার মানসিক অবস্থা এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রাবল্য লক্ষ্য না করিয়া যদি উচ্চোপাসনা অবলম্বন কর তাহাতে বিপত্তি ঘটিবেই ঘটিবে। সাধনার স্তর দিয়া ক্রমশঃ তোমাকে উচ্চতর দেশে উঠিতে হইবে। কিন্তু কোনও একটী স্তর উল্লঙ্ঘন করিলে তোমার পদস্খলন অবশম্ভাবী। ধীরে, অতি ধীরে তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইষ্ট-সিদ্ধির পথ সর্ব্বদাই পিচ্ছিল। তন্ত্র যে উপাসনার সোপানাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন কর; সদ্‌গুরুর উপদেশ লও, ক্রমশঃ ধ্যান ও ধারণার প্রসার বাড়াইতে চেষ্টা কর, দেখিবে তোমার ইষ্ট লাভ হইবে। প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামের হঠাৎ গতিরোধ করিলে তুমি গোমুখীর খরস্রোতের মুখে মত্ত ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবে। ভোগলালসা যখন তোমার অস্থি-মজ্জাগত, তখন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া একেবারে সমূলে উৎপাটনের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তাই তন্ত্র বলিতেছেন,—জীব! ভোগের মার্গ দিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হও। মর্কট-বৈরাগ্যের ভাণ করিও না। ভাবের ঘরে চুরি করা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মহাপাপ। তাই তন্ত্রোক্ত পন্থা কঠোর এবং নির্ম্মম নয়। তাহা

সরস এবং সহজগম্য। তন্ত্রের আর একটী স্বতঃসিদ্ধের কথা বলিব। তন্ত্র বলেন,—'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে শক্তির সমাবেশ দেখিতেছ, এই জগৎযন্ত্রের চক্র, প্রতিচক্র এবং অনুচক্রে যে শক্তির আবেশে স্নেহবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই শক্তিই তোমার শিরা-প্রশিরা এবং অসংখ্য নাড়ীজালে নিবদ্ধ। যদি তুমি সাধনার দ্বারা তোমার সুপ্ত শক্তিনিচয় জাগ্রৎ করিতে পার তাহা হইলেই তোমার ইষ্টলাভ হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াই নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন, এরূপ ধারণা তন্ত্রে নাই। কোনও নিবিড় মেঘপটলাবৃত বিরাট্ পুরুষের ধ্যান তন্ত্রে দেখা যায় না। আত্মতত্ত্বের ও আত্মার অনুশীলন ভিন্ন কখনই শক্তিলাভ হইতে পারে না। ইহাই তন্ত্রের মূলমন্ত্র। প্রত্যেক মানুষের মূলাধারে যে কুলকুণ্ডলিনী সুপ্তভাবে বিরাজিতা, তাঁহাকে জাগরিত করাই তান্ত্রিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য। কালী, তারা কিম্বা অন্যান্য মহাবিদ্যার প্রতিমা উপলক্ষ্য মাত্র। চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে হইলে একটী মূর্ত্তি অগ্রে ধরিয়া সেই মূর্ত্তিতেই তাহাকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু পূজায় বসিলে ন্যাস এবং ভূতশুদ্ধির দ্বারা মনকে পূত করিয়া তোমার সূক্ষ্ম শরীর তোমার উপাস্য প্রতিমায় সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। সেই সন্নিবেশ হইলে পর প্রতিমা জাগরিত হইবেন। তোমার চেতনা দিয়া চৈতন্যময়ী দেবীর পূজা করিতে হইবে। ইহাই হইল তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির মূল কথা। প্রস্তর মৃত্তিকার পূজা তন্ত্রে নাই। তন্ত্র বলেন, যদি তোমার দেহনিবদ্ধ সূক্ষ্মশক্তি তোমার উপাস্যা দেবীতে আরোপ করিতে না পার—তাহা হইলে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না এবং তোমার পূজা হোম-যাগ সমস্তই মিথ্যা হইবে। শরীর, মন এবং সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই ত্রিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিতে হইবে। তোমার চৈতন্যের বিনিময়ে তুমি শ্রেষ্ঠতর চৈতন্য পাইবে। কিন্তু মূলে সাধনা। চেষ্টা ভিন্ন কিছুই হইবে না। যে সাধনার বলে ইহ-জন্মেই ইন্দ্রত্ব চন্দ্রত্ব লাভ হইবে, যে সাধনার বলে পরাবিদ্যার গুহ্য রহস্য তোমার করায়ত্ত হইবে, তাহাতে কতখানি পুরুষকার আবশ্যক তাহা আর বলিতে হইবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাগ্যনিয়ন্তা। যাহার যেরূপ সাধনা, সেইরূপ সিদ্ধি। আজ আমাদের দেশ জড়তায় আচ্ছন্ন। আয়াস এবং তন্দ্রার মোহে আমরা গতানুগতিকের মত জীবন যাপন করিতেছি। আমরা মনে করি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মরজ্জু নাসারন্ধ্র আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে। সে রজ্জু এড়াইবার কোনও উপায় নাই। তাই তন্ত্রোক্ত পুরুষকারবাদ আমাদিগকে আকৃষ্ট করে না। যেখানে চেষ্টা, পুরুষকারের ও প্রযত্নের আহ্বান সেইখানেই আমরা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশে পশ্চাৎপদ হই। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাই তন্ত্রের মতে পাপ। পুরুষকার ও সাধনাই পুণ্য। আবার কবে পুরুষকারের পাঞ্চজন্যনিনাদ আমাদিগের অসাড় মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ক্রিয়ান্বিত করিবে? কবে আবার ভারতমহাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে প্রান্তরে সাধনার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' যে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিত, আজ সেই দেশেই পুরুষকার মোহাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পুরাকালে উৎকলখণ্ড কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে কলিঙ্গসেনাপতি ভীমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। বহুদিন কলিঙ্গনৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। মগধের মহারাজ মহানন্দ খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার কলিঙ্গ-বিজয় স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টের জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক পুনরায় কলিঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। তখন মগধের ভাগ্যসূর্য্য মধ্যগগনে অবস্থিত। চাণক্যনীতির প্রভাবে অশোকের পিতামহ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার একচ্ছত্র রাজ্য ছিল। মগধসেনার বিজয়দামামা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল। কেবল কলিঙ্গরাজ্য এবং তৎসংলগ্ন অন্ধ্ররাজ্য মগধের বশ্যতা-স্বীকার করে নাই। তাহার কারণ আর কিছুই

নয়, কলিঙ্গ স্বভাবসুরক্ষিত। পূর্ব্বে মহাসাগর বীচিবিক্ষেপে মগধপ্রাধান্য উপেক্ষা করিত। পশ্চিমে মহাবন ও গিরিরাজি। উত্তরে অসংখ্য নদী মগধসৈন্যের গতিরোধ করিয়া বিদ্যমান। দক্ষিণে স্বাধীন অন্ধ্রদেশ। কিন্তু অশোকের সেনা বহু যুদ্ধে রণবিশারদ হইয়াছিল। তাঁহার নৌবাহিনী শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয় কলিঙ্গের উপকূল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে কলিঙ্গনৃপতি বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে একলক্ষ কলিঙ্গসেনা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বন্দী হইয়াছিল। এই ভয়াবহ রক্তপাতে অশোকের মনে ভাবান্তর হইল। যুদ্ধে লাভজয় করিয়া তাঁহার জিঘাংসা এবং অর্থলোলুপতা বাড়িয়া যায় নাই। পরন্তু তাঁহার মনে হইল, কিসের জন্য এত রক্তপাত, কিসের জন্য এত মর্ম্মবেদনা। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বিশাল রাজ্যমধ্যে যাহাতে শাক্যসিংহের অমৃতময় উপদেশ প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্তদেশ হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত নানাস্থানে তাঁহার অনুশাসন প্রস্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ধৌলী পর্ব্বতে আজিও বিদ্যমান আছে। সেই অনুশাসনে অশোক জীবে দয়া দেখাইতে প্রজাপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়াছেন। অনুশাসনে স্পষ্ট লেখা আছে আহারার্থে বা ধর্ম্মের অনুরোধে কেহই জীবহিংসা করিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে কলিঙ্গরাজ্যে ৩৫০ খ্রীঃপূর্ব্বে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও কোনও দিন অন্যের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া লোকের মত পরিবর্ত্তন করা তাঁহার অভিমত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তন্ত্রবিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হুয়েংসানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক হুয়েংসান্ উৎকলদেশে আসেন। তখন উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল; কিন্তু তিনি মন্দিরের পাশে পাশে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির দেখিয়াছিলেন। হুয়েংসানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে আর একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুয়েংসান অযোধ্যা ও প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন তখন দস্যুগণ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে সুপুরুষ দেখিয়া দুর্গার নিকট বলি দিবার সঙ্কল্প করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদে লোকের মন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ দার্শনিকতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নয়। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলেই সঙ্ঘে বাস করিতে পারে না। বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত মুক্তির পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। তাই লোকের মনে বৌদ্ধ দার্শনিকতার প্রতি ক্রমশঃ বিরাগ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে নানা দেবদেবীর উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। শাক্তধর্ম্মই সর্ব্বপ্রাচীন; এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার বহু প্রচলন ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় বুদ্ধের তিরোধানের কিছুদিন পরেই তান্ত্রিক উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল। তিব্বতদেশে আজিও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন আছে। যে দেশে লামা বা প্রধান বৌদ্ধযাজক স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজা পান, সে দেশেও আজ পর্য্যন্ত তারা, কালী অবলোকিতেশ্বর মহাদেবের পূজার বিধি আছে। তন্ত্রের অভ্যুত্থানের পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় হিন্দুধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতু তুলিয়া যখন ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের নব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহাকে বৌদ্ধশ্রমণ এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। তান্ত্রিক উপাসনা ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিকতা যেমন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নয়, সেইরূপ তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যও সকলের বোধগম্য নয়। কিন্তু তান্ত্রিকপূজা, বলিদান এবং বিলাসবহুল প্রক্রিয়ায় সাধারণের চঞ্চলচিত্তের ক্ষণিক ধর্ম্মপ্রবণতার পরিতোষ হয়। বাহ্য আড়ম্বর এবং বিলাসের চাকচিক্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ লোকসকলকে আকৃষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক বিধি জনসাধারণের প্রিয়। বোধ হয় এই আকর্ষণী শক্তির বলেই ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের কবোষ্ণ দার্শনিকতা পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকবিধি পুনরবলম্বন করিয়াছিল। তন্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,

মোক্ষ এই চতুঃবর্গের সাধনা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে কেবল শুষ্ক মোক্ষ। অনেকেই প্রথম ত্রিবর্গের সাধক। তাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বজনপ্রিয়। অলৌকিক শক্তিলাভের আশা সাধকদিগের একটী দুর্ব্বলতা। তন্ত্রে লেখা আছে, সাধক ইষ্টদেবীর সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তাহার বিভূতির সঞ্চার হয় অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিনিচয় ফুটিয়া উঠে। সেই বিভূতির মোহে সাধক অনেক সময় প্রতারিত হন। অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি যখন সাধকের করায়ত্ত হয়, তখন সাধক সেই সকল শক্তি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসেন। শক্তির সংযমে যে পরমানন্দের আস্বাদ আছে তাহার জন্য ব্যগ্র না হইয়া সাধক স্বীয় শক্তির প্রয়োগেই বিড়ম্বিত হন। তন্ত্রের নিষেধসত্বেও অধিকাংশ লোকে ক্ষণভঙ্গুর শক্তিলাভের প্রয়াস করেন। সাধারণ লোক সাধনার মার্গ অবলম্বন না করিয়া মনে করেন দুই একদিন দেবীর পূজা করিলেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিবেন। এই বর লাভের আশাতেই অধিকাংশ লোক তন্ত্রোক্তমতে পূজা করে। লোকপ্রিয়তাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায়ক হইয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

হাণ্টার সাহেবের মতে ৪৭৪ হইতে ১১৩২ অব্দ পর্য্যন্ত কেশরীরাজবংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই রাজবংশ উড়িষ্যার আদিম রাজবংশ। পরবর্ত্তী গঙ্গাবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও উড়িষ্যাদেশীয় বলা যাইতে পারে না। O'malley's Gazeteerএ কেশরী রাজ্যের আয়তন এইরূপ ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—কেশরীবংশীয়ের রাজত্বকালে উড়িষ্যার সীমা বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশীয় রাজগণ যে শাক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যাজপুর কেশরীরাজাদিগের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী। পরে ভুবনেশ্বর তাঁহাদিগের রাজধানী হয়। যাজপুর এবং ভুবনেশ্বর উভয়ই শক্তিক্ষেত্র ;—তবে একটু পার্থক্য আছে। যাজপুর বা বিরজাক্ষেত্রে শক্তির প্রাবল্য অত্যধিক। সেখানে বহু শিবের মন্দির আছে। বিরজামাহাত্ম্য পাঠে জানা যায়,—একসময়ে বৈতরণী নদীর গোমুখী হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত এক লক্ষ শিবমন্দির ছিল ; কিন্তু শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাই তন্ত্রোক্ত মত। তন্ত্র বলেন সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শিব বিকারগ্রস্ত এবং শক্তির পুত্রস্থানীয়। সর্ব্বলোকজননী এই বিশ্বসংসারে যে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকট করিতেছেন সেই সৃষ্টিক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংহার-নিরত। তাই শক্তির প্রথম স্থান। বিরজাক্ষেত্রে এই ভাব। শক্তির প্রাধান্য বিরজাক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পূজাবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভুবনেশ্বরে কিন্তু এ ভাব নাই। কালক্রমে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অপচয় হইয়াছিল। তন্ত্রের দার্শনিকতা ভুলিয়া গিয়া লোকে প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রাধান্য মানিয়া লইল। বর্ত্তমানকালে এদেশে স্ত্রীলোককে যেরূপ আনাদরের চক্ষে দেখা হয় পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না ; ক্রমশঃ স্ত্রীলোকের প্রতি অনাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রাধান্য কমিয়া গিয়া শিবের প্রাধানা প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই ভুবনেশ্বরে শিবের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি পার্ব্বতীরূপে তাঁহার জায়া হইয়া পূজা পাইতেছেন। যে আদ্যাশক্তির তাণ্ডবে শিব জড়তা প্রাপ্ত হইয়া দশমহাবিদ্যারূপে শক্তি-উপাসনা করিয়াছিলেন সে আদ্যাশক্তির পূজা ভুবনেশ্বরে নাই। এখানে শিবের বৈভবদর্শনে শক্তি সঙ্কুচিতা। নববধূ যেরূপ পতিগৃহে আসিয়া এক কোণে বিষাদমালিন্যে দিন কাটায় শক্তিও সেইরূপ জায়ারূপে দীনহীনভাবে পূজা পাইতেছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মের এই অবনতির সহিত আমাদের ভারতীয় অবনতির বোধ হয় একটী সম্বন্ধ আছে। তন্ত্রের উপাসক কখনই স্ত্রীর অবমাননা বা অমর্য্যাদা করিতে পারেন না। তন্ত্র পদে পদে বলিতেছেন প্রত্যেক যুবতীই দশমহাবিদ্যাস্বরূপিনী ; স্ত্রী পরিতুষ্ট হইলে দেবী পরিতুষ্টা হন। যে সাধক স্ত্রীলোকের অবমাননা করেন কিংবা তাঁহাদিগের নিন্দা বা কুৎসা করেন তাঁহার সদ্গতি কখনই হইতে পারে না। স্ত্রীমর্য্যাদারক্ষা তন্ত্রোক্ত উপাসনার একটী অবশ্য পালনীয় বিধি। যেদিন হইতে উপাসনায় শক্তির অনাদর হইয়া শিবের প্রাধান্য হইয়াছে, বোধ হয় সেইদিন হইতেই আমাদিগের কুললক্ষ্মীগণেরও

অনাদরের সূচনা হইয়াছে। আবার যদি আমরা জাগিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে জগদম্বাস্বরূপিনী কুললক্ষ্মীর উপাসনা করিতে হইবে। শক্তিপূজার লুপ্ততায় যে পুরুষের প্রাধান্য উপাসনা ক্ষেত্র হইতে প্রসারিত হইয়া আমাদিগের গৃহস্থলীর কুললক্ষ্মীদিগকে জড়তাগ্রস্ত করিয়াছে তাহা দূর করিতেই হইবে।

হরিদ্বার।

(শ্রীসারদারঞ্জন দত্তগুপ্ত)

আর্য্যাবর্ত্তের যে অংশ উত্তরাখণ্ড বলিয়া কথিত হয়, তাহা এতই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও নয়ন ও মনের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এই কারণবশতঃ, যদিও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একবার আমি হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদূণ, মুসরী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি বিগত দশহরার অবকাশে আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও দুইজন বন্ধুসঙ্গে পুনরায় ঐ সকল স্থান দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে উপনীত হই। ইহা হিমালয়-পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। এইস্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী সূরযমল সিও-প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার এক প্রাসাদতুল্য অতি বৃহৎ ও সুশোভন ধর্ম্মশালা আছে। ইহা এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দ্বারা পরিচালিত। কলিকাতার স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুর এই সভার অন্যতম সদস্য। জনকতক কর্ম্মচারী ও ভৃত্য যাত্রীদের সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে। এই ধর্ম্মশালায় থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আহারের বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। রন্ধনশালা আছে, পানীয় ও স্নানের জলের বন্দোবস্তও আছে। যাঁহারা রন্ধন করিয়া আহার করিতে চান, তাঁহাদিগকে বাসনপত্রাদিও দেওয়া হয়। যাঁহারা রন্ধন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা "পবিত্রভোজন-ভবনে" (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হোটেলে), অথবা বাজারে খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আহার করিতে পারেন।

ধর্ম্মশালায় একটি গৃহ আমাদিগকে দেওয়া হয়। সেইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা স্নানার্থে গঙ্গার ধারে যাই। যাঁহারা "তীর্থ করিতে" আসেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ও কুশাবর্ত্ত ঘাট অর্থাৎ যে দুই ঘাটে যাত্রীদের স্নান করিতে হয়, তাহা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে কোনও স্থানে স্নান করা সুবিধাজনক। কারণ, উল্লিখিত ঘাটদ্বয়ে পুরোহিত, পাণ্ডা, ভিক্ষুক, এমন কি ক্ষৌরকারগণ পর্য্যন্ত বড়ই বিরক্ত করে। হিন্দুতীর্থমাত্রেই, "যাত্রী-শীকার" করা এই শ্রেণীর লোকদিগের একমাত্র ব্যবসায়।

হরিদ্বার গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। একটা শাখা তীর্থের উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বগামিনী হইয়া পূর্ব্বধারে আসিয়া দক্ষিণবাহিনী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে গঙ্গা হিমালয়ের শাখা শিবা-লিক পর্ব্বতশ্রেণী হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। নদী অতিশয় খরস্রোতা ও কলকল-নাদিনী। তলদেশে ও তীরে অসংখ্য নির্ম্মল প্রস্তর-খণ্ড বিদ্যমান থাকাতে জল সতত স্বচ্ছ কাচের ন্যায় পরিষ্কার এবং স্বভাবতঃ শীতল। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বত্য অঞ্চলে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, তখন নদীর জল তুষারের ন্যায় শীতল বোধ হয়। জলের গভীরতা অল্প হইলেও স্রোতের বেগহেতু জলমধ্যে অধিকক্ষণ অবস্থান করা বা অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। স্নানকালে মৎস্যের ক্রীড়াদর্শন অত্যন্ত আনন্দজনক। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কদাচ আহা-রার্থে মৎস্য হিংসা করে না ও করিতে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তি জলে অবতরণ করিলে অসংখ্য মৎস্য আহারের লোভে তাহাকে পরিবেষ্টন করে অথবা কৌতুহল বশতঃ তাহার সহিত জলক্রীড়া করিতে আসে। ইহাদিগকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করি-লেও ইহারা বিশেষ ভীত হয় না।

আমরা গঙ্গার নির্ম্মল স্রোতে স্নান করিয়া আহারাদি সমাপনান্তর ভ্রমণে বহির্গত হই। এই স্থানের একটা বিশেষত্ব এই যে দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাধারণতঃ কোনও 'দামদস্তুর' করিতে হয় না। আমরা যত দোকান হইতে যত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছি সর্ব্বত্রই 'একদর'। বিক্রেতা একবার যে মূল্য বলিয়া দিয়াছে, তাহা কিছুতেই

পরিবর্ত্তন করে নাই। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা হরিদ্বারকে 'হরদোয়ার' বলে। 'হরদ্বার' বা 'হরিদ্বার যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কার্য্যতঃ তীর্থযাত্রীদের ভিতরে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীর লোকই দৃষ্ট হয়। এ স্থানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণই পুণ্যসঞ্চয়ার্থে আগমন করেন। প্রবাদ আছে যে হরিদ্বারে মহাত্মা কপিলমুনি সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন; এই কারণেই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থানকে কপিলস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হরিদ্বারে যে ঘাটে যাত্রীরা স্নান করিয়া পাপ ক্ষালন করেন, তাহার নাম 'ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট' বা 'গঙ্গাদ্বারঘাট'। ঘাটসংলগ্ন নদীর কতকটা অংশ বাঁধবেষ্টিত করিয়া "কুণ্ড" প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই কুণ্ডের তলদেশ বাঁধান। ইহার এক কোণ হইতে একটি বাঁধান উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী তীরসংলগ্ন হইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়াই নদীর জল কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরে কতকটা স্থান দানশীল লোকের অর্থে উত্তমরূপে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হইয়াছে। উহার চলিত নাম "হর্‌কা পাহাড়ি"। এই স্থানে পাদুকাদি লইয়া যাইবার বিধি নাই। যুক্তপ্রদেশের জনৈক ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা হরিদ্বারের ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে স্বহস্তে এই 'হর্‌কা-পাহাড়ি'র ভিত্তিস্থাপন করেন। পার্শ্বের প্রাচীরে একখানা মর্ম্মর প্রস্তরে ঐ মর্ম্মে কয়েক ছত্র লেখা রহিয়াছে। "কলৌ শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণাঃ খলু"। নতুবা হিন্দুর পবিত্র তীর্থের পবিত্রতম ঘাটের উপরে অবস্থিত "হর্‌কা পাহাড়ি"র ভিত্তিস্থাপন জন্য একজন "লাট সাহেব"কে আহ্বান করা হইবে কেন?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই ঘাটে পুরোহিত, পাণ্ডা ও ভিক্ষুক সদা বর্ত্তমান। হিন্দুর তীর্থস্থানের কথা স্মরণ হইলে প্রথমতঃ এই বিভীষিকাত্রয়ই আমাদের মনে উদিত হয়। এই সকল ব্যক্তি প্রায়শঃ লোভান্ধ, নির্ল্লজ্জ ও "নাছোড়বান্দা"। প্রথমে সুমিষ্ট বাণী শুনাইয়া ও বিনামূল্যে কতিপয় উপদেশ দান করিয়া পরে নিরীহ যাত্রীদিগকে লাঞ্ছনা দিতে এই পুরোহিত ও পাণ্ডাসম্প্রদায় অত্যন্ত পটু। ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে দীর্ঘ সোপানাবলী আছে; যাত্রীরা তদুপরি উপবেশন করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করেন। বলা বাহুল্য প্রত্যহ বহুলোক ঐ কুণ্ডের বদ্ধজলে উপবেশনান্তর শির অবনত করিয়া "অবগাহন" করেন ও আপনাদিগকে পবিত্রীকৃত মনে করেন; অথচ পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরের মন্দিরে বিষ্ণুর চরণচিহ্ন ও নানাবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। "গঙ্গাদ্বারে" ঐ সমস্ত "প্রাপ্তি-দ্বার" মাত্র। এই ঘাটে কুম্ভযোগের সময় স্নান করিতে পারিলে নাকি আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর অন্তর এস্থানে কুম্ভমেলা হয়, এবং তাহাতে হিমালয় হইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীরা তাহার দক্ষিণে কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্ব্বনাথের মন্দিরের বহির্দ্দেশে মহাবোধি বৃক্ষতলে বুদ্ধদেবের একটি মূর্ত্তি বিরাজমান। ইহাতে অনুমান হয় কোনও সময়ে এস্থানেও বৌদ্ধপ্রভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

হরিদ্বারে প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে দিগ্‌দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোকের আগমন হয়।

অতঃপর আমরা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বামপার্শ্বে অনতি উচ্চ শৈলমালা—অন্যদিকে নদী ও নদীতীরস্থ গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে দুই একটি দেবমন্দির আছে। যাত্রীরা অনেকেই কৌতূহলবশতঃ একটু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক মন্দিরাদি ও চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্তও এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা যে পথে চলিতেছিলাম তাহা শৈলশ্রেণী বেষ্টন করিয়া ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়াছে। এই স্থানে পথের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গার একটি শাখাবিশেষ এরূপভাবে স্রোতমুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে জলের বর্ণ সম্পূর্ণ নীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া রেলওয়ের পার্শ্বে

একটি ক্ষুদ্র বাঁধান পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। ইহা গোলাকার ও ক্ষুদ্র ; কূপ বলাই সঙ্গত। ইহা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। তলদেশ ও তীর প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। জলে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। জলের গভীরতা অতি অল্প। চতুষ্পার্শ্বে গোলাকার সোপানাবলী। এস্থানে পর্ব্বতগাত্রে দুই একটি প্রকোষ্ঠে দেবমূর্ত্তি আছে। জলাশয়টির চলিত নাম "ভীমগোদা"। "ভীমগোদাকে" স্থানীয় অধিবাসীরা কেন যে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে তাহা আমাদের..বুদ্ধির অনধিগম্য। তবে ব্রহ্মকুণ্ডের সংশ্রবে যে পয়ঃপ্রণালীর কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা ভীমগোদা ব্রহ্মকুণ্ডের ও নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ভীমগোদা স্বাভাবিক জলাশয় নহে। ইহার তীরে চর্ম্মপাদুকা আনয়ন করা এবং ইহার জলে অবতরণ করা নিষিদ্ধ। এখানেও যাত্রীরা তর্পণাদি করেন, ইহাই অনুমান হয়। জলে পুষ্প বিল্বপত্রাদিও ভাসমান দেখা গিয়াছিল। আমরা 'ভীমগোদা' দর্শন করিয়াই সে দিবসের মত প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব।

[আমাদের পরমহিতৈষী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যতদূর বুঝিতেছি আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহ বিক্রয় করা জনসাধারণের অমত। আমাদের মতে আদিসমাজের কর্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করিলে ভাল হয়। "আদিম স্মৃতি বজায় রাখা" এই অর্থে বলা হইয়াছে যে আদিব্রাহ্মসমাজ অটুট রাখিয়া অন্যত্র শাখাস্বরূপ নূতনসমাজগৃহ নির্ম্মিত হয় তো হউক। রসিক বাবু পল্লী খারাপ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। পতিতা রমণীদের ব্রহ্মোপাসনায় যোগদানে বাধা দেওয়া উচিত নয় ঠিক, কিন্তু যদি তাহারা সেই ভাবে আসিয়া যোগদান করে। যাই হোক এবিষয়ে মতভেদ আছে। তঃ বোঃ সং]

শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়—

নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার পত্রিকার একপার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর ১৯১৯ } নিবেদক শ্রীরসিকলাল রায়—

শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত সঞ্জীবনীসম্পাদক-মহাশয়েষু—

মহাশয়—

বিগত ১৫ই আশ্বিন তারিখের "সঞ্জীবনীতে" আদিব্রাহ্মসমাজ-বিক্রয়-বিরুদ্ধে আপনি যে সবল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই প্রতিবাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। আপনি অতি যথার্থই লিখিয়াছেন যে, "যে সমাজ রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যেখানে তিনি স্বয়ং উপাসনা করিতেন, যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়া বহুলোকের প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন,সেই পবিত্র স্থান বিক্রয় করিতে যাঁহারা সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীর ধিক্কারের পাত্র হইবেন। আমরা অবগত হইয়াছি ৯০৫০০ টাকায় আদিসমাজ বিক্রয় করা হইবে—রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মা ঐ দুরাচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন তাহা আদিব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ কি একবার চিন্তা করিয়াছেন?" এই প্রতিবাদধ্বনিতে সমাজ-বিক্রয়-প্রস্তাব যে চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত হিসাবে আপনার প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব সুখী হইয়াছি। তবে তিনি যে কয়েকটি কথা কহিয়াছেন তাহা বিচারসাপেক্ষ। তিনি কহিতেছেন যে, "পল্লী খারাপ, এবং সেই কারণে আদিসমাজের অনেক সভ্য ইচ্ছা থাকিলেও উপসনায় যোগ দিতে পারেন না—সপরিবারে আসা তো দূরের কথা"—আমি জানি কোন পতিতা স্ত্রীলোক উপাসনাকালীন সমাজপার্শ্বস্থ জানালার নিকট দণ্ডায়মানা থাকিলে তাহাকে সরিয়া যাইতে কহা হইত। আমি মনে করি ঐরূপ পতিতা স্ত্রীলোক যদি উপাসনাকার্য্যে মনোযোগী হয় তাহাকে কোন বাধা না দেওয়া উচিত। সমাজগৃহ স্থাপনাবধি এতাবৎ বহু বৎসর কাল সমাজের সভ্যেরা ব্রহ্মানন্দ পান করিয়া আসিতেছেন। যে স্থানে স্ত্রীলোকেরা বসেন সেস্থান সমাজের এক প্রান্তে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত। সুতরাং পল্লীদোষ তথায় পৌঁছিতে পারে না। সমাজগৃহের পার্শ্বস্থ দুই একটি জানালা বন্ধ করিয়া দিলে পতিতা রমণী সমাজগৃহাভ্যন্তর দর্শন করিতে পারে না। তিনি কহিতেছেন, "আমার মতে যদি একটি উপযুক্ত স্থানে উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে তাহা করা হউক, কিন্তু রামমোহন রায়ের 'আদিম স্মৃতি' বজায় রাখিয়া"—নূতন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ ও রামমোহন রায়ের আদিম স্মৃতি বজায় রাখা—ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কহিতেছেন যে, "অর্থাভাবে আদিসমাজ গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব" সুতরাং বিক্রয় প্রস্তাব বলবান হইয়া পড়িতেছে। অতি প্রাচীন আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরকে উপেক্ষা করিয়া সেই স্থানে নূতন উপাসনামন্দির স্থাপন করিলে আদিসমাজের পবিত্রতা ও রামমোহন রায়ের স্মৃতিকে দূষিতভাবে উপেক্ষা করা হইবে। যে আদি ব্রাহ্মসমাজে এতাবৎকাল ব্রহ্মনাম সম্বোধিত হইয়া প্রাণকে শান্তিনীরে ডুবাইয়াছে, মাড়োয়ারী করতলস্থ হইয়া সেই ভবন চাউল, দাউল, ও বস্ত্রাদির বিক্রয় স্থান হইবে—ইহা প্রাণে সহ্য হইবে না।

যেরূপে হউক প্রাচীন আদিসমাজগৃহকে রক্ষা করা হউক ও আদি স্মৃতিকে অক্ষুন্ন রাখা হউক।

১৮৪১ শকের ৭ই ভাদ্র রবিবার দিবসের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

গত ২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবসের আহ্বান অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৭ই ভাদ্র রবিবার অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
" হরিপদ ত্রিবেদী।
" যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।
" সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী দাসগুপ্ত মহাশয়ের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সিটি কলেজ লাইব্রেরীর জন্য সুলভ মূল্যে পুস্তক পাইবার প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—সুলভ মূল্যে পুস্তক প্রদান অনুমোদিত হউক।

২। কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে আদিসমাজ লাইব্রেরীতে "Chore Bagan Mullick Family পুস্তক প্রদানের জন্য ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়কে পুস্তক প্রদানের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

৩। মাহিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার মহাশয়ের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

উক্ত পত্রে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

(১) মহর্ষিদেবের উপদেশ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি পুরাতন তত্ত্ববোধিনী হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ।

আপাততঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। সেগুলি মুদ্রিত হইবার পর এ বিষয়ে চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবটি উপাদেয় নিঃসন্দেহ।

(২) আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

একজন ভাল ইতিহাস লেখক পাইলে সম্পাদক তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের কতকগুলি অংশ গত ৪ বৎসরের তত্ত্ববোধিনীতে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা লেখান।

তাঁহার বয়সের আধিক্যের কারণে এ প্রস্তাব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

পত্রখানি এই সঙ্গে প্রচারিত হইল।

সশ্রদ্ধ নমস্কারানন্তর নিবেদন,

আজ আপনার নিকট কয়েকটী প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছি, বিনীত নিবেদন আমার অপরাধ লইবেন না ও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন প্রস্তাবগুলি প্রণিধানযোগ্য কিনা ও কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রস্তাব :—মহর্ষিদেবের অনেক উপদেশ ও বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও শাস্ত্রাদির অনুবাদ যাহা "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে" বা কোন পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই সেগুলি পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে আছে। এই সকল ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী একত্র করিয়া করিয়া যথাযথভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা উচিত ইহাই প্রথম প্রস্তাব ও নিবেদন এরূপ হইলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে ও বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। উপদেশগুলি বা প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পড়িয়াছি—পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়াছি সে সকলের তুলনা আর কোথাও পাই না। আমার মনে হয় এই সকল উপদেশের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ সে সময়ে এত জীবন্তভাব ধরিয়াছিল ও সে সকলের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ এখন এমন হীনপ্রভ হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে সে সকল অমূল্য উপদেশ পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে এখনও অবজ্ঞাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছে আর "ছাইপাঁশ" বক্তৃতা ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। আপনার কাছে আমার সানুনয় নিবেদন যে আপনি ত্বরায় সে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট আবার এখন প্রকাশ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। এ কার্য্যের জন্য আপনিই উপযুক্ত সেইজন্য আপনাকে এ অনুরোধ করিতে সাহস করিয়াছি। অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এ কার্য্য নিশ্চয়ই আপনার গৌরবের বিষয় হইবে। আপনার যদি সময় না থাকে তাহা হইলে দুতিন জন কর্ম্মচারী রাখিয়া এ কার্য্য শীঘ্র সমাধান করিতে পারেন;

আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে :—

(১) উপদেশ ও বক্তৃতা—প্রথম পুস্তক।

অনেক উপদেশ আছে তার মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি, যথা—

(ক) তত্ত্ববোধিনী সভার ২য় অধিবেশনে বক্তৃতা।

(খ) ১৭৮২ শকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ।

(গ) ১৭৮২ শকে ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে বক্তৃতা যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত বিষয় :—ব্রাহ্মসমাজের ২১ বৎসরের বৃত্তান্ত।

(ঘ) কেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে নিয়োগ ও উপদেশ।

(ঙ) ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(চ) বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর উপাচার্য্যপদে নিয়োগ ও বক্তৃতা।

(ছ) হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উপদেশ।

(জ) হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা।

(ঝ) ১৭৮৯ শকে অভিনন্দনের উত্তর।

(ঞ) ১৭৮৯ শকে "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা।

(ট) ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ।
(ঠ) ১৭৯৬ শকে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ।
(ড) ১৭৯৮ শকে সিন্দুরিয়াপটীতে উৎসব।
(ণ) সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিনন্দনের উত্তর—যাহা "উপহার" বলিয়া বিখ্যাত।

এইরূপ আরও কত অনন্ত বক্তৃতা ও উপদেশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিক্ষিপ্ত আছে তার সংখ্যা করা যায় না—কয়েকটী যাহা আমার সুন্দর বলিয়া বোধ হইল তাহাই লিখিলাম। এ সকল একত্র করিলে অতি বৃহৎ ও অতি সুন্দর পুস্তক হইবে মহর্ষিদেবের জীবনের ক্রমবিকাশ ও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

(২) মহর্ষিদেবের প্রবন্ধ—দ্বিতীয় পুস্তক।

তত্ত্ববোধিনীতে মহর্ষিদেবের অনেক প্রবন্ধ আছে—ভবসিন্ধু বাবু ও অজিৎ বাবু তাঁহাদের পুস্তকে সে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ১৭৯২ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু অনেক প্রবন্ধের বিষয় জানিতে পারেন। পরিবারের কেহ কেহ, বা পুরাতন ব্রাহ্মরাও কেহ কেহ সন্ধান বলিতে পারেন। সে সকল প্রবন্ধ একত্র করিলে কি একটী বৃহৎ পুস্তক হইবে না?

(৩) মহর্ষিদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—তৃতীয় পুস্তক।

ভবসিন্ধু বাবু তাঁহার লিখিত জীবনচরিতে ৩৭১ পৃষ্ঠায় ও অজিত বাবু ৪৭৭ পৃষ্ঠায় মহর্ষিদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) চতুর্থ পুস্তক—ছোট ছোট পুস্তকগুলি লইয়া একটী পুস্তক হইতে পারে, যথা—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।
(খ) আত্মতত্ত্ববিদ্যা।
(গ) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।
(ঘ) পরলোক ও মুক্তি।

এমন সব অমূল্য পুস্তক ক্ষুদ্রাকারে থাকাতে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না ও আমার মনে হয় ক্রমে সে সকল দুষ্প্রাপ্য হইবে ও লোপ পাইবে—সেইজন্য এ সকল একত্র করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করা ও প্রকাশ করা উচিত।

"জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" আপনার প্রেরিত listএ পাইলাম না—ইহা কি আর আজকাল পাওয়া যায় না? "উপহার" (বাঙ্গলায়) কি পাওয়া যায় না?

(৫) পঞ্চম পুস্তক—ঋগ্বেদের অনুবাদ।

১২৫৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে—(তত্ত্ববোধিনী ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন দ্রষ্টব্য)—ঋগ্বেদের অনুবাদ বাঙ্গলায় কি পাওয়া যায়? অনুবাদ না পাওয়া গেলে ক্ষতি নাই কিন্তু উপদেশ ও প্রবন্ধ সকলের বিশেষ দরকার আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় M. A. পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষাকে একটী বিষয়রূপে নিরূপণ করিতে চান যদি ইহা নিরূপিত হয় তাহা হইলে মহর্ষিদেবের লেখনী নিঃসৃত প্রবন্ধ ও স্বর্গীয় অনন্ত উপদেশ সকলই বাঙ্গালা ভাষায় Classics রূপে নির্ব্বাচিত হইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এ সুযোগ ছাড়িলে বাঙ্গলাভাষার ও সমগ্র দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ইহা ঈশ্বর প্রেরিত সুযোগ বলিয়া মনে হয়। আপনার নিকট বিনীত ভিক্ষা এ স্বর্গীয় সুযোগ হারাইবেন না।

এ সকল পুস্তক ব্যতীত আরও পুস্তকের অভাব আমরা অনেকে অনুভব করি। আপনার মণ্ডলীগঠনের প্রবন্ধ পড়িয়া সে অভাব আরও বোধ করিতেছি। যদিও মহর্ষিদেবের অনন্ত উপদেশ ব্যতীত মণ্ডলীগঠন হইতে পারে না ইহা একরূপ ধ্রুব সত্য, তথাপি আরও কয়েকটী পুস্তক প্রয়োজন—সেই জন্য আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব নিবেদন করিতেছি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস (বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত) একখানি থাকা প্রয়োজন। ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হইবে। আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলে হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। অনেকে আকাঙ্ক্ষা করেন যে আপনি বা শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লেখেন—ভবসিন্ধু বাবুর বা অজিত বাবুর জীবনী নানা কারণে সকলের মনোনীত হয় নাই বিশেষত ভাষার দোষের জন্য।

অবশেষে সানুনয় ভিক্ষা—কোন অপরাধ লইবেন না—মনের আবেগে অনেক কথা লিখিলাম—ক্ষমা করিবেন। প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

বিনত নিবেদক
শ্রীসিদ্ধেশ্বর সরকার।

স্থির হইল——

(১) সম্পাদক মহাশয় মহর্ষিদেবের উপদেশ প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে ভালই হয়।

(২) আদিব্রাহ্মসমাজের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা উচিত।

(৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে মহর্ষিদেবের সমগ্র জীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৪। Secy All India Music Conferenceএর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পত্র আলোচিত হইল।

এই সভার সহিত আদিসমাজের যোগস্থাপনের উপায় স্থির করিলে ভাল হয়। আদিসমাজ হইতেই বলিতে গেলে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তান লয় সম্বলিত সঙ্গীতের চর্চ্চার সূত্রপাত হয়।

স্থির হইল—সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি এ বিষয়ের যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার ভার প্রদান করা হউক।

৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গত ২০ মার্চ্চ তারিখের আদিসমাজ লাইব্রেরীতে পুস্তক প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"আদিব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরী দেশীয়গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত লাইব্রেরীসমূহের পথপ্রদর্শক ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইতিপূর্ব্বে আমি যখন আদিসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সেই সময়ে পাথুরেঘাটার ভবনাথ

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নিজের লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক প্রায় ৪০০ খণ্ড আদিসমাজের লাইব্রেরিতে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাহার একখানিও নাই। অধিক কি, এবারে সমাজের ভার গ্রহণের পর সে লাইব্রেরীই আর দেখিতে পাই নাই। সেই কারণে আমি কতকগুলি পুস্তক সমাজে প্রদান করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষসভার এবং সেই সঙ্গে ট্রষ্টীদিগের এই নির্দ্ধারণ চাই যে, আদিব্রাহ্মসমাজের লাইবেরীর পুস্তকগুলি সমাজের গৃহেই থাকিবে; পুস্তকগুলি অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে পুস্তকদাতার অভিমত জানিয়া অধ্যক্ষ সভার এবং ট্রষ্টীদিগের অনুমতি লইতে হইবে।" ইতি—

স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে পুস্তক-প্রদানসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হউক।

৬। কম্পোজিটর ও প্রেসম্যানের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

পুরাতন কম্পোজিটারদিগের মাসিক ২৲ টাকা এবং প্রেসম্যান তিনকড়ি দের মাসিক ১৲ টাকা বৃদ্ধি অনুমোদন করিলে ভাল হয়।

স্থির হইল—কম্পোজিটার রণগোপাল চক্রবর্ত্তী ও গোপীনাথ ঘোষ এবং প্রেসম্যান তিনকড়ি দে, ইহাদের প্রত্যেককে মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে বৃদ্ধি দেওয়া হউক।

৭। বেজুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের বেজুড়াতে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজকে দানের প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

ইহার স্বত্ব আদিব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিতে গেলে ট্রষ্টডীড্ করা আবশ্যক একথা তাঁহাকে লেখা হইয়াছে।

স্থির হইল—ট্রষ্টডীড্ পাইলে প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, "জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির" স্বত্ব ব্রাহ্মসমাজকে দানের প্রস্তাব। আলোচিত হইল।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত সর্ত্তে ঐ গ্রন্থের স্বত্ব দিতে সম্মত আছেন—"উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ ফুরাইয়া গেলেই পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত ৫০০ পাচশত কাপির একটী সংস্করণ সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করা হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে(এই সর্ত্তের অন্যথা হইলে উহার স্বত্ব তাঁহারই নিজস্ব থাকিবে।"

গত ৪ঠা ফাল্গুনের অধিবেশনে স্থির হয় যে উক্ত পুস্তক এক খণ্ড সভাপতি মহাশয়ের নিকট পাঠান হউক এবং তাঁহার মতামতসহ প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলেন "অনেক কথার note প্রয়োজন এবং মধ্যে মধ্যে নূতন কথা দেওয়া প্রয়োজন। স্থানে স্থানে correction ও দরকার; edit করিয়া বাংলা পাঠ্য হিসাবে ছাপাইলে ভাল হয়।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির" স্বত্ব তাঁহার প্রস্তাবিত স্বত্ব অনুসারে গ্রহণ করা হউক।

৯। আদিব্রাহ্মসমাজপ্রেসের প্রিন্টার শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রাপ্তির প্রার্থনা। আলোচিত হইল।

স্থির হইল—প্রিন্টার শ্রীযুক্ত রণগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহের সাহায্য ৮৲ আট টাকা মঞ্জুর করা হউক।

১০। ধলগোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রায়ের ২রা জুন তারিখের পত্র। আলোচিত হইল।

ইনি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক, পড়ার খরচ প্রার্থনা করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন।

স্থির হইল—বর্ত্তমানে প্রার্থিত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে না লেখা হউক।

১১। পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের ২১শে মে তারিখের পত্র। আলোচিত হইল।

তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একটি বিপত্নীক ও আনুষ্ঠানিক (অর্থাৎ রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহিত) কায়স্থ পাত্র একটী ২৫ বৎসরের ব্রাহ্মবিধবা পাত্রীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। তিনি বিবাহের পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্য তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কিনা এবং কোন আচার্য্য বা পুরোহিত যাইতে পারিবেন কিনা।

স্থির হইল—আইনানুসারে সিদ্ধ হইবে কি না দেখা হউক। যদি অসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

১২। শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী মহাশয়ের ২৭শে আষাঢ় তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন।

১। পুরাতন নিয়ম অনুসারে এখন প্রতি বুধবারে উপাসনা হইতেছে, আমি এই বুধবার ভিন্ন আর একদিন (যেদিন সকলের সুবিধা হইবে) উপাসনা করিতে বলি, অর্থাৎ সপ্তাহে দুইদিন উপাসনা হওয়া কর্ত্তব্য।

২। এই দুই দিন ছাড়া এক একদিন এক একজন সভ্য অথবা সম বিশ্বাসী বন্ধুর বাড়িতে উপাসনা করা। এই উপাসনায় সকল সভ্য যোগ দিবেন। ইহাতে এই উপকার মনে করি যে পরিবারে উপাসনা হইলে মহিলাগণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সম্ভোগ করিয়া পবিত্র হইতে পারিবেন। এই উপাসনায় জলযোগ দ্বারা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হওয়া একেবারে নিষেধ। এইরূপ পারিবারিক উপাসনা প্রতি মাসে যতবার ইচ্ছা ও সুবিধা হইবে ততবারই করিতে পারা যাইবে। কোনদিন কাহার বাড়িতে উপাসনা হইবে, পূর্ব্ববারের উপাসনার শেষে বলিয়া দেওয়া হইবে।

৩। মাঝে মাঝে নিকটস্থ কোন গ্রামে যাইয়া সেই গ্রামের লোকদিগকে লইয়া খোলা জায়গায় কীর্ত্তনাদি সহ উপাসনা করিলে ভাল হয়। ইহাতে গ্রামের লোকজন ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। প্রতি সভ্যের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজ নিজ এলাকাস্থিত সভ্যগণের বাড়িতে যাইয়া পরস্পর দেখাশোনা, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা।

৫। আমাদের মধ্যে প্রচারকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অতএব উপযুক্ত প্রচারক প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সভ্যদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ বলিতে পারেন, তাঁহাকে বলিবার অবসর দেওয়া, এবং তাঁহাকে প্রচারকের কার্য্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

আরো অনেক কর্ত্তব্য আছে তাহা এক্ষণে তত দরকার নাই। আপাতত এই কয়টি কার্য্য আপাতত এই

কয়টি কার্য্য আরম্ভ করিলেই সমাজের অনেক উপকার আশা করা যায়।

প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটি সভা আহ্বান করিয়া সেই সভায় ইহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঠিক করিবেন ইতি—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদীর উপর প্রতি রবিবারে একটী উপাসনা ও আলোচনা সভা সংস্থাপনের ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি

—•—

একমেবাদ্বিতীয়ং
বিংশ কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসংবৎ ৯০
৯১৭ সংখ্যা
১৮৪১ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

বিবেকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ।

(ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩-১-৮।

"চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না, বাক্যের দ্বারাও নহে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও নহে, তপস্যা কিংবা কর্ম্মের দ্বারাও নহে; কিন্তু অন্তর্যামী জ্ঞান নির্ম্মল হইলে, প্রপঞ্চ হইতে উৎপন্ন যে মলিন সংস্কার তাহা হইতে মুক্ত হইলে এবং রজ ও তম এই পাপজনক গুণের নিরাস হইয়া কেবল সত্ত্বগুণ অথবা সাত্ত্বিক ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে মনুষ্য যখন ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বপ্রকারের পরিপূর্ণ যে পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পায়।"

ভাল, মন্দ, যোগ্য, অযোগ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল, পুণ্য, পাপ,—এই সকলের বিবেচক যে বিবেক, তদ্দ্বারা মঙ্গলময় পরমেশ্বর আপন বাণী মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদিত করান, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাই সব নহে। এই বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে স্বকীয় মঙ্গলময় ও বিশুদ্ধ স্বরূপও প্রকটিত করেন। স্বকীয় বৃত্তি ও স্বকীয় আচরণ সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ, মঙ্গলময়, পুণ্যময় অথবা যোগ্য বলিয়া কোন মনুষ্য প্রত্যয় করিতে না পারিলেও, আপন হৃদয় মলিন, পাপী ও দুষ্ট বাসনায় পরিপূর্ণ এইরূপ সকলেরই মনে হইলেও, পরিপূর্ণ, মঙ্গল, বিমল, অকলঙ্ক সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে বিমুক্ত, শুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা এইরূপ স্বরূপের জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ মঙ্গলের জ্ঞান অন্তরে না থাকিলে, অমঙ্গল এরূপ প্রত্যয়ই আমাদের হইতে পারে না; এইরূপ পরিপূর্ণ স্বরূপের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা পাপী, আমরা দুষ্ট, এইরূপ আপনাদিগকে মনে করি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধ শান্ত ও মঙ্গলময় হউক এইরূপ বলবতী ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের জ্ঞান আমাদের অন্তরে উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকরণ করিব, তাহার সাদৃশ্য আমরা প্রাপ্ত হইব, মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ হইয়া থাকে। সেইজন্যই তুকারাম বাবার ন্যায় সাধু "আমি পতিত, আমি পাপী, তোমার শরণাপন্ন হইলাম", "সেবাহীন দীন পাতকের রাশি"—এইরূপ বলিয়াছেন। সংসারে অতিশয় আসক্ত ও বিষয়সুখের মধ্যে নিমগ্ন যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের অন্তঃকরণে এই পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের জ্ঞানবিধায়ক বিবেক মলিন হইয়া যায়; রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবল হইয়া, পাপের সংস্কার দৃঢ় হইয়া বিবেক নষ্টপ্রায় হয়। আত্মার এইরূপ অবস্থা হইলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান তাহার হয় না, সে পাপ-পঙ্কের কীট হইয়া পড়ে। উক্ত হইয়াছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ, ১-২-২৩।

"দুশ্চরিত্র হইতে যে নিবৃত্ত হয় নাই, যে শান্ত নহে, যাহার বৃত্তি সমাধানযুক্ত হয় নাই, মন শান্ত হয় নাই, তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না এবং তাহার পরমেশ্বরপ্রাপ্তিও হয় না।" কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, কামক্রোধাদি রিপু হইতে আত্মা মুক্ত হইলে, দয়া ক্ষমা শান্তি এই সকল হৃদয়ে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, সেই অনন্ত শান্ত আনন্দময় পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং জীবাত্মা পরম শান্তিসুখ অনুভব করে। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

৫-২৬।

"যাঁহারা যতি, কামক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন যাঁহারা আপনার চিত্তকে সংযম করিয়া বিবেকের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, ও আত্মার প্রকৃত যোগ্যতা জানিয়াছেন, তাঁহাদের চারিদিকে ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান থাকে"। সারাংশ, মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিবেক বলিয়া যে তত্ত্ব আছে তাহার যোগে, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহার জ্ঞান অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছার জ্ঞান এবং তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে; এবং এই বিবেক পাপমলায় কলঙ্কিত না হইয়া শুদ্ধ থাকিলে ও তদনুরূপ আপন বৃত্তি ও আচরণ হইলে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়।

মানব-ইতিহাসের বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহরূপে দেখা যায় যে, সাত্ত্বিক ভাবের জ্ঞান আমরা এই প্রকারে সহজে প্রাপ্ত হই, এবং তাহার উত্তরোত্তর জয় হয়। দুষ্ট পাপী অধম যে ব্যক্তি, সে কখন কখন সাত্ত্বিক পুণ্য-পুরুষদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়;— কিন্তু এই অবস্থা অধিককাল টিকিয়া থাকে না। যে জনসমূহের মধ্যে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় কিয়ৎকালের মধ্যেই তাহার বিলোপ হয়ই-হয়। ভালর সম্মুখে মন্দ টেকে না। মন্দের নাশ হইতে কখন ২৫ বৎসর, কখন ৫০, ১০০, ২০০ বৎসর লাগে; কিন্তু অন্তে তাহা নষ্ট হইয়া, ভালোর জয় হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। এবং মন্দ হইতে ভাল-পরিণাম হয়—এরূপও অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই। যাহা ভাল তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা—এইরূপ আমরা বিবেকযোগে উপলব্ধি করিয়াছি; অতএব ভালর জয় হওয়াও যাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছার জয় হওয়াও তাহা—একই। অতএব ভালর জয় হইয়া থাকে, মন্দ হইতেও ভাল উৎপন্ন হয়—ইহা যদি ঠিক হয়, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছারই জয় হইতেছে এবং এই সমস্ত জগতে পরমেশ্বরই রাজত্ব করিতেছেন, তিনিই সকলের শাসয়িতা, এইরূপ সিদ্ধ হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥

কঠ, ২-২-৮

"সমস্ত প্রাণী যখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে তখন যিনি জাগৃত থাকিয়া আপন ইচ্ছানুসারে উৎপত্তি করিয়া থাকেন, তিনিই দেদীপ্যমান, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই শাশ্বত, এইরূপ উক্ত হয়। সমস্ত বিশ্ব তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিত; তাঁহাকে অতিক্রম করে এমন কেহ নাই।"

আমরা নিদ্রিত থাকি বা সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের মধ্যে পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকি, কিংবা অজ্ঞান হইয়া কিছুই দেখি না—তখন পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা নহে। আমরা দেখি কিংবা না দেখি, বুঝি কিংবা না বুঝি, তথাপি জাগতিক ব্যাপার সমান চলিতে থাকে। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য অতীব গহন। আমরা তাহা জানিতে পারি না। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য জগতের ব্যাপার অকুণ্ঠিত ভাবে সতত চলিতেছে। আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, কিংবা দশ বৎসরের মধ্যে, কিংবা শত, সহস্র, লক্ষ বৎসরের মধ্যে যে পরিণাম ঘটিবে তাহার বীজ আজ রোপন করা হইতেছে। পরমেশ্বরের গৃহে কাল-পরিমান বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের নিকট শত বৎসর দীর্ঘ কাল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার যোজনার মধ্যে শত বৎসরের গণনা নাই। অনন্তের সম্মুখে শত বৎসরের গণনা কি? হয়ত আজ যে কাজ কোন রাজপুরুষ করিতেছেন, তাহা হয়ত পরমেশ্বরের হাতে শত বৎসরের পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের

মূল কারণ হইবে। আজ আমরা যাহা করিতেছি তাহা হইতে, অমুক এক জনসমাজের মধ্যে কালান্তরে হয়ত এক মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, এইরূপ পরমেশ্বরের যোজনা। হিমালয় পর্ব্বত কোটি বৎসরের পর বিনষ্ট হইবে এইরূপ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্যেক বর্ষায় অল্প অল্প মৃত্তিকা, নদ-নদী, কাষ্ঠ-পাষাণ উহা হইতে বাহিত হইয়া আস্তে আস্তে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে থাকিবে। যেখানে এখন সমুদ্র আছে সেইস্থানে লক্ষ বৎসরের পর ভূমি উৎপন্ন হইবে এইরূপ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে অসংখ্য কীটের দ্বারা মৃত্তিকার এক কণার উপর অপর কণা ক্রমশ রচিত হইয়া ঐ পরিণাম সংঘটিত হইবে। এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কাল যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় না, সেইরূপ দেশও প্রতিবন্ধক হয় না। পৃথিবীর উপর যে বৃষ্টি হয়, তাহা অনেকাংশে দুরবীক্ষণদৃষ্ট সূর্য্যবিম্বের উপরিস্থ কালো টিপের গতির উপর নির্ভর করে। ঐ কালো টিপ সূর্য্যমণ্ডলের উপর চক্রবায়ুর ঘূর্ণনে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাহার পর, পৃথিবীর উপর মেঘ উৎপন্ন হইয়া প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টি হইবে—এই ব্যাপারের বীজ ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরস্থ সূর্য্যমণ্ডলের উপর পরমেশ্বর রোপণ করেন। এবং এইরূপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র—এই সমস্তের পরস্পরের নিকট-সম্বন্ধ আছে। অতএব দেশ ও কাল হইতে কোন প্রতিবন্ধক না হইয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম সতত সমানই চলিতেছে; ক্ষণকালের জন্যও তাহার বিরাম হয় না।

এই যে পরমেশ্বর, তিনি দেদীপ্যমান, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারই আলোক আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট অজ্ঞান অন্ধকার নাই। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের জ্ঞান তাঁহার আছে। ভবিষ্যতের জ্ঞান আমাদের নাই, ভূতকালকে আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারি না। মুখ্যরূপে ইন্দ্রিয়যোগেই আমাদের জ্ঞান হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুর সহিত ঐ ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগ হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান বস্তুর সহিত সংযোগ হয় বলিয়াই আমাদের যা অল্প কিছু জ্ঞান হয়। আমাদের অনুমান দুর্ব্বল; যতটা আবশ্যক সেরূপ ঘটনাবলী আমাদের অনুমান প্রাপ্ত হয় না। তাই, তদ্দ্বারা ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান অতি অল্পই হয়। ভূতকাল-সম্বন্ধে আমাদের মতো লোকের লিখিত গ্রন্থ আছে. তাহা হইতে কিছু শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতেও বিবাদ ও বাধা বিস্তর; এবং এইরূপ গ্রন্থ হইতে কালের জ্ঞান অল্পই হয়। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের ন্যায় শরীররূপ কারাগৃহে বদ্ধ নহেন। আমাদের ন্যায় কারাগৃহের ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষ দিয়াই তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন এরূপ কোন কথা নাই; তিনি শরীরবিহীন, ইন্দ্রিয়রহিত কেবল আত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানময়; তাই সমস্ত ভূত-ভবিষ্যবর্ত্তমান তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর। নিকটস্থ বস্তুর জ্ঞান, এখান হইতে কোটি যোজন দূরস্থ বস্তুর জ্ঞান, সকল দেশের জ্ঞান তাঁহার আছে। পরমেশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সকলের মূলতত্ত্ব। তিনি শাশ্বত পুরাণ পুরুষ। বিশ্বজগতে বুদ্‌বুদ্‌বৎ অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন হয়, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত থাকে এবং অন্তে লয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের ন্যায় আজ পর্য্যন্ত কত লোক জন্মিয়াছে এবং আমাদের ন্যায় সংসার করিয়া অন্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিশ্বের রূপান্তর হইয়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর উপর লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কেবল বৃক্ষ ছিল, সর্পাকার প্রাণী ছিল; ঐ অবস্থা আস্তে আস্তে নষ্ট হইয়া এখনকার অবস্থা আসিয়াছে। এই প্রকারে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু পরমেশ্বর একই সমান; তিনি বিনাশরহিত, তিনি বিকাররহিত, তিনি শাশ্বত, পরাৎপর, পরমাত্মা;—তাঁহার উপর কালের প্রভাব চলে না, তিনি কালের প্রভু। এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ হইয়া চলিতেছে, তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে। বিশ্বের অসংখ্য লোকমণ্ডল, পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বনস্পতি, অসংখ্য জড়পদার্থ, তাঁহারই শক্তিতে চালিত হইতেছে। ঐ সমস্ত একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। পরমেশ্বরই সকলের রাজা, সকলের শাসয়িতা। তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে এরূপ কাহারও সামর্থ্য নাই।

রাজা রামমোহন রায়।

(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু)

৮৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশবাসী যে মহাপুরুষ স্বদেশের হিতব্রতে প্রবাসে গমন করিয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজার জন্য আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আমরা এই সভাগৃহে সমাগত হইয়াছি।

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের পূজা প্রচলিত আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ মানসচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই পথে অগ্রসর হইতে শক্তিলাভ করিবার জন্য, আমরা মহাপুরুষদিগের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। যখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-তরী এই অকূল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন স্নিগ্ধজ্যোতি ধ্রুব-তারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সেই পথভ্রান্ত তরণীকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বনীয়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Longfellow লিখিয়াছেন :—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,"

অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন আমাদিগের জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার প্রধান সহায়। মহাপুরুষেরা জগতের গুরু—তাঁহাদের আগমনে জগতে সত্যের আলোক প্রকাশিত হয়। সেই আলোকের সাহায্যে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বিপথগামী মানব, সত্যের পথ, কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইয়া সেই দিকে জীবনের গতি ফিরাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং কেবল যে মহাপুরুষদিগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহা নহে; আমাদের আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগের স্মৃতি-পূজার আয়োজন অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশ ধন্য হইয়াছে; যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি ধন্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে এই বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি আজীবন সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, তিনি যে সকল বিশ্বজনীন উদার-মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানব-জাতির কল্যাণপ্রদ। জগতের যে কোন মনুষ্য তাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, চিরদিন শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে। এই জন্য তিনি বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী হইলেও, সমগ্র বিশ্ববাসীর আপনার লোক ছিলেন—বঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি হইলেও আসমুদ্র পৃথিবীই তাঁহার প্রকৃত জন্মভূমি। তাঁহার ধর্ম্মমত এমনই উদার ছিল যে তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল; অথচ তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মের ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত—একেশ্বরবাদ—অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। জগতে অতি অল্পলোকই এরূপ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই প্রতিভাবলেই তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তিনি মূল ভাষায় রচিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিব্রু ভাষায় রচিত বাই-বেলে যীশুতে ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয় নাই, খ্রীষ্ট-

বাদের (Doctrine of Trinity) উল্লেখ তন্মধ্যে নাই এবং খ্রীষ্টের রক্তে মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইবে, এরূপ মতের প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের এই সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য মার্সমান্ প্রমুখ তৎকালীন মিসনরীদিগের সহিত তাঁহার বহু তর্ক ও বিচার হইয়াছিল। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম যে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মিসনরীদিগের সহিত বিচার করিয়া অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে দুই একজন মিসনরী ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ (Unitarianism) গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তথায় মহম্মদের পয়গম্বরত্বের কোথাও উল্লেখ নাই—কেবল একমাত্র একেশ্বরবাদই কোরাণে সমর্থিত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদ্ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে সেই সকল গ্রন্থে প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা যে উপাসনার নিকৃষ্ট পদ্ধতি, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না; তিনি যাবতীয় মলিনতা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে সার পদার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমি নিজে হিন্দু এবং আমার বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম জগতে আর নাই। যিনি যে মতেই ভগবানের আরাধনা করুন না কেন, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম, সুপুত্র, কুপুত্র উভয়কেই তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারীভেদে, পূজার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একেশ্বরবাদ যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যখন সমস্ত জগত অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আমাদের দেশেরই প্রাচীন ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা ও তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ঋষি-উচ্চারিত সেই প্রাচীন মহাবাণী তাঁহার দেশের লোককে নূতন করিয়া শুনাইবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন না; তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক না বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক বলিব।

তাঁহার ভাষাজ্ঞান তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয়। নয় বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনা নগরে গমন করেন। তিন বৎসরে তথায় আরবী ভাষা মৌলবীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মূল কোরাণ গ্রন্থ আয়ত্ত করেন এবং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই একেশ্বর বাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া সংস্কৃতশিক্ষার জন্য কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃতভাষা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অত্যন্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি তিনটী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং দুইটী ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের যে মূল ভিত্তি, তাহা এই বয়সেই তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় এবং প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় গদ্যে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিবার জন্য পুত্র পিতার বিষম বিরাগভাজন হন এবং ইহার ফলে তিনি সেই কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারাই তাঁহার অসীম সাহস, দুর্জ্জয় মানসিক বল ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায়, আত্মশক্তি ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপর প্রান্তে অবস্থিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তখন যানাদির সুবিধা ছিল না, পথ অপরিচিত ও হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তিব্বত-অভিযান কোন বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যেও আসে নাই। এই নির্ভীক বাঙ্গালী বালক বৌদ্ধধর্ম্ম, লামাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার জন্য, সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া একাকী সেই দেশে উপনীত হইয়া-

ছিলেন। এরূপ সাহস ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় জগতের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। তিনি সেখানে যাইয়া লামা-পূজার প্রতিবাদ করিলে লামাগণ তাঁহার প্রাণবিনাশের সংকল্প করেন কিন্তু স্নেহশীলা তিব্বত-রমণীগণ সেই সুকুমারমতি বালককে গোপনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বত-রমণীগণের নিকট হইতে এই বিপদের সময় তিনি যে স্নেহ ও দয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যাবজ্জীবন বিস্মৃত হন নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল, এই ঘটনা তাহার মূলে বর্ত্তমান।

তিনি ২৮ বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি হিব্রু ভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মমত বিচারসম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

বৃদ্ধ বয়সে দেশের কার্য্যে বিলাত যাত্রা তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের আর একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তখন বিলাত গমন এখনকার মত সহজ ও সুসাধ্য ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বিলাতে গমন করেন নাই। তখন বিলাত যাইতে ছয়মাস সময় লাগিত এবং ধর্ম্ম ও দেশচার উভয়ই ইহার প্রবল বিরোধী ছিল। তিনি সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে ৫৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের গুণে হিন্দুজাতির প্রতি ইয়ুরোপীয় সুধীমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশকে এক অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি আদর্শ-জ্ঞানী, আদর্শকর্ম্মী এবং আদর্শ ভক্ত ছিলেন। এই তিনের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন এক, দুই, বড় জোর, আট বা দশ কলার সমষ্টি মাত্র, তাঁহার জীবন ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। তিনি একজন পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন এবং আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। দেশপূজ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই নব যুগকে "রামমোহন-যুগ" বলিয়া গিয়াছেন। এই যুগের কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক স্বার্থ-বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হইবে, অনেক বিপদ অনেক দুঃখ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে, তবে এই যুগের সাধনা সম্পূর্ণ হইবে। রামমোহন রায়ের স্বদেশবাসী আমরা তাঁহার সেই প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধিলাভের আনুকূল্যে কার্য্য করিতে কি পশ্চাৎপদ হইব?

ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সংস্কারকার্য্যের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে সংস্কারের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা-প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উদ্যোগী হন এবং তজ্জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন, তখন রাজা রামমোহন রায় সেই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শুদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষায় দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচারিত না হইলে দেশের লোকের মনের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা ঘুচিবে না, শাসনকার্য্যে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারা উচ্চ অধিকার কখনই পাইতে পারিবে না। জীবনসংগ্রামে তাহারা চিরদিনই পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে। সুতরাং তিনি সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা-প্রচারের বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহার বহুদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সবিশেষ পরিচায়ক। হিন্দুকলেজ-স্থাপনে তিনি ডেভিড্ হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, অথচ তাঁহার সংযোগ হিন্দুপ্রতিষ্ঠাতাগণের বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে ইহার সহিত যোগদান করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা

বিস্তারের জন্য নিজের ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন ডাক্তার ডফ্ এদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য কলিকাতায় প্রথম মিসনরী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি খিখিমতে তাঁহার সাহায্য করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচার কার্য্য সমাধান হইবার ব্যবস্থা তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন পরে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার চিরদিনের আশা ফলবতী হইয়া ছিল। যদিও তিনি ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা যে এই সুব্যবস্থার আদি কারণ, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে উচ্চ শিক্ষার ফলে দেশ উন্নতির দিকে এত অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূলে রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ভারতবাসীমাত্রেই ইহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক যেরূপ উর্ব্বর ছিল, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ কোমল ও উদার ছিল। হৃদয়ের এই উদারতা ও কোমলতাই তাঁহাকে বিবিধ সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের স্থল। তাঁহার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া কেহই আইনানুসারে ইহা নিবারণ করিতে সাহস করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় যেখানে সতীদাহের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা কর্ণে শুনিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে যাইয়া নানা উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে সতীর সংকল্প পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে সতী স্বামীবিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় এবং সামাজিক অপযশের ভয়ে অনেকানেক বিধবা স্বামীর সহগমন করিতেন। সহগমনের সময় ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইলে অনেক স্থলে জোর করিয়া তাহাকে চিতায় প্রবেশ করান হইত এবং যদিও সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মম আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক চিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিত। স্ত্রীজাতির প্রতি এই পৈশাচিক সামাজিক অত্যাচার অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের কোমল হৃদয়ে বিষম আঘাত করিতেছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রচলিত হইয়া ভারতবাসী হিন্দুকে ধর্ম্মের নামে স্ত্রীহত্যার পাতক হইতে রক্ষা করে। এই সংস্কারসংসাধনের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে অশেষবিধ সামাজিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ ছিল না। তাঁহার দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি ও সুদৃঢ় বিবেকবুদ্ধিবলে তিনি সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে "হরকরা" নামক ইংরাজচালিত একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কোন কারণে গভর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার সম্পাদককে আটক করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহম রায়ের দ্বারা পরিচালিত "আক্‌বর" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের প্রচারও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এখানকার আন্দোলনে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ জর্জ্জের নিকট সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ও অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনের শেষ ফল দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের দুই বৎসর পরেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টের একটী কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়

এদেশের কৃষকদিগের হীনাবস্থার বিষয় বিশেষভাবে বিলাতের মন্ত্রীসভার গোচর করিয়া উহার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক এদেশবাসী লোক যাহাতে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্যও তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় যে দুই একখানি গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি অনেকগুলি উপনিষদ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভাষার উন্নতি ও সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রনিহিত ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশে জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি সংবাদপত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ কর্ত্তৃক "সমাচার-দর্পণ" নামক একখানিমাত্র সংবাদপত্র বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হিব্রুভাষার বাইবেল হইতে এবং আরবীভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে অনেকানেক স্থান অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; অনেকানেক ইংরাজী গ্রন্থ ও সময়োপযোগী পুস্তিকা লিখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজ গৃহে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন। "একেশ্বরবাদ" প্রচারই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ব্রাহ্ম-সভায়" পরিণত হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান "আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহ" এই সভার স্থায়ী ভবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণভাবে ব্রহ্মোপাসনা কলিকাতায় প্রচলিত হয়। এই উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ইহার উপাসনা-কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ১৮৩০ সালে বিলাত গমন করেন এবং তথায় তিন বৎসর স্বদেশের কল্যাণে কার্য্য করিবার পর সাঙ্ঘাতিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করেন।

যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণ কামনার জন্য—সেই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবেই আমাদের অদ্যকার এই স্মৃতি-পূজার আয়োজন সার্থক হইবে।

বিবাহ মঙ্গল।

রাগিণী—সাহানা।

তোমারি আহ্বানে আজ
পরিয়া মিলন-সাজ
এসেছে আশীষ তরে
শুভ মিলনের পরে।
দীরঘ জীবন-পাথে
ধরি' যেন তব হাতে
তোমারি করুণা পরে
চলে নিরন্তর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে লয়ে যেন ফিরে।
সন্ততি ফেলুক ছেয়ে
শত কলতানে গেহ,
তব পুণ্য নাম গেয়ে
ধন্য হোক প্রাণ দেহ;
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক,
ঘুচে যাক দুখ শোক;
আনন্দ হউক নিত্য
অনুচর সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে লয়ে যেন ফিরে।

বঙ্গের অভাব।

(শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত)

কালের শাসনে বাঙ্গালী আমরা, সুজলা, সুফলা বঙ্গমাতার আদরে পালিত শিশু আমরা, আজ অন্ন

* রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু কর্ত্তৃক বিবৃত, পরিচারিকা কার্ত্তিক ১৩২৬ হইতে উদ্ধৃত।

বস্ত্রের কাঙ্গাল। অনশন না হউক অর্দ্ধাশন আমাদের নিত্য সহচর। বস্ত্রের অভাবে নগ্ন হইতে বসিয়াছি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালকবালিকাগণকে বিলাতি ছাঁচের খাকীরঙ্গের হাফ্‌প্যান্ট পরাইয়াছি। গৃহলক্ষ্মীগণকে প্রায় ডোর-কৌপিন ধরাইয়াছি। এ দুর্দ্দশা কেন হইল ?

বঙ্গদেশে ধনী বা ধনকুবেরের অভাব নাই একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—একথাও অতি সত্য। তাঁহাদের হৃদয় তাঁহাদের প্রতিবেশী অসহায় দরিদ্রগণের দুঃখে এককালেই কাঁদে না, ইহাও সত্য নহে। নানাবিষয়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান বাঙ্গালীর মধ্যেও বিরল নহে। যে প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তি আজ বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা, সে শক্তিও সুপ্ত নহে। সকলেই বাঙ্গালীর দুঃখ-মোচনে সচেষ্ট, তথাপি আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ অধিকতর অবসন্ন হইতেছি ইহাও ত নিত্য সত্য। শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দশা ছিল না। তখন অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রায় কোন বাঙ্গালীকে পরের দ্বারে যাইতে হইত না। এমন কি, বাঙ্গালার ভিক্ষুকগণও স্বচ্ছন্দলব্ধ ভিক্ষা-মুষ্টি দ্বারা স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিত। বিগত শত বৎসরে বঙ্গের লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কৃষিযোগ্য ভূমিও অধিক হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবন নামধেয় বিশাল বনভূমির অনেকাংশ এবং উত্তুঙ্গশিখর হিমাচলের পাদবর্ত্তী বিস্তৃত কাননভূমি অপরিমেয় শস্যরাজি উৎপাদন করতঃ বঙ্গের অজস্র কল্যাণ সাধন করিতেছে। বঙ্গের বর্দ্ধমান বহির্বাণিজ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালীর গৃহে অধিকতর অর্থাগম করিতেছে। বিদেশী পণ্যের আমদানিও দ্রুতবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিদেশী পণ্য আমরা অবাধে ক্রয় করিয়া বিদেশীয় বণিকগণের উদরপোষণের উপায় করিয়া দিতেছি, অথচ আমরা দিনে দিনে অন্নহীন হইতেছি। একি বিষম প্রহেলিকা ! তবে কি আমাদের চির-করুণাময়ী জননী বঙ্গভূমির অফুরন্ত শস্য-ভাণ্ডারের বিনিময়ে আমরা বিদেশীয় বিলাসিনী ও বিলাসী-গণের চাকচিক্যময় বিলাসবিভ্রমের বাগুরাবদ্ধ হইয়া অন্নবিনিময়ে বিষ গ্রহণ করিতেছি ? এ কথাটা যেন কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বলিয়া মনে হয়। একদিন অপরাহ্নে সমস্ত দিবার দারুণ পরিশ্রমের পরে অবসন্ন ও ক্লিষ্টদেহে ধনগরবে গরবিনী বঙ্গ-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর সুশোভন রথ্যা-বলম্বনে পদব্রজে গৃহে ফিরিবার কালে ঐ সকল সংকীর্ণ বা প্রশস্ত বিবিধ রাজপথগুলির উভয়পার্শ্বে বিরাজমান অসংখ্য সৌধমালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বিস্তার করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তমনে পদচালনা করিতেছিলাম। যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই দিকেই কেবল অগণ্য বিপণিশ্রেণী আমার লুব্ধ-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নানাবিধ মনোমুগ্ধ-কর পণ্যরাশি মনোমোহনসাজে সুশোভিত। তখন হঠাৎ মনে হইল যে ক্ষুদ্র মানব আমরা, আমাদের অভাবের পরিমাণ কি এত বৃহৎ, যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ এতঅধিক দ্রব্যরাজি আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বা-হের জন্য আবশ্যক হয় ? লালসার দৃষ্টিকে দূরে রাখিয়া, বিলাসের মোহ-আবরণ ধীরে সরাইয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলাম যে আমাদের নিত্য অভাব মোচনোপযোগী নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ঐ সকল সুশোভন বিপণিশ্রেণীর মধ্যে প্রায়শঃ নাই। নয়নরঞ্জন সুসজ্জিত পণ্যরাশির মধ্যে আমাদের ক্ষুৎপিপাসার অভাব-মোচনোপযোগী চাউল, ডাউল, তরি-তরকারি, দুগ্ধ ঘৃত, আটা ময়দা অথবা বাতাতপ হইতে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি রক্ষা করিবার উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্ত্র কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইল। চিরকরুণাকোমল বিশ্বপতির চির আশীর্ব্বাদরূপী এই সকল অন্ন পানীয় কোথাও বা আবর্জ্জনারাশির পশ্চাতে ক্ষুদ্র অন্ধকারাবৃত অপ্রশস্ত পথপার্শ্বে, কোথাও বা কোন ক্ষুদ্র কুটী-রের অভ্যন্তরে মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন। আর যে সকল বস্তুর অভাবে আমাদের দেহযাত্রা নির্ব্বা-হের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, সেই সকল খেলনার দ্রব্য মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদের প্রলুব্ধ করি-তেছে। অভাগা আমরা, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচকে অঞ্চলে বাঁধিতেছি, আর হা-অন্ন যো-অন্ন করিয়া তপ্তনিশ্বাসে করুণাময়ী শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার করুণা-শীতল বক্ষকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছি। বঙ্গের গৃহস্থ ছিলাম আমরা। ক্ষেত্রের শস্য,

গোয়ালের গরুর দুগ্ধ, পুষ্করিণী বা নদী-তড়াগের মৎস্য ও পানীয়, বনজাত বা উদ্যানজাত ফলমূল, জলাভূমিজাত তৃণের শয্যা, অযত্নপালিত শিমুলতুলার উপাধান, আর গৃহে গৃহে গৃহমাতৃকাগণের রোপিত কার্পাসবৃক্ষজাত তাঁহাদের স্বহস্তপ্রসূত কার্পাসতন্তুজাত বস্ত্র আমাদের নিত্য অভাব অজস্রপরিমাণে নিত্য মোচন করিত। হতভাগ্য চিরভ্রান্ত আমরা, কোন্ কুহকে ভুলিয়া আজ সেই স্বভাবের শিশু আমরা, স্বভাবসুন্দরীর অফুরন্ত ভাণ্ডারের রত্নরাজি বিলাইয়া দিয়া—অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাকচিক্যময়ী বিদেশীয় বিলাসবাসনা বুকে পুরিয়া বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর অপ্রয়োজনীয় অসার বস্তুরাশিকে অপরিত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। অভাবের এই কল্পিত মূর্ত্তিকে দূরে রাখিয়া আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র দ্বারা স্ব স্ব অভাব মোচন করিবার সরল ও সুগম পথে যদি আমরা আবার ফিরিতে পারি, যদি আমাদের বঙ্গীয় জনসমাজের শীর্ষস্থানে যাঁহারা আসীন, যাঁহাদের অনুকরণে জনসাধারণ পরিচালিত, তাঁহারা উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতঃ আমাদের গন্তব্য পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবে বুঝিবা আমাদের এই দুর্দ্দশামোচনের পথ পুনরুন্মুক্ত হইতে পারে।

এ ত গেল মানসিক বিবর্ত্তনের কথা। এটি যেমন নিত্য প্রয়োজন তেমনি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয় ও পরিধেয় সংস্থানকল্পে সাধারণ বঙ্গবাসীর আর একটি কর্ত্তব্য অন্যদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গবাসীর সমাজগঠন, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল একবার সেদিকে ফিরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে তখনকার দিনে কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্য, গম, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, তিসি, বেগুন, পটোল, উচ্ছে, আলু, মুলা প্রভৃতি শাকসবজি প্রভৃতি উৎপাদিত হইত। পল্লীসংস্থানের মধ্যে এই সকল কঠোর পরিশ্রমী সরল ও মিতাচারী পল্লীবাসীগণ সমাজের বিরাট দেহের মেরুদণ্ড ছিল। কৃষকপল্লীর গোময়পূত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্ণকুটীরগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে চিরসুষমা বিস্তার করিয়া পুষ্টদেহ হৃষ্টমন বালকবালিকাগণের ক্রীড়াধ্বনিতে, কৃষকবধূর সুপুষ্ট বরবপুর অলঙ্কারশিঞ্জিতে ও তুষ্ট প্রাণের সরল সলজ্জ ব্রীড়াময়ী ভাষার কলনিনাদে, দৃঢ়কায় বলশালী কৃষকযুবকের সরল প্রাণের সহজ সঙ্গীতে সদাসর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। পল্লীবাসী উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর প্রতিবেশীবর্গ ইহাদের আনন্দপূতকুটীরে সময়ে অসময়ে সদাই গতায়াত করিতেন। দাদা, ভাই, কাকা, চাচা, মামু প্রভৃতি স্নেহের ও প্রীতির সম্বন্ধ পাতাইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত। সুদর্শন কৃষিপল্লীর অদূরে আভীরপল্লী। দলে দলে গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ তৃণগুচ্ছ মুখে লইয়া কোথাও বা শ্বেত কোথাও বা কৃষ্ণ, কোথাও বা ধূসর নিটোল দেহগুলির কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। রজতাভরণভূষিত সুপুষ্ট গোপবধূগণ কেহবা গোময়মর্দ্দন, কেহবা গাভীদোহন, কেহ বা দধিমন্থন এবং কেহবা নবনীতরক্ষণ করিতেছে। গোযূথের পশ্চাতে দলে দলে গোপশিশুগণ বেত্রহস্তে বালকণ্ঠের তরল সুধাবর্ষণ করিয়া গোচারণে ধাবিত হইতেছে। সুবলিষ্ঠ দেহে সদাতৃপ্ত গোপযুবকগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃতভার বহন করিয়া প্রতিবেশীগণের গৃহে গৃহে অথবা অদূরবর্ত্তী নগরে বা গ্রামান্তরে গতায়াত করিতেছে। প্রাতে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে পল্লীশিরোমণি শিরোমণি মহাশয় হইতে পল্লীপ্রান্তবাসিনী ভিখারিণী পর্য্যন্ত আভীরপল্লীর সম্মান বর্দ্ধন করিতেন। সেই কাকা, দাদা প্রভৃতি মধুর সম্বোধন, সেই বিশ্বপরিবারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধ্যে স্নেহ প্রীতির পবিত্র বন্ধন।

পল্লীর অন্য প্রান্তভাগে মৃত্তিকাজাত বর্ত্তুলাকার মৃৎপাত্রের প্রাচীরের অন্তরালে কি সুন্দর কুলালচক্রের আবর্ত্তন। মাটির দেহটির ভিতরে মৃত্তিকা-কোমল মনটি লইয়া কুম্ভকারবধূ মাটী ছেনিতেছে, হাঁড়ি কলসীতে রং ফলাইতেছে, কুম্ভকার চাক ঘুরাইতেছে, পণ লেপিতেছে বা পণাগ্নিতে ইন্ধন দিতেছে ও মুখে মৃদুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, কুম্ভকার-শিশু নৃত্য করিতেছে। কি স্বভাবসুন্দর দৃশ্য! কি স্বভাবসুন্দর অভাবমোচন!

অদূরে কতকগুলি গোলাকৃতি পর্ণকুটীর হইতে একটি সুস্বর লহরী আসিয়া উঠিতেছে। পল্লীর তৈলিক বলদ ঘুরাইয়া পল্লীকৃষকের শ্রমলব্ধ তিল,

সর্ষপ, নারিকেলাদি মর্দ্দন করত পল্লীবাসীগণের তৈলের অভাব দূর করিতেছে। এখানেও সেই সরল প্রাণের সরল খেলা, সেই উচ্চ-নীচ বিভিন্ন স্তরের জনমণ্ডলীর সদালাপ ও সদ্ভাবের সুন্দর বিনিময়। অদূরে স্বর্ণকারগণ পল্লীবধূগণের অঙ্গ-শোভাসম্পাদনে নানাবিধ ভূষণরচনায় ব্যস্ত এবং তৎসান্নিধ্যেই লৌহকারগণ লৌহস্তম্ভের দারুণ আঘাতে লৌহ নিষ্পেষিত করিয়া পল্লীবাসী জনগণের জন্য নানাবিধ লৌহ অস্ত্র গঠনে ক্ষিপ্রহস্ত। ভস্ত্রার দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্ভব ও অসম্ভব নানাবিধ রসালাপে পথিকগণের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে। কত বা বলিব? কত বা বলিতে জানি! পল্লীর হাটে পল্লীর ধীবরেরা মৎস্য, পল্লীগোপের দধিদুগ্ধ, পল্লীর কৃষকের কৃষিলব্ধ শস্যসব্জী পল্লীতন্তুবায়ের বস্ত্র, পরস্পরে বিনিময় হইত। তখন সর্ষপবিনিময়ে ধান্য, ধান্যবিনিময়ে তণ্ডুল, তণ্ডুলবিনিময়ে বস্ত্র, কদলীবিনিময়ে কন্দমূল, শাকের বিনিময়ে খড় এইরূপে হাট বসিত। কেবলমাত্র সমুদ্রজাত কড়িরাশি অর্থনীতিবিদ্‌গণের দুর্ভাবনা দূর করিত। হায় মা বঙ্গভূমি! আর কি সেদিন ফিরিবে? আর কি তোমার স্বভাব-শিশু পল্লীকৃষক, পল্লীগোপ পল্লী তৈলিক, পল্লী-স্বর্ণকার, পল্লীকর্ম্মকার প্রভৃতিকে লইয়া পল্লীর সওদাগর, পল্লীর জমিদার ও পল্লীর অধ্যাপকগণ, পরস্পরের মধ্যে স্নেহের, প্রীতির বিনিময় করিবেন!

এখন উপায় কি! একই উপায় হইতেছে—বাঙ্গালীকে আবার বাঙ্গালী হইতে হইবে। বাঙ্গালার পল্লী আবার যথাসম্ভব পূর্ব্বের ছাঁচে গড়িতে হইবে। পল্লীবাসীগণের পরস্পরের মধ্যে সেবাধর্ম্মকে পুনরায় উদ্দীপিত করিতে হইবে। পল্লীবাসীগণকে পুষ্ট না রাখিলে দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর নহে। প্রজাসাধারণের বা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে এই প্রয়োজন লক্ষিত হয় এবং তাহার পরিণামস্বরূপ জনমণ্ডলীকে লইয়া কো অপারেটিভ বা সম্মিলিত সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন জনসঙ্ঘকে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য কৃষিসমাজে মিলিত করিয়া তাহাদের সমবেত দায়িত্বাত্মক মূলধনসংগ্রহের ও সমবেত শক্তি-নিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দিয়া পল্লীজনগণকে পুষ্ট করা হইতেছে। উক্ত পাশ্চাত্য আদর্শে বঙ্গীয় রাজশক্তি বঙ্গীয় দরিদ্রকুলের মঙ্গল কামনায় এই প্রণালীতে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ্ বা সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি রাজকীয় নূতন বিভাগ সৃষ্টিকরতঃ তাহার হস্তে ইহার পরিচালন ও বর্দ্ধনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের জনসঙ্ঘ এখনও শৈশবের ধূলিখেলা অতিক্রম করে নাই। এই নূতন বিভাগকে রাজকীয় শাসনবিভাগের সহিত মিলিত করিয়া এবং শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীগণের হস্তে এই জন-সাধারণের মিলন-মন্দির গুলিকে বহুল পরিমাণে সমর্পণ করিয়া রাজ-পুরুষগণ এই সকল সমিতিকে সাধারণের প্রীতি অথবা ইহাদের প্রতি আপন বলিয়া জন-সাধারণের মমতা আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। যে রাজপুরুষ দণ্ডবিধাতা, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণের সান্নিধ্যে দরিদ্র চির অধীন জনগণ আসিতে সাহসী হন না; কোন কারণে সান্নিধ্যে আসিলেও তাহারা সাহসহারা ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

যে কোন উপায়ে জনমঙ্গল সাধন করিতে যাওয়া হউক না কেন, কৃষি শিল্প বা বাণিজ্য যাহা-কেই অবলম্বন করনা কেন সর্ব্বাগ্রে মূলধন সংগ্রহ প্রয়োজন। সেইজন্য এই সকল সমিতি প্রথমতঃ মূলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা বঙ্গীয় পল্লীজনগণের জীবনের কালস্বরূপ ঋণভার মোচনের চেষ্টা করিতেছেন। একটী ঋণগ্রস্ত দরিদ্র অসহায় গৃহস্থের দায়িত্বে তাহার প্রয়োজন-পরিমিত অর্থ সংগ্রহ হয় না। এইজন্য কতকগুলি ব্যক্তিকে মিলিত করিয়া তাহাদের মিলিত দায়িত্বকে প্রতিভূ রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল ধনশালী ব্যক্তি বা কুসীদজীবিগণ একজনকে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রয়োজনপরিমিত অর্থ ঋণ দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত, তাঁহারাই ঐরূপ দশ বিশটী সম্মিলিত দরিদ্রের পার্থিব সম্পত্তি বা দায়িত্ব প্রতিভূ রাখিয়া সকলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণদানে মুক্তহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু স্বজাতীয় চরিত্রের উপর তাঁহাদের বিশ্বাসের অভাবহেতু তাঁহারা এইরূপে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীতে মিলিত কোন সমিতির সাহায্য করিতে

এত শীঘ্র বা এত সহজ বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হয়েন না। তাহার দুইটী প্রধান কারণ আছে। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানিগুলির সভ্যদিগের দায়িত্ব সাধারণতঃ অংশ হিসাবে নিয়মিত। প্রত্যেক অংশী যে কয়টী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার দায়িত্ব সেইখানে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তদতিরিক্ত কোন অংশীর অন্য কোন সম্পত্তি জয়েণ্টষ্টক সমিতিগুলির দেনার দায়ে দায়ী নহে। পক্ষান্তরে এই সকল কো-অপারেটিভ সমিতির প্রত্যেক অংশী বা সভ্যের সমগ্র সম্পত্তির সমস্ত দেনার দায়িত্বে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি দায়ী থাকে। ইহা অর্থসাহায্যকারী কুসীদজীবিগণের পক্ষে যেরূপ নিরাপদ অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট কো-অপারেটিভ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে তেমনি বিপদসঙ্কুল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের দোষে বা অপটুতায় যে কোন দায় উপস্থিত হইবে তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া উক্ত দায় পরিশোধিত হইতে পারিবে। সুতরাং পরস্পরের উপর প্রবল প্রীতি ও বিশ্বাস না থাকিলে এই সকল সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আর একটি কারণ এই যে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী রাজশক্তি কর্তৃক পরিচালিত নহে, সেগুলি রাজবিধির অন্তর্গত ও তাহার আয়-ব্যয়াদি রাজকর্ম্মচারীবিশেষের পরিদর্শনাধীন হইলেও তাহাদের দেনা পরিশোধের জন্য উক্ত কোম্পানীর যৌথ অর্থসম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যতীত প্রত্যেক অংশীর অন্য কোন সম্পত্তির উপর কোন অধিকার রাজপুরুষগণের নাই। পক্ষান্তরে কো-অপারেটিভ সমিতির কার্য্যকালে রাজনিয়ম অপেক্ষাকৃত কঠোর,—রাজপুরুষগণের প্রত্যক্ষ পরিচালনের অন্তর্ভূর্ত রাখিয়া প্রত্যেক সভ্যের সর্ব্বস্ব বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সম্মিলিত সমিতির ক্ষতির দায় পূরণ করিতে রাজপুরুষগণ অধিকারী। এই উভয় কারণে কো-অপারেটিভ সমিতিগুলিতে অর্থ নিয়োগ করিতে ধনী বা মহাজনগণ সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের এত অবনতি, ভগবৎ বিশ্বাস এত ক্ষীণ, সৎকর্ম্মে অনুরাগ এত সঙ্কীর্ণ যে আমরা পর-প্রতারণাকে অনেকস্থলেই পাপ বলিয়া মনে করি না। আমাদের যে কোন যৌথ কার্য্যে রাজার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

কো-অপারেটিভ সমিতিগুলি এইরূপ রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হইয়াও আশানুরূপ সুফলের পরিবর্ত্তে অনেকস্থলে কুফল লাভ করিতেছে। এই সকল সমিতির কোন কোন সভ্য ঋণপ্রাপ্ত সহজসাধ্য হওয়াতে আত্মশক্তির অতিরিক্ত অপরিমেয় ঋণ গ্রহণে পরিশেষে পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সহযোগী প্রতিবাসীগণকে বিপন্ন, সমিতির উদ্দেশ্য বিফল এবং রাজপুরুষগণের কার্য্যভার কঠোরতর করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইতেছেন। শিশুসমিতিগুলি এইরূপে অকালে জরাগ্রস্ত হইতেছেন বা জীবনলীলা পরিসমাপ্ত করিতেছেন। রাজপুরুষগণের এবং এই নবীন কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল পরিচালকগণের ইহা বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এই সকল সমিতির অধিকাংশ সর্ব্বজাতীয়, সর্ব্বশ্রেণীস্থ বিভিন্ন জীবিকাবৃত্তিধারী, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রভৃতি দ্বারা মিলিত ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে স্ব স্ব অবলম্বিত বৃত্তির তারতম্য, অবস্থার বিপর্য্যয়, সামাজিক সম্বন্ধের অথবা কোন আভ্যন্তরিক আকর্ষণের অভাব এই সকল সমিতির 'সমবায়' নামকে সার্থক করিতে দিতেছে না। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল সমবায়-সমিতি কার্য্যোন্মুখী হইতেছে না, এবং সমবেদনা ও সহযোগিতা আত্মপ্রসার লাভের অবকাশ পাইতেছে না। কোন অনুষ্ঠানের শৈশবে তাহার ভবিষ্যৎ রূপ অনুমান করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আপাতত সমিতিগুলির বিফলতার দুইটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়। আমাদের গুণকর্ম্মানুসারী প্রাচীন জাতিভেদকে অমান্য করিয়া প্রাচীন কর্ম্ম-সমবায়গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমিতির সংযুক্ত সভ্যগণকে লইয়া এক একটি অভিনব জাতি বা দল পরোক্ষে গঠন করিতে গিয়া এবং ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা সুগম করত ঋণ পরিশোধের উপযোগী অধিকতর অর্থাগমের চেষ্টা দূরে পরিহার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াতে এই বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রাজপুরুষগণ অপেক্ষা আমরা অধিকতর অপরাধী। তাঁহারা বিদেশী; আমাদের সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা, আমাদের মনোবৃত্তি, আমাদের অভাব বুঝিবার

পক্ষে তাঁহারা অসমর্থ। আমরাও আমাদের স্বীয় হৃদয়কে বুঝিতে না পারায় বা বুঝিলেও পদস্থ রাজকর্ম্মচারীবিশেষের মন তুষ্টির জন্য দৌর্ব্বল্য লইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হওয়ায় বর্ত্তমান যুগের উদ্ভাবিত জনমণ্ডলের এইকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলিকে ডুবাইতে বসিয়াছি। বঙ্গের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচনপক্ষে পল্লীতে পল্লীতে উপনগরে উপনগরে এবং এমন কি নগরে নগরে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী দ্বারা হউক অথবা কোঅপারেটিভ সমিতি-গঠন দ্বারা হউক সমবেত দায়ীত্বে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ নিয়োগ করিয়া প্রতি সভ্যকে কুশীদজীবীগণের কঠোর কবল হইতে মুক্ত করিয়া এবং অপরার্দ্ধ তাহাদের পিতৃ-পিতামহের অবলম্বিত বৃত্তিবিশেষের উন্নতিকল্পে যতদুর সম্ভব আধুনিক উন্নত প্রণালীতে নিয়োগ করিয়া অধিকতর অর্থাগমের পথ সুগম করতঃ তদ্দারা ক্রমশঃ পূর্ব্বার্দ্ধ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকগণ এই প্রস্তাবের পূর্ব্বাংশে বর্ণিতরূপে স্বীয় স্বীয় অভাবের মাত্রা সঙ্কুচিত করিয়া সহজলব্ধ অন্ন-পরিধেয়-লাভে তুষ্ট থাকিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে পারিলে আবার বুঝিবা বঙ্গপল্লী হাস্যময়ী সুষমা বিস্তার করিতে পারিবেন। পল্লীসমূহের পক্ষে কোঅপারেটিভ প্রণালী সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। উপরোক্তরূপে কয়েকটী বৎসরের চেষ্টায় দরিদ্র সভ্যগণের ঋণভার স্কন্ধচ্যুত হইলে ক্রমশঃ প্রত্যেকের মূলধন গঠিত হইবে এবং যৌথ কার্য্যে প্রত্যেকে সুশিক্ষিত হইবেন। তখন অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগতভাবে অথবা জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী গঠনে তাঁহারা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপে সর্ব্বথা আত্মোন্নতিকর লাভজনক ব্যবসায়ে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকায় বহিশ্চাকচিক্যশালী কল্পিত অভাবমোচক উপলখণ্ড গুলিকে আর কেহ বাঞ্ছনীয় দ্রব্য মনে করিবে না। পল্লীগৃহে আবার হাসি ফুটিবে, পল্লীমাতা আবার মাতৃত্বের কিরণে প্রভাময়ী হইবেন, পল্লীবধূ আবার ব্রীড়াময়ী শান্তিসহচরী হইবেন। পল্লীবাসীগণ প্রজ্বলিত ঈর্ষ্যানল নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাদের সদাতৃপ্ত হৃদয়ে, তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতিপ্রবণ বক্ষে প্রেমও প্রীতির শীতল স্পর্শ অনুভব করিবেন। বঙ্গপল্লীর সুসন্তানরূপে, বঙ্গবাসী জনমণ্ডলীর মেরুদণ্ডরূপে তাঁহারা সমাজের ও সাম্রাজ্যের নিয়ামকগণের প্রতি প্রীতি-ফুল্ল প্রাণে অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহাদের হৃদয় সকল ঘটনার নিয়ন্তা বিশ্বপতির চরণতলে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং বিশ্ববাসীগণকে ধন্য করিবেন। মাগো বঙ্গভূমি, এ স্বপ্ন কি পূর্ণ হবে না ?

উৎকলে শক্তিপূজা।

(শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলিয়াছি কেশরীবংশীয়দিগের রাজ্যের সীমা বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীতে বিরজা দেবী অধিষ্ঠান করিতেন। পুরী একটী প্রাচীন বন্দর। হুয়েংসন যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন তখন পুরী বন্দরের নাম চরিত্রপুর ছিল। এই চরিত্রপুর হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া বহু নৌকা সমুদ্র-পথ দিয়া যাতায়াত করিত। এইখানে বিমলার মন্দির। বিমলা ও বিরজা পীঠস্থান বলিয়া সমগ্র ভারতে পূজা পাইতেছেন। "বিরজা উড্রদেশে চ বিমলা পুরুষোত্তমে"। কথিত আছে দক্ষযজ্ঞে পার্ব্বতী প্রাণত্যাগ করিলে শিব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তভাবে মহা তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলেন। উন্মত্ত ভৈরবের পদ-তাড়নে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু তখন শিবের অলক্ষ্যে সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পড়িয়া এক একটী পীঠস্থান হইল। এই পৌরাণিক গল্প অবিশ্বাস করিলেও বিরজা ও বিমলা যে প্রাচীন শক্তিক্ষেত্র তাহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কুলালীকামনায় বা কুব্জিকামত তন্ত্র আন্দাজ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। (Vide M. M. Haraprasad Shastri's Nepal catalogue of manscripts page 79 । LXXIX.) ঐ তন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

> "গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।
> পীঠোপপীঠক্ষেত্রেষু কুরু সৃষ্টিরনেকধা।

গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে কুরু সৃষ্টিস্বমীদৃশঃ।
পঞ্চবেদাঃ পঞ্চৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকঃ॥
এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠা ন স্থাপ্যতে।
তাবৎ ন মে ত্বয়া সার্দ্ধং সঙ্গমঞ্চ প্রজায়তে॥

কেশরীবংশীয় রাজগণ আরও সাতটী প্রধান শক্তির মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের রাজ্যের প্রধান প্রধান ঘাটিতে ঐ সাতটী শক্তিমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। যথা,—তালচেরে হিঙ্গুলা, অসুরেশ্বরে হরচণ্ডী, বাঁকীতে চর্চ্চিকা, বাণপুরে ভগবতী, ঝঙ্করে সারলা, কাকটপুরে মঙ্গলা, কুজঙ্গে রামচণ্ডী। বোধ হয় তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, শত্রু রাজ্য আক্রমণকরিলে একএক ঘাটি এক এক দেবী রক্ষা করিবেন। আজিও কটকনগরে বাট-মঙ্গলা, বাঘমঙ্গলা, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে যখন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে কাষ্ঠসংগ্রহ কিংবা অন্য কোনও আবশ্যক কর্ম্মে যায়, তখন বাটমঙ্গলা ও বাঘমঙ্গলার পূজা মানসিক করে। তাঁহারা বনাকীর্ণ পথের সমস্ত ভয় হইতে পথিককে রক্ষা করেন। বাঘমঙ্গলার পূজা মানসিক করিলে ব্যাঘ্র পথিকের অনিষ্ট করিতে পারে না। কেশরী-বংশীয় রাজগণ অযোধ্যা, উজ্জয়িনী এবং বঙ্গদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বহু ভূমি দাম করিয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় বল্লালসেন উৎকলে ৪০ জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন।

পঞ্চাশ মগধে ষষ্টি ভোঁটে ষষ্টিঃ রভাঙ্গকে।
চত্বারিংশদুৎকলে চ, মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককঃ॥

উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যধিক ছিল। ক্রিয়া-কলাপ ও কর্ম্মকাণ্ড একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তাই শাক্ত কেশরীবংশীয় রাজগণ বিদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই আনীত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ আজিও বহু ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকলেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক এবং দুর্গাপূজার সময় অনেকেই বনদুর্গার পূজা করেন।

কেশরীবংশের অবসানে উৎকলে গঙ্গাবংশের অভ্যু-খান হয়। গঙ্গবংশীয়গণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজগণ জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করি-য়াছেন। প্রতাপরুদ্রদেবের সময় চৈতন্য মহাপ্রভু উৎকলে আসেন। তিনি যে নামামৃত প্রচার করেন তাহার প্রভাবে উৎকলে ভাবের বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; আজ উৎকলের ঘরে ঘরে ভাগবতের পূজা হয়। হাড়ী, বাউরী এবং পাণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরাও ভক্তিগদগদকণ্ঠে তুলসীর উপাসনা করে। এই ভাবের বিপ্লবে শক্তি-উপাসনার অনেক চিহ্ন লোপ পাইয়া আসিতেছে। দেশরক্ষাকর্ত্রী উপর্য্যুক্ত নয়টী দেবীর নিকট আজিও পশু বলি হয় বটে কিন্তু বলির সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। অনেক শাক্ত-পরিবার শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর দারুময় মূর্ত্তি উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া উপাসনা বিষয়ে অনেকটা রক্ষণশীল; তাই তাঁহারা মন্ত্রান্তর গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শক্তি উপাসনা কেশরী রাজ-বংশীয়ের রাজ ধর্ম্মছিল। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। উপরে কএকটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করি-য়াছি। রাজধর্ম্ম এবং জন ধর্ম্ম অনেকস্থলে ভিন্ন হয়। কিন্তু উৎকলে কেশরী বংশীয়গণের রাজত্ব কালে জনসমাজ সর্ব্বতোভাবে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। আমাদিগের ধারণা এদেশে কোনও দিন সংহতি শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তি উপাসনায় সমাজের এই সংহতি-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকলের গ্রামে গ্রামে শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক দেবতার মন্দির আছে; পূজার জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি বহুকাল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের এক একটী পূজার স্থান আছে। সেটি ঠাকুরাণী-তলা। নিম্বাদি বৃক্ষের মূলে কোন দেবীর ভগ্নাংশ সিন্দুর চর্চ্চিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন তাঁহার পূজা হয় না। তবে তাঁহার একজন পূজক নিযুক্ত আছেন। পূজা পার্ব্বনে কিংবা গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইলে গ্রাম্যদেবীর পূজার আয়োজন হয়। গ্রাম্যদেবীর পূজা সর্ব্বসাধারণের পূজা। পূজার সময় কাহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা বহু পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত আছে। হল প্রতি কত চাঁদা দিতে হইবে তাহাও ঠিক করা আছে। প্রবাদ আছে—গ্রাম্যদেবীর যোগিনীগণ অশান্ত হইয়া উঠিলে গ্রামে ওলাউঠা প্রভৃতি মারী-ভয় হয়। দেবীর পূজা করিলে যোগিণীগণ শান্ত

হয় মহামারীও উপশম হয়। গ্রাম্যদেবীর পূজায় পশু বলির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আজকাল সকল গ্রামে পশু বলি হয় না। অধিকাংশ গ্রাম্যদেবীর পূজা নাপিত প্রভৃতি জাতি করিয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ পূজকও আছেন। পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কোনও ভুল ভ্রান্তি হয় না। কোনও উপকরণে পূজার অঙ্গহানি হয় না। নিরক্ষর উৎকল গ্রামবাসীর এই সংহতি-শক্তি কত ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আজিও জীবিত আছে। গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের দেবী উপাসনা দেখিয়া কে বলিবে উৎকলে শক্তিপূজা নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? গঙ্গাবংশীয় দিগের রাজদণ্ডের প্রভাবে এবং শ্রীচৈতন্যের উন্মাদকর ভাববন্যার স্রোতে শক্তির পীট, নগর ও গণ্ডগ্রামে টলিয়াছে। কোন কোন স্থানে শক্তির আসনে চৈতন্য মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু নিরক্ষর শবর বাহুরী প্রভৃতির হৃদয়ে শক্তির আসন আজিও অটল রহিয়াছে। উৎকলে শক্তি পূজার বহু প্রচলন বিষয়ের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি :—

Throughout the plains of Orissa every village has a titulary Goddess called Gram Devati or Thakurani. The Gram devati is generally established under the shade of a tree; sometimes a house is constructed for her protection from the rain and the sun and sometimes though very rareley, she has not the protection of even a tree. The Goddess is commonly represented by a piece of shapeless stone, surrorunded by several small pieces of stone also shapeless representing her children. All the pieces are smeared with vermilion. Carved images are also met with though very rarely, they are not uniform in details and many of them were probably constructed for other purposes. Sometimes the trunk of a tree supposed to possess supernatural properties like the Sahara is smeared with vermilion and worshipped as the village Goddess. Like the people of the plains, the Gondhs and Sudhas of Athmallik have stones to represent their female village Goddess, but curiously enough the Kondhs of Nayagarh believe this village diety to be of the male sex and use and wooden post 2½ feet high to represent it. The Gonds and Sudhas of Athmallik named their Goddess Pitabali or Kambecvari. The meaning of Pitabali is not known, but Khambecvari is probably derived from khumba or post which represent the male God of the Kandh. The most noticeable feature of the Gram Devati worship is the nonpriestly caste of men who conduct it. In the plains, the Bhandari, Mali, Raul or Bhopa is usually the priest. The aborigines select men from their own tribe to officiate as priest.

Journal of the Assiatic Society of Bengal.
Vol LXXII, Part III (No 2 of 1903).

উৎকলের গ্রামে গ্রামে যেরূপ সাধারণ লোকে মিলিত হইয়া গ্রাম্যদেবীর পূজা করেন সেইরূপ গড়জাত মহালের, সুধা, কন্দ, গন্দ, শবর প্রভৃতি জাতিরাও গ্রাম্যদেবীর উপাসক। কে ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগকে শক্তিপূজা শিখাইয়াছে? রাজ আজ্ঞা বা অনুশাসনে তাহারা শক্তিভক্ত হয় নাই। তাহাদিগের বর্ব্বর জীবনের অমার্জ্জিত মনোবৃত্তি বোধ হয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া শক্তির চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। হিংসার প্রতিমূর্ত্তি মত্ত মাতঙ্গ, শার্দ্দূল, ভল্লুক প্রভৃতি কতশত হিংস্র জন্তু নিরন্তর পর্ব্বত কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লব আদিমনিবাসী কন্দ প্রভৃতি জাতির নিত্যকর্ম্ম বলিলেও চলে। জীবন ধারণের জন্য কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মৃগ অন্বেষণ করিতে হয়। এরূপ নির্ম্মম ঘটনাবলীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে মানবের মন শক্তি সঞ্চয় এবং শক্তির উপাসনার জন্য নিত্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কতকগুলি গ্রাম্যদেবীর নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নামগুলি অতি অদ্ভুত। গুটিকতক নমুনা দিলাম :—আম্ভার-ঘর-বাউতী, বুড়ীদেই ঠাকুরাণী, বায়াণী ঠাকুরাণী, বিশানায়ে

ক্যাণী, মাছদেই ঠাকুরাণী, বাটপন্থেই, ডালখাই ঠাকুরাণী, কামড়া-মুঁই, জটীয়া-বাউর্ত্তী, ঘাসখাই, গোকুলপুরিয়ানী, বাসুলী, মঙ্গলা, গড়বাউর্ত্তী, দক্ষিণা চণ্ডী, চম্পানায়েকাণী, তারাদেই ঠাকুরাণী, কঙ্কটী ঠাকুরাণী, কেন্দুমুণী ঠাকুরাণী, ভগবতী।

আমার একটি অনুমান আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার মনে হয় অতি প্রাচীন কালে উৎকল এবং তৎসংলগ্ন কলিঙ্গদেশে শক্তি উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে লেখা আছে

> স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং, চৈত্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
> সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥
> তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রা নিরোবমান।
> বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥

চৈত্রবংশীয় "সুরথ রাজা" যবন রাজগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হন। পরে মহামায়ার বরে স্বরাজ্য লাভ করেন। উদয়গিরি শৈলের হস্তীগুম্ফায় খারবেল নামক রাজার একটি প্রস্তরলিপি অল্পদিন হইল সম্পূর্ণ অনুদিত হইয়াছে। এই প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায়—কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশের নাম চৈত্রবংশ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এ প্রস্তর লিপি আন্দাজ ১৭৩ হইতে ১৬০ খৃঃ পূঃ খোদিত হইয়াছিল। খারবেল চৈত্রবংশীয় রাজা ছিলেন। কলিঙ্গনগরী খারবেলের রাজধানী ছিল। হুয়েংসান যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন তখন পুরীর নাম ছিল চৈত্রপুর বা চরিত্রপুর। জগন্নাথদেবের মন্দিরের তালপত্র লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় কেশরীবংশীয়-দিগের বহুপূর্ব্বে যবনগণ উড়িষ্যা জয় করিয়া কয়েক শতাব্দী এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। সুরথ রাজা যদি প্রকৃতই কলিঙ্গরাজ্যের চৈত্রবংশ সম্ভূত হন, তাহা হইলে কলিঙ্গে শক্তিপূজার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। রুদ্রযামল মন্ত্রে ৫৪ অধ্যায়ে কমলাকে কলিঙ্গনগরেশ্বরী বলা হইয়াছে ঃ—

> অজমণিস্মৃতিপ্রাণা কলিঙ্গনগরেশ্বরী
> অতিভোজ তরঙ্গিণী গুপ্তচক্রাম্বিকাম্বদা
> মণিনাগগতা নাশা ত্রিনাসা নামস্ব প্রিয়া ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৬০০ খৃষ্টাব্দের লোক। তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কলিঙ্গদেশেই কালকেতুর আখ্যায়িকা সমাবেশ করিয়াছেন। কলিঙ্গরাজা চণ্ডীর ভক্ত কালকেতুকে বন্দী করিয়া রাখেন। রাত্রে কলিঙ্গরাজ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিলেন ঃ—

> দেখিনু ভৈরব ভীম লোচন বিশাল।
> কাতি খর্পর, হাতে গলে মুণ্ডমাল ॥
> হান হান করিয়া ধরিলা মোর কেশ।
> চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥
> পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভে জটাভার ॥
> শঙ্খের কুণ্ডলকর্ণে ভীষণ আকার ॥
> পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
> বাকুলনা কুলযেন চৌদিকে দশন ॥
> বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
> চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
> গজ ঘোড়া কাটি পিয়ে রুধিরের পানা।
> নাচয়ে আপন তালে প্রেত ভূত দানা ॥
> মড়ার নাড়িতে কেহ করয়ে উত্তরি ॥
> অঙ্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অঙ্গুরি ॥
> তিলক করয়ে কেহ হাড়ের চন্দনে
> তর্পণ করয়ে কেহ কপাল ভাজনে।
> গর্দ্দভে চাপায় মোরে দেয় হাড়মাল।
> পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল ॥
> পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি।
> মোর অঙ্গ মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি ॥
> গজপৃষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোহণ।
> শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণে ॥

শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁহার বহুপূর্ব্বের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্ডীর একজন প্রধান ভক্ত এবং তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তক কালকেতু কলিঙ্গরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কবেকার ঘটনা নির্ণয় করা কঠিন। তবে কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে জানা যায় যে চণ্ডীপূজা এক সময়ে কলিঙ্গদেশে কাল-কেতুর দ্বারায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বোধ হয় কাল-ক্রমে সুরথের রাজ্যে শক্তিপূজা আংশিক লোপ পাইয়াছিল, এবং কালকেতু সেই দেশে শক্তিপূজা পুনঃ প্রচারিত করেন। একই স্থানে ধর্ম্মবিশ্বাসের সাময়িক অপচয় এবং উপচয় প্রায়ই দেখা যায়।

শক্তি-ভিক্ষা।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

> ধূলির মাঝারে লুটা'তে দিও না শির ;
> হে দেব, তোমার বলে বলীয়ান, বীর,

স্থিরচিত্ত আমি ; প্রতি রোমে রোমে মোর
জাগিতেছ তুমি ; প্রতি প্রশ্বাসে নিশ্বাসে
তোমারি শক্তি অদৃশ্যে করিতেছে কাজ ;
হে রাজরাজ, শক্তি দাও তোমারি কার্য্য
সাধিতে ;
জাগ্রত যেন রহে সদা মনে
প্রতি অণু-রেণু মাঝে তুমি ; বিলায়েছ
আপনারে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে মুক্ত-
হস্ত ধনীর মত ; সুন্দর বসুন্ধরা
তোমারি সৌন্দর্য্যে লুটিয়া ; বিহঙ্গ গায়
গান,—তোমারি সঙ্গীত সে ; তপন তারা
তোমারি আদেশে নৃত্য করে, দীপ জ্বালে
দিবানিশি ; আমি (ও) কবি গাহি তব বলে ॥

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত দুইখানি আলোকচিত্র প্রকাশ করিলাম। প্রথমটি বেলুরের জগতবিখ্যাত দেবমন্দিরের চিত্র। ইহা কারুকার্য্যখোদিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিষয়ে অদ্যাবধি ভারতের অতুলনীয় কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার ফারগুসন (Dr. Fergusson) সাহেব এই মন্দিরসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রদান করিয়াছেন :—

There are many buildings in India, which are unsurpassed for delicacy of detail, by any in the world ; but the temples at Belur and Halebid surpass even these, for freedom of handling and richness of fancy. The amount of labour which each facet, of this porch (Belur) display is such as I believe never was bestowed on any surface of equal extent in any building in the world.

It may probably be considered, as one of the most marvellous exhibitions of human labour, to be found even in the patient East. No two facets of the temples are the same ; every convolution of every scroll is different. No two canopies in the whole building are alike ; and every part exhibits joyous exuberance of fancy scorning every mechanical restraint.

দ্বিতীয়টিতে সম্রাট দ্বিতীয় পুলোকেশীর সভায় পারস্য দূতের অভ্যর্থনার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা অজন্তার গুহামন্দিরের প্রস্তরখোদিত চিত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদিগের শাসনকালে কোন দুষ্ট লোক পুলকেশীর মুখটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কর্ণাটের রাজবংশাবলী এবং তাঁহাদের শাসনাধীন সম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

১। চালুক্য বংশ। এই বংশীয় নয় জন ভূপতি প্রায় ২০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম পুলকেশী, কীর্ত্তিবীর্য্য, দ্বিতীয় পুলকেশী এবং বিক্রমাদিত্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। ইহাঁর ভ্রাতা বিষ্ণুবর্দ্ধন বর্গীদেশ অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় অপর এক শাখা গুজরাটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে জয়সিংহ বর্ম্মার অধীনে গুজরাট স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত স্থানে শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পিপলনের, চিপলুন, কুন্দল গাঁ, রায়গড়, বাদামী, মহাকুট, খেড়া, আড়ুর, নেকর, ঐহোলী, পট্টদকল, হেদ্রাবাদ, ইত্যাদি।

ইহাঁদের রাজধানী বাদামী নগরে ছিল। এই বংশীয় নৃপতিগণ, মৌর, কন্দল, কুলাচার্য্য, রাষ্ট্রকুট, গঙ্গা, লাট, মালব, গুর্জ্জর, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতির রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুলোকেশী একশত জাহাজ লইয়া উড়িষ্যার পীঠস্থান পুরীনগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনিই হর্ষবর্দ্ধনকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। উত্তরদেশীয় নৃপতিগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য ইনি নর্ম্মদাতীরে বহুসংখ্যক সৈনিক প্রহরী রাখিয়াছিলেন। ইনি পারস্য দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পারস্য রাজদূতকে স্বীয় রাজসভায় স্থান দিয়া-

ছিলেন। রাজা পুলোকেশী কর্তৃক পারস্য দূতের অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তা গুহা মধ্যে অঙ্কিত আছে।

২। রাষ্ট্রকূট বংশীয় চতুর্দ্দশসংখ্যক রাজা ২২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দন্তিদুর্গ, কৃষ্ণ, ধ্রুব, গোবিন্দ (৩) এবং নৃপতুঙ্গ এই কয়জন নৃপতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তথাপি অমেঘবর্ষণ নৃপতুঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বাষট্টি (৬২) বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা নৃপতুঙ্গ বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিরাজমার্গ নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রগ্রন্থ কন্নাড় ভাষার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। এই রাজ্যের রাজধানী মালখেড় নামক স্থানে ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ্য চালুক্য রাজ্য অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ছিল। রাজা ধ্রুব তাঁহার সৈন্যসমূহ লইয়া প্রয়াগের সন্নিকট কৈসম্বির রাজা বৎসের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ (তৃতীয়) মালব হইতে কঞ্চি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের সম্রাট ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নর্ম্মদা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ নিজ শাসনাধীন রাখিয়াছিলেন। এই নৃপতি সম্বন্ধে বরদার শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি লোককে রাজসিংহাসনে বসাইতে এবং তাহা হইতে নামাইতে পারিতেন। পূর্ব্বে চালুক্যদিগের অপেক্ষা এই বংশের রাজত্বকালীন অধিক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল শিলালিপির স্থান অধিকতর স্থান জুড়িয়া আছে দেখা যায়। সামনগর, পৈঠন, বর্ণি, রত্নাপুর, বরোদা, তোড়খেড় খোন্দেশ, বনসারী, বেকল, ক্যনেরী, কামপুর, নীলগুন্দ, সবদত্তি, ক্যোবে, অটকুর, পট্টদকল প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদিগের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই বংশীয় কৃষ্ণ রাজা ৭৬০ শকে, জগতপ্রসিদ্ধ কৈলাস নাথ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩। রাষ্ট্রকূট বংশের পর চালুক্যগণ পুনরায় রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম চালুক্য নামে অনেক দিন বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। প্রথম কথিত পূর্ব্ব চালুক্য বংশের শেষ রাজা রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা দন্তিদুর্গের দ্বারা পরাজিত হওয়ার পর উক্ত বংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই বংশের পরবর্ত্তী রাজাগণ করদ বা মিত্র রাজার ন্যায় কালযাপন করিতে ছিলেন। তৎপরে এই বংশীয় রাজা তৈলপ বিশেষরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া তৎকালীন রাষ্ট্রকূটরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পশ্চিম চালুক্য নামে নিজ বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের একাদশ নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তৈলপ, জয়সিন্ধু (২) সোমেশ্বর (১) এবং সপ্তম বিক্রমাদিত্যের নামই বিখ্যাত। তন্মধ্যে সপ্তম বিক্রমাদিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইনি বিক্রমকেশরী বা চাতুঃক্রম বিক্রম নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের রাজধানী নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নামক স্থানে ছিল। এই চালুক্য রাজগণ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াও তালব, চোল, চের, দ্রমিল, ডাহল, বেংগি, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি স্থানের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা দ্বিতীয় তৈলপ ভোজপ্রবন্ধোল্লিখিত ভোজরাজার খুল্লতাত মুঞ্জার শাসনাধীন মালব জয় করিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জা তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রী রুদ্রাদিলের নিষেধসত্ত্বেও গোদাবরী নদী অতিক্রম করিয়া তৈলপ কর্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হইয়াছিলেন। তৎপরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করায় লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েন। সপ্তম বিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতার অধীনে সৈনাপত্যকালে উত্তরে বঙ্গদেশ এবং আসাম ও দক্ষিণে কেরক (মালাবার) এবং সিংহল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি খৃঃ ১০৭৬ সালে শকনামীয় নব শতাব্দীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই শক পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রম-শকের দিবসই অর্থাৎ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ দিবসে আরব্ধ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য যেমন যুদ্ধনীতিবিশারদ ছিলেন তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানও তদনুরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়েই কর্ণাট রাজ্য উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সময় নিম্নলিখিত মিত্র বা করদ রাজ্যগুলি তাঁহার অধীনে ছিল :—

	রাজ্য বংশ	স্থান
১।	যাদব	দেবগিরি
২।	শিলহরা	উত্তর এবং দক্ষিণ কঙ্কন
৩।	ঐ	কোলাপুর
৪।	কদম্বা	গোয়া

৫।	ঐ	হোঙ্গল
৬।	সিন্দা	এলবুর্গ
৭।	গুপ্তা	মুট্টল
৮।	রট্টা	সন্তাদত্তি
৯।	কদম্বা	বনবাসী
১০।	পাণ্ডয়া	নোলামবত্তি (চিত্তলদ্রুগ), কোলহার, টমকুর এবং বাঙ্গালোর (মহীসুর)
১১।	হোয়সালা	গঙ্গবড়ি অর্থাৎ মহীসুর এবং হাসান জেলা।
১২।	তর্দেকড়ি	বিজাপুর

এতদ্ভিন্ন গম্বুর, কম্মার বাড়ি এবং সীতাবল্দি প্রভৃতি বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের এবং মধ্য ভারতের অন্তর্গত স্থানসমূহে রাজপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজ করিত। কেবল মাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ রাজদ্রোহী হইয়া কিছুদিন অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। উত্তরদেশীয় রাজগণও দুইবার মাত্র নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তন্নিবারণার্থ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। নতুবা ৫০ বৎসরকাল তিনি নির্ব্বিঘ্নে এবং নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিল্হন কবি ইহাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত নামক সংস্কৃত কাব্যে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই রাজার সময়ের প্রায় দুই শত শিলালিপির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। এই সকল শিলালিপি কন্নাড় ভাষায় লিখিত। গদগ, ভৈরমট্টি, থারেপট্টনম, কায়েম, বল্লেগবী, মিরাজ, বাংকাপুর, অনন্তপুর, সীতাবল্দি, করকুত্রি, চিত্রকলদ্রুগ প্রভৃতি স্থানে বিক্রমাদিত্যের অনেক শিলালিপি বর্ত্তমান আছে।

৪। কুলাচার্য্য বংশের আদি পুরুষের নাম বিজলাল। ইহাঁর রাজধানী কল্যাণ নগরে ছিল। ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহার মন্ত্রী বাসবা-লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই লিঙ্গায়ত ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ণাটের সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ইহাকে কর্ণাটকের প্রচলিত ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাসবা যে কেবল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে—সমাজ সংস্কার বিষয়েও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়-সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি।

৫। হোয়সালা মহীসুরের যাদব বংশের অন্যতম নাম মাত্র। এই বংশের রাজগণের মধ্যে বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং বীরবল্লাল বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার সাহায্যে রামানুজ তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারের অনেক সুবিধা পান। রামানুজস্বামীর জীবনচরিতে আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। হোয়সালা বংশের শিলালিপি শ্রাবণ বেলগুল, হলেবিড়ু, চিতলদ্রুগ, হরিহর, বেলগামি, বেলুর, সোরাব, হোঙ্গল প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুড় এবং হলেবিড়ুর ভারতের সুন্দরতম দেবমন্দিরগুলি এই বংশের রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। হলেবিড়ু হোয়সালাবংশের রাজধানী ছিল।

৬। পশ্চিম চালুক্য রাজগণের প্রতিভা যখন অস্তমিত হইতেছিল, সেই সময় হলেবিড়ুর হোয়সালা এবং দেবগিরির যাদব বংশ উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চালুক্যবংশের পর ওদ্রাজের দক্ষিণ অর্দ্ধ হোয়সালাদিগের হস্তগত হয় এবং দেবগিরির যাদবগণ উত্তরার্দ্ধ অধিকার করেন। বিল্লন, সিন্দ্ধমা, জেত্রিপাল, রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ যাদববংশের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। চন্দনপুর, সঙ্গমনার, বসাই, আজনেরী, খালদেশ অন্তর্গত পটলা, বণ্ডিগিরি, তৈলাবল্লি, পৈথান প্রভৃতি স্থানে দেবগিরির যাদবদিগের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশের মাধব রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র-লেখক হেমাদ্রি বর্ত্তমান ছিলেন।

৭। যাদব বংশের পর বিজয়নগরের রাজবংশের বিষয় উল্লেখ যোগ্য। এক সময় প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যই এই বিজয়নগর-রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশীয় রাজগণ খৃঃ ১৩৩৬ হইতে ১৫৫৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে হরিহর, বক্কা, কৃষ্ণদেব রায় এবং তালিকোটের রামরাজার নামই প্রসিদ্ধ।

এই বংশ দাক্ষিণাত্যের রাজবংশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। অদ্যাবধি ইহাঁদের রাজধানী বিজয়নগরের (বর্ত্তমান হম্পীর) ভগ্নাবশেষ দেখিলে এই সম্রাজ্যের লুপ্তস্মৃতি জাগরিত হয়। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে পর্য্যটকগণ এইস্থান দেখিতে আসেন। মান্দ্রাজের সিবিলিয়ান Mr. Robert Sewell সাহেব তাঁহার History of a Forgotten Empire গ্রন্থে বিজয়নগরের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। আমি এস্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

In the year 1336 A. D., during the reign of Edward III of England, there occurred in India an event which almost instantaneously changed the political condition of the entire south. With that date the volume of ancient history in that tract closes and the modern begins. It is the epoch of transition between the Old and New.

The event was the foundation of the city or kingdom of Vijayanagar. Prior to A D. 1336 all Southern India had lain under the domination of the ancient Hindu kingdoms,—kingdoms so old that their origin has never been traced, but which are mentioned in Buddhist edicts rock cut sixteen centuries earlier; the Pandiyans at Madura, the Cholas at Tanjore, and others. When Vijayanagar sprang into existence the past was done with for ever, and the monarchs of the new state became lords or overlords of the territories lying between the Deccan and Ceylon.

Its rulers in their day swayed the destinies of an empire far larger than Austria, and the city is declared by a sucession of European visitors in the 15th and 16th centuries to have been marvellous for size and prosperity—a city with which for richness and magnificence no western capital could compare.

এই বিজয়নগর রাজধানীতে পর্ত্তুগীজ সওদাগরগণ বাণিজ্য করিতে আসিত। Haes নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ সদাগর এই বিজয়নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

The cavalry most richly mounted and caparisoned, and the foot soldiers so many that they surround all the valleys and hills in a way with which nothing in the world can compare.

To see the grandeur of the nobles and men of rank, I cannot possibly describe it all, nor should I be believed if I tried to do so; then to see the horses and the armour that they wear, you would see them so covered with metal plates that I have no words to express what I saw, and some hid me from the sight of others; and to try and tell of all I saw is hopeless, for I went along with my head so often turned from one side to the other that I was almost falling backwards off my horse with my senses lost.

Naniz নামক আর একজন পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, বিজয়নগর-সম্রাট ইচ্ছা করিলে অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিতে পারেন। তাঁহার হিসাব মতে তৎকালে বিজয়নগরের ৭,০৩,০০০ সাত লক্ষ তিন সহস্র পদাতিক, ৩২,৬০০, বত্রিশ সহস্র ছয় শত অশ্বারোহী এবং ৫৫১ পাঁচ শত একান্ন রণহস্তী এবং অসংখ্য পরিচারক ছিল।

বিজয়নগর-সম্রাটগণ সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান-আক্রমণকারীগণকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার বাহুবলে এবং মানসিক তেজস্বিতার গুণে সমগ্র কর্ণাট প্রদেশে বাস্তবিক এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। বিজয়নগর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য এবং কলাবিদ্যার আকরভূমি ছিল। ভবিষ্যতে বিজয়নগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। বাদামী, হরিহর, কান্চি, বেলুর, বেলগাবি, পুলবমালী, কৃষ্ণপুরম, প্রভৃতি স্থানে বিজয়নগরসাম্রাজ্যের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সহসা আনন্দ বীণা
বাজিল সবার প্রাণে।
যা কিছু বাসনা ছিল
দূরে সব পলাইল।
মাতিল সবার মন
ব্রহ্মানন্দ রস পানে ॥
হৃদয় কমল ফুটি'
সুগন্ধ বহিল ছুটি';
জগতের জীবদল
ব্যাকুল-পরাণ হল
কস্তুরী মৃগের দল
যথা নিজ নাভিঘ্রাণে ॥

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত লোকদিগের জন্য উৎকণ্ঠা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত)

সময় অল্পই ছিল। এখন আমার প্রথম কাজ, সখু ও নানুকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ও আদর করিয়া, তাহাদের খেলনা কি চাই, মিঠাই কি চাই ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া "আমি আসবার সময় তোমাদের সব জিনিস আন্‌ব, ভুলব না," এইরূপ স্বীকার করিবার পর খুব মিনতির সহিত তাহারা একবার "আচ্ছা" বলিল। কিন্তু ছেলেরা আবার আমাকে খুব জোর করিয়া বলিল, "তুমি যদি কাল দুক্কুর পর্য্যন্ত না এসো তাহলে আমরা খাব না, আর তোমার সঙ্গে কথা কব না, আর কোথাও তোমাকে একলা যেতে দেব না"—তাহাদের এই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া আমি ভাণ্ডুপায়ে একেবারেই বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কল্যাণে গেলাম। সেখানে দুই তিনটা বাঙ্গলা দেখিলাম, কিন্তু তাহা পছন্দ হইল না। সেখানে স্থানে স্থানে প্লেগ হইতেছে শুনিয়া ভাণ্ডুপায় যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতে পদব্রজে ৭ মিনিটের রাস্তার উপর ধুলিয়ার শ্রী বাবাসাহেব গরুড়ের বড় বাগান ও বাঙ্গলা আছে সেইখানে গিয়া সেই বাঙ্গলা দেখিলাম। বাঙ্গলা খুব বড় ও হাওয়াদার ছিল, কিন্তু একেবারেই বে-মেরামত ও উজাড় বলিয়া মনে হইল; তাহা হইলেও কম্পৌণ্ড বড়, বাগান সুন্দর, ও খোলা হাওয়া হওয়ায় সেই জায়গাই পছন্দ করিলাম এবং তখনই "কোন লোককে বোম্বায়ে পাঠাইয়া লেপন করিবার মজুর ও চুণকাম করিবার লোক ডাকাইয়া কাজে লাগাও, বেশী পয়সা লাগলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু রাত্রির মধ্যে সমস্ত জায়গা ঝাড়িয়া, লেপ দিয়া ও চুণকাম করিয়া বাসোপযোগী করা চাই," এইরূপ সেই বাঙ্গলা-বাসী কেরাণীকে বলিলাম। সে সকালে সমস্ত তৈরী করিবে এইরূপ স্বীকার করিবার পর আমি কাশীনাথকে এক চিঠি লিখিলাম যে, আমি ভাণ্ডুপায় গরুড়ের বাঙ্গলা পছন্দ করিয়াছি। কাল সকালের গাড়ীতে বাসুদেব মাষ্টার ও বারকোরা ইহাদিগকে সমস্ত জিনিসপত্রের সহিত ভাস্তপায় পাঠাইবে এবং তুমি সন্ধ্যাকালে কোর্ট হইতে আসিবার পর সমস্ত জিনিসপত্র ও দরকারী খাতাপত্র লইয়া আসিবে। কাল রবিবার। সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তোমরা আমাদিগকে তার করিবে তাহা হইলে আমরা চাকর বামন লইয়া সোমবারে সকালে সবাই ভাণ্ডুপায়ে আসিব। এই সমস্ত হইলে পর রাত্রি ১০টার গাড়ীতে বাহির হইয়া একটার সময় লোনাওলীতে আসিয়া পৌছিলাম। বাড়ী আসিয়া সমস্ত দিন যে সব কাজ করিলাম, সে সমস্ত বলিয়াছি। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া উনি ভালই মনে করিয়া থাকিবেন এইরূপ দুই চারবার তাঁহার মুখ হইতে যে উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তার পর দিন সন্ধ্যাকালে "সমস্ত প্রস্তুত" এইরূপ ভাণ্ডুপা হইতে তার আসিল, তখন সেই রাত্রেই, ১২টার গাড়ীতে ও "বজাবা"কে আগেই রওানা করিয়া দিয়া আমরা অন্য গাড়ীতে ভাস্তপায় আসিলাম। এই সব দিনে লোনাওলীতে ও ভাণ্ডুপায়, এই দুই স্থানেই হাঁড়ীকুড়ী, বিছানা, কাপড়, রান্নার মসলা ও চাকর-বাকরের ব্যবস্থা থাকায় আমরা গিয়া সেই সময় জিনিসের বোঝা বহা প্রভৃতি কোন কষ্ট আমাদিগকে পাইতে হয় নাই। কেবল এখান হইতে সেখানে বেড়াইতে যাইবার মতো গিয়াছিলাম। সোমবারে সকালে ৯টার সময় ভাণ্ডুপায় আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনে বাসুদেব ও মাষ্টার আসিয়াছিল। আমার বাসায় গিয়া, কাশীনাথকে পড়িবার জন্য ডাকিয়া আনো এইরূপ বলিলাম, কিন্তু সে বোম্বায়ে গেছে জানা গেল। আমরা আজ এখানে আসিব এই কথা জানিয়াও কাল সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া ছেলেটা আবার বোম্বায়ে গেল কেন? উনি প্রতীক্ষা করে থাক্‌বেন বলে তার কি কোন ভাবনা হল না! এই কথা মনে করিয়া আমার রাগ হইল। কিন্তু উনি কিছুই মনে করিলেন না। বরং জিজ্ঞাসা করিলেন, বোম্বায়ে গিয়ে থাকে ত যেতে দেও; কিন্তু তার শরীর ভাল আছে ত? এই সব ব্যাপার হইবার পর স্নান ও আহার করিয়া কোর্টে যাইবার জন্য ষ্টেশনে গেলেন। সেই দিন কাশীনাথ দুকুরে খাইতেও আসে নাই। দুইটার সময় আমাদের "বজাবা" জলখাবার ডিবা লইয়া নিত্যানুসারে কোর্টে গেল, যাইতেই শিরেস্তাদার বলিল, "আমার নামে চিঠি এসেছে যে, "রবিবারে ভাণ্ডুপায় গিয়াছিলাম, কিন্তু সোমবারে ভোরের বেলায় জ্বর আসিয়া কুচ্‌কী ফুলিয়াছিল বলিয়া এই কথা সেখানে কাহাকে না জানাইয়া আমি চুপি চুপি উঠিয়া খোড়াহতে খোড়াইতে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ও ভায়খলিতে নামিয়া হিন্দু-হাসপাতালে আসিয়াছি। আমি ভাল আছি। দেশাই ডাক্তার আমাকে ভাল ঔষধ দেবেন এই কথা বজাবাকে দিয়া দিদিঠাকরুণকে জানাইবে—এই চিঠি আমি রাও-সাহেবকে ("ওঁকে") লিখিতাম, কিন্তু অকারণে বেশী ভাবনা হইবে এবং আমার এক্ষণে শারীরিক অবস্থা যেরূপ

তাহাতে ভাবনার বিষয় নাই ; ৩।৪ দিনের মধ্যে ভাল হইব" প্রভৃতি লিখিতে বলিয়া চিঠি বজাবার নিকট দিয়াছিল। বজাবা সন্ধ্যাকালে প্রায় ৬টার সময় তাণ্ডুপায় আইসে। সে এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবনায় পড়িলাম। মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হওয়ায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কারণ এই সংবাদ এখন রাত্রেই "উনি" জানিতে পারিলে আর খাইতে যাইবেন না সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইবে না ; শুধু তাহা নহে, এই রাত্রেই ফর্সা হইবার অপেক্ষা না করিয়াই হাসপাতালে গিয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্লেগের সংসর্গে অন্য লোকেরও খুব ছোঁয়াচে লাগে এইরূপ আমি শুনিয়াছিলাম, তখন এই সময়ে প্লেগ-রোগীর নিকট ওঁর যাওয়া উচিত নয় এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল বলিয়া আমি এই সঙ্কটে পড়িলাম। ভাল, যদি না জানাই তাহা হইলে আমার উপর শুধু দোষ আসিবে না, ওঁর রাগও হইবে। কারণ এই ছেলেটি আমাদের দূর-সম্পর্কীয় শাশুড়ীঠাকুরুণের বাপের বাড়ীর দিক হইতে আত্মীয় ; তাছাড়া ইংরেজী লেখাপড়ায় বেশ দখল ছিল। ও একবার কাজ করিতে বসিলে ৫।৬ ঘণ্টা ধরিয়া উহার ঘাড় নড়িত না কিংবা বিরক্তি হইত না। উহার ব্যবহার অন্যের সহিত উদ্ধত ও স্বভাবে নির্ভীক ছিল। এক "ওঁর" উপর তাহার ভক্তি থাকায় "উনি ছাড়া আমাকে হুকুম করবার কেহ নাই" এইরূপ উহার ধারণা ছিল। ইহা সত্বেও সে কাজে হুসিয়ার হওয়ায় তাহার উপর "ওঁর" খুব অনুগ্রহ ছিল। কখন কখন আমি রাগ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, তখনি উনি বলিতেন যে, "ও এখন ছেলেমানুষ, কাঁচা বয়স, এতটা সে কি বুঝতে পারে? তার কাজ আছে বলে হয়ত রাগ করে থাকবে, কোন কথা বলে থাকবে, সেদিকে লক্ষ্য না করলেই হল। কাজের লোকেরা প্রায়ই একটু রাগী হয়ে থাকে।" এই কথা আমি জানিতাম বলিয়াই কাশীনাথের অসুখের কথা সেই রাত্রে আমি তাঁর কানে আসিতে দিই নাই। আসল কথা, উনি আসিবামাত্র পড়িবার জন্য তাকে নিশ্চয়ই ডাকাইতেন, কিন্তু বৃহস্পতিবার হইতে এই সব লোকের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ওঁর নিদ্রা ছিল না এবং তাতে আবার রবিবারে রাত্রি দুইটার সময় লোণাওলীতে গাড়ীতে উঠায় গোড়াতেই ঘুম হয় নাই এবং পরের গাড়ীতে উঠিয়াও ঘুম হয় নাই ; সেইজন্য বাড়ী আসিয়া বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পড়িবার নামও করেন নাই। বাড়ী আসিয়াই আহারে বসিলেন, কিন্তু খাইলেন খুবই কম এবং বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আমাকে বলিলেন, "আজ আমার মাথা ও গা-হাত-পা বড় ব্যথা করচে। একটু গা টিপে দেও, আর বাদামের তেল মাথায় মাখিয়ে দেও তাহলে হয়ত ঘুম আসবে।" তারপর চাকরকে ডাকিয়া পায়ে মাখন মালিস করাইতে লাগিলাম এবং আমি গা টিপিয়া দিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া গা টিপিবার পর মাথায় ও রগে বাদামের তেল মালিস করিতে লাগিলাম। এই মালিসের দরুণ ১০টার সময় ওঁর ঘুম আসিল এবং আমার খুবই ভাল লাগিল। সেই রাত্রে আমার একটুও ঘুম হয়নি বলিলেও চলে। আমি ভোর চারিটার সময় উঠিলাম। চুল ধুইয়া ও বাঁধিয়া রান্নার সমস্ত মসলা উনুনের পাশে বাহির করিয়া রাখিলাম এবং রান্না কি করিতে হইবে পাচককে বলিয়া দিলাম। বেশ ফর্সা হইয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া ছেলেদিগকে উঠাইয়া আনিলাম, সখুর চুল বাঁধা, ও চুল ধোয়া হইয়া গেলে সে তাহার পোষাক পরিলে ; এবং আমি তাকে বলিলাম ;—"তোকে আজ বাসুদেব শেখাইবে, তোর মাষ্টারকে আজ আমি বোম্বারে নিয়ে যাচ্চি, শীঘ্রই ফিরে আসব, নানু ও তুই খেলা কর, ঝগড়া করিসনে।" এই কথা শুনিয়া সে তার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। নানুরও কাপড় বদলাইয়া অন্য পোষাক পরাইয়া, কোকো পান করাইয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য শিপায়ের জিম্মা করিয়া দিলাম। এই সমস্ত হইলে পর 'ওঁর' চায়ের সময় হইয়াছে বলিয়া চা দিয়া আমিও চা পান করিলাম এবং অবশিষ্ট অংশ ছাত্রী ছেলেদিগকে দিয়া "তোমরা সবাই চা পান কর, আমার দেরী হচ্চে, আমি যাই ৯টা ৯।০টার সময় ফিরে আসব" এইরূপ বলিয়া ছেলেদের মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া আমি ষ্টেশনে গেলাম এবং ভায়খলিতে নামিলাম। সেখানে ভাড়া-গাড়ী করিয়া হিন্দু-হাসপাতালে গেলাম। সখুবাই ও কেশব পূর্ব্বে এই হাসপাতালেই আসিয়াছিল। আমি প্রথমে গিয়াই কেশবাকেই দেখিলাম। তাহার ছয় জায়গা গোলার মতো ফুলিয়াছিল কিন্তু জ্বর অল্পই ছিল এবং ভাল হইবার দিকে যাইতেছিল। তাহার মা শুশ্রূষা করিতেছিল। মাই তাই প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহাকে দেখিয়া তারপর যেখানে কাশীনাথকে রাখা হইয়াছিল সেইখানে আসিলাম এবং গিয়া দেখি তাহাকে খাটে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, নিকটে ৪ জন ছাত্র ও ডাক্তার দেশাই দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার জ্বর ১০৫ ডিগ্রী হওয়ায় একসঙ্গেই তাহার তৃষ্ণা ও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ডাক্তার দেশাই আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "ও ভুল বকচে কিন্তু এখনো চেতনা আছে। তবু এরপর আরও ভুল বকবে। ওর ওঠা উচিত নয়। বোধ হয় "হার্ট ফেল" হবার ভয় আছে ; কিন্তু ও কারও কথা শোনে না, ওর কারও কথা ভাল লাগে না ; তাই ওকে বেঁধে রাখতে হয়েছে ;" এই সব কথা ডাঃ দেশাই যখন বলিতেছিলেন তখন কাশীনাথ একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। তখন আমিই সম্মুখে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি? কাশীনাথ ভাল আছিস? এখন তোর কেমন বোধ হচ্চে? ডাক্তার বল্‌ছেন কালকের চেয়ে আজ তুই অনেকটা ভাল আছিস।" এইরূপ যখন বলিতেছিলাম সে আপনার চোখ রগড়াইয়া ও আচ্ছাদন খুলিয়া আমার পানে তাকাইল। এবং উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল "দিদি তুমি এসেছ? আমার সংবাদ তোমাকে দিয়েছে? আমি বলিলাম"—হ্যাঁ" ; এখন উনিও কোর্ট থেকে ফিরে যাবার সময় এইদিকে এসে তোকে দেখে যাবেন।" এই কথা শুনিয়া এবং ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া খুব গর্ব্বের সহিত বলিল :—

"Look at my master how kind he is specially to me. He has sent his own wife to see me, in this Plague Hospital. Besides he is comming personally to see me. He would have come yesterday but busy as he is, gets no time, you know. He is always busy in the day and night, till he gets fast

asleep. I am his reader, you know. I read so many hours a day. I never sit still. But you have made me prisoner, don't you know who I am? I am justice Ranade's reader. He will never do without me. You have no business to detain me. I am his private secretary. Don't you know whose man I am? will he like if I sit still doing nothing? I must get up and attend to my work, I shall not listen to any body" এইরূপ বলিয়া সে সজোরে চেঁচাইতে লাগিল এবং উঠিবার জন্য ধড়ফড় করিতে লাগিল। এইরূপ হইলে পর ডাঃ দেশাই আমাকে ইসারা করিলেন, আমি তদনুসারে বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং "জৈন হাসপাতালের দিকে গাড়ী নিয়ে যা" গাড়ীওয়ালাকে বলিলাম। সেইখানে গিয়া বৈদ্য এই ডাক নামের গুজরাটী ডাক্তারকে খবর পাঠাইলাম; তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাদের পীড়িত চাকর যেখানে ছিল সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন। সেই হাসপাতালে আমাদের তিন পরদেশী চাকর ছিল। মাতাদীন ও পাহারাওয়ালা দুজনেই বেহোঁস্ ছিল। উহাদিগকে দেখিয়া আমি দুর্গাপ্রসাদের কাছে আসিলাম; তার আধা-আধি জ্ঞান ছিল, কিছু কথা বলিতেছিল। কিন্তু বর্ণোচ্চারণ স্পষ্ট হইতেছিল না, সে কি করিতেছে বুঝিতে পারিতেছিল না। ডাঃ বৈদ্য আমাকে বলিলেন;— "এই লোকটা ঔষধ কিংবা দুধ একটু পেটে পড়তে দেয় নি" এই কথা শুনিয়া আমি দুর্গাপ্রসাদ হাঁক দিয়া ডাকিলাম এবং আমি তোকে দেখ্‌তে এসেছি, তুই আমাকে চিন্‌তে পারচিস কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তার চোখ খুব লাল হইয়াছিল, আড়ষ্ট হইবার মত দেখাইতেছিল। আমি তাকে বলিলাম "তুই ঔষধ কিংবা দুধ কেন খাসনে বল্ দিকি? ভয় নেই। এই ডাক্তার খুব ভাল। উনি কখনই তোকে খারাপ ঔষধ দেবেন না। আমি ত এইখানে আছি, একটু দুধ খা দিকি। কাল ডাক্তার তোকে বাঙ্গালা পাঠিয়ে দেবেন।" এই কথা শুনিয়া সে "আ" বলিল এবং দুই তিন আউন্স দুধ খাইল। তাহার পর অন্য ওয়ার্ডের রোগী দেখিয়া আমি ষ্টেশনে আসিয়া প্রায় ১০॥০টার সময় ভান্তপায় আসিলাম। সেই সময় উনি স্নান করিয়া টুলের উপর বসিয়া আমি কোথায় গিয়াছি খোঁজ লইতেছিলেন, "বালকেরো" পাতার উপর ভাত বাড়িল এবং আহার আরম্ভ হইল। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" এখন কি উত্তর দি ভাবিতেছি, এমন সময় দুই ছেলেই বলিতে লাগিল "তুই শীঘ্‌ঘির আসবি বলিছিলি, এলিনি তো?" তখন এই ভাল সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া ওঁর কথার উত্তর না দিয়া প্রথমে আমি ছেলেদের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। তখন অর্দ্ধেক আহার হইয়া গিয়া শেষের ভাত খাইবার সময় হইয়াছিল। তখন আমি বলিলাম, জৈন হাসপাতালে দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি লোকদিগকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাদের অবস্থা বড় ভাল নয় এইরূপ ডাক্তার বলিলেন। এইরূপ কথা বলিবার দুই চার মিনিট পরে বলিলাম—"আমাদের কাশীনাথও পীড়িত হয়ে হিন্দু হাসপাতালে গেছে এই কথা বাজরা আমাকে রাত্রে বলেছিল। তাকেও দেখব বলে সকালেই শীঘ্র উঠে গিয়েছিলুম। ডাক্তার দেশাই তার ব্যবস্থা বেশ করেছেন। তার জ্বর ১০৫, তার একজায়গায় নারকেলের মতো একটা গোলা হয়েছে। সে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় আছে ও প্রলাপ বক্‌চে। কারও কথা শোনে না, তাই ডাক্তার তাকে খাটে বেঁধে রেখেছে। আমি কাশীনাথের বৃত্তান্ত যখন বলিতেছিলাম, তখন শেষের ভাত দুই চার গ্রাস খাওয়া হইয়া গিয়াছে। কাশীনাথের নাম করবামাত্রই, খাইতে খাইতে হাত গুটাইয়া আমি যে বৃত্তান্ত বলিতেছিলাম তাহা স্তব্ধভাবে শুনিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন, চোখ জলে ভরিয়া আসিল এবং "আমরা এই ১৫ দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা যদি ছেড়ে দিতাম তাহলে এ রকম হত না; এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ, বেশ কাজের, এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ছেলে খুব কম আছে"—এই কথা বলিয়া খুব বিচলিত হইয়া আর এক গ্রাসও না খাইয়া আঁচাইলেন। সেই দিন মুখশুদ্ধি, সুপারি প্রভৃতি খাইবার দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাই ঐ সব যেমন তেমনি পড়িয়া রহিল। পোষাক পরিতে পরিতে চোপদার বলিলেন,—"যাবার সময় কাশীনাথকে দেখে যাব।" চোপদার আস্তে আস্তে বলিল, "এখন যাইবার সময় ভায়খালিতে নামলে কোর্টে যেতে দেরী হয়ে যাবে"; তখন উনি তাকে বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, সন্ধ্যাকালে আসবার সময় ভায়খালিতে নামতে হবে এটা যেন মনে থাকে"। সে "হ্যাঁ" বলিয়া দপ্তর ও ছড়ি হাতে লইল এবং উনিও ৩টার সময় হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে খবর আসিল যে "আপনার ৫ জন চাকরের মধ্যে ৩ জন আজ মরিয়াছে। তাহাদের গোর দিবার ব্যবস্থা আপনারা করিবেন কিংবা হাসপাতাল হইতে করা যাইবে তাহা জানাইবেন"। চিঠি পড়িয়া উনি এক কেরাণী ও এক চোপদারকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন এবং আর এক চোপদারের হাতে চিঠি দিয়া আমার নিকট পাঠাইলেন। সেই চোপদারের নিকট সমস্ত সংবাদ পাইলাম—এবং আমার মন বড় খারাপ হইল। চিঠির অনুসারে তখনি ৫০ টাকা দিয়া তাকে রওনা করিলাম। "কাশীনাথের ব্যবস্থা তুমি করিবে এবং অন্য দুই জনের ব্যবস্থা তাহাদের জাতওয়ালাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে পয়সা দিয়া করাইবে" এইরূপ উনি বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইল।

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে, জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর—অথবা অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিভাষা

অনুসারে মায়া (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন জগৎ), আত্মা ও পরব্রহ্ম—ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানা যাইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'নামরূপ' ও তাহাদের আবরণের নিম্নে 'নিত্য তত্ত্ব', জাগতিক সমস্ত বস্তু এই দুই বর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায়া কিংবা প্রকৃতি বলে। কিন্তু নামরূপকেই একপাশে সরাইয়া রাখিলে যে নিত্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা নির্গুণই থাকিবে। কারণ কোন গুণই নামরূপবর্জ্জিত হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্ত্বই পরব্রহ্ম; এবং মনুষ্যের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের নিকট এই নির্গুণ পরব্রহ্মেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মায়া সত্য পদার্থ নহে; পরব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত ও অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহার দ্বারা আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই ন্যায় অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্যের বিচার করিলে মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয়ও দৃশ্য জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মক অর্থাৎ অনিত্য মায়ার বর্গে পড়ে; এবং এই দেহেন্দ্রিয়-আচ্ছাদিত আত্মা নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; কিংবা ব্রহ্ম ও আত্মা একই। যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগতকে স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের ভেদ পাঠকের এখন অবশ্যই উপলব্ধি হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগৎ নাই; তিনি একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন; এবং বেদান্তশাস্ত্রী বাহ্য জগতের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলিয়া মনে করেন, এবং এই নামরূপের মূলে ও মনুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মস্বরূপী নিত্য দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং এই একপদার্থাত্মক আত্মতত্ত্বই চরম সত্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদী "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই ন্যায় অনুসারে সৃষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়প্রকৃতির পক্ষেও স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তীরা সৎকার্য্যবাদের বাধাটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে"; এইরূপ নির্দ্ধারণ করা প্রযুক্ত এক্ষণে সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মার মধ্যে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিভাগে সমাবেশ হইয়াছে। শুদ্ধাধিভৌতিক পণ্ডিত হেকেল অদ্বৈতী ধরিলাম। কিন্তু তিনি এক জড় প্রকৃতিতেই চৈতন্যেরও সংগ্রহ করেন; এবং বেদান্ত জড়কে প্রাধান্য না দিয়া দেশকালে অসীম, অমৃত ও স্বতন্ত্র চিদ্রূপী পরব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বৈত ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের অদ্বৈত এই দুয়ের মধ্যে এই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত গীতাতে আছে, এবং এক প্রাচীন কবি সমস্ত অদ্বৈত বেদান্তের সার এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

"কোটি গ্রন্থের সার অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি—(১) ব্রহ্ম সত্য (২) জগৎ অর্থাৎ জগতের সমস্ত নামরূপ মিথ্যা কিংবা নশ্বর; এবং (৩) মনুষ্যের আত্মা ও ব্রহ্ম মূলে একই, দুই নহে"। এই শ্লোকের মধ্যে 'মিথ্যা' শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে তিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদ অনুসারে তৃতীয় চরণের 'ব্রহ্মামৃতং জগৎ সত্যং' এইরূপ পাঠান্তর স্বচ্ছন্দে করিয়া লইতে পারেন; সেইজন্য ভাবার্থের বদল হইবে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি সমস্ত দৃশ্য জগতের অদৃশ্য অথচ নিত্য পরব্রহ্মরূপী মূলতত্ত্বকে সৎ বলিবে কি অসৎ (অসত্য=অনৃত) বলিবে, ইহা লইয়া কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই এই মতদ্বয়ের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি। সৎ কিংবা সত্য এই একই শব্দের দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়া উঠিয়াছে; এবং 'সৎ' এই শব্দকে প্রত্যেক ব্যক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, তৎপ্রতি প্রথমে যদি ঠিক্ লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকার্য্য। এই সৎ কিংবা সত্য শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্মুখে এক্ষণে জাজ্বল্যমান অর্থাৎ ব্যক্ত (কাল উহার বাহ্য রূপ বদলাক বা নাই বদলাক); এবং দ্বিতীয় অর্থ (২)—চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও যাহার স্বরূপ চিরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে, প্রথম অর্থ যাঁহার সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য বলেন। এবং পরব্রহ্ম তাহার বিরুদ্ধ, অর্থাৎ চক্ষের অদৃশ্য সুতরাং তাঁহাকে অসৎ বা অসত্য বলা যায়। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি 'সৎ' ও দৃশ্য জগতের অতীতের প্রতি 'ত্যৎ' (অর্থাৎ যাহা অতীত) কিংবা 'অনৃত' (চক্ষের অদৃশ্য) শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে যে, যাহা কিছু মূলে বা আরম্ভে ছিল সেই দ্রব্যই "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ।" (তৈ. ২. ৬)—সৎ (চক্ষের গোচর) এবং 'ত্যৎ' (যাহা অতীত), বাচ্য ও অনির্বাচ্য, সাধার ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়), সত্য ও অনৃত—এইরূপ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্রহ্মকে 'অনৃত' বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে; পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদেই "এই অনৃত ব্রহ্ম জগতের 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা আধার, তাহার অন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাঁহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় হইয়াছে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শব্দভেদে ভাবার্থের বদল হয় নাই। সেইরূপ আবার শেষে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ"—"এই সমস্ত জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রহ্ম) ছিল, এবং ঋগ্বেদের (১০.১২৯.৪) বর্ণন অনুসারে তাহা হইতেই পরে সৎ অর্থাৎ নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৭)। ইহা হইতেও স্পষ্টই দেখা যায়—অসৎ এই শব্দ এই স্থানে "অব্যক্ত অর্থাৎ "চক্ষের অদৃশ্য" এই অর্থেই যোজিত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণাচার্য্য উক্ত বচনের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন, (বেসূ. ২. ১. ১৭)। কিন্তু 'সৎ' কিংবা 'সত্য' এই শব্দের,—চক্ষে দেখা না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ (অর্থাৎ উপরে প্রদত্ত দুই

অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়) অর্থ যাঁহাদের সম্মত, তাঁহারা অদৃশ্য অথচ অপরিবর্ত্তনীয় পরব্রহ্মকেই সৎ কিংবা সত্য এই নাম দিয়া, নামরূপাত্মক মায়াকে অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর এইরূপ বলিয়া থাকেন। উদাহরণ যথা—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত"—হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা 'নাই' তাহা হইতে সৎ অর্থাৎ "যাহা আছে" তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে—এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে (ছাং. ৬. ২. ১, ২)। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেই এই পরব্রহ্মকে একস্থানে অব্যক্ত এই অর্থে 'অসৎ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে (ছাং. ৩.১৯.১)* একই পরব্রহ্মের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার 'সৎ' ও একবার 'অসৎ' এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ—অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই হইলেও শুধু শব্দবাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহায্যকারী পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়া গিয়া শেষে ব্রহ্ম সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, এবং দৃশ্য জগৎ অসৎ অর্থাৎ নশ্বর, এই একই পরিভাষা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌গীতাতে এই শেষের পরিভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ১৬-১৮) পরব্রহ্ম সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ। পুনশ্চ দৃশ্য জগতকে 'সৎ' বলিয়া পরব্রহ্মকে 'অসৎ' বা 'ত্যৎ' (তাহা = অতীত) বলিবার তৈত্তিরীয়োপনিষদীয় সেই পুরাতন পরিভাষার চিহ্ন এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ওঁ তৎসৎ এইরূপ যে ব্রহ্মনির্দ্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৭. ২৩) তাহার মূল অর্থ কি হইতে পারে—এই পুরাতন পরিভাষার দ্বারা ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। 'ওঁ' এই গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র; উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (প্র.৫; মাং.৮-১২; ছাং. ১. ১)। 'তৎ' অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য জগতের অতীত, দূরবর্ত্তী অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব; এবং 'সৎ' অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ। এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই অর্থেই "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" (গী. ৯. ১৯)—সৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও অসৎ অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতায় কর্ম্মযোগ প্রতিপাদ্য হওয়ায় সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের দ্বারাও কর্ম্মযোগের পূর্ণ সমর্থন হয়; "ওঁ তৎসৎ"-এর 'সৎ' শব্দের অর্থ লৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্‌বুদ্ধিতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল পাওয়া যায় সেই কর্ম্ম; এবং তৎ এর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। এইরূপ সংকল্পে যাহাকে 'সৎ' বলা হইয়াছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ কর্ম্মই হওয়ায় (পর প্রকরণ দেখ) এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের এই কর্ম্মমূলক অর্থ মূল অর্থ হইতে সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ওঁ তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং সত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনির্দ্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতার্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না থাকায় এখানে সেগুলি বুঝানো হয় নাই।

জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাত্মা) ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে পর, "জীব আমারই অংশ" (গী. ১৫. ৭) এবং আমিই এক 'অংশের দ্বারা' এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি" (গী· ১০-৪২) এইরূপ যাহা ভগবান গীতায়—এবং বাদরায়ণাচার্য্যও বেদান্তসূত্রে ইহাই বলিয়াছেন (বেসূ. ২. ৩. ৪৩· ৪. ৪. ১৯)—কিংবা পুরুষসূক্তে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—"স্থিরচর ব্যাপুনি অবঘা জো জগদাত্মা দশাংগুলে উরলা"—সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়া যে জগদাত্মা দশাঙ্গুলে রহিয়াছেন—এইরূপ যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে 'পাদ' বা 'অংশ' শব্দের অর্থ নির্ণয়ও সহজ হয়। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও নিরবয়ব একপদার্থাত্মক ও নামরূপবিরহিত সুতরাং অচ্ছেদ্য, এবং নির্ব্বিকার হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা হওয়া সম্ভব নহে (গী. ২. ২৫)। তাই, চতুর্দ্দিকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই একপদার্থী পরব্রহ্ম এবং মনুষ্যের দেহান্তর্গত আত্মা, এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 'শারীর আত্মা' পরব্রহ্মেরই অংশ এইরূপ বলিতে হইলেও, 'অংশ' বা 'ভাগ' শব্দের 'কাটিয়া ফেলা বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা', বা 'ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি দানা' এইরূপ অর্থ না করিয়া, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে গৃহস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ (মঠাকাশ, ঘটাকাশ) এই সকল যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, সেইরূপ 'শারীর আত্মা'ও পরব্রহ্মের অংশ, এইরূপ অর্থ করিতে হয় (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ১৩ দেখ)। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত একপদার্থমূলক তত্ত্ব,—ইহাও এইরূপ সত্য নির্গুণ পরমেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ। অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মূল তত্ত্ব (তাহা আকাশের মত যতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের দ্বারা বদ্ধ নামরূপমাত্র সুতরাং অসীম ও নশ্বর। ইহা সত্য যে, সেই তত্ত্বসমূহের ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত; কিন্তু পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া সেই সমস্তের মধ্যে ওতপ্রোত আছেন এবং তদতিরিক্ত জানি না তিনি কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। পরমেশ্বরের ব্যাপকতা দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহা দেখাইবার জন্য 'ত্রিপাদ' শব্দ পুরুষসূক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ 'অনন্তই' বিবক্ষিত। বস্তুত দেখা যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ বা সংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার; এবং ইহা বলিয়া আসিয়াছি যে পরব্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত। এই জন্য, যে নামরূপাত্মক 'কালের' দ্বারা সমস্ত কবলিত হইয়াছে সেই কালকেও যিনি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন তিনিই পরব্রহ্ম, উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়

* অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ এই শব্দ জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাব (মায়া) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাবকে সৎ বুঝিয়া (real) বস্তুতত্ত্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্তু হেগেল ও গ্রীন প্রভৃতি উক্ত আবির্ভাবকে অসৎ (unreal) বলেন এবং বস্তুতত্ত্বকে (real) সৎ বলেন।

(শ্বে. ৬. ১৫) ; এবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ"—পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে সূর্য্যচন্দ্র কিংবা অগ্নির সমান কোন প্রকাশক সাধন নাই, কিন্তু তিনি স্বপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণনা গীতাতে ও উপনিষদে আছে (গী. ১৫. ৬ ; কঠ. ৫. ১৫ ; শ্বে. ৬. ১৪) তাহারও ইহাই তাৎপর্য্য। সূর্য্য চন্দ্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। যাঁহাকে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (গী. ১৩. ১৭ ; বৃ. ৪. ৪. ১৬)—জ্যোতির জ্যোতি বলা হয় সেই স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন ; তাঁহার অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই ; এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয় (মুং. ২. ২. ১০)। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়গোচর অতি সূক্ষ্ম অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমস্তই দেশকালাদি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব 'জগতে'ই উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক্, উহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল হইতে স্বতন্ত্র ; অতএব কেবল নামরূপেরই বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি সাধন বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা শতগুণ সূক্ষ্ম ও প্রগল্ভ হইলেও তাহার দ্বারা জগতের মূল "অমৃত তত্ত্বের" সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্ব্বিকার ও অমৃততত্ত্বকে কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারও মধ্যে নির্গুণ অর্থাৎ নামরূপরহিত স্বরূপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এবং নির্গুণই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল শব্দের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় যাঁহাদের দুই অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসাধারণত্ব নাই। এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই ভাবের দ্বারা সংকটকালেও সম্পূর্ণ সমতার সহিত আচরণ করিবার স্থিরস্বভাব উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ইহার জন্য বহুবংশাগত সংস্কারের, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়তা আবশ্যক হয়। এই সমস্তের সাহায্যে "সর্ব্বভূতে একই আত্মা" এই তত্ত্ব যখন কোন মনুষ্যের সঙ্কট সময়েও তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে সহজ ভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহারই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারেই মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় (গী. ৫. ১৮—২০ ; ৬. ২১, ২২)—ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপরি-উক্ত সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সারভূত ও শিরোমণিভূত চরম সিদ্ধান্ত। এই আচরণ যে ব্যক্তিতে দেখা যায় না তাহাকে কাঁচা বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে এখনও সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই। প্রকৃত সাধু এবং নিছক্ বেদান্তশাস্ত্রী, ইহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ এবং এই অভিপ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লক্ষণ বলিবার সময় "বাহ্য জগতের মূল তত্ত্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা" জ্ঞান না বলিয়া "অমানিত্ব, ক্ষান্তি, আত্মনিগ্রহ, সমবুদ্ধি" ইত্যাদি উদাত্ত মনোবৃত্তি জাগৃত হইয়া যাহার দ্বারা চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্ব্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ১৩. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বারা যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তির বাসনাত্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয়। কিন্তু কাহার বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন না থাকায় এখনকার কেবল কেতাবী জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, 'জ্ঞান' বা 'সমবুদ্ধি' শব্দের মধ্যেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা (বাসনাত্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ করা হয়। ব্রহ্মসম্বন্ধে শুষ্ক বাক্পাণ্ডিত্য প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া "বাঃ বাঃ" বলিয়া শিরঃসঞ্চালক, কিংবা অভিনয় দর্শকের ন্যায় "আরও একবার" বলিবার লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯ ; ক. ২. ৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে যে ব্যক্তি অন্তর্বাহ্যশুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে সে-ই প্রকৃত আত্মনিষ্ঠ এবং তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক্ পণ্ডিতের হয় না—সে যতই কেন বুদ্ধিমান বা বিদ্বান হোক না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২.২২ ; মুং. ৩. ২. ৩) ; এইরূপ তুকারাম বাবাও বলিয়াছেন—"ঝালাসি পণ্ডিত পুরাণ সাঙ্গসী। পরী তূঁ নেণসি মী হেঁ কোণ॥" অর্থাৎ—"পণ্ডিত হইয়াছ, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি জান না যে 'আমি' কে ?" (গা. ২৫ ৯৯)। আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা দেখ। 'মুক্তি লাভ হয়' এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হইয়া পড়ে! মনে কর আত্মা হইতে এই মুক্তি কোন পৃথক বস্তু ! ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে দ্রষ্টা ও দৃশ্য জগতে ভেদ ছিল ঠিক ; কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যের পূর্ণ জ্ঞান হইলে আত্মা ব্রহ্মেতে মিলিয়া যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রহ্মরূপ হইয়া যান ; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' মোক্ষ এই নাম দেওয়া হইয়াছে ; এই নাম কেহ কাহাকে দেয় না, ইহা অন্য কোথা হইতে আসে না, অথবা তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আত্মজ্ঞান যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রহিয়াছে ; কারণ মোক্ষ তো আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ; উহা পৃথক স্বতন্ত্র কোন বস্তু বা স্থল নহে। শিবগীতাতে এই শ্লোক আছে (১৩. ৩২)—

মোক্ষস্য ন হি বাসোঽস্তি ন গ্রামান্তরমেব বা।
অজ্ঞান-হৃদয়-গ্রন্থি-নাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ প্রদেশে যাইতে হয়, এরূপ

নহে ; আপন হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হওয়াকেই মোক্ষ বলে।" অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে নিষ্পন্ন এই প্রকার এই অর্থই "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম।"—যাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার সকল স্থানেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপী মোক্ষ লাভ হয়, এবং "যঃ সদা মুক্ত এব সঃ" (গী. ৫. ২৮) ভগবদ্গীতার এই শ্লোকসমূহে এবং "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন (মুং. ৩. ২. ৯)—ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের আত্মার জ্ঞানদৃষ্টিতে এই যে পূর্ণাবস্থা হয়, ইহাকেই 'ব্রহ্মভূত' (গী. ১৮. ৫৪), বা "ব্রাহ্মীস্থিতি" (গী, ২. ৭২), বলা হইয়া থাকে ; এবং স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫-৭২), ভক্তিমান্ (গী. ১২. ১৩-২০) বা ত্রিগুণাতীত (গী. ১৪. ২২-২৭) পুরুষদিগের ভগবদ্গীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও এই অবস্থারই বর্ণনা। 'ত্রিগুণাতীত' পদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই গীতারও অভিমত ; এরূপ যেন বুঝা না হয় ; তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম—(বৃ. ১. ৪. ১০)—এই ব্রাহ্মী অবস্থা কখন ভক্তিমার্গের দ্বারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখন বা গুণাগুণবিচাররূপ সাংখ্যমার্গের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায়। এই মার্গসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মার্গ হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বরস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ভক্তিই সুলভ সাধন ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে। এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি। সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্মাত্মৈক্যের অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান হইয়া জগতের সর্ব্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; এবং এই অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে সেই পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন—এইটুকুতো নির্ব্বিবাদ। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ পশু ও মনুষ্যের একই হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কিংবা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই হইয়া থাকে। সমস্ত ভূতের বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এইপ্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করাই নিত্য মুক্তাবস্থা, পূর্ণযোগ বা সিদ্ধাবস্থা। গীতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টীকা করিবার সময়—জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মভূত পুরুষের সাম্যাবস্থার সরস ও চটকদার নিরূপণ করিয়াছেন ; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাহ্মী স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই। যথা :—"হে পার্থ ! যাঁহার হৃদয়ে বৈষম্য কিছুমাত্র নাই, যিনি শত্রুমিত্র সকলকে সমান ভাবেন ; অথবা হে পাণ্ডব ! যিনি প্রদীপের ন্যায় ইহা আমার ঘর চলিয়া এখানে আলোক প্রদান করিব এবং উহা অপরের ঘর বলিয়া ওখানে অন্ধকার করিয়া রাখিব, এপ্রকার ভেদজ্ঞান করেন না ; বীজ যে বপন করে এবং গাছ যে কাটে, উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে ছায়াদান করে ;" ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২. ১৮.)। সেইরূপ "পৃথিবীর ন্যায় তিনি এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না যে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহা ভাবেন না যে, রাজার শরীর রক্ষা করি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি ; যেমন জল এই ভেদ করে না যে, গরুর তৃষ্ণা শান্তি করি এবং ব্যাঘ্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করি ; সেইরূপই সর্ব্বভূতে যাঁহার একই মৈত্রী ; যিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান দয়া, এবং যিনি 'আমি' ও 'আমার' ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাঁহাতে সুখদুঃখের আভাসও দেখা যায় না" ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২. ১৩)*। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা শেষে যাহা লাভ হয় তাহা ইহাই।

সমস্ত মোক্ষধর্ম্মের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, সুরদাস, তুলসীদাস, ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পূর্ব্বে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার আধারভূত ঋগ্বেদের এক প্রসিদ্ধ সূক্ত ভাষান্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের অগম্য মূলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই সূক্তে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্‌ভ, স্বতন্ত্র ও মূলস্পর্শী তত্ত্বজ্ঞানের মার্ম্মিক বিচার অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পূর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরূপাত্মক জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় ইহা দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই সূক্তের গুরুত্ব বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আপনাপন ভাষায় তাহার চমৎকার ভাষান্তর করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত হইতেছে ; এবং এই সূক্তের প্রারম্ভিক শব্দ হইতে ইহাকে "নাস-

---

* পার্থা জয়াচিয়া ঠাযী। বৈষম্যাচী বার্ত্তা নাহী।
বিহুমিত্রা দোহী। সরিসা পাড়ু॥
কাঁ ঘরিচিয়া উজিযেডু করাবা। পারখিয়া অঁধার পাডাবা।
হে নেণেচি গা পাণ্ডবা। দীপু জৈসা॥
জো খাণ্ডাবয়া ঘাকে ঘালী। কাঁ লাবণী জয়ানে কেলী॥
দোঘাঁ একাচি সাঊলী। বৃক্ষু দে জৈসা॥

কিংবা তৎপূর্ব্বে (জ্ঞা. ১২, ১৩) সেই অধ্যায়ে—

উত্তমাতে ধরিজে। অধমাতে অব্হেরিজে।
হেঁ কাহীঁচ নেণিজে। বসুধা জৈসী॥
কাঁ রায়াচেঁ দেহ চালূঁ। রঙ্কা পরৌতে গালূঁ।
হেঁ ন ম্হণেচি কৃপালু। প্রাণু সৈঁ পা॥
গাঈচী তৃষা হরূঁ। কাঁ ব্যাঘ্রা বিষ হোঊনি মারূঁ।
ঐসে নেণেচি কাকরূ, তোয় জৈসেঁ॥
তৈসী আঘ বিশ্বাচি ভূতমাত্রী। একপণে জয়া মৈত্রী॥
কৃপেশী ধাত্রী॥ আপণচি জো॥
আণি মী হে ভাষ নেণে। মাঝেঁ কাহীঁচি ন ম্হণে॥
সুখদুঃখ জাণণেঁ। নাহীঁ জয়া॥

দীয় সূক্ত" বলে। এই সূক্তই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২. ৮. ৯) প্রদত্ত হইয়াছে; মহাভারতের নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে, ভগবদিচ্ছায় সর্ব্বপ্রথমে জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, ইহার বর্ণনা এই সূক্তেরই আধারে করা হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪২. ৮)। সর্ব্বানুক্রমণিকা অনুসারে ইহার ঋষি পরমেষ্ঠি প্রজাপতি এবং দেবতা পরমাত্মা; ইহাতে ত্রিষ্টুভ্ বৃত্তের অর্থাৎ এগারো অক্ষরে চার চরণের সাত ঋক আছে। 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দ্ব্যর্থী হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে 'সৎ' বলা সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের যে মতভেদের কথা পূর্ব্বে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—এই মূল কারণ সম্বন্ধে কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬) কিংবা "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" (ঋ. ১০. ১১৪-৫)—তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, কিন্তু তাঁহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে; আবার কোন কোন স্থলে ইহার উল্টাও বলা হইয়াছে যে, "দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেহসতঃ সদজায়ত" (ঋ. ১০. ৭২. ৭)—দেবতাদেরও পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে 'সৎ' অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি হওয়া সম্বন্ধে ঋগ্বেদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়; যেমন জগতের মূলারম্ভে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই দুই তাহারই ছায়া; তিনিই পরে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন (ঋ. ১০.১২১.১,২); প্রথমে বিরাট্‌রূপী পুরুষ ছিলেন; তাঁহা হইতে যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ. ১০. ৯০); প্রথমে আপ (জল) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন (ঋ. ১০. ৭২. ৬; ১০. ৮২. ৬); ঋত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর রাত্রি (অন্ধকার) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল (ঋ. ১০. ১৯০. ১)। ঋগ্বেদে বর্ণিত এই মূল দ্রব্য সমূহের পরে অন্যান্য স্থানে এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা:—(১) জলের, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ' এই সমস্ত প্রথমে কেবল জল ছিল (তৈ. ব্রা. ১.১. ৩. ৫); (২) অসতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইহা প্রথমে অসৎ ছিল (তৈ. ২. ৭); (৩) সতের, ছান্দোগ্যে 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই সমস্ত প্রথমে সৎই ছিল (ছাং. ৬. ২); কিংবা (৪) আকাশের, 'আকাশঃ পরায়ণম্' আকাশ সমস্তের মূল (ছাং. ১. ৯); (৫) মৃত্যুর, বৃহদারণ্যকে 'নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ' প্রথমে ইহা কিছুই ছিল না, সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল (বৃ. ১. ২. ১); এবং (৬) তমের, মৈত্র্যুপনিষদে 'তমো বা ইদমগ্র আসীদেকম্' প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম (তমোগুণী, অন্ধকার) ছিল—পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ত্ব হইল, (মৈ. ৫. ২) শেষে এই সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়া মনুস্মৃতিতে জগতের আরম্ভের বর্ণনা এই প্রকার করা হইয়াছে—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

অর্থাৎ "এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, ভেদাভেদ উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল; অনন্তর তাহার মধ্যে অব্যক্ত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন"—(মনু. ১.৫-৮)। জগৎ আরম্ভের মূলদ্রব্যসম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা নাসদীয় সূক্তের সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে কোন্ মূলদ্রব্য সত্য ধরা যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। উহার সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন যে—

সূক্ত ও অনুবাদ।

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥ ১॥

১। তখন অর্থাৎ মূলারম্ভে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না! অন্তরীক্ষ ছিল না এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। (এইরূপ অবস্থাতে) কে (কাহাকে) আবরণ করিল? কোথায়? কাহার সুখের জন্য? অগাধ ও গহন জল? কোথায় ছিল? *

ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২॥

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, সেইজন্য (অন্য) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ) ও ছিল না। (এইপ্রকার) রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন (=প্রকেত) ছিল না। (যাহা ছিল) তাহা একমাত্র আপন শক্তি (স্বধা) দ্বারাই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত অর্থাৎ স্ফূর্তিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহ
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥ ৩॥

৩। যে (যৎ) এইরূপ বলা যায় যে, অন্ধকার ছিল, আরম্ভে এই সমস্ত অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেদাভেদবিরহিত জল ছিল, কিংবা আভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম (আরম্ভেই) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, তাহা (তৎ) মূলে এক (ব্রহ্মই) তপের মহিমার দ্বারা (রূপান্তরে পরে) প্রকট হইয়াছিলেন। †

---

* প্রথম ঋক্—চতুর্থ চরণে 'আসীৎ কিং' এই অন্বয় করিয়া আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি; এবং উহার ভাবার্থ হইতেছে 'জল সে সময়ে ছিল না' (তৈ. ব্রা. ২.২.৯ দেখ)।

† তৃতীয় ঋক্—কেহ কেহ ইহার প্রথম তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া উহার এইরূপ বিধানাত্মক অর্থ করেন যে, "অন্ধকার, অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের দ্বারা আচ্ছাদিত আভু (শূন্যগর্ভ) ছিলেন"। কিন্তু আমার মতে তাহা ভুল। কারণ প্রথম দুই ঋকে, মূলারম্ভে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার বিপরীত অন্ধকার কিংবা জল মূলারম্ভে ছিল, এই সূক্তে ইহা উক্ত হইতে পারে না। তাছাড়া, তৃতীয় চরণের যৎ শব্দ

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪॥

৪। ইহার মনের যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃসৃত হয় তাহাই আরম্ভে কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে। জ্ঞানীরা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্রহ্মের মধ্যে সৎ-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের (প্রথম) সম্বন্ধ, এইরূপ

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্
অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥

৫। (এই) রশ্মি বা সূত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত; এবং যদি বল যে ইহা নীচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল। (ইহাদের ভিতর কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হইল এবং (বাড়িয়া) বড়ও হইল। তাঁহারই স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রযতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়া রহিল।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনা-
থ কো বেদ যত আবভূব॥ ৬॥

৬। (সৎ-এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে আসিল ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক) প্র অর্থাৎ বিস্তার পূর্ব্বক—এখানে কে বলিবে? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারাও এই (সৎ জগতের) বিসর্গে পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা কে জানিবে?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যৎ আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭॥

৭। (সৎ-এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংবা সৃষ্ট হইয়াছে বা হয় নাই,—তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে অধ্যক্ষ (হিরণ্যগর্ভ), তিনিই জানেন; কিংবা না জানিতেও পারেন (কে বলিতে পারে?)

চক্ষের বা সাধারণত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরূপাত্মক নানা দৃশ্যের জালে বিজড়িত না থাকিয়া তাহার অতীত কোন এক ও অমৃত তত্ত্ব আছে ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য। এই সাধনের গোড়াই পাইবার জন্য উক্ত সূক্তের ঋষির বুদ্ধি একেবারেই দৌড়িয়া গিয়াছিল; ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কত তীব্র ছিল! মূলারম্ভে অর্থাৎ জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তাহা সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অমৃত, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত ঋষি সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া ইহা বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্ত্য ও অমৃত, অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও সুখভোক্তা, এই প্রকার দ্বৈতের পরস্পরসাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের সৃষ্টির পরে হওয়ায়, জগতে এই দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ এক ও দুই এই ভেদও যখন ছিল না তখন, কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত? তাই এই সূক্তের ঋষি আরম্ভেই নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারম্ভের এক দ্রব্যকে সৎ বা অসৎ, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা মৃত্যু ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া উচিত নহে; যাহা কিছু ছিল তাহা এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং, তাহা একমাত্র একই, চতুর্দ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফুর্ত্তিমান ছিল, তাহার জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছাদক অন্য কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় ঋকে 'আনীৎ' এই ক্রিয়াপদের 'অন্' ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করা বা স্ফুরণ হওয়া, এবং 'প্রাণ' শব্দও সেই ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু যাহা না সৎ আর না-অসৎ, তাহা সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল এবং শ্বাসোচ্ছ্বাস চলিবার বায়ু তখন বায়ুই বা কোথায় তাহা কে বলিতে পারে? তাই 'আনীৎ' এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং' = বায়ুহীন ও 'স্বধয়া' = আপনার নিজ মহিমাতে—এই দুই পদ জুড়িয়া "জগতের মূলতত্ত্ব জড় ছিল না" এই অদ্বৈতাবস্থার অর্থ দ্বৈতের ভাষায় খুব নিপুণভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, "তাহা এক বায়ু বিনা আপন শক্তিতেই শ্বাসোচ্ছ্বাস করিতেছিল কিংবা স্ফুরিত হইতেছিল" ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে যে বিরোধ দেখা যায়, তাহা দ্বৈতভাষার অপূর্ণতাপ্রযুক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। "নেতি নেতি" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" (ছাং. ৭. ২৪. ১)—আপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া একাই অবস্থিত—ইত্যাদি পরব্রহ্মের যে বর্ণনা উপনিষদে আছে তাহাও উপরোক্ত অর্থেরই দ্যোতক: সমস্ত জগতের মূলারম্ভে চারিদিকে এই যে অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব স্ফুরিত ছিল বলিয়া এই সূক্তে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবশিষ্ট থাকিবে। তাই গীতাতে "সমস্ত পদার্থের নাশ হইলেও যাহার নাশ হয় না" (গী. ৮. ২০), এইরূপ এই পরব্রহ্মেরই কোন পর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে এই সূক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "তাহা

নিরর্থক এরূপ অর্থ করিলেও মানিতে হয়। তাই তৃতীয় চরণের বৎ-এর সহিত চতুর্থ চরণের তৎ পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপরিউক্ত অর্থ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মূলারম্ভে জল প্রভৃতি পদার্থ ছিল' এইরূপ যাহারা বলে তাহাদের উত্তরস্বরূপে এই ঋক্ এই সূক্তে আসিয়াছে; এবং তোমার কথা অনুসারে তম, জল, প্রভৃতি পদার্থ মূলে ছিল না, উহা এক ব্রহ্মেরই পরবর্ত্তী বিস্তার, এইরূপ বলাই ঋষির উদ্দেশ্য। 'তুচ্ছ' ও 'আভু' এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আভু শব্দের অর্থ বড় কিংবা সমর্থ হইতেছে; এবং ঋগ্ বেদে অন্য যে দুই স্থানে এই শব্দ আসিয়াছে (ঋ. ১০. ২৭. ১, ৪) তথায় সায়ণাচার্য্যও উহার এই অর্থই করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে (চিত্র. ১২৯. ১৩০) তুচ্ছ এই শব্দ মায়ার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে (নৃসিং. উত্ত. ৯ দেখ), সুতরাং আভুর অর্থ তুচ্ছ না হইয়া 'পরব্রহ্ম'ই হইতেছে। 'সর্ব্বং আঃ ইদম্' এই স্থানে আঃ (অ + অস্) অস্ ধাতুর ভূতকালের রূপ; তাহার অর্থ 'আসীৎ'।

সৎও নহে অসৎও নহে" (গী. ১৩. ১২)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত মূলারম্ভে যদি অন্য কিছুই ছিল না তবে "আরম্ভে জল, অন্ধকার, বা আভু ও তুচ্ছ ইহাদের দ্বন্দ্ব ছিল" ইত্যাদি যে বর্ণনা বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় ঋকে কবি বলিতেছেন যে, জগতের আরম্ভে অন্ধকার ছিল কিংবা অন্ধকারে আবৃত জল ছিল, কিংবা আভু (ব্রহ্ম) ও তাঁহার আচ্ছাদনকারী মায়া (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই ছিল ইত্যাদি, ঐ সমস্ত সেই সময়েই যখন একমাত্র মূল পরব্রহ্মের তপমাহাত্ম্যে তাঁহার বিবিধ রূপে বিস্তার হইয়াছিল—এই বর্ণনা একেবারে মূলারম্ভের স্থিতিবিষয়ক নহে। এই ঋকে 'তপ' শব্দের দ্বারা মূল ব্রহ্মের জ্ঞানময় বিশেষ-শক্তি বিবক্ষিত হওয়ায় তাহার বর্ণনা চতুর্থ ঋকে করা হইয়াছে (মুং. ১.১. ৯ দেখ)। "এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ" (ঋ. ১০. ৯০. ৩.) এই ন্যায় অনুসারে সমস্ত জগৎই যাঁহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমস্তের অতীত, সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, ইহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও দ্রষ্টা, ভোক্তা ও ভোগ্য, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও অমৃত ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্রূপী, অসাধারণ পরব্রহ্মই মূলারম্ভে ছিলেন ইহা নির্দ্ধারণ করিলেও যখন ইহা বুঝাইবার সময় আসিয়াছে যে, এই অনির্ব্বাচ্য নির্গুণ একমাত্র এক তত্ত্ব হইতে আকাশ, জল প্রভৃতি দ্বন্দ্বাত্মক নশ্বর সগুণ নামরূপাত্মক বিবিধ সৃষ্টি কিংবা এই জগতের মূলভূত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো আমাদের উল্লিখিত ঋষিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতের ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; এবং শেষে ঋষি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষ্যের বুদ্ধির সীমার বাহিরে। চতুর্থ ঋকে মূল ব্রহ্মকেই 'অসৎ' বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার অর্থ "কিছু নাই" ইহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কারণ দ্বিতীয় ঋকেই 'তাহা আছে' এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই সূক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য জগতের সহিত যজ্ঞের উপমা দিয়া এই যজ্ঞ করিবার ঘৃত, সমিধ প্রভৃতি সামগ্রী প্রথমে কোথা হইতে আসিল (ঋ. ১০. ১৩০, ৩)? কিংবা গৃহের দৃষ্টান্ত লইয়া মূল এক নির্গুণ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর আকাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রকৃতি) কোথা হইতে মিলিল?—কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ. এইরূপ ব্যবহারিক ভাবা স্বীকার করিয়াই ঋগ্বেদ ও বাজসনেয়ীসংহিতায় কঠিন বিষয়সমূহের বিচার এই প্রকার প্রশ্ন দ্বারা করা হইয়াছে (ঋ. ১০. ৩১. ৭; ১০. ৮১. ৪; বাজ. সং ১৭. ২০)। সেই অনির্ব্বাচ্য একমাত্র এক ব্রহ্মেরই মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার কাম'রূপী তত্ত্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বস্ত্রের সূত্রের ন্যায় কিংবা সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপর চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সৎএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশ পৃথিবী-রূপ এই বৃহৎ আট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, উপরোক্ত সূক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে (বাজ. সং. ৩৭, ৭৪ দেখ) এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। এই সূক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েতি।" (তৈ. ২. ৬; ছাং. ৬, ২. ৩)—সেই পরব্রহ্মেরই বহু হইবার ইচ্ছা হইল—(বৃ. ১. ৪ দেখ); অথর্ব্ববেদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দৃশ্য জগতের মূলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব্ব প্রথমে 'কাম' উৎপন্ন হইল, (অথর্ব্ব. ৯. ২. ১৯)। কিন্তু এই সূক্তের বিশেষত্ব এই যে, নির্গুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নির্দ্বন্দ্ব হইতে দ্বন্দ্বের কিংবা অসঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব বুদ্ধির অগম্য বলিয়া সাংখ্যের ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া মূলপ্রকৃতিরই বা তাহার ন্যায় অন্য কোন তত্ত্বকে স্বয়ংভূ ও স্বতন্ত্র মানা হয় নাই; কিন্তু এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন যে, "যাহা বুঝা যায় নাই, স্পষ্ট বল যে তাহা বুঝা যায় নাই; কিন্তু সেই জন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাও আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবধারিত অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মের যোগ্যতাকে দৃশ্য জগৎরূপ মায়ার যোগ্যতার সহিত সমান বুঝিও না, এবং পরব্রহ্মসম্বন্ধে অদ্বৈত বুদ্ধিও ছাড়িয়া দিও না"। তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মানিলেও তাহাতে জগৎ সৃষ্ট করিবার জন্য বুদ্ধি (মহান্) বা অহঙ্কার প্রথমে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়াই হয় নাই। এবং এই দোষ যখন কিছুতে এড়ানো যায় না তখন প্রকৃতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই বা কি লাভ? মূল ব্রহ্ম হইতে সৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা জানা যায় না এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। মানববুদ্ধির কথা দূরে থাক্, সৎএর উৎপত্তি কিরূপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও দৃশ্য জগৎ আরম্ভ হইবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, আগেকার ব্যাপার তাঁহারা কি প্রকারে জানিবেন? (গী. ১০. ২ দেখ)। কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাও হিরণ্যগর্ভ অনেক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ এবং ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র তিনিই আরম্ভে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" (ঋ. ১০. ১২১. ১)—সমস্ত জগতের 'পতি' অর্থাৎ 'রাজা' বা অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি এই বিষয় জানিতে পারিবেন না কেন? এবং তিনি যদি জানিয়া থাকেন, তবে উহা দুর্ব্বোধ কেন বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই সূক্তের ঋষি প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ঔপচারিক উত্তর দিলেন যে,—"হাঁ; তিনি এই বিষয় জানিয়া থাকিবেন"; কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মদেবেরও জ্ঞানের গভীরতা দ্রষ্টা এই সূক্তে ঋষি আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সভয়ে তখনই আবার বলিয়াছেন যে, "অথবা নাও জানিতে পারেন! কে বলিবে? কারণ তিনিও সৎএর শ্রেণীতে পড়ায়, 'পরম' বলা হইলেও 'আকাশের' মধ্যেই অবস্থিত জগতের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান এই অধ্যক্ষের কোথা হইতে আসিবে?" কিন্তু এক 'অসৎ' অর্থাৎ অব্যক্ত ও নির্গুণ দ্রব্যেরই সহিত বিবিধ নামরূপাত্মক সৎ-এর অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না গেলেও মূলব্রহ্ম যে একই সে বিষয়ে ঋষি নিজের অদ্বৈত বুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই।

এবিষয়ে এই একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, অচিন্ত্য বস্তুর গহন-অরণ্যে মানব-বুদ্ধি, সাত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্ম্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সেখানে তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ঋগ্বেদে যে এই সূক্ত পাওয়া যায় ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের! বিষয় এই সূক্তান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ (তৈত্তি. ব্রা. ২. ৮. ৯), উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হইয়াছে। এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কাণ্ট প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কর্ত্তৃক ঐ বিষয়েরই অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মনে রেখো যে, এই সূক্তের ঋষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্ত্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে—দৃঢ়, স্পষ্ট কিংবা তর্কদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ ইহার পরে এখনও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিয়া অধিক আশাও নাই।

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পূর্ব্বে 'কেসরী'র অনুকরণে যে রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ চলা গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষপাত করা উচিত। কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ানুসন্ধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থের আরম্ভে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কর্ম্মযোগশাস্ত্রই গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা দেখান হইয়াছে। অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে সুখদুঃখ বিচারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি একদেশদর্শী ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খণ্ড। আবার কর্ম্মযোগের আধ্যাত্মিক উপপত্তি বলিবার পূর্ব্বে, আত্মা কি তাহা জানিবার জন্য ষষ্ঠ প্রকরণেই প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রান্তর্গত দ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষর বিচার করা হইয়াছে। এবং আবার এই প্রকরণে আসিয়া আত্মার স্বরূপ কি এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে দুইদিকে একই অমৃত ও নিগুর্ণ আত্মতত্ব কিরূপে ওত-প্রোত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছি। এইপ্রকার এখানে ইহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতে একই আত্মা—এই সমবুদ্ধিযোগ সম্পাদন করিয়া তাহা সর্ব্বদাই জাগৃত রাখাই আত্মজ্ঞান ও আত্মসুখের পরাকাষ্ঠা; এবং আরও বলা গিয়াছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা বা মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহা কি ভাবে করিতে হইবে, কিংবা এই ব্যবহার যে শুদ্ধবুদ্ধিতে করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি—এই যে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক কিংবা অবিরোধীভাবে যে করিতে হইবে ইহা আর এক্ষণে বলিতে হইবে না। কর্ম্মযোগের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন নামরূপাত্মক জগতের ব্যবহার আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা জ্ঞানীপুরুষের ত্যাগ করা উচিত; এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য নির্দ্ধারিত হইবে কর্ম্মাকর্ম্ম এবং শাস্ত্রও নিরর্থক হইবে! তাই এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্মের নিয়ম কি, ও তাহার পরিণাম কি, অথবা বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও কর্ম্মযোগশাস্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবশ্যক। ভাগবদ্গীতাতে তাহার বিচার করা হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা এই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় ভগবদ্গীতার বেদান্ত বা ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না হইতেই, তাহারা আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় সুরু করিয়া দেন। কিন্তু সেরূপ করিলে আমার মতে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এইজন্য ভগবদ্গীতার উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব।

ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত।

আসামের নদ-নদী।

(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী—আসাম পরিব্রাজক)

আসাম প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদ-নদী প্রবাহিত। যোগিনী তন্ত্র মতে এই প্রদেশের কামরূপ জেলায় একশত নদী বিদ্যমান ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে, "নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্"। কালপ্রভাবে এখানকার বহুসংখ্যক নদী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে বৈচিত্র্য কি? এই প্রদেশের দক্ষিণদিকের নদীগুলি স্রোতঃশীলা নহে। উত্তরদিকের নদীসমূহ হইতে বন্যা আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ও দক্ষিণদিকের নদীগুলিকে পরিপূর্ণ করে। এ কারণ জ্যৈষ্ঠমাস না হওয়া পর্য্যন্ত জলের স্রোত অধিক হয় না।

আসাম প্রদেশে যে সকল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কতকগুলির নামোল্লেখ করা হইল:—

১। অগ্রাণ, ২। আলী, ৩। করতোয়া, ৪। করঙ্গী, ৫। কল্যাণী, ৬। কাকদোঙ্গা, ৭। কালদিয়া, ৮। কপিলি, (Kapili) ৯। কৃষ্ণাই, ১০। কুলশী, ১১। কুণ্ডলপাণি, ১২। ককিলা, ১৩। খোয়াই (Khowi) ১৪। গঙ্গাধর, ১৫। ঘিলিধারী, ১৬। চম্পাবতী, ১৭। চাউলখোয়া, ১৮। ঝাঞ্জী (Jhangi) ১৯। জাতিঙ্গা, ২০। জিরাই, ২১। জিনারী, ২২। জিনঝিরাম, ২৩। জংলুং, ২৪। জগদুয়ার, ২৫। জিয়াধনশিরী, ২৬। ঝানজি, ২৭। টাঙ্গনমারী, ২৮। টিপাই, ২৯। টিয়ক, ৩০। টেঙ্গাপানি,

৩১। ডিবাং, ৩২। ডিচাং, ৩৩। ডিচৈ, ৩৪। ডিক্রু ৩৫। তকি, ৩৬। তিপকাই, ৩৭। তিঙ্গরাই, ৩৮। তেঙ্গাপানু, ৩৯। তুরঙ্গ, ৪০। দৈয়াং, ৪১। দিজু, ৪২। দিখৌ (দিখু), ৪৩। দিমৌ, ৪৪। দিজমুর, ৪৫। দিজমা, ৪৬। দিগরু (সোনাপুরীয়া), ৪৭। দিসই ৪৮। দিছাং, ৪৯। দিক্রং, ৫০। দিহিং, ৫১। দুধনাই, ৫২। দেওপাণি, ৫৩। ডকাবনজুলি, ৫৪। দ্বারিকা, ৫৫। ধনশিরি (ধানশ্রী), ৫৬। ধোলহাড়ী, ৫৭। নোনাই, ৫৮। নদিহিং (Noadihing) ৫৯। পরুয়া, ৬০। পাগলামানস, ৬১। ব্রহ্মপুত্র, ৬২। বরাকর (বরাক), ৬৩। বড়নদী, ৬৪। বড়পাণি, ৬৫। বলদি, ৬৬। বাটা, ৬৭। বামনাই, ৬৮। বিহানীমুখ, ৬৯। বুড়ীদিহিং, ৭০। বেগাঁপাণি, ৭১। ভরলু, ৭২। ভেড়ামোহনা, ৭৩। ভোলা, ৭৪। ভৈরবী, ৭৫। মনু, ৭৭। মানস, ৭৮। মাতঙ্গ, ৭৯। মিচা, ৮০। যমুনা, ৮১। যত্নকাটা, ৮২। রঙ্গা, ৮৩। লথাইতারা, ৮৪। লক্ষ্মী, ৮৫। লাঙ্গাই (Langai) ৮৬। শিলাং, ৮৮। শিলপা, ৮৯। সজং, ৯০। সরল ভাঙ্গা, ৯১। সরুমানস, ৯১। সিংগ্রা, ৯২। সিঙ্গলা, ৯৩। সিন্ধু, ৯৪। সোনকোষ, ৯৫। সোনাই, ৯৬। সোবনশিরি (সুবর্ণশ্রী) ৯৭। সোমেশ্বরী, * ৯৮। হরিপাণি বাহাতবাচীয়া, ৯৯। কাকজান, ১০০। গরুয়া, ১০১। ছিগা, ১০২। টোকোলাই, ১০৩। নামডাং ১০৪। মিতং, ১০৫। মেলং, ১০৬। মুদৈজান, প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র।

আসামে প্রবাহিত নদ-নদীগুলির মধ্যে "ব্রহ্মপুত্র" সর্ব্বপ্রধান। এই নদীর উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে উক্ত আছে। ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ মানসসরোবর নামক হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন দিহিং নদীর সহিত মিলিত হইয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। অনন্তর উহা শদীয়া নগর হইতে ৯ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়া এবং ডিব্রুগড় হইতে ৩ মাইল উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া আসাম প্রদেশের শিবসাগর, কামরূপ প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অতঃপর উহা পশ্চিমদিকে আসিয়া গারোপর্ব্বতমালা ঘুরিয়া গিয়া বঙ্গদেশে মেঘনা ও পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মানসসরোবর হইতে লাসা পর্য্যন্ত এই প্রবাহিত নদ "সাম্পো" নামে অভিহিত।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম অনেক ছিল, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান :—হ্রদিনী, অন্তিবলা, থাটাই, পছিলেহ, কামছ, ত্রুথিছায়ান, ধৌনী, থামাউন, ছিয়ামে, জুঐনছ, কয়হতিকা, কর, ছেরছিলিহ কায়া প্রভৃতি।

Captain John Bryan Newfirlle ১৮২৪ খৃঃ অব্দের এবং Lieut R. Wilcox ১৮৩২ খৃঃ অব্দের Asiatic Researches নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় ব্রহ্মপুত্রকে "লোহিতনদী" বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পশ্চিম "মালোয়া"র (সিন্ধিয়া রাজ্যান্তর্গত) মাণ্ডাসর নামক স্থানে গুপ্তবংশীয় মহারাজ যশোধর্ম্মণের প্রস্তরস্তম্ভলিপি (Stone pillar inscription) সমূহের মধ্যে এই "লৌহিত্য নদী"র নাম পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে :—

"আ লৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তালবনগহনোপত্যকাদা মহেন্দ্রাদা।
গঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ॥"

—Corpus Ins. Indi, Vol III, P. 146.

গঙ্গা ও সিন্ধুনদের ন্যায় "ব্রহ্মপুত্র" জলসেচন কার্য্যে (irrigation) উপকারে না আসিলেও প্রতিবৎসর বন্যার সময় ইহার তীরদেশস্থ ও সমীপবর্ত্তী স্থান সকল পলির দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় ঐ সকল স্থানে ধান্য, সর্ষপ, পাট প্রভৃতি শস্য আশানুরূপ উৎপন্ন হয়। পুণ্যনীর ব্রহ্মপুত্র নদ আসামদেশকে শস্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই নদের উভয়পার্শ্বে পাহাড় পর্ব্বত। এই সকল পাহাড় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, শিলঘাট (কলিয়াবর), তেজপুর, গৌহাটী, পলাশবাড়ী * নগরবেড়া, হাতিমোড়া, গোয়ালপাড়া, যোগীঘোপা বিলাসপাড়া, ধুবড়া প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে এই নদে শদিয়া পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ধুবড়ী হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া ষ্টিমার যোগে ডিব্রুগড় যাইতে হইলে উহার তীরস্থ যে সকল প্রধান বাণিজ্য-বন্দর অতিক্রম করিতে হয় তাহাদের নাম যথা :—ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, রাঙ্গামাটী (মঙ্গলদৈ যাত্রী) তেজপুর, শিলঘাট (নগাঁওযাত্রী), দিখুমুখ, দিবাংমুখ (শিবসাগর যাত্রী), ডিহিংমুখ, ডিব্রুমুখ (ডিব্রুগড় যাত্রী)। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ও বুড়িদিহিং নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগে মরণজাতিরা বসবাস করে। আসামীরা ইহাদিগকে মতক বা মোয়ামরিয়া বলে।

(ক্রমশঃ)

* সোমেশ্বরী—গারোপাহাড় জেলায় এই নদীর তীরদেশ খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় জেলায় "হরিণদী" পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত চূণা পাথরের খনি আছে।

* পলাশবাড়ী—এখানে মাড়োয়ারী সওদাগরেরা পার্ব্বত্য লোকদিগের নিকট হইতে কার্পাস, লাক্ষা, সরিষা ধান্য, চাউল, রেশম, পাট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান করিয়া থাকে।
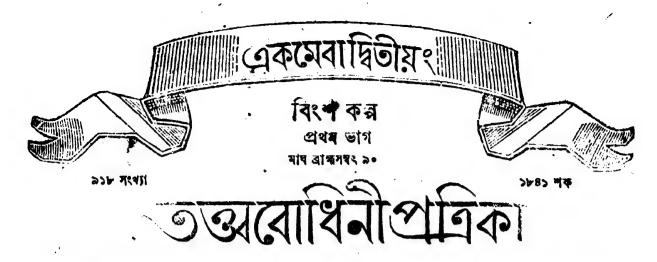
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মামেকং শরণং ব্রজ।

নবযুগ যে নেমে এসেছে আর পুরাতন যুগ যে চলে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের ঋষিরা বলে গেছেন যে মহাসমর মহামারী প্রভৃতি কোন-না-কোন সূত্রে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের বিনাশই যুগপরিবর্ত্তনের সূচনা করে দেয়। বাস্তবিক, ওরকম লক্ষ লক্ষ লোক যে কোন দেশে মরবে, সেই দেশেই তো ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন না হয়ে যেতে পারে না। ভাবেরই পরিবর্ত্তনে যুগেরও পরিবর্ত্তন হয়। এবারে একা মহাসমর নয়, একা মহামারী নয়, আর একা করালমূর্ত্তি মহাদুর্ভিক্ষ নয়, কিন্তু এই তিনটী মিলেজুলে কেবল এদেশে নয়, কেবল ইউরোপে নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোটী কোটী লোকের ধ্বংস সাধন করেছে। এতেও যদি মানুষের ভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, প্রাচীন যুগ চলে গিয়ে নবযুগের আবির্ভাব না হয়, তবে আর হবে কিসে? সমস্ত পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে যখন দুঃখশোকের হাহাকার জেগে উঠল, অশান্তি যখন পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেল্ল, তখনই জগৎবাসীর প্রাণের ভিতরে অনুসন্ধান জেগে উঠল যে কি উপায়ে সেই অশান্তির প্রতিবিধান করা যায়, কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করলে জগতে এ রকম সর্ব্বব্যাপী দুঃখশোক না আসতে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। এই অনুসন্ধান থেকেই নবযুগের উৎপত্তির সূত্রপাত হোল। লোকেরা বুঝতে পারল, দেখতে পেল যে, প্রাচীন যুগের কুসংস্কার, ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অধর্ম্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হোতে হোতে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছিল, মানুষের বাসস্থানের অনুপযুক্ত করে তুলেছিল। তারা বুঝতে পারল যে, কুসংস্কার সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সত্যকার সরল সবল ধর্ম্মকে না ধরলে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর না করলে এই দুঃখশোকের মূল দূর হবে না, অশান্তির শান্তি হবে না। এই ভাবের উপরেই নবযুগের আবির্ভাব হোল। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য ভারতভূমিতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অস্ত্রের ঝনঝনার ভিতর থেকে যে সত্যবাণী জাগ্রত হয়ে ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়ে দিয়েছিল, আজ হাজার হাজার বৎসর পরে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর এক মহাসমরে মহা আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে সেই সত্যবাণী জাগ্রত হয়ে নবযুগের শান্তিবার্ত্তার সূচনা করে দিয়েছে। সেই সত্যবাণী হচ্ছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। নবযুগের ভাবসাগরের মন্থনে যে সমস্ত সত্যবাণী উঠেছে, সে সমুদয়ের কেন্দ্র হচ্ছে ঐ এক কথা—ভগবানে নির্ভর কর—একান্ত নির্ভর কর, মানুষের উপর ষোল আনা নির্ভর কোরো না।

এবারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নবযুগের উৎপত্তি হোলেও আমাদের দেশেও তার আঘাত বেশ অনুভব করা গেছে—এখানেও আমরা সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ এই সত্যবাণীই ভাল করেই শুনতে পেয়েছি। এই বাণী যদি গ্রহণ করি, আত্মস্থ করতে পারি, তবেই রক্ষা পেলুম; আর যদি এই বাণী পরিত্যাগ করি, তবেই প্রাচীন যুগের বিনাশের ঘূর্ণীতে আপনাকে বলিদান দিতে হবে। প্রাচীন যুগের মূল কথা হচ্ছে মানুষের উপর অতিরিক্ত নির্ভর। রাজনীতি বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, সকল বিষয়েই প্রাচীনযুগের লোকেরা মানুষের কথার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করত। নিজের বিবেক কি বলে, বুদ্ধি কিসের সঙ্গে সায় দেয়, সে সমস্ত ভাববার বড় একটা লোকদের অবসরও ছিল না, আর বড় একটা প্রবৃত্তিও ছিল না। তার ফলে লোকেরা বড়ই পরবশ হয়ে উঠেছিল। এই পরবশ্যতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিজেরই অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। এই অতিরিক্ত পরবশ্যতা যখন রাজনীতিকে স্পর্শ করল, তখনই মহাসংগ্রাম সম্ভব হোল। জর্ম্মনিতে রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরবশ্যতার চর্চ্চা হয়েছিল। তাই সেখানে লোকদের মন এমনি অবশ হয়ে গিয়েছিল যে তারা ন্যায় অন্যায় ভাববার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। সম্রাট বল্লেন যে যুদ্ধ করতে হবে, আর অমনি লোকেরা অন্ধ মেষপালের মতো সেই আদেশ শিরোধার্য্য করে মহাসমরের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিছুমাত্র দ্বিধা করল না—ভেবে দেখল না যে ন্যায় বা অন্যায় কোনটাকে বজায় রাখবার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছে। তার পর যেই নবযুগের অরুণালোকে উদ্ভাসিতচিত্ত হয়ে লোকেরা বুঝল যে একটী লোকের আদেশে অন্যায়কে বজায় রাখবার জন্য লড়াই করছিল, অমনি যেন জাদুকরের প্রভাবে অত বড় লড়াইটা হঠাৎ থেমে গেল। তখনই ন্যায়ধর্ম্মের প্রসারের পথ আপনাপনি চারিদিকে উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ দেশেও রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরবশ্যতা যখন দেশকে অধোগতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি ভগবান এই দরিদ্র ভারতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শাসনসংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। যে শাসনসংস্কার যে পরিমাণে আমাদিগকে আত্মনির্ভর আর সেই সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভর শিক্ষা দেবে, সেই শাসনসংস্কারকে সেই পরিমাণে আমরা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করব।

প্রাচীন যুগে সমাজের মধ্যেও এই অতিরিক্ত পরবশ্যতা প্রবেশ করে স্বদেশ বিদেশ সকল দেশেরই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছিল। ইহারই ফলে পাশ্চাত্যভূখণ্ডে শ্রেণীভেদ প্রভৃতির নামে নানাবিধ কুপ্রথা স্থায়িত্ব লাভের জোগাড় করছিল, আর সমাজশক্তি শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম করছিল। কিন্তু ভগবান পাশ্চাত্যদের শরীরে মনে বল দিয়েছেন, তাই তারা সেই ধ্বংসের মুখ থেকে আত্মরক্ষা করে নবযুগের নূতন আলোকে সমাজকে নূতনভাবে গড়বার চেষ্টা করছে। এই পরবশ্যতার ফলেই এদেশেও বজ্রের আঁটন ফস্কাগিরো-গোছের জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথাসমূহের অতিমাত্র বাঁধাবাঁধি সমাজকে যে কি রকম দ্রুতগতিতে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে, তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্র একটু ধীরভাবে আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। যে কোন প্রথাই বল না কেন, তার বাঁধাবাঁধির একটা সীমা চাই। সেই প্রথা যেটুকু ন্যায্য, যেটুকু দরকারী, সেইটুকুই রাখা উচিত; তার অতিরিক্ত রাখতে গেলেই সমাজশক্তিকে বিপন্ন করা হয়। মানুষের চোখের দিকে না দেখে ভগবানের মঙ্গলদৃষ্টির উপর নিজেদের দৃষ্টি রেখে যে প্রথার যতটুকু ভাল তাই রাখবার চেষ্টা করলে তবেই আমাদের মঙ্গল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখেও যদি আমরা চক্ষু বুজে থাকি, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করতে না পারি, তবে আজ হোক আর কিছু বিলম্বে হোক, আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।

ধর্ম্মের মধ্যেও পরবশ্যতা অতিরিক্ত মাত্রায় ঢুকে আসল ধর্ম্মকে ঢেকে ফেলেছিল। তারই ফলে মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ, পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়ি, ধর্ম্মের আড়ম্বর প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ঢুকে মনুষ্যত্বকে একেবারে শুকিয়ে দিয়েছিল। ধর্ম্মের আসন স্বার্থ অধিকার করে বসেছিল। অর্থ মান সম্পদ প্রভৃতি লাভের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছিল। অর্থ প্রভৃতি লাভের অনুকূলে যে রাজ-

নীতি যে সমাজনীতি মন্ত্র প্রচার করতে লাগল, সেই রাজনীতি সেই সমাজনীতি ধর্ম্ম থেকে শতক্রোশ দূরে থাকলেও ধর্ম্ম বলে গৃহীত হতে লাগল। ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড থেকে সরে যেতে লাগলেন। তারই ফলে পাশ্চাত্যদের সর্ব্বাঙ্গীন পতন হোতে লাগল। এক সময়ে যেমন প্রাচ্য-ভূখণ্ড অনেক কাজ করে নিয়েছে, অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, সেই রকম এখন পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের অনেক কাজ বাকী আছে, অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে বাকী আছে, তাই ভগবান পাশ্চাত্যভূখণ্ডকে বাঁচাবার জন্য পতনের শেষস্তরে পৌঁছতে না পৌঁছতে রুদ্রমূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে অধর্ম্মের পরাভব সাধন করে ধর্ম্মের দীপ্তদীপ জগতের সামনে আবার ধারণ করলেন। পাশ্চাত্যদের চিন্তাস্রোত এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, যে দর্শন শাস্ত্রের জন্ম প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে দেখাবার জন্য, সেই দর্শনশাস্ত্রও সত্য-ধর্ম্মকে ছেড়ে দিয়ে নানা উপায়ে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। নবযুগের বিমল সত্যভাবের কাছে কি এই সমস্ত মিথ্যাভাব দাঁড়াতে পারে? সংগ্রামের আঘাত যেই অসহ্য হয়ে উঠল, অমনি নবযুগের বিমল বায়ু জনসমাজে প্রবেশ করল; সকলেরই প্রাণ থেকে একই কথা উঠতে লাগল যে, 'আমরা এ সমস্ত মিথ্যা ধর্ম্ম চাই নে—এ সমস্ত আমাদের প্রাণে শান্তি দিতে পারছে না; আমরা চাই সরল ও সবল ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম আমাদের সরল পথে ভগবানের আসনতলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে'। সকলেই ভগবানকে একমাত্র সহায় বলে জানতে পারল। অতি পুরাকালে যেমন প্রাচীন ও নবীন যুগের আঘাত-সংঘর্ষণে এদেশে সকল সত্যের সার গায়ত্রীমন্ত্র উত্থিত হয়েছিল, তেমনি আজ পাশ্চাত্যদেশে দুই যুগের সংঘর্ষণে এই বাণীই উঠল—"সকল ধর্ম্ম ছেড়ে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।"

এই মহাবাণী যখন এবারে পাশ্চাত্যভূখণ্ড গ্রহণ করেছে, তখন এ নিশ্চিত যে পাশ্চাত্যদেশ নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে। গীতাতে আমরা এই আশ্বাসবাণীই পাচ্ছি। গীতা বলছেন—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, তাহলে আমিই সেই শরণাগতকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এ আশ্বাসবাণী মিথ্যা নয়—খুবই সত্য।

পাশ্চাত্যদেশের মতো আমাদের দেশকেও ধর্ম্ম-বিষয়ে পরবশ্যতা একরকম গ্রাস করে রেখেছে। যে মহাবাণী আজ পাশ্চাত্যদেশের বলবিধান করতে উদ্যত, সেই মহাবাণী তো আমাদেরই দেশে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। তবে আমরা আজ ধর্ম্ম বিষয়ে এত দীনহীন হয়ে পড়েছি কেন? কারণ এই যে, আমরা সেই মহাবাণীর বিপরীত আচরণই করছি বল্লেও চলে। মহাবাণী বলছে সকল ধর্ম্ম ছেড়ে ভগবানের আশ্রয় লও, আর আমরা ভগবানকে ছেড়ে অন্য সকল ধর্ম্মকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে চাই। ধর্ম্ম—প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম তো একই, তবে "সকল ধর্ম্ম" ছাড়বার কথা বলার তাৎপর্য্য কি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যে সকল ধর্ম্মপ্রতিরূপ বা ধর্ম্মের ছায়াকে ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করি তাদেরই উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম ছাড়বার কথা বলা হয়েছে। সত্য ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রতিরূপকে ধরে আছি বলেই আমাদের মধ্যে গুরুবাদ, পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়ি প্রভৃতি এসে দেশটাকে একেবারে নির্জ্জীব করে ফেলেছে। উপযুক্ত লোককে গুরু করা মন্দ অথবা গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের জন্য পুরোহিত লওয়া মন্দ সে কথা বলি না। কিন্তু যখন গুরুকে ভগবানের আসনে স্থান দেওয়া হয় অথবা পুরোহিতকে ছেড়ে কোনই ধর্ম্মকার্য্য হতে পারবে না বলে মনে করি, তখনই আমরা আসলে ধর্ম্মরাজ্যে সহস্রপদ নীচে নেমে গেলুম। তখনই আমাদের প্রাণের উপর অসাড়তার একটা আবরণ এসে পড়ল। আমাদের দেশের অবস্থা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেখাতে পারলেন, অমনি তাঁকে ভগবানবোধে পূজা করতে লাগলুম। ভাবলুম না যে জগতে আমার কাছে অতিপ্রাকৃত বোধ হলেও সমস্তই প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত বলে আসলে কিছুই নেই। দেশব্যাপী যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে যে কার গুরু ভগবান স্বয়ং। তার প্রমাণের জন্য দেখাতে হবে যে কে কতটা অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জাদুগিরি দেখাতে পারেন। সেই রকম প্রতি পা ফেলব আর তার জন্য পুরো-

হিতকে ডাকব, এই রকম পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়িটাও প্রকৃত ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হবার পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে আত্মনির্ভরের শক্তি একেবারে চলে যায়। তার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের আত্মা শক্তিচালনার অভাবে ক্রমে হীনতেজ হয়ে যায়।

নবযুগের সুবিমল বাতাসের হিল্লোল আজ আমাদেরও স্পর্শ করেছে। আমাদের উচিত প্রাচীন যুগের অতিরিক্ত পরবশ্যতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মনির্ভর এবং সেই সঙ্গে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করতে শিখি। আমাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণতন্ত্রের দেশে দাঁড়িয়ে, কবীর নামক চৈতন্যদেব রামপ্রসাদের দেশে দাঁড়িয়ে আজ বলতে হচ্ছে যে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর আমাদের নূতন করে শিখতে হবে। মায়ের কোলে ছেলে দরকার হোলেই ছুটে যাবে, ছেলের যখন যা দরকার মায়ের কাছে চা'বে, ছেলের যাতে ভাল হবে মা তাই দেবেন, এ সব কথা আবার শিখতে হবে কি? কিন্তু উপায় নেই। আমাদের মনপ্রাণ জগন্মাতা থেকে এত দূরে সরে গেছে যে, তাঁর দিকে মনপ্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য যত্ন চেষ্টা করতে হবে, সাধনা করতে হবে। এই পৃথিবীতেই দেখি, পিতা পুত্রে, মায়েছেলেতে, স্বামী-স্ত্রীতে কতনা পরস্পর নির্ভর করে; আর যিনি জগতের পিতামাতা, যিনি আমাদের প্রত্যেকের সখা, তাঁর উপর নির্ভর না করে যাব কোথায়? তাঁর উপর নির্ভর করে চলতে পারলেই আমরা নির্ভয় হতে পারব।

সমগ্র ভারতভূমিতে আবার সেই মহাবাণী জাগিয়ে তুলতে হবে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। এই মহাবাণী আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্যসত্য জাগিয়ে তুলতে পারলেই আমরা কেবল নির্ভয় হব না, আমরা সকল কার্য্যেই সফলকাম হব। গীতা ভগবানের এই আশ্বাসবাণী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ভগবানের উপর যাঁরা একান্ত নির্ভরশীল হন, ভগবান তাঁদের সংসারভার নিজেই বহন করেন—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। সংসারের কার্য্যে সফলকাম হব বলে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বলিনে, আর সেভাবে নির্ভর করতে গেলেও নির্ভর করতে পারব না; কিন্তু তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁরই প্রিয়কার্য্য বলে সংসারের সকল কর্ম্ম করতে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হব—কারণ তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যখন আমার ইচ্ছার যোগ হোল, তখন সে ইচ্ছার অপ্রতিহত বেগ কে প্রতিরুদ্ধ করতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত; ধর্ম্মের যা কিছু ছায়া, ধর্ম্মের যা কিছু প্রতিরূপ, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র তাঁরই পায়ের তলে পড়ে থাকা উচিত, তাঁরই কথা শুনে তাঁরই দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে আমাদের চলা উচিত, তবেই আমরা নিজেরাও উন্নতির শিখরদেশে উঠতে পারব, বেদ-উপনিষদের ঋষিদের স্বদেশবাসী বলে গৌরব করতে পারব, আর ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করে তুলতে পারব। এখন তো আমরা কেবল নামেমাত্র ব্রাহ্ম হয়ে আছি, আর সেই কারণে অন্যান্য যে সকল সমাজ সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের কাছে আজ আমরা অবনতমস্তক হয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছি। "ব্রাহ্ম" শব্দে মাত্র বিশেষ কোন মহিমা নেই—ব্রাহ্মের উপযুক্ত কার্য্যে ও ব্যবহারে আছে। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণগোস্বামী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন আচার্য্য ও প্রচারকগণ ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরের বলে, স্বার্থের দিকে দৃষ্টিকে অন্ধ করে কার্য্যে ব্রতী হবার ফলে প্রচারকার্য্যে সফলকাম হয়েছিলেন আর ব্রাহ্মসমাজকে বড় করে তুলতে পেরেছিলেন। আমাদের সে নির্ভর কোথায়? আমরা প্রতি পদক্ষেপ করব, আর ভাবব যে এতে আমার কতটা স্বার্থহানি হবে অথবা এতে আমার কতটা মানমর্য্যাদা বা সমৃদ্ধি বাড়বে। আমি বক্তৃতা দেব,—ভগবানের নাম কে কতটা গ্রহণ করলেন সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য করব না—আমার লক্ষ্য থাকবে, আমার বক্তৃতা কে কতটা ভাল বলেন, তাই শোনবার দিকে।

আসল কথা এই যে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হলে, তাঁর নামে

সর্ব্বত্যাগী হতে প্রস্তুত, না হলে আমরা কোন কার্য্যেই সফলকাম হতে পারব না, ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করা তো দূরের কথা। আর তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে কোনই বাধা নেই। কোন্ মায়ের ছেলে নিজের মায়ের ভালবাসার অন্ত পেয়েছে? তখন, যে জগন্মাতা নিত্যকাল সমানরূপে অবস্থিতি করছেন, যাঁর অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় জগতের ইতিহাসের প্রতি অক্ষরে পাচ্ছি, যাঁর জ্ঞানের কণামাত্র পেয়ে পণ্ডিতেরা নিত্য নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন, যাঁর প্রেমের কণামাত্র পেয়ে মা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ছেলেকে রক্ষা করতে পশ্চাৎপদ হয় না, তাঁর উপর নির্ভর করে কাজ করব, এ বিষয়ে যে সংশয় আসে, সেইটাই আশ্চর্য্য। সংশয়ে ডুবে আপনাকে বিনাশের পথে নিয়ে যেও না। সেই প্রেমসাগর রসের ভাণ্ডারে আপনাকে ডুবিয়ে দাও—কোন ভয় থাকবে না। ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে কান পেতে শোন, সেই জগন্মাতার অভয়বাণী—মাভৈ রব—শুনে নাও, আর অভয় হয়ে যাও—তোমাদের জীবন ধন্য হোক—ধন্য হোক। বেশী কথা না বলে, সকল ধর্ম্ম ছেড়ে প্রাণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই ধরে রাখ, একমনে তাঁরই পূজা কর, তিনিই তোমাদের ভয় ভাবনা নিজে বহন করবেন। তোমাদের সকল পাপ তাপ থেকে মুক্ত করবেন। কোন চিন্তা কোরো না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ব্রহ্মচক্রে ঈশ্বরজ্ঞান।

(ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ।

বৃহদারণ্যক ৩৮৯

"হে গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে শ্বেতপর্ব্বত হইতে কতকগুলি নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, আর কতকগুলি পশ্চিমদিকে।"

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তৈত্তিরীয় ২।৮

"ইঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, পর্জ্জন্য ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।"

এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের দ্বারা সুব্যবস্থিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহারই নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পর্জ্জন্য ও মৃত্যু আপন আপন কাজ করিয়া বিশ্বচক্র চালাইতেছে। ইহাদের ব্যাপার একটু কম হইলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইবে। পৃথ্বী ও বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ অন্তর্বর্ত্তী আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, উহাদিগকে সূর্য্য নিজ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা টানিয়া রাখিতেছে, উহাদিগকে আপনা হইতে অতি দূরে যাইতে দেয় না, তাই উহারা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়। আকর্ষণ শক্তির বলাবল গোলকের বৃহত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য্য সমস্ত গ্রহ অপেক্ষা অনেক বড়, তাই তাহার বল উহাদের উপর প্রকটিত হইতেছে এবং উহাদিগকে আপন মার্গের উপর ঠিক্ রাখিতেছে। সেইরূপ আবার, যদি সূর্য্যের বল প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি সকল গ্রহই সিধা পথ ধরিয়াই চলিবে এবং উত্তরোত্তর দূরে দূরে চলিয়া গিয়া যেখানে সূর্য্য দেখা যায় না, এইরূপ কোন স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। এইরূপ প্রকারে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলে আমাদের ন্যায় প্রাণীদিগের কি গতি হইবে! সূর্য্য হইতে যে তেজ ও উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হয়, তাহারই যোগে সমস্ত প্রাণী সজীব থাকিয়া আপন আপন কার্য্য

করে; ঐ তেজ প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের সমেত সমস্ত বিশ্ব তমোময় হইয়া যাইবে, ঐ উত্তাপ না পাইলে সমস্ত পৃথিবী বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হইবে, সমুদ্র জমিয়া গিয়া পাথরের মতো কঠিন হইবে; তার পর আমাদের মতো প্রাণী থাকিবে কি করিয়া? সমস্ত চেতন পদার্থ নষ্ট হইয়া, সমস্ত বনস্পতি বিলুপ্ত হইয়া, এই পৃথিবী কেবল পাষাণময় হইবে। পক্ষান্তরে সূর্য্যকে যথোপযুক্ত বৃহত্ত্ব দিয়া, তাহার ভিতর আকর্ষণ শক্তি স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা পৃথিবীকে আপন মার্গে সূর্য্যেরই নিকটে রাখিয়া, পরমেশ্বর প্রাণীদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং সমস্ত জীবের ব্যাপার যথোপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলেও এতটা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন যে, ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীতেও ঐ অগ্নির প্রখরতা অনুভূত হইতেছে। এবং সূর্য্য-কিরণ-গত অগ্নিযোগে বৃষ্টি পড়িতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং অন্য অনেক কাজ হইতেছে। এই প্রকারে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নিকট করিয়া দিয়া পরমেশ্বর সমস্ত ভূতকে নিয়মে রাখিতেছেন। পরমেশ্বর-যোজিত এই সকল নিয়ম অবাধ দেখিয়া, এবং সমস্ত জগৎ অচেতনের মতো চলিতেছে ও তাহার অন্তর্গত নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ মনে করিয়া প্রমাণসিদ্ধ পদার্থজ্ঞানবেত্তারা চেতনস্বরূপ যে পরমেশ্বর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের দিকে লক্ষ্য করেন না; কিন্তু তাঁহাদের এই অভিপ্রায় নির্ম্মূল। কারণ, জগতের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকাশ করাই তাঁহাদের কাজ; কিন্তু এই নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ, কিংবা পরমেশ্বরের দ্বারা স্থাপিত, তাহার নির্ণয় করা তাঁহাদের কাজ নহে। এইরূপ নির্ণয় করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আসে না। ঐ নির্ণয়, আমাদের অন্তর্যামী যে আত্মা এবং আত্মায় অবস্থিত যে স্বাভাবিক বুদ্ধি, তাহা দ্বারাই হইয়া থাকে এবং ঐ নির্ণয় ইহাই যে,—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কর্ণাটের পূর্ব্ববর্ণিত রাজবংশাবলীর রাজত্বকালীন তদ্দেশীয় ধর্ম্মমতের কথা উল্লেখ করিব।

পুরাকালে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। এজন্য ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই দেশের, রাজ্যের এবং সমাজের নেতা হইতেন। তাঁহারাই রাজ্য স্থাপন এবং তাহার ধ্বংস সাধন করিতেন। তাঁহাদের দ্বারাই সমাজ গঠিত এবং সংবর্দ্ধিত হইত। তাঁহারাই কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির গুরু ছিলেন। এই জন্যই রাজন্যবর্গ তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না।

রামায়ণ মহাভারতের সময় যেমন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল, হিন্দুর শেষ রাজন্যবর্গের সময়ও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশেও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল তাহা নহে। রোমের ক্যাথলিক পুরোহিত পোপের ক্ষমতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক সময় জার্ম্মনির সম্রাট চতুর্থ হেনরী কোন কারণে পোপ হিলডেব্রাণ্ডের (Pope Hildebrand) অপ্রিয়ভাজন হন। তিনি রোমনগরে আসিয়া পোপের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু পোপ হিলডেব্রাণ্ড তাঁহাকে নগ্ন পদে তুষারময় স্থানে তিন দিবস দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তবে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হন। এমন কি তৎকালে জার্ম্মণীর সম্রাটনির্ব্বাচনের ক্ষমতাও সাত জন ধর্ম্মযাজকের উপর অর্পিত ছিল।

কর্ণাটের রাজবংশাবলীর বিষয়ও আলোচনা করিলে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরশর্ম্মা ক্ষত্রিয়রাজ পল্লব কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কদম্বা বংশ স্থাপন করেন। গঙ্গাবংশ সিংহানন্দী নামক একজন জৈনগুরু

কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বিজয়কীর্ত্তি রাজা অবনিলের গুরু ছিলেন এবং জৈন লেখক শব্দাবতার-সম্পাদক পূজ্যপাদ, রাজা দুর্ব্বিনীতের গুরু ছিলেন।

চালুক্যবংশ বিষ্ণুগোপ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। জয়সিংহ বিজয়াদিত্য নামক একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কর্ণাটের সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া এ-দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি রাজা পহ্লবের সহিত যুদ্ধে হত হন। তাঁহার গর্ভবতী বিধবা-স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুগোপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়। বিষ্ণুগোপ এই সন্তানটিকে রাজসিংহ নাম দিয়া নানা শাস্ত্র বিশেষতঃ যুদ্ধনীতি শিক্ষা দেন। রাজসিংহ পরে চালুক্য-বংশ স্থাপন করেন। বোধ হয় উপরি উক্ত কারণেই তিনি বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইতেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি নৃপতুঙ্গ, তাঁহার জৈন গুরু জিনসেনের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেন। এই জিনসেন আদিপুরাণ নামক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। হোয়সালা রাজ্য সুদত্ত নামক ধর্ম্মযাজকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামানুজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রদাতা ছিলেন। এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্যের মঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া হক্কা এবং বক্কা নামক ভাতৃদ্বয়কে বিজয়নগর-সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সকল হিন্দুরাজগণের সময়ে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ রাজার রাজত্বকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলা সুকঠিন। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দেশীয় হিন্দুরাজগণ প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিকে অতি উদারচক্ষে দেখিতেন। জৈন, শৈব, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে একসঙ্গে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কদম্বা বংশের প্রথম নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু উক্ত বংশের স্থাপনকর্ত্তা ময়ূর শর্ম্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কদম্বা রাজকোষের অর্থে ময়ূর শর্ম্মা বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লালগুণ্ডীর ব্রাহ্মণগণ ময়ূরশর্ম্মার নিকট হইতে অষ্টাদশ অশ্বমেধ যজ্ঞের দানস্বরূপ ১৪০টি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের কৃষ্ণশর্ম্মা ৫ম শতাব্দীতে স্বয়ং অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কদম্বারাজের রাজত্বকালে বনবাসী-নিবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক কর্ণের প্রসিদ্ধ চৈত্রালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মাধব ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিতেন এবং চতুর্বর্ণকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু এই বংশীয় রাজগণ জৈন ছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নৃপতিগণ, কুলাচার্য্যগণ এবং হোয়সালা-বংশীয় প্রথম নৃপতিগণও জৈন ছিলেন। কিন্তু কাহারও সময় প্রজাগণের ধর্ম্মস্বাধীনতার বিপর্য্যয় ঘটে নাই।

চালুক্যগণ কন্যায়ন গোত্রভুক্ত ছিলেন। রাজা পুলকেশী (প্রথম) অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছিল এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছিল। চালুক্যদিগের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য বালসূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ চারিদিকে দীপ্তি প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সময়েই পুরাণসকল লিখিত হয়। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে একেবারে নিষ্কাসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে তদনুরূপ হয় নাই। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা জৈনধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে যখন রাজা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জৈন গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণবেলগুলা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন সেই সময় হইতেই এদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার আরম্ভ হয়। যাহা হউক চালুক্যগণ বিষ্ণুর উপাসকসত্বেও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শক ছিলেন। তাঁহারা অনেক জৈনমন্দিরের জন্য দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আইথলীর শিলালিপির জৈন লেখক রালুকীর্ত্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েকটি ভগ্ন জৈনমন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার বিজয় পণ্ডিতকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই বংশীয় নৃপতি মঙ্গরীশ কর্ত্তৃক বাদামির বিষ্ণুগুহামন্দির খোদিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা গোবিন্দের পুত্র

করক বৈদিকধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়ের ব্রাহ্মণগণ অনেক যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণ শৈব ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বিরূয়ের প্রসিদ্ধ শিব মন্দির নির্ম্মিত হয়। অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গ জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈনসেন তাঁহার গুরু ছিলেন। ইহাঁর সময়েই গঙ্গাভদ্র কর্ত্তৃক জৈন-পুরাণ রচিত হয়। তথাপি এই সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য খচিত শিব এবং বিষ্ণু-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা নৃপতুঙ্গের সময় করদরাজ প্রীতিবর্ম্মা সম্বদত্তি নামক স্থানে একটি জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মলগুন্দ নগরে চিত্ররায় নামক জনৈক বৈশ্য কর্ত্তৃক একটি জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজা চতুর্থ গোবিন্দ অনেক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

পশ্চিম চালুক্যবংশের রাজত্বকালে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নবযুগের অধিষ্ঠান হয়। এই বংশের আদি রাজাগণ পূর্ব্ব চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট-দিগের ন্যায় সকল ধর্ম্মকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। আমরা দেখিতে পাই খৃঃ ৯৭০ সালের শিলালিপিতে বিষ্ণু এবং জৈন দেবতা উভয়েরই সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। এইবংশীয় রাজা চালুক্য বিক্রম বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তিনি একটী বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী খনন করাইয়া-ছিলেন।

কুলাচার্য্য রাজা বিজ্জলাল জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী বাসবা-লিঙ্গায়ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই বংশীয় ত্রিভুবন-কীর্ত্তি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ১৬ জন বৈশ্য মিলিত হইয়া ধর্ম্মবরাল বা ডোম্বল নামক স্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করে এবং উক্ত মন্দির ও লোকুন্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য ভূমি দান করে। যদিও কুলাচার্য্যরাজত্বের শেষ ভাগে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি তৎপূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত ইহাঁদের সময় ধর্ম্মের উদারতা রক্ষিত হই-য়াছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

বিজয়নগরের রাজগণ সকল ধর্ম্মা-বলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই বংশের আদি পুরুষ বক্কারায় ইহার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা কৃষ্ণরায় এরূপ অপক্ষপাতে অপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার করিতেন যে এমন কি তাঁহার ঘোর শত্রু মুসলমানদিগকেও তিনি স্বীয় রাজধানীতে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে দিয়া-ছিলেন।

কর্ণাটের নৃপতিগণের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সমদৃষ্টি ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

বাদামির শিলালিপি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে বাতাবী নগরে এককালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে হরিহর, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে।

বাদামীর সন্নিকট বেলুর নামক স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি আছে।

সোমেশ্বরের রাজত্বকালীন (খৃঃ ৯৭০) মহা-মণ্ডলেশ্বর বনবাসীনিবাসী চাবুন্দ রায়ের এক শিলালিপিতে জৈন দেবতা জিন এবং হিন্দুদেবতা বিষ্ণু উভয়ের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহার শেষ ভাগে লিখিত আছে যে নৃপতি নাগবর্ম্ম জিন, বিষ্ণু এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১০৩২ শকে কোলাপুর রাজ্যে শিলাহার রাজা কর্ত্তৃক একটি পুষ্করিণী খোদিত হয়। তিনি এই পুষ্করিণীর ধারে বুদ্ধ, শিব এবং অর্ক দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গের কবিরাজমার্গ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোকে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অলঙ্কারশাস্ত্র মতে কাব্যে "সময়বিরুদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই উপলক্ষে রাজা নৃপতুঙ্গ উক্ত শ্লোকে "সময়" শব্দের অর্থ কপিল, সুগবর্ণ, কণাদ এবং চার্ব্বাক সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াছেন। কবিগণ যাহাতে সাময়িক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু না লিখেন সেই উদ্দেশেই তিনি উক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে সাংখ্য, বুদ্ধ, বৈশেষিক বৌদ্ধ সম্বন্ধে লিখিবার সময় তত্তৎ মতবিরুদ্ধ কোন

শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে লেখক এই নিয়ম অতিক্রম করেন তিনি "সময়বিরুদ্ধ" দোষে দূষিত হন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, এমন কি ঘোর নাস্তিকবাদী লোকায়তিক এবং চার্ব্বিকগণের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে রাজা নৃপতুঙ্গ কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

হরিহরের মন্দিরও ধর্ম্মে উদারতার একটি উদাহরণ। এই মন্দির বিজয়নগররাজ কর্তৃক ১২২৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হরিহর মূর্ত্তি বৈদিক শিববিষ্ণুর একীভাবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেলুরের শিলালিপিতে লিখিত আছে—
যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবমিতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনমিতি কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীকেশবঃ সদা॥

৭। জৈন ও লিঙ্গায়ত এবং জৈন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু রাজন্যবর্গ সাধারণতঃ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতেন। পশ্চিম চালুক্য বংশের শেষ সময়ে নৃপতিগণ সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে যে অধিকতর সমদৃষ্টিতে দেখিতেন তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃঃ ১৩৬৪ সালে বৈষ্ণবদিগের অত্যাচারে অতিপীড়িত হইয়া জৈনগণ সমবেত হইয়া রাজা বক্কুরায়ের নিকট আবেদন করে। রাজা বক্কু রায় উভয়পক্ষের নেতাগণকে আহ্বান করিয়া সেই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন এবং উভয় পক্ষকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মস্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি জৈন দলপতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দলপতির হস্তে রক্ষিত করিয়া বলেন "আজ হইতে তোমরা পরস্পরকে বন্ধুভাবে দেখিবে। আমি তোমাদিগের উভয়কেই আপনাপন ধর্ম্মানুরূপ ক্রিয়ায় স্বাধীনতা প্রদান করিলাম। আমি উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দেখিব এবং রক্ষা করিব।" পরে এই আদেশবাণী সমস্ত বস্তিগুলিতে প্রচার করিয়াছিলেন। এবং নিয়ম করিয়া দেন যে জৈনগণ চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সেই অর্থ দ্বারা ২০জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া জৈন মন্দির সকল রক্ষা করিবেন। অপরন্তু ব্রাহ্মণগণ যে সকল জৈন মন্দির নষ্ট হইয়াছিল নিজেদের অর্থে সে গুলির সংস্কার করিবেন।

আসামের নদ-নদী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

(শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ দুইটী প্রাচীন জনপদ।

প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা "উত্তরকূল ও দক্ষিণকূল" এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আকবর সাহের সময়ে এই দুই জনপদ "সরকার"রূপে পরিগণিত হইয়া রাজস্ব সংগৃহীত হইত। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ "উত্তরকূল" ও দক্ষিণাংশ "দক্ষিণকূল" নামে তৎকালেও অভিহিত হইত। গৌহাটী হইতে আরম্ভ করিয়া মিরি, মিসমি জাতিদিগের আবাসভূমি পর্য্যন্ত উত্তরকূলের সীমা ছিল; আর দক্ষিণকূলের সীমা ছিল নদীয়া হইতে শ্রীনগরের পাহাড় পর্য্যন্ত। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য—যিনি ৭১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন তিনি—এই উত্তরকূল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন (Calcutta review 1867, P. 521)। "অহম বুরঞ্জী"তে * তিনি কাশ্মীররাজ "ললিতাদিত্য" নামের পরিবর্ত্তে "পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয় জীতারি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

মাজুলী দ্বীপ।

ব্রহ্মপুত্র নদমধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। চলিত কথায় আমরা যাহাকে "চর" বলি আসামীরা তাহাকে "চৎ" বলে। এই নদ দ্বারা গঠিত "মাজুলী" নামে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ "চৎ"টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাজুলী দ্বীপ শিবসাগর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। এই দ্বীপের অন্তর্গত "রত্নপুর" নামক স্থানে জীতারিবংশীয় "ধর্ম্মপাল" নামক জনৈক সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগত ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের

* বুরঞ্জী=বু-প্রাচীন, রঞ্জ-বর্ণনা; অর্থাৎ প্রাচীন বিষয়ের বর্ণনাত্মক পুস্তক।

আদম সুমারী বিবরণে দৃষ্ট হয় "এই দ্বীপের আয়তন ৪৮৫ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫০০০ জন। এই মাজুলী দ্বীপমধ্যে অসংখ্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত। এখানকার কোন কোন স্থান অরণ্যানীতে সমাকীর্ণ। মাজুলী দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বেত জন্মে। এই দ্বীপে আউনিয়াতি, দক্ষিণপাঠ, গরমুর, (১) কুরুয়াবাহী, কমলাবাড়ী প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান সত্র সংস্থাপিত।

ভস্মাচল।

এই দ্বীপটী গৌহাটীর নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৪০ বিঘা কথিত আছে। "হরকোপানলে" কামদেব এই-স্থানে ভস্মীভূত হওয়ায় ইহার নাম "ভস্মাচল" হইয়াছে। এখানে তিনটী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের মধ্যে দুইটী ভগ্নপ্রায়। আদি মন্দিরটী ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম উমানন্দ ভৈরব। ভস্মাচলে একটী গহবরের সম্মুখে নিম্নোল্লিখিত দ্বিচরণ হেঁয়ালী শ্লোক (২) দৃষ্ট হয়:—

"শিবাগমাং শিবাগম্যং শিবযোগ্যং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে॥ ১॥
দেবদেবীসুতসোঽহং শিবগৌরী সদাস্তু নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সাহুস্থিতিং প্রতি॥ ২॥

ব্রহ্মপুত্র অতি খরস্রোত নদ। সমুদ্র হইতে ৮০০ মাইল দূরে "ডিব্রুগড়" পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ কোনরূপে নৌদ্বারা অতিক্রম্য; তৎপরে স্বভাবতঃই দুরতিক্রম্য। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদের সঙ্গমস্থলে "সংগ্রামগড়" নামক স্থানে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে বাদশাহ ঔরাঙ্গজেব মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের রণপোতসমূহের প্রবেশপথ রোধ করিবার জন্য ঐ দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ নিম্ন ভূমিতে বহুসংখ্যক গণ্ডার বসবাস করে। কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল ব্রহ্মপুত্রনদের জরীপ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ Rennell's Memoir নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক De Barros ব্রহ্মপুত্রের নাম caos নদী রাখিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ বলিয়া আখ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে উল্লেখ আছে:—

অশোক অষ্টমী (৩) জন্য স্নানদানে মহাপুণ্য
প্রসঙ্গে প্রবল পাপ নাশ।
সংক্ষেপে সকল সার কহিতে শকতি কার
এই ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস॥ (৪)

কলঙ্গ।

ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলির মধ্যে "কলঙ্গ" সর্ব্বপ্রধান। এই শাখানদীটী পারাপারের জন্য যোগী, রাহা, নগাঁও, কুয়াড়িতাল, এই কয়েকটী স্থানে, খেয়াঘাট (Ferry ghat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যমুনা, দৈয়াং, বড়পাণি, উম্‌ইয়াম্ (umiam) কিলিং প্রভৃতি "কপিলি"র শাখানদীসমূহ কলঙ্গে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে কলিয়াবর, শ্যামাগুড়ি, পুরণিগুদম, রাহা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান অবস্থিত। জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে "কপিনল" এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে "দিগরু" নদী নির্গত হইয়া এই কলঙ্গ নদীতে পড়িয়াছে। খাসিয়ারা এই দিগরুকে "উমথ্রু" বলে।

জেলান্তর্গত উল্লেখযোগ্য নদী।

আসাম প্রদেশ ব্রহ্ম-উপত্যকা, সুরমাউপত্যকা, পার্ব্বতীয় বিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ আবার ১২টী জেলা লইয়া গঠিত। তাহাদের নাম যথা:—১। গোয়াল পাড়া, ২। কামরূপ, ৩। দরঙ্গ, ৪। শিবসাগর, ৫। লখিমপুর, ৬। নগাঁও, ৭। শ্রীহট্ট, ৮। কাছাড়, ৯। নাগাপাহাড়, ১০। খাসিয়া জয়ন্তীয়াপাহাড়, ১১। গারোপাহাড়, ১২। লুসাই পাহাড়।

গোয়ালপাড়া=চম্পাবতী, জিনঝিরাম, কৃষ্ণাই, দুধনাই, সোনাই, কালানদী, জিনারী, তিপ্‌কাই, বামনাই, হরিপানি, বা হরতবাটিয়া প্রভৃতি।

(১) গরমুর—এই ছত্রের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ জনৈক অহম রাজা ৪০০০০ একর নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট উহার পরিবর্ত্তে ৩৩১ একর নিষ্করসম্পত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় লোকদিগের উপর এখানকার গোঁসাইদিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব পরিচালন দৃষ্ট হয়।

(২) লেখক ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

(৩) চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র এবং বুধবার হয় তবে সেই অষ্টমীকে অশোকাষ্টমী বলে।

(৪) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, চতুর্দ্দশ সর্গ, ২৪৬ শ্লোক, পৃঃ ৪৭৯।

কামরূপ = ব্রহ্মপুত্র, (৫) অগ্রাণ, কুলশী (শ্রী), কালদিয়া, দিজমা, দিগরু (সোনাপুরী) চাউলখোয়া, টাঙ্গনমারী, ডোকাবন, জুলি, তকি, তেকেলজ, তুরঙ্গ, বাতা, বড়নদী, বলদী, মানস (Manas) পাগলমানস, সরুমানস, নদিহিং, মাতঙ্গ, লখাইতারা সজং, সিঙ্গারা, সিম্মু, প্রভৃতি।

দরঙ্গ = সিয়াধর্ণশিরী নোনাই, বিলাধারী, বড়নদী, ভৈরবী, ভোলা।

শিবসাগর = ব্রহ্মপুত্র, ককিলা, কাঞ্চ-দাঙ্গ, জাজী, বুড়ী দিহিং, দিখৌ, (৬) দিমৌ, দিসাই, দিছাং, দ্বারিকা, ধনশিরী প্রভৃতি।

লখিমপুর = ব্রহ্মপুত্র, কুণ্ডলপাণি, ডিব্রু, নদিহিং, টেঙ্গাপাণি, রঙ্গা, দিক্রং, দিজমুর, দিগরু, তিঙ্গরাই, বিহানীমুখ, ধোলহাড়ী, সুবর্ণশ্রী প্রভৃতি।

নগাঁও = কপিলি, কলঙ্গ, ধনশিরী, দিজু, দেওপাণি, বড় পাণি, ননাই, মিচা, যমুনা, সোনাই প্রভৃতি।

শ্রীহট্ট = করঙ্গী, বরাকর, বেজাপাণি, যদুকাটা বা কিনচিয়াং (Kynchiang), ধনশিরী, ধলেশ্বরী বা ভেড়া মোহনা, মন্থু, সিঙ্গল প্রভৃতি।

কাছাড় = ঝরি, টিপাই, বরাকর, ধন-শিরী প্রভৃতি।

নাগাপাহাড় = দৈয়াঙ্গ, ধনশিরী, যমুনা প্রভৃতি।

খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় = কপিলি, কুলশী, কুশিয়ারা, বড়পাণি, যদুকাটা প্রভৃতি।

গারোপাহাড় = সোমেশ্বরী প্রভৃতি।

লুসাইপাহাড় = ধলেশ্বরী (ট্লং), টুইভল সোনাই প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ।

কপিলি = জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ১৬৩ মাইল প্রবাহিত হইবার পর নগাঁও জেলার পশ্চিম প্রান্তে "যোগী" নামক স্থানের নিকট "কলঙ্গ" নামক ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখানদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দ্বারা নগাঁও জেলা হইতে কাছাড় জেলা পৃথক হইয়াছে। কাছাড়ের সীমানায় কপিলি নদীর তীরে একটী উষ্ণ প্রস্রবন আছে। কপিলি নদী অতিক্রম করিলেই খাসিয়া জয়ন্তীয়া জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এই নদীতে নৌকাদ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের বেশ সুবিধা আছে। ছাপারমুখ, যমুনামুখ, খাড়িখানা, এবং ধর্ম্মতুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগরসকল কপিলি নদীর তীরদেশে অবস্থিত।

কুলশী = শিলংয়ের কিঞ্চিৎ পশ্চিম প্রান্তস্থ খাসিয়া পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উপর "কুকুরমারী" নামক স্থানে একটী লৌহসেতু আছে। ট্রাংক রোড় তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

গদাধর = ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া গোয়ালপাড়াস্থ ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

জিনঝিরাম = গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত "উরুপদ" বিল হইতে নির্গত হইয়া ঐ জেলার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১২০ মাইল। ইহার তট-দেশে লক্ষ্মীপুর, দক্ষিণ শালমারা, সিংগীমারী প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠিত।

জাজী = মক্কচাং নামক স্থানের সন্নিকটে নাগা পাহাড় জেলায় উৎপন্ন হইয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া শিবসাগরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে.

দিশাই = নাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িতেছে। এই নদীর বামতীরে সুপ্র-সিদ্ধ "যোড়হাট" নগর অবস্থিত।

দিহিং = মদীয়া নগরী হইতে কিছু দূরে পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। এই নদী লখিমপুর জেলার পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দিহিং নদীর তীরদেশে অসভ্য "আবর" জাতিরা বসবাস করে।

দিখৌ = নাগা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া শিব-সাগর জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ দিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে

---

(৫) কামরূপ জেলায় ব্রহ্মপুত্রে তীরবর্ত্তী জলাভূমি বন, খাগড়া ও নানাবিধ ঘাসের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উহাতে গণ্ডার ও বন্যমহিষের বসবাস দৃষ্ট হয়।

(৬-৭) লেপ্টন্যান্ট উইলকক্স দিখৌ ও দিছাং (কেহ কেহ ইহাকে ডিসাংও বলে) নদীদ্বয়ের তীরদেশে সর্ব্ব-প্রথম কয়লার নমুনা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় খনি বিদ্যমান আছে বলিয়া ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট দেন। Admo R, of Assam 1874-75.

পতিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র ইহাকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে, "তীর্থশ্রেষ্ঠদিখুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে"। এই নদীর তীরে অহম রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী "গরগাঁও" নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ডিছাং = নাগা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে শিবসাগর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪০ মাইল। নামরূপে এই নদীর উপর আসাম বেঙ্গল রেলের একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ডিছাং নদীর তীরস্থ "বড়হাট" নামক স্থানে অন্যূন ২০টী লবণের উৎস দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নাগারা উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া অন্য জাতির সহিত বিনিময় ব্যবসায় চালাইত।

ডিবাং = হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া মিশমি পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সদীয়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বামতটে "বোম-জুড়" নগর প্রতিষ্ঠিত। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার্থ তথায় গভর্ণমেণ্টের একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাস আছে। ডিবাং নদীর তীরে শানজাতির শাখাসম্ভূত "খামতি"রা বসবাস করে।

বড়নদী = ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা নদী, ভূটানের পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই বড় নদীরও কতকগুলি শাখানদী আছে, তন্মধ্যে ননাই, নলদী, বেলশিরী, পাঁচনাই, ভৈরবী, বড়গাং, বুড়াই, এই কয়টী প্রধান।

বাটা = খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কামরূপের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বুড়িদিহিং = পাটকাই পর্ব্বত শ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৫০ মাইল। আসাম বেঙ্গল রেলের গমনাগমনের জন্য ইহার উপর দুই স্থানে দুইটী সেতু এবং জন-সাধারণের পারাপারের জন্য পাঁচ স্থানে পাঁচটী খেয়াঘাট (Ferry ghat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বুড়িদিহিং নদীর বাম পার্শ্বে পাটকাই পর্ব্বতের পাদদেশে সুপ্রসিদ্ধ "মার্ঘেরিটা" নগর প্রতিষ্ঠিত।

মানস = ভূটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া "চাউল খোয়া" নদীর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ "বিজনী" নগর অবস্থিত। মানসের দক্ষিণ দিক দিয়া মরু, পলনী, আই, পোমাযান, বানদুয়া এবং বামদিকে চাউলখোয়া প্রভৃতি শাখানদী প্রবাহিত হইয়াছে। মূল নদীটী দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল।

নদিহি = সিংফো পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে পশ্চিমদিকে ও তৎপরে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীটী ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে তেমন সুবিধা-জনক নহে।

টেঙ্গাপাণি = সিংফো পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে।

ধনশিরি (১) = বারাইল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ডিমাপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর পূর্ব্বদিকে "গোলাঘাট" নামক স্থানে আসিয়াছে। সেখান হইতে উহা পশ্চিম দিকে বাঁক লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৮০ মাইল। এই নদীর তীরস্থ "ডিমাপুর" নামক স্থানে কাছাড়ী দিগের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (A. B. Ry.) "বোকাখান" নামক স্থানে এই নদীটীকে অতিক্রম করিয়াছে।

ধনশিরি (২) = লাসার নিকটস্থ চৌয়াং নামক স্থান হইতে নির্গত হইয়া ওদালগুড়ির কিঞ্চিৎ উত্তর দিক দিয়া দরঙ্গ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে ইহা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবা-হিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে সমাকীর্ণ। ইহার দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সৌকর্য্য অথবা সন্নিহিত স্থানগুলিতে জল সেচনের কার্য্য হয় না।

শিল্লা = মিরিপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পড়িতেছে।

সিংগ্রা = খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কামরূপের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে।

সুবর্ণশ্রী = তিব্বতের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া "খেরকুটীয়াসুটা" নামক ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখানদীতে পড়িতেছে। অহম রাজগণের সময়ে

এই নদীর বালুকণা ধুইয়া সুবর্ণকণিকা (৮) বাহির করা হইত। ব্যবসায় বাণিজ্যার্থ এই নদীপথে নৌকাযোগে চা, রবার, শরিষা, আলু, চাউল, কাষ্ঠ, বেত্র প্রভৃতি দ্রব্য অন্যত্র আনীত হইয়া থাকে।

ভরলু=হিমালয়ের পাদদেশস্থ আকা, ডাফলা দিগের আবাসভূমি হইতে নির্গত হইয়া ডিক্রোই ও জুরাহোর নদীর সহিত মিলিত হইয়া দরঙ্গ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরদেশে কোন উল্লেখ যোগ্য নগর নাই।

ভোগদই=নাগাপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার বামতটে মরিয়ণি ষ্টেশন অবস্থিত।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠায় উদ্বোধন।

আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে এই যে, দেবমন্দিরে পূজা দিতে গেলে প্রথমেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে হয়। শুনেছি যে, এই ঘণ্টা বাজাবার উদ্দেশ্য এই যে, দেবতা ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠবেন এবং জানতে পারবেন যে অমুক লোক পূজা দিয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে হয় যে এই প্রথার ভিতর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত ভয়ভাবনা ফেলে দিয়ে দেবতার সঙ্গে প্রাণ-মন সমস্ত এক করে লেওয়া। আজকের এই শুভ মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম আমাদেরও তেমনি ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে, নিজেদের প্রাণমন সমস্তই এক করে নিতে হবে। তাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের হৃদয়সিংহাসনে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি তাঁর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই, আপনারাও সেই অর্চ্চনায় যিনি যে ভাবে পারেন আমার সঙ্গে যোগ দিন—ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্তু। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। মোহপাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে বিনাশ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। হে দেব হে পিতা, পাপসকল মার্জ্জনা কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার।

এখন, ভগবান যখন তাঁর জাগ্রত মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়সিংহাসন অধিকার করে বসলেন, তখন আর নূতন করে আমাদের পরস্পরকে জাগিয়ে তোলবার অবকাশ কোথায়? তাঁর নিশ্বাসের স্পর্শে আমাদের চিত্তকমল তো আপনিই ফুটে গেছে, নূতন করে আর ফোটাব কি করে? আজকের এই পবিত্রভাব বক্তৃতা করে নষ্ট করতে ইচ্ছা করি নে। আজকের এই ধর্ম্মক্ষেত্র সম্মিলনসমাজে এই শুভমুহূর্ত্তে ভগবানের পবিত্র স্পর্শ আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে; আর সেই অনুভব করবার অবসর পাব বলেই, আপনাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আনন্দের সমুদ্রে ডুব দেবার একটা অবসর পাব বলেই আজ এখানে এসেছি।

সমস্ত ভারতবর্ষে একটা মহাজাগরণের ভাব এসে পড়েছে। তার ফলে ভারতবাসী ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হতে চাচ্ছে। সমস্ত ভারতবাসী এখন বুঝেছে যে সকলের অন্তরে যখন সেই একই ভগবানের সিংহাসন, সেই বিগতবিবাদং একই পরমেশ্বর যখন ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তখন আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কোনই লাভ নেই; তখন আমাদেরও উচিত বিগতবিবাদ হওয়া। তাই না আজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে গভীর একতার সূত্রপাত হতে দেখতে পেলুম।

সমস্ত ভারতবর্ষ যখন একতার পথে দ্রুতপদে চলেছে, তখন ব্রাহ্মসমাজই কি কেবল কূপমণ্ডুকের মতো আপনাকে উন্নতির শিখরদেশে আরূঢ় ভেবে আসলে অবনতির মুখে অনৈক্যের উপর বসে থাকবে? এ হতে পারে না—আমরা কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজকে এ অবস্থায় আসতে দেব না। ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, ব্রাহ্মসমাজ থেকে যদি আমরা সকল উন্নতি, সকল

(৮) পূর্ব্বে সুবর্ণশ্রী, ধনশিরি (ধানশ্রী), ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী হইতে বৎসরে প্রায় ২ মণ স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইত।

স্বাধীনতার মূল আত্মার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে থাকি, তবে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য না এনে আমরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আজ ৩৩ বৎসর অতীত হতে চলল, পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব তাঁর ব্রাহ্মগণকে প্রদত্ত "উপহারে" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রাণের সঙ্গে বলেছিলেন যে, "মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়"। তিনি একটী সুগম্ভীর বৈদিক মিলন মন্ত্রের দ্বারা "উপহার" আরম্ভই করিলেন—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল, তোমরা পরস্পরের মন অবগত হও। এই মন্ত্রই আজকাল ভারতের মিলনের মহামন্ত্র হয়ে উঠেছে। সেই মহামন্ত্র আজ আমিও আমার এই ক্ষুদ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করে তাহা দ্বারাই আপনাদিগকে যথাশক্তি উদ্বোধিত করবার চেষ্টা করছি—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল, তোমরা পরস্পরের মন জান। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের প্রাণের ইচ্ছাই ছিল যে, ব্রহ্মোপাসক সকলেই যেন একহৃদয় হয়ে ভগবানের উপাসনায় সম্মিলিত হন। কে জানে যে আজ তাঁর আত্মা এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের মধ্যে মিলনের প্রাণস্পর্শী আগ্রহ দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন না? কে জানে যে ব্রাহ্মসম্মিলনের প্রথম সূত্রধর ভাই প্রতাপচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই? কে বলতে পারে যে, আজ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই মিলন দেখে আনন্দিত হচ্ছেন না? আমি বিশ্বাস করি যে, যে ক্ষেত্রে প্রাণের সঙ্গে ভগবানের নাম গীত হয়, যে ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পরলোকগত ধর্ম্মাত্মাগণ উপস্থিত হয়ে নিজেরাও আনন্দ উপভোগ করেন, আর মর্ত্ত্য মানবেরও আনন্দবর্দ্ধনে সহায় হন।

এই ঐক্যসাধনের একটী প্রধান উপায় হচ্ছে ব্রহ্মসাধন। আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতার সময় চলে গেছে, অহমিকা প্রকাশের সময় চলে গেছে; দ্বন্দ্ববিবাদের সময় চলে গেছে; ছোটখাটো মান অভিমানের সময় চলে গেছে। এখন নীরবে ব্রহ্মসাধনের সময় এসেছে। আমি ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্যদের উপদেশের মূল্য কম করতে চাইনে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রাণের ভিতর সত্যসত্য বিগতবিবাদং পরমেশ্বরকে ধরে তাঁর উপাসনা করে আমাদের বিগতবিবাদ হতে হবে। সে দিন অমৃতসহরে আর্য্যসমাজের এক অধিবেশন হয়েছিল। সেই অধিবেশনের সভাপতি বল্লেন যে তর্কবিতর্কের পথ ধরে চলা আর চলবে না; এখন অবধি শান্তির পথ ধরতে হবে। তিনি নিজের বিশ্বাসমতে বল্লেন যে যোগ ও প্রাণায়াম না ধরলে শান্তির পথ ধরা যেতে পারে না। তার পর এই সে দিন মহনীয় ভারতসম্রাট দুই মিনিটকাল নীরব থাকবার উপদেশ দিয়াছিলেন। বিলাতে এক সভাই স্থাপিত হোল নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ ধরে নীরব ধ্যান অভ্যাস করবার জন্য। এই সমস্ত থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে নীরব সাধনের মূল্য লোকে ভালরকম বুঝতে আরম্ভ করেছে।

নীরব ব্রহ্মসাধন যে কি করে করতে হবে, তা আমি কি বোঝাব? আমি নিজে ব্রহ্মসাধনের পথে খুবই অল্প অগ্রসর; তখন অন্যকে ব্রহ্মসাধনের পথ ঠিক্ করে দেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে এইটুকু বুঝি যে, যিনি বিশ্বজননী, যিনি আমাদের প্রত্যেকের মাতা, তাঁর কাছে সোজা পথ ধরে যাব, এতে আর বোঝাবুঝি কি? বাঁকা পথে গেলেই আবার বাঁকা পথ দিয়ে ফিরে এসে সোজা পথ ধরতে হবে। এই করতে গেলেই সাধন চাই, পরিশ্রম চাই। কিন্তু সোজা পথে সরল প্রাণে মায়ের কাছে যেতে গেলে কেহই আটকাতে পারে না। এটাও যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে ব্রহ্মসাধন অথবা ভগবানকে প্রাণের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখবার চেষ্টা ব্যতীত আমাদের বাঁচবার অন্য উপায় নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

ভগবানের কাছে প্রাণের সঙ্গে এই প্রার্থনা করি যে, এই সম্মিলনসমাজ সত্যসত্য মৈত্রীকে ভিত্তি করে দণ্ডায়মান হোক। কে জানত যে সুদূর হিমালয় থেকে একটা নির্ঝরিণী বাহির হয়ে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই বঙ্গদেশকে শস্যশ্যামল করে তুলবে? তেমনি কে জানে যে এই সম্মিলন সমাজ যথাসময়ে বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মসমাজের বলবিধান করবে না? আমাদের কেবল এইটুকু মনে রাখতে হবে

যে, যেমন সমস্ত নদনদী সরল পথে গিয়ে সমুদ্রেই পড়ে, তেমনি ভগবানের কাছে যাবার, মায়ের কোলে পৌঁছবার পথ অনন্ত—অনন্ত। সুতরাং কে কোন্ পথ দিয়ে মায়ের কোলে যেতে চায়, তা নিয়ে যেন আমরা ঝগড়া না করি। খাল কেটে যেমন উষর ভূমিকে সরস করা হয়, তেমনি দেখাতে শতবার চেষ্টা করব যে কোন্ পথে গেলে সরল পথ ধরা হবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে দ্বন্দ্ববিবাদ ছাড়তে হবে।

এই সম্মিলনসমাজ ব্রাহ্মদের সম্মিলনভূমি হোক; এই সম্মিলন সমাজ, যাঁরা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসক এবং যাঁরা পরোক্ষভাবে রূপকল্পনার ভিতর দিয়া ব্রহ্মোপাসক, সকলেরই মিলনভূমি হোক। এই সমাজ বক্তৃতা ও সাধনের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করুন। এই সম্মিলনসমাজ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে যেন দ্বৈতী অদ্বৈতী কাহাকেও নিজের কোল থেকে দূরে ফেলে না দেন। এই সম্মিলনসমাজের ভিতর যেন জাতিভেদ রক্ষা অথবা জাতিভেদত্যাগ, পূর্ব্বজন্ম আছে কি নেই, আদেশবাদ ঠিক কি ঠিক নয় এ সমস্ত ছোটখাটো প্রমাণসাপেক্ষ দর্শন-সাপেক্ষ অবান্তর বিষয়ের তর্কবিতর্কে প্রবেশ করে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজগুলির মতো একে দলাদলির ক্ষেত্র এবং কাজেই বলহীন করে না ফেলে। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করবার বিবাদকলহ করবার সময় চলে গেছে। এই সম্মিলনসমাজ মানবমাত্রকেই নির্ব্বিশেষে ভগবানের নাম প্রাণের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করতে যদি শিক্ষা দেন, তবেই ভগবান নিজেই প্রত্যেককে প্রত্যেকের নিজের নিজের উপযুক্ত উপায়ে তাঁর কাছে যাবার কোন্ পথটী সত্যসত্য সরল পথ তা দেখিয়ে দেবেন। তখনই সম্মিলনসমাজের প্রকৃতপক্ষে বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং তখনই সম্মিলনসমাজ প্রকৃতপক্ষে সার্থকনাম ও সফলকাম হবেন। ভগবান্ এই সমাজের উপর তাঁর অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

স্বরলিপি।

জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা।

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
(তবে) সব কালো কি আলো হয়ে
ফুটবে না?
কাঁটার বন যে হৃদয় আমার—
(ও তার) গায়ে গায়ে কুসুমরাশি
লুটবে না?
শুষ্ক কঠিন মরুভূমি
জানো আমার হৃদয় তুমি,—
(সেই) পাষাণ-পথে সহস্র-ধার
উৎস কি গো
ছুটবে না?

তোমার চরণ যদি নামে
আমার বুকের পরে—
(তবে) তারার মালা আঁধারে কি
দুল্‌বে না?
গোপন প্রাণের বেদন-জ্বালায়
(ও সে) গভীর ধারে সুধার ধারা
গল্‌বে না?
তোমায় ভুলেই আছি আমি
কত যুগ যে হৃদয়-স্বামী;
(ও গো) তুমি আমায় না জাগালে
এ মোহ-স্বপন
টুটবে না॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

১´ • ১´ • ১´
II { মা মা -া । গা গা -া I রা সা -া । সা -া -গা I রা -া -া ।
তো মা র্ চ র ণ্ য দি • না • • মে • •
তো মা র্ চ র ণ্ য দি • না • • মে • •

• ১´ • ১´ •
। -া -া -া I রা গা -া । মা পা -া I ধা -পধপা -মগা । -রা -গা মা } I
• • • আ মা র্ বু কে র্ প • • • • • • • রে
• • • আ মা র্ বু কে র্ প • • • • • • • রে

১´ ° ১´ ° ১´

I মা মা -া । পা পনা র্সা I র্সা -া -র্রা । র্সা ণা -া I ধা পা -া ।

ত বে ° স বৃ কা লো কি ° ° আ লো ° হ রে °

ত বে ° তা মার্ মা না ° ° আঁ ধা ° রে কি °

° ১´ °

। মা -া -গা I রা -গমা মা । -া -া -া II

ফু ° ট্ বে ° ° না ° ° °

হ ° দ্ বে ° ° না ° ° °

১´ ° ১´ ° ১´

I গা গা -া । গা -া সা I সা রা -া । রা রা -া I -া -া -া ।

কাঁ টা র্ ব ন্ বে হৃ দ য়্ আ মা ° ° ° °

গো প ন্ প্রা ° ণের্ বে দ ন্ আ না ° ° ° °

° ১´ ° ১´ °

। -া রা রা I রা গা -া । মা পা -া I পধা পা -া । মা গা -া I

র্ ও তার্ গা য়ে ° গা য়ে ° কু সু ম্ রা শি °

র্ ও সে গ ভী র্ ধা রে ° সু ধা র্ ধা রা °

১´ °

I রগা রগমা মা । -া -া -া II

লুট্ বে ° ° না ° ° °

গল্ বে ° ° না ° ° °

১´ ° ১´ ° ১´

II { মা -া পা । পা না -া I না না -া । -া র্সা র্সা I র্সা র্সা -া ।

শু ব্ ক ক ঠি ন্ ম রু ঃ ° তু মি জা নো °

তো মা র ভু লে ই আ ছি ° ° আ মি ক ত ° (১)

° ১´ ° ১´ °

। র্সা র্সনধা -া I ধা -নর্সর্রা -া । র্রা র্রা -র্না I -া -া -া । -া -া } না I

আ মা ° র্ ° হৃ ° ° দ য়্ তু মি ° ° ° ° ° ° সেই

র্ ° গ্ যে ° হৃ ° ° দ য়্ স্বা মী ° ° ° ° ° ° ওগো

১´ ° ১´ ° ১´

I না না -র্সা । র্সা র্সা -র্রা I র্সা ণা -া । ধা পা -া I পধা পা মা ।

পা যা ণ্ প থে ° স হ ° অ ধা র্ উৎ স কি

তু মি ° আ মা র্ না জা ° গা লে এ মো হ স্ব

° ১´ °

। গা রা -গা I রা -গমা মা । -া -া -া II II

গো ছু ট্ বে ° ° না ° ° (১)

পন্ টু ট্ বে ° ° না ° ° °

(১) উপরকার পংক্তির বাণীগুলিকে ১ম "তোমার চরণ যদি" হইতে ধরিয়া "ছুটবে না" পর্য্যন্ত, উপরকার পংক্তিতেই আরম্ভ ও শেষ করা হইয়াছে।

(২) নীচেকার পংক্তির বাণীগুলিকে, ঠিক্ সেই হিসাবে, ২য় বারের "তোমার চরণ যদি" হইতে ধরিয়া "টুটবে না" পর্য্যন্ত নীচেকার পংক্তিতেই আরম্ভ ও শেষ করা হইয়াছে

———•———

সম্রাটের ঘোষণা।

ভগবানের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে আমি পঞ্চম জর্জ্জ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়রল্যাণ্ড যুক্তরাজ্যের এবং সমুদ্রের অপর পারের ব্রিটিশ অধিকৃত দেশ সকলের রাজা, খৃষ্টানধর্ম্মের রক্ষক ও বাহক এবং ভারতবর্ষের সম্রাট।

ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা গবর্ণরজেনারেল এবং আমার রাজপ্রতিনিধি, সামন্তরাজসকলের রাজা ও শাসনকর্ত্তা, এবং ভারতবর্ষের সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী আমার প্রজাবর্গকে অভিনন্দিত করিয়া এই ঘোষণা প্রচার করিতেছি।

(১) ভারতবর্ষের শাসনকেন্দ্রে এবং পদ্ধতিতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল—পরিবর্ত্তনের একটা নূতন যুগ সূচিত হইল। আজ আমি এমন একটা আইনে আমার রাজকীয় স্বীকৃতি এবং স্বাক্ষর যোগ করিয়াছি যাহা পূর্ব্বেকার' ইতিহাস প্রসিদ্ধ, যে সকল শাসন-পদ্ধতি এই ব্রিটিশ রাজ্যের পার্লামেণ্ট আইনে পরিণত করিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের উন্নতিবিধানকল্পে এবং প্রজাবর্গের অধিকতর তুষ্টিসাধনকল্পে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের যে সকল আইন মান্যবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রচিত হইয়াছিল, এ দেশে সুশাসনের ধারা এবং সুবিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গকে শাসনসংযত কার্য্যে ও পদে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে এক আইন রচিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয় সে আইনের প্রভাব ভারত-শাসনকার্য্যের ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে তুলিয়া লইয়া রাজশক্তির অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং উহারই প্রভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারে সাধারণের হিতচিকীর্ষার পক্ষে সুব্রতাচরণের বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতির সাধারণ জীবন এখনও ভারতবর্ষে সজীব রহিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইনের কল্যাণে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের বীজ বপন করা হয় এবং সে বীজ ১৯১৯ সালের আইনের প্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন যে আইন পাশ হইল, সে আইনের দ্বারা প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণকে রাজ-শাসনের একটা নির্দ্দিষ্ট বিভাগের ভার দেওয়া হইল। ইহার ফলে ভবিষ্যতে পূর্ণ দায়ীত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইল। আমি এমন আশা আশ্বস্তির সহিত করিতে পারি যে, এই আইন যে নব-নীতির ও পদ্ধতির সূচনা করিতেছে তাহা যদি সফলতার পথে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়, তবে মানবজাতির উন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটা বড় স্থান অধিকার করিবে। সেই জন্য, শুভ অবসর বুঝিয়া এবং উপযোগী সময় জানিয়া আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার মত আশ্বস্ত হইয়া আপনারা অতীতের আলোচনা করুন এবং ভবিষ্যতে কল্যাণের আশা করুন।

(২) যেদিন হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণচিন্তার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমি এবং আমার রাজবংশের পূর্ব্বজগণ ইহাকে পবিত্র এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য ন্যাসের ন্যায় গ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন। গত ১৮.৮ খৃষ্টাব্দে পুণ্যশ্লোকা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ইহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে, যে বাধ্যবাধকতাসূত্রে তিনি তাঁহার অন্য প্রজাদের সহিত আবদ্ধ, ঠিক সেই সমসূত্রেই তিনি ভারতীয় প্রজাদের নিকট দায়ী ছিলেন। এই ঘোষণার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে ধর্ম্মাচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে আইনের রক্ষাকবচ দান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে যখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ জনক রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিদ্ধান্ত ও শাসনপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের ঘোষণাতেও তিনি এই অঙ্গীকারকে দৃঢ় করেন এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুক্তিও সমর্থন করেন। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন সিংহাসনে আরোহণ করি, তখন আমি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গকে এবং প্রজাপুঞ্জকে তাঁহাদের প্রতি আমার আনুকূল্য, অনুরাগ ও অনুকম্পা যে নিত্য অব্যাহত আছে ও থাকিবে, সে সমাচার তাহাদিগকে শুনাই এবং তাহাদের রাজভক্তি এবং রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া ইহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর কল্যাণ

ও উন্নতি আমার পক্ষে একটা প্রধান চিন্তার এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া থাকিবে। পর বৎসর আমি মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলাম এবং সেই সময় ভারতবর্ষের প্রতি আমার হৃদ্‌গত অনুরাগ ও অনুকম্পার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলাম।

(৩) উপরে যাহার আবৃত্তি করিলাম তাহাতে এক পক্ষে স্নেহের ও অনুকম্পার অন্য পক্ষে অনুরাগ ও আনুগত্যের পরিচায়ক; এবং এই পরিচয়েই আমি এবং আমার পূর্ব্বজগণ অনুপ্রাণিত হইয়া ভারত রক্ষা ও শাসন করিয়া আসিতেছি। পরন্তু আমার এই যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ এবং পার্লামেণ্ট এবং ভারতশাসন উদ্দেশ্যে যাহারা আমার প্রতিনিধি কর্ম্মচারী হইয়া সে দেশে বাস করিতেছেন ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর আর্থিক, সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গকে, আমরা বিধাতার কৃপায় যে সকল সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি তাহার অংশভাগী করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই, কিন্তু এখনও একটা সামগ্রী দিবার আছে—একটা অধিকার দান করিবার আছে, যাহা না পাইলে কোন জাতি ঐহিক উন্নতিতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহা এই—স্বজাতির এবং স্বদেশের শাসন এবং রক্ষাকার্য্য, স্বজাতির এবং স্বদেশের স্বার্থ ও সমৃদ্ধির পুষ্টিসাধন করিবার যে দাবী বা অধিকার প্রত্যেক জাতির ব্যষ্টির হৃদয়ে নিহিত আছে, তাহারই উন্মেষসাধন।

বহিঃশত্রুর অভিযান ও আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব আছে তাহা সাম্রাজ্যের রাজা প্রজা সকলেরই পক্ষে স্পর্দ্ধার কর্ত্তব্য। পরন্তু ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ও সামাজিক সুশাসনের ও রক্ষার ভার ভারতবাসী মাত্রেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে এবং সে আশা ও আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত বা অন্যায় নহে। কিন্তু ইহা অতি গুরুভার। ইহার গুরুত্ব এত অধিক যে, সদ্য সদ্য এ ভার কাহারও স্কন্ধে সহসা অর্পণ করা চলে না; কিছু কিছু করিয়া অধিকার দিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে অভিজ্ঞ এবং পর্য্যাপ্ত যোগ্যতায় উপেত করিবার ইচ্ছা আমার আছে এবং সেই সঙ্কল্প অনুসারেই আমি এই অবসর সৃষ্টি করিয়া দিতেছি। ইহার কল্যাণে আমার প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, ক্রমে ক্রমে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে এবং সেই যোগ্যতালাভের অনুপাতে তাহাদের পক্ষে শাসনাধিকার সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

(৪) ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের হৃদয়ে প্রতিনিধিমূলক ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতির প্রতি যে অনুরাগের ভাব উপচিত হইতেছে তাহা আমি অনুকম্পা এবং উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি এবং অনুভব করিতেছি। সামান্য এবং অতি ক্ষুদ্র সূচনা হইতে এই আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে এবং দৃঢ় সাধনায় পরিণত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা বৈধ প্রণালীর ভিতর প্রবাহিত হইয়া দৃঢ় সঙ্কল্পে ও তেজস্বিতায় প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহারই মধ্যে অনেক বার অনেকে আইনের গণ্ডী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়া নিন্দা ও গ্লানির কলঙ্ক লেপ দিয়া এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দেশাত্মবোধের আবরণে যে দাঙ্গাফ্যাসাদ ঘটান হইয়াছিল তাহার কলঙ্কগঞ্জনাকে পরাজিত করিয়া আমার প্রজাবর্গের হৃদয়ে সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রবলতা লাভ করিয়াছে; কারণ বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে মানবতার উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ জাতি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন সেই আদর্শের উদ্বোধনে ভারতবাসীও সংবুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমাদের সহিত সুখে, দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, সমভাগী হইয়া সে দুর্দ্দিন সহচররূপে অতিবাহন করিয়াছিল, এ সাহচর্য্য, এ সাধনা যে সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষাজাত—সেই সিদ্ধিলাভের অনুকূল তপস্যা ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না।

সত্য কথা বলিতে কি, ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবর্ষের শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ হইতেই স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীদের মনে জাগিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ জাতির সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধের ফলে ভারতবাসী জগতের

মানবতন্ত্রে জাতীয় অভ্যুদয়ের এবং তৎসঙ্গে জাতি বিশেষের ইতিহাস-বিন্যাসের পরিচয় ও অধ্যয়ন করিয়া অনিবার্য্যরূপে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; এ চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ শাসন ফলেই অপ্রহিত-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন ভাব, এমন আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কল্যাণময় ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে ব্যর্থই হইত এবং ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছিলেন সে ব্রতের উদ্‌যাপন পূর্ণ হইত না। সেই হেতু যথেষ্ট বিচার ও বিবেচনা করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক ও দায়ীত্বসূচক শাসনের বীজ বপন করা হয়। পরে স্তরে স্তরে, ক্রমে ক্রমে ইহার বিস্তার ও সম্প্রসারণ সাধন করা হয়। এখন আমাদের সম্মুখে আর একপদ চলিতে বাকী আছে, সেই পদ অবলম্বন করিলেই ভারতবর্ষে দায়ীত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলনের প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ আমি তাহাই করিলাম।

(৫) ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও অনু-কম্পা আমি বংশানুক্রমে ধারণ করিয়া আসিতেছি তাহাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া আমি এই পথে আমার প্রজা ভারতবাসী কি ভাবে অগ্রসর হন তাহা লক্ষ্য করিব। পথ বড় বন্ধুর, অনায়াসগম্য নহে। এই পথে সিদ্ধিলাভের পক্ষে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটিবে, অনেক দুঃখ-কষ্ট সহিতে হইবে এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর প্রজার মধ্যে তিতিক্ষা ও ক্ষমা সম্যকরূপে প্রকট করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সকল উচ্চগুণ না থাকিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহা আমার প্রজাবর্গের মধ্যে স্বতএব বিক-শিত হইবে এবং আমার আশা আছে যে, ব্যব-স্থাপক সভার সদস্যগণ নিজেদের দায়ীত্ব বুঝিয়া দেশের প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগ নিরসনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন এবং তাহাদের কল্যাণ-সাধনে উদ্যোগী হইবেন; কেন না এখনও দরিদ্র জন-সাধারণ নির্ব্বাচন-অধিকারে অধিকারী হইতে পারে নাই। যাহারা ভোট দিতে পারিবে না, তাহারা যেন উপেক্ষিত না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার প্রজাপুঞ্জের নেতৃবর্গ, ভাবি-মন্ত্রিগণ দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়া দেশের ও জাতির কল্যাণসাধনের জন্য ব্রতী হইবেন এবং ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের ও জাতির কল্যাণকল্পে দীক্ষিত হই-বেন।

কারণ, ইহা যেন স্মরণ থাকে যে, প্রকৃত দেশাত্মবোধ দল এবং শ্রেণীর গণ্ডী কাটাইয়া উচ্চ ও উদার কার্য্যে লিপ্ত হয়। তাই আমার অনুরোধ যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের অনুরাগ ও আনুকূল্য রক্ষা করিয়া মন্ত্রী সকল আমার ভারত-বর্ষের শাসক-সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারিগণের সহিত একযোগে সাম্রাজ্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করিবেন এবং ক্ষুদ্র ও সামান্য মতভেদ পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ এবং সমবেদনাপূর্ণ শাসনপদ্ধতি প্রচলনে সচেষ্ট হইবেন। যেমন মন্ত্রিগণের কাছে আমি এই আশা করিতেছি তেমনই আমার নিযুক্ত শাসক-সম্প্রদায়ের নিকটও আমার এই দাবী যে, তাঁহারা উঁহাদের নূতন সহচরদের সহিত সদ্ভাব ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন এবং আমার প্রজা ও প্রজার প্রতিনিধিবর্গকে সংযতভাবে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের পথে পরিচালিত করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন ধীরতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতির ও দেশের সেবা করিয়াছেন তাহা হইতে চ্যুত হইবেন না।

(৬) এই সন্ধিক্ষণে আমার এই বড় সাধ যে যতদূর সম্ভব আমার প্রজা এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটু তিক্ত বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়াছিল তাহা মুছিয়া যায়। যাঁহারা রাজনীতিক উন্নতি-সাধনের আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইয়া আইনের গণ্ডী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিলেন তাঁহারা যেন ভবিষ্যৎ আইন মানিয়া চলেন, ইহাই আমার অনুরোধ। আর ভারতশাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত আমার কর্ম্মচারীবর্গ যাহারা ভারতবর্ষে শান্তি ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ভার পাইয়াছেন এবং সেই হেতু প্রজাপক্ষের উৎপাত উপ-দ্রবকে কঠোর হস্তে দলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহারাও যেন প্রজার আস্পর্দ্ধার আধিক্যটা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অতীতটাকে মুছিয়া ফেলেন। একটা নূতন যুগের সূচনা হই-তেছে; এ সময়ে আমার প্রজা এবং রাজকর্ম্ম-

চারীদের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে শাসক ও শাসিত উভয়েই এক সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই হেতু আমি আমার রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি যে আমার পক্ষ হইতে এবং আমার প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে সাধারণভাবে দয়াপ্রকাশ করুন অর্থাৎ যে সকল রাজনীতিক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হউক। যাঁহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইয়া কোন বিশেষ আইনের ধারা অনুসারে বা সহসাসঞ্জাত কোন বিধির বিধানানুসারে কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত বা অন্য কোন পদ্ধতি অনুসারে স্বাধীনতা উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ণ অব্যাহতি দিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস আছে যে এই অনুকম্পার যাঁহারা ফলভোগী হইবেন বা অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে এমন ব্যবহার করিবেন এবং আমার প্রজা সাধারণও এমন ভাবে চলিবেন যাহার কল্যাণে এ সকল আইনের প্রয়োগ আবশ্যকই হইবে না।

(৭) এই সঙ্গে অর্থাৎ ব্রিটিশশাসিত ভারত-বর্ষে শাসনাধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সামন্তরাজগণের জন্য একটা মন্ত্রণা-মজ-লিসের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই মজলিসে সামন্তরাজগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যের কল্যাণ কামনার পরামর্শ করিবেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ে সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইবেন। এই মন্ত্রণা মজলিস আমার বিশ্বাস, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গলাস্পদ হইবে। এই সঙ্গে আমি আমার সামন্ত-রাজগণকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যে এবং রাজ্যশাসনকার্য্যে যে সকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অব্যা-হত এবং অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কোন ক্রমে তাহার কোন অংশের অপচয় ঘটান হইবে না।

(৮) আমার প্রিয় পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে আগামী শীতকালে আমি ভারতবর্ষে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তিনি ভারতবর্ষে যাইয়া সামন্তরাজ-সংসদের প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে নূতন শাসন-অধিকারের উদ্বোধন সাধন করিবেন। ভগবান করুণ, তিনি যেন ভারতবর্ষে যাইয়া শান্তি ও স্বস্তি দেখিতে পান, প্রজাবর্গের মধ্যে সদ্ভাব ও সাহচর্য্য দেখিতে পান, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনুরাগ ও অনুকম্পার পরিচয় পান। কেন না এই ভাবসমন্বয়ের উপরই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

এইবার আমার প্রজাবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমকণ্ঠে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার কৃপায় এবং মহিমায় ভারতবর্ষ এমন ভাবে পরিচালিত হউক যাহার প্রভাবে ইহার সমৃদ্ধি ও শান্তি, তুষ্টি ও তৃপ্তি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং ভারতবাসী পূর্ণ রাজনীতিক স্বাধী-নতা লাভে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

হিন্দুস্থান, ৯ পৌষ ১৩২৬।

বরাবর পাহাড়ের নূতন প্রস্তরলিপি।

১। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং এর বর্ণ-নায় আছে যে পাটলিপুত্র ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী দেশে একটী বড় পাহাড় ছিল। এই পাহাড় একাধারে ঋষি, বিষধর সর্প ও হিংস্র জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল। দেবতারা এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য খচিত দশ ফিট উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ঐ সকল বহু মূল্যবান্ বস্তু প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে এবং বহুকাল হইতে সেখানে কোন জনপ্রাণীর সমাগমও নাই। 'এই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের শীর্ষদেশে একটী স্তূপ আছে। এখানে দাঁড়াইয়া তথাগত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মগধদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।'

এই পাহাড়ের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। যদি তিলৌরা, ধরাবত এবং কোকো-দলকে যথাক্রমে তিলোদক, গুণমতী ও শিলভদ্র বিহারের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই সকল স্থানের দূরত্ব ও স্থিতি বিবে-

চনা করিলে বরাবর পাহাড়কে নিঃসন্দেহে পরিব্রাজকবর্ণিত পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির হইতেই ভগবান্ বুদ্ধদেব মগধদেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এই স্থান নির্ণয়ের কথা সর্ব্বপ্রথমে মিঃ বেগলার ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন। কিছুকাল জেনারেল কানিংহাম ভ্রমবশতঃ পরিব্রাজক-বর্ণিত পাহাড় ও গিরিয়েক ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণদিকের পর্ব্বতমালা অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। এই পর্ব্বতমালা ওয়াজীরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনারেল যখন তৃতীয়বারে বিহার ভ্রমণ করেন তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে (১৮৭৯ ৮০ ও ১৮৮০-৮১ খৃঃ) তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি মিঃ বেগলারের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন পূর্ব্বদিকে গিরিব্রজে যখন জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন তখন তাঁহারা—

'গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্ ॥'

গোরথগিরি হইতে মগধদেশের পুরী দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গোরথগিরির কথা অপর কোন সংস্কৃতগ্রন্থে আছে কিনা বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ মিঃ বেগলারই সর্ব্বপ্রথমে এই পাহাড়কে বিহারের কোন পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "গোরথ" ও "বাথান" একার্থবোধক এবং ইহাতে গৃহপালিত গবাদি পশু বুঝায়, এইজন্য রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'বাথান' পাহাড়ের প্রাচীন নাম মহাভারতের গোরথগিরি ছিল।

এই ক্ষেত্রে মিঃ বেগলারের অনুমান সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'বাথান' ও 'গোরথ' এই দুইটী নামের অর্থগত সামঞ্জস্য এত সামান্য যে ইহা হইতে ইহাদের অভেদত্ব কোন দিক দিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বরাবর পাহাড়ের সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বতচূড়া হইতে রাজগৃহ পর্ব্বতের উত্তরদিকের উপত্যকার দূরত্ব সরল রেখায় প্রায় তেইশ মাইল। বাথানি পর্ব্বত অতি নীচু এবং বরাবর হইতে রাজগৃহের তিন পোয়া ব্যবধানে এই সরল রেখার উপর অবস্থিত। এই পর্ব্বতমালার সন্নিকটে দক্ষিণদিকে অন্যান্য উচ্চতর পাহাড় আছে, কতকগুলি বাথানি অপেক্ষাও রাজগৃহের নিকটতর, কিন্তু সবগুলিই রাজগৃহ পর্ব্বতশ্রেণীর তুলনায় অতি নীচু এবং ইহাদের কোন পাহাড় হইতেই মগধদেশের চারিদিকের দৃশ্য একখানি চিত্রপটের মত পুরাপুরিভাবে প্রতিভাত হয় না।

গোরথগিরির স্থাননির্ণয় এতদিন সমস্যার বিষয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মহাভারতের আমলে বরাবর পর্ব্বতই গোরথগিরি নামে পরিচিত ছিল। বরাবরে প্রাপ্ত দুইখানি প্রস্তরলিপি হইতে ইহার সবিশেষ প্রমাণ জানিতে পারা যায়। সম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গুহার নিকটেই পাহাড়ের উপর এই প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'এই লিপি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।' ইহা সম্ভবপর যে এই অক্ষরগুলি অশোক গুহার লিপির সমসাময়িক (অর্থাৎ ২৫৭-২৫০ খৃঃ পূঃ) এবং ইহাও সম্ভবপর যে একই শিল্পী উভয় স্থানের লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিনেসণ্ট স্মিথ বলেন 'উত্তরে বা দক্ষিণে প্রাপ্ত কোন প্রস্তরলিপিই অশোকলিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।' গোরথলিপির স্থাননির্ণয়ে এই প্রস্তরলিপি যে সবিশেষ মূল্যবান্ ইহা আর বর্ত্তমানে অস্বীকার করা যায় না।

গোরথগিরির অবস্থিতি সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলে, মহাভারত ও হিউয়ানসিয়াংএর বর্ণিত পাহাড় যে বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গ ইহা স্বীকার করিতে কোনই আপত্তি দেখা যায় না। বরাবরের সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গে তিন্তিড়ী বৃক্ষে পরিবেষ্টিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই স্থান হইতে রাজগির পর্ব্বতমালা অতি সুন্দর দেখায় এবং খুব নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বহু দূরবর্ত্তী (প্রায় বিশ কি ত্রিশ মাইল) গুর্পা ও শৃঙ্গী পাহাড়দ্বয়ও চক্রবালের সীমান্ত রেখায় অতি পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

২। প্রথম সুবৃহৎ প্রস্তরলিপিখানি ১৯১৩ খৃঃ

৫ই মার্চ্চ মেসার্স জ্যাক্‌সন্ ও রাসেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রস্তরলিপি বড় একখানা প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ এবং ইহা ভূমি হইতে ৮৷৷০ ফিট উচ্চ। এই লিপি পাহাড়ের যে অংশে উৎকীর্ণ সেই দিক্‌টা একেবারে মুক্ত। এই কারণে অক্ষরগুলি বৃষ্টি ও বাত্যায় ক্ষয় হইয়া একটু অস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথমে 'গোরথ' শব্দটী বেশ পড়িতে পারা গিয়াছিল, কিন্তু শেষের বাক্যটী বুঝিতে পারা যায় নাই। ছয়-মাস পর প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে এই লিপির ছাপ গ্রহণ করা হইল রাখাল বাবু উহা পড়িয়া রিপোর্টে লিখিয়াছেন, 'এই ছাপটী সম্পূর্ণ নয়। ইহাতে শেষের অক্ষরটী বাদ পড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শেষাংশ 'গিরো' বা 'গিরৌ' (পাহাড়ে) হইবে। 'গোরথ' 'গোরট' শব্দের অপভ্রংশ হইবে।'

এই রিপোর্ট পাইয়া মিঃ জ্যাক্‌সন প্রস্তরলিপি-খানি বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহাতে কোন অক্ষরই বাদ পড়ে নাই এবং উহাতে যে শেষ অক্ষর ছিল এমন কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিখানা মিঃ জ্যাক্‌সন্ ১৯১৪খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর আবিষ্কার করেন। এই সময়ে তিনি সুদাম ও লোমশ ঋষিগুহার অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। লোমশ-ঋষি-গুহার প্রবেশদ্বারের কেন্দ্র হইতে বিশ ফিট দক্ষিণে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দরজার Lintel হইতে প্রায় সাত ফিট্ উপরে স্থাপিত। ১৮৪৭ খৃঃ কাপ্তেন কিটো এই গুহার অভ্যন্তরের জল বাহির করিয়া দেওয়ায় জন্য একটী পরিখা খনন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরলিপির 'থ' অক্ষরটী ভিন্ন প্রথমোক্ত লিপিরই অনুরূপ। রাখাল বাবুর মতে এখানেও 'গোরথগিরি' লিপি-গুলি উৎকীর্ণ আছে। 'থ' লিপিটী বিভিন্ন প্রকা-রের হইলেও ইহা যে 'থ' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তরলিপির আকৃতি প্রথম খানার তুল-নায় অর্দ্ধেক। শেষ লিপির একটু পরেই 'ভা' লিপি যে ছিল তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা ঠিক কিনা তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই।

একই নমুনার দুইটী প্রস্তরলিপি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হওয়ায়, বরাবর ও গোরথগিরির অভিন্নতা সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে। তবে এই বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য মিঃ জ্যাকসন দুইটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। সেই দুইটী এই :—(ক) শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহিত গোরথগিরি হইতে মাগধপুর দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতে আছে 'গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্।' যদি মহাভারতকার দুর্গবেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বরাবরের শৃঙ্গ বা গোরথগিরি হইতে উহা দর্শন একরূপ অসম্ভব। 'মগধ দেশ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন' ইহা বলিলে কোনই গোলযোগ থাকে না।

মাননীয় মিঃ ওল্ডহাম 'মাগধপুরম'এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'সম্ভবতঃ মাগধপুর বরাবর পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ইব্রাহিমপুর ঐ নগর হইবে'। ইহা ঠিক যে প্রাচীনকালে এই স্থানে বড় একটী উপনিবেশ ছিল; ইব্রাহিমপুর ও জরুগ্রামের চারিদিকে মাঠে ঘাটে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকেরা জমি চাষের সময় ভগ্নস্তূপের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বহু ইট ও পাথর পাইয়া থাকে। এই সহরটী পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু এই ইটপাথরগুলি অতি প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয় না। মিঃ জ্যাকসন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রাচীন ভগ্নস্তূপের ইট পাথর পান নাই। ইহা হইতে তিনি মনে করেন সেই সময়ে শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর তৈরী ইট পাথর প্রস্তুত করিতে পারিত না। প্রাচীন রাজগৃহে যেরূপ অতীতকালের সুন্দর সুন্দর ইট পাথর পাওয়া যায় সেরূপ ইট পাথর ইব্রাহিমপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিদ্ধেশ্বরনাথশৃঙ্গের পাদদেশে একটি স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর ইট-পাথর পাওয়া যায়। দক্ষিণে শৈলবেষ্টিত স্থানে চারিটি অশোকনির্ম্মিত গুহা আছে। পূর্ব্বদিকে ফল্গুর পশ্চিম শাখা পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আছে সেই ভূমি সম্বন্ধে মিঃ বুকানন বলেন, 'স্থানীয় লোকেরা বলে এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্র গয়াসুরের উপর যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

ইহাই প্রকৃত রামগয়া, তবে এইস্থান দূরবর্ত্তী বলিয়া গয়ালীরা প্রাচীন গয়ায় নূতন রামগয়া স্থাপন করিয়াছিলেন'; এই জনশ্রুতির কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

উপরোক্ত প্রস্তরলিপি দুইখানি আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পর 'পাটনা কলেজ ম্যাগাজিনে' লিখিত হইয়াছে, 'বরাবর পর্ব্বতমালার বেষ্টনীর ভিতরে বহুস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার বনিয়াদ দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধেশ্বর শৃঙ্গের পাদদেশের পূর্ব্বদিকে এবং উপত্যকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে জঙ্গলের ভিতর এইরূপ বনিয়াদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই বেষ্টনী এত ক্ষুদ্র যে, ইহার ভিতর যে বড় একটি সহরের পত্তন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, তবে ইহা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ বলিয়া বাহিরের লোকেরা এখানে আসিয়া বিপদের সময় আশ্রয় লইত। বেষ্টনীর পূর্ব্বদিকের সুরক্ষিত দ্বার হইতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই 'শেষ প্রান্তে সহরটি অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়।'

সহরটি যে প্রাচীন রাজগৃহের সমসাময়িক, এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। দক্ষিণ পর্ব্বতমালার শৃঙ্গের উপরে একটী গুম্বজাকার প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ আছে, এই দুর্গের অনুরূপ বহু দুর্গ রাজগিরে দেখিতে পাওয়া যায়। বেষ্টনীর ভিতর দিয়া দুর্গ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে। রাম-গয়ার সমতল ভূমিতে যে মুরলী পাহাড় আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে অষ্টকোণাকৃতি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে বাণাসুরের আখড়া ছিল। প্রাচীন রাজগৃহের কেন্দ্রে অবস্থিত মনিয়ার মঠও এইরূপ বহু দালানকোটা আছে।

গোরথগিরির স্থান-নিরূপণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে উপরোক্ত গুহাশিলালিপির একখানিতে বরাবর পাহাড়ের অপর নাম 'খলতিক' দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র গুহার শিলালিপিতে আছে,—

'লজিন পিয়দশিন দুভদশভসভিষিতেন ইয়ং
কুভ খলতিক পবতসি দিন অজিভিকেহি।'

খলতিক পাহাড়ে অবস্থিত এই গুহা রাজা প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির ত্রয়োদশ বৎসরে আজিভিকদের দান করিয়াছিলেন। পাণিনীর বার্ত্তিকায়ও খলিতক পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'খলিতক' শব্দ উক্ত পাহাড়ের সংলগ্ন বনভূমিকে বুঝায়।

কানিংগাম সাহেব কর্ণচৌপার গুহার প্রবেশ দ্বারের উত্তরদিকে শিলালিপিতে খলতি (বা খলন্তি) পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেনার্ট, বার্ণফ অথবা বুলার আদ্যাক্ষর 'খ' ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারেন নাই।

'খলতিক' শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। বার্ণফ 'খলিতক' স্থলে 'স্খলতিক' (পিচ্ছিল) ব্যবহার করিয়াছেন এবং বুলার 'খলতি' শব্দের অর্থ 'নেড়া' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাহাড়ের কতকটা অংশ যে পিচ্ছিল ও নেড়া তাহাতে কোন ভুল নাই।

জ্যাকসন সাহেব বলেন 'ভাষাগত অর্থের আপত্তি না থাকিলে আমি বরাবর পাহাড়ের 'খলতিক' 'গোরথ' বা 'গোরথক' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি দেখি না। ইহা ঠিক যে বরাবর পাহাড় রাজগৃহের গিরিব্রজ নামের মত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তীকালে ইহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিউয়েনসিয়াংএর সময়ে প্রাচীন রাজগৃহের নাম কুশাগরপুর ছিল। ১৮১১ খৃঃ বুকানন ইহাকে 'হংসপুর নগর' এবং ১৮৪৭ খৃঃ কিটো 'হংসুটানর' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ নামে রাজগৃহকে কেহ অভিহিত করে না। এইরূপে লোমশঋষি গুহার নাম সপ্তম শতাব্দের শিলালিপিতে 'প্রভরগিরি-গুহা' দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই প্রভরগিরি' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে 'বরাবর' হইয়াছে।*

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ।

["স্যার" উপাধি ত্যাগে]

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

হে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র বঙ্গের!
ত্যাগের মহিমা-গর্ব্বে কি দীপ্তি চিত্তের

* এই প্রবন্ধ মিঃ V. H. Jackson, M. A. লিখিত ও বিহার ও উড়িষ্যার জার্ণালে প্রকাশিত 'Two new Inscriptions from the Barabar Hills, and an identification of Gorathagiri' প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

উদ্ভাসিল আজি তব! তুমি নহ আর
ধনীর দুলাল শুধু, ভারতীমাতার
সুধাস্রাবী সপ্ততন্ত্রী, বসন্তের পিক্
মধুকণ্ঠ অতুলন! মুগ্ধ দশ দিক্
হেরিতেছে সবিস্ময়ে মহর্ষি-সন্তান
উদার নির্ভীক প্রাণে ন্যায়ের সম্মান
রক্ষিবারে রাজদণ্ড মোহের শৃঙ্খল
ছিন্ন করি অনায়াসে তপোতেজোজ্জ্বল
প্রবোধিত ভারতের লাঞ্ছিত আত্মার
দাঁড়াল প্রতিভূরূপে! ত্যজিয়ে অ-'সার'
আজি সত্য সার-গ্রাহী ঋষি নরোত্তম
তুমি আর্য্যকুল রবি! ভাতে নিরুপম
মেঘ মুক্ত দিনমণি! লহ নমস্কার
হে সবিতৃ বাঙ্গালার! কবি চট্টলার
করে তোমা অর্ঘ্য দান! প্রবুদ্ধ ভারত
প্রতীক্ষা করিছে আজি, ওগো সিদ্ধব্রত!
রুদ্র গীতি তব কণ্ঠে শুনিতে এবার
সকল সুপ্তির অন্তে প্রণব-ঝঙ্কার!

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু র্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।*

মহাভারত, শান্তি, ২৪০.৭।

এই জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই পরব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গোচর দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহ অধ্যাত্মশাস্ত্রের চালুনী দিয়া সংশোধন করিতে গেলে উক্ত পদার্থ সকলের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কিন্তু চির-পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং অনিত্য নামরূপাত্মক আবির্ভাব, এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অদৃশ্য অথচ নিত্য পরমাত্মতত্ত্ব, এইরূপ নিত্য-অনিত্য রূপী দুই বিভাগ হইয়া যায়। রসায়নশাস্ত্রে কোন পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেরূপ পৃথক্‌রূপে বাহির করা হয়, সেই প্রকার এই দুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্‌রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে না সত্য। কিন্তু জ্ঞান-দৃষ্টিতে সেই দুইকে পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রীয় উপপত্তির সুবিধার জন্য উহাদিগকে অনুক্রমে 'ব্রহ্ম' ও 'মায়া' এবং কখন কখন 'ব্রহ্ম জগৎ' ও 'মায়া জগৎ' এইরূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি ইহা যেন মনে রাখা হয় যে, ব্রহ্ম মূলেই নিত্য ও সত্য হওয়া প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে 'জগৎ' এইরূপ প্রসঙ্গে অনুপ্রাসার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম জগৎ' এই শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মকে কেহ উৎপন্ন করিয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এই দুই জগতের মধ্যে, দেশকালাদি নামরূপের দ্বারা অনবদ্ধ অনাদি, নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত হইয়া তাহার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ব্রহ্মজগতে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব্ব প্রকরণে করা হইয়াছে; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্র ঐ খানে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা মূলে ব্রহ্মজগতের হইলেও দৃশ্য জগতের অন্য বস্তুর ন্যায় তাহাও নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি নামরূপ নশ্বর। হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব কিরূপে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের বিচারার্থ, কর্ম্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বৈতী রাজ্যেও আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই মূলে যদি একই নিত্য ও স্বতন্ত্র আত্মা থাকে তবে পিণ্ডের অর্থাৎ শরীরের আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া জানায় কি বাধা আছে, এবং তাহা কিরূপে দূরে হইতে পারে, এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। এ প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়। কারণ, বেদান্তদৃষ্টিতে আত্মা কিংবা পরমাত্মা এবং তৎসম্বন্ধীয় নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই দুই বর্গে বিভক্ত হওয়ায়, নামরূপাত্মক আবরণ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ কোন স্থানে ঘন কোন স্থানে তরল হওয়া প্রযুক্ত দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়,—বেদান্তের এইরূপ মত। আত্মারূপী ব্রহ্ম কোথাও নাই এরূপ নহে। ব্রহ্ম প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মনুষ্যের মধ্যেও আছেন। কিন্তু দীপ একই হইলেও লোহার ভিতর কিংবা ন্যূনাধিক স্বচ্ছ কাচের লণ্ঠনের মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্ম-

---

* "কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা তাহার মুক্তি হয়"। গী. র. ৩ঃ।

তত্ত্ব সর্ব্বত্র একই হইলেও তৎসম্বন্ধীয় কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্য-ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে। অধিক কি, সচেতনের মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহাই তাহার কারণ। আত্মা সর্ব্বত্র একই সত্য; তথাপি তাহা মূলে নির্গুণ ও উদাসীন হওয়ায়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপনা হইতে কিছুই করিতে পারে না; এবং এই সকল সাধন মনুষ্য-যোনি ব্যতীত অন্যত্র পূর্ণরূপে না থাকায়, মনুষ্যজন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ হইলে, আত্মার এই নামরূপাত্মক আবরণের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভেদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থূল আবরণ শুক্রশোণিতাত্মক স্থূল দেহই মনুষ্যের শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক্, মাংস ও কেশ উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিয়া এই সমস্তকে বেদান্তী 'অন্নময় কোষ' বলেন। এই স্থূল কোষ ছাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্রমে বায়ুরূপী প্রাণ অর্থাৎ 'প্রাণময় কোষ', মন অর্থাৎ 'মনোময় কোষ', বুদ্ধি অর্থাৎ 'জ্ঞানময় কোষ' ও শেষে 'আনন্দময় কোষ' পাওয়া যায়। আত্মা তাহারও অতীত। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে আনন্দময় কোষের কথা বলিয়া, বরুণ ভৃগুকে আত্মস্বরূপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন (তৈ. ২. ১-৫; ৩. ২-৬)। এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থূলদেহের কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চতন্মাত্রকে বেদান্তী 'লিঙ্গ' কিংবা 'সূক্ষ্ম শরীর' বলেন। একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে কিরূপে জন্ম লাভ হয় সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধির অনেক 'ভাব' মানিয়া ইহার উপপত্তি করা হয়, সেরূপ না করিয়া তাহার বদলে এই সমস্ত কর্ম্মবিপাকের কিংবা কর্ম্মফলের পরিণাম,—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই কর্ম্ম, লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে অর্থাৎ আধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্ম্মও লিঙ্গশরীর দ্বারা তাহার সঙ্গে গিয়া আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, এইরূপ গীতাতে, বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, নামরূপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য পরমেশ্বরস্বরূপী হইবার পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভের পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম্ম এই দুয়েরই বিচার করা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই পূর্ব্বেই লিঙ্গশরীরের বিচার করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব না। যে কর্ম্মের দরুণ আত্মার ব্রহ্মজ্ঞান না হইয়া অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয় সেই কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে মনুষ্যের কিরূপ আচরণ করা উচিত, এই প্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি।

সৃষ্টির আরম্ভকালে মূল অব্যক্ত ও নির্গুণ পরব্রহ্ম যে দেশকালাদি নানারূপাত্মক সগুণ শক্তি দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হয় বেদান্তশাস্ত্রে তাহারই নাম 'মায়া' (গী. ৭. ২৭; ২৫); এবং তাহার মধ্যেই কর্ম্মেরও সমাবেশ হয় (বৃ. ১. ৬. ১)। অধিক কি, 'মায়া' ও 'কর্ম্ম' দুই-ই সমানার্থক বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না-কোন কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার হওয়া ব্যতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া কিংবা নির্গুণের সগুণ হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য আমি আমার মায়া দ্বারা প্রকৃতিতে জন্মিয়া থাকি (গী. ৪. ৬), প্রথমে ইহা বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতা তই "অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে পঞ্চমহাভূতাদি বিবিধ সৃষ্টি হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম" এইরূপ কর্ম্মের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৩)। কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার কিংবা ক্রিয়া; কিন্তু তাহা মনুষ্যকৃতই হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই হউক—এইরূপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তু যে কোন কর্ম্মই ধর না কেন, তাহার পরিণাম সর্ব্বদা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়া তাহার বদলে অন্য নামরূপ করা; কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল দ্রব্য কখন বদলায় না,—একই রকম থাকে। উদাহরণ যথা—বয়নক্রিয়ায় 'সুতা' এই নাম গিয়া সেই দ্রব্যেরই নাম হয় 'বস্ত্র'; এবং কুম্ভকারের ব্যাপারে 'মাটী' এই নামের বদলে 'ঘট' এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার সময় কর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়া নাম ও রূপ এই দুইকেই কেহ কেহ 'মায়া' বলেন। তথাপি যখন কর্ম্মের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হয় তখন কর্ম্মস্বরূপ ও মায়াস্বরূপ একই, তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয়। তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম্ম, এই তিনই মূলে একইস্বরূপই,—ইহা আরম্ভেই বলা অধিক সুবিধা। মায়া একটি সামান্য শব্দ; এই মায়ার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম "নামরূপ" এবং মায়ার ব্যাপারের বিশিষ্টার্থক নাম "কর্ম্ম"; উহার মধ্যেও এই সূক্ষ্মভেদ যে করা যাইতে পারে না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ এই ভেদ দেখাইবার আবশ্যকতা না থাকায়, তিন শব্দকেই অনেক সময় সমান অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদন (কিংবা উপাধি=উপরে স্থাপিত আবরণ) আমাদের

চোখে দেখা যায় তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি' বলে। সাংখ্যবাদী পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বকে স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানেন। কিন্তু মায়া, নামরূপ কিংবা কর্ম্ম, ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানা ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও অনিত্য এই দুই কল্পনা পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায়, দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে থাকিতে পারে না। তাই বিনাশী প্রকৃতি কিংবা কর্ম্মাত্মক মায়া স্বতন্ত্র না হওয়ায়,—এক নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই মনুষ্যের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সমূহ মায়া-দৃশ্য দর্শন করে, এইরূপ বেদান্তীরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মায়া পরতন্ত্র এবং পরব্রহ্মেতেই এই মায়াদৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার মীমাংসা হয় না। গুণপরিণামে না হইলেও বিবর্ত্তবাদে নির্গুণ ও নিত্য ব্রহ্মেতে নশ্বর সগুণ নামরূপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা সম্ভব হইলেও এখানে এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ রূপ, নির্গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে মূলারম্ভে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন্ ও কেন প্রকাশ পাইল? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও চিদ্রূপী পরমেশ্বর, নামরূপাত্মক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্ ও কেন উৎপন্ন করিলেন? কিন্তু ঋগবেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণন-অনুসারে এই বিষয় শুধু মনুষ্যের নহে, দেবতা ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় (ঋ. ১০. ১২৯; তৈ. ব্রা. ২. ৮. ৯), এই প্রশ্নের—"জ্ঞান দৃষ্টিতে নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মেরই ইহা এক অচিন্ত্য লীলা"—ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়া যায় না (বেসূ. ২. ১. ৩৩)। যখন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক নশ্বর কর্ম্ম কিংবা সগুণ মায়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—এইরূপ গোড়ায় ধরিয়া লইয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ম্ম অনাদি এইরূপ বেদান্ত-সূত্রে উক্ত হইয়াছে (বেসূ. ২. ১. ৩৫-৩৭); ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা আমারই মায়া (গী. ৭. ১৪) এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া ও পুরুষ উভয়ই 'অনাদি' বলিয়াছেন (গী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার শ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাঽবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য 'মায়া' 'শক্তিঃ' 'প্রকৃতি'রিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলাপ্যেতে" (বেসূ. শাংভা. ২. ১.১৪)। "(ইন্দ্রিয়গণের) অজ্ঞানবশত মূলব্রহ্মেতে কল্পিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের 'মায়া', 'শক্তি' কিংবা 'প্রকৃতি' বলা হয়"; এই নামরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের আত্মভূত বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহা জড় হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন (তত্ত্বান্যত্ব) এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য) বিস্তারের মূল, তাহা বলিতে পারা যায় না; এবং "এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পক্ষে আবশ্যক ও অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপনিষদে অব্যক্ত, আকাশ, অক্ষর, এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে" (বেসূ. শাংভা. ১. ৪. ৩)। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্ময় (পুরুষ) ও অচেতন মায়া (প্রকৃতি), সাংখ্য এই দুই তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানে; কিন্তু বেদান্তী, মায়ার অনাদিত্ব একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র স্বীকার করেন না; এবং এই কারণে সংসারাত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ গীতায় উল্লেখ আছে—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো নচাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" (গী. ১৫. ৩)—এই সংসার বৃক্ষের রূপ, অন্ত, আদি, মূল কিংবা তল পাওয়া যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' (গী. ৩. ১৫) ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে; 'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ' (৩. ১৪) যজ্ঞও কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; কিংবা 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা' (গী. ৩. ১০) ব্রহ্মদেব প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম্ম) একসঙ্গেই সৃষ্টি করিয়াছেন;—এইরূপ যে বর্ণনা আছে তাহার তাৎপর্য্যও এই যে, "কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মরূপী যজ্ঞ, জগৎ অর্থাৎ প্রজা, এই সমস্ত এক সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে"—কিন্তু এই জগৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদেব হইতে সৃষ্ট হইয়াছেই বলো কিংবা মীমাংসকের মতানুসারে সেই ব্রহ্মদেব নিত্য বেদশব্দ হইতে উহা উৎপন্ন করিয়াছেনই বলো, উভয়ের অর্থ একই (মভা. শাং. ২৩১; মনু. ১. ২১)। সারকথা, কর্ম্ম অর্থে দৃশ্য জগতের সৃষ্টি হইবার সময় মূল নির্গুণ ব্রহ্মেতেই দৃশ্যমান ব্যাপার। এই ব্যাপারেরই নাম নামরূপাত্মক মায়া; এবং এই মূল কর্ম্ম হইতেই চন্দ্রসূর্য্যাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাপার পরে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (বৃ. ৩. ৮. ৯)। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের মূলভূত এই যে জগৎ-উৎপত্তিকালের কর্ম্ম কিংবা মায়া তাহা ব্রহ্মেরই কোন এক অচিন্ত্য লীলা, স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুরুষেরা বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।* কিন্তু জ্ঞানের গতি

* "What belongs to mere appearance is necessarily subordnated to the nature of the thing in itself". Kant's *Metaphysics of Morals* (Abbot's trans. in Kant's *Theory of Ethics* P. 81).

এখানে বাধিত হওয়া প্রযুক্ত এই লীলা, নামরূপ, কিংবা মায়াত্মক কর্ম্ম 'কখন' উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই, কেবল কর্ম্মজগতেরই বিচার যখন করিতে হইবে, তখন এই পরতন্ত্র ও নশ্বর মায়া এবং মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গভূত কর্ম্মকেও 'অনাদি' বলা বেদান্তশাস্ত্রের রীতি (বেসূ. ২. ১. ৩৫)। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, সাংখ্যের উক্তি অনুসারে মূলেতেই পরমেশ্বরের সমানই মায়া নিরারম্ভ ও স্বতন্ত্র অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে;—অনাদি শব্দে দুর্জ্ঞেয়ারম্ভ অর্থাৎ যাহার আদি (আরম্ভ) জানা যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময়নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

কালিদাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন এবং কোন্ রাজার তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এই বিষয়ে নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে এতরূপ মতভেদ আছে দেখিয়া বোধ হয় যে এ বিষয়ে আর আলোচনা বৃথা। কিন্তু মহাকবি কালিদাস আমাদের কেন, জগতের একটি অমূল্য রত্ন। তাঁহার সময় নিরূপণ করিতে না পারা আমাদের কলঙ্ক। অধিকন্তু, কালিদাসের সময়নিরূপণের সহিত ভারতবর্ষের অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। তাঁহার সময় নিরূপণ না হইলে প্রাচীন ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উদ্যম ও পরিশ্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদেরও উদ্যম কতকভাবে অসম্পূর্ণই থাকিবে। আমাদের দেশের রীতিনীতি ও ভাবভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাহা না বুঝিলে কোনও অনুসন্ধানই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। Egypt, Babylon, Crete এই সমস্ত স্থানে তাঁহারা যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেইগুলিকেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল ধরিয়া লন। কিন্তু excavations, inscriptions এবং coins ইত্যাদি দ্বারা যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে এতদ্দেশে তাহাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। ভারতবর্ষ বৈরাগ্যের দেশ, এই ভাব অন্য দেশে খুব বিরল। নিজের নাম রাখিয়া যাইব, নিজের বা স্বজনবন্ধুর জীবনচরিত রাখিয়া যাইব এরূপভাব এদেশে সব সময়ে দেখা যায় না। যতটুকু আছে তাহারই ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ অনেকস্থলেই পাশ্চাত্য মতেরই অনুসরণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা পাশ্চাত্য বিপশ্চিদ্গণের গ্রন্থ হইতে। কাজেই একটা কিছু নূতন কথা গ্রন্থের বিরুদ্ধে বলিলে নিন্দাস্পদ বা হাস্যাস্পদ হইব এইরূপ ভয় অনেক স্থলে দেখা যায়। তবে অনেক স্থলে একথা খাটে না। কালিদাসের সময়সম্বন্ধে প্রোফেসর সারদারঞ্জন রায় মহাশয় এভাব অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার যুক্তি অনেক স্থলেই সারগর্ভ। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধ লেখেন; তাঁহার লেখা অনুসারে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহার মতে কালিদাস যশোধর্ম্ম ধর্ম্মবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই মত সমর্থন করিতে গিয়া তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বড়ই দুঃখ বোধ হয়। যাহা হউক আমরা সমস্ত মতগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এ বিষয়ে তিনটি মতই প্রধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১ম মত। কালিদাস উজ্জয়িনী বা অবন্তির রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের সভাপতি ছিলেন। এই বিক্রমাদিত্যের রাজ্য হইতেই সম্বৎ সনের প্রাদুর্ভাব—ইহার সময় খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসর।

২য় মত। কালিদাস সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাপতি ছিলেন। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্ব্বাচীন গুপ্তবংশের প্রধান রাজা। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের পিতা চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি আলাকজেণ্ডারের সমকালীন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য; তাঁহার সময় খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ বা চতুর্থের শেষ।

৩য় মত। কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তৎকালীন অবন্তির রাজা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শকদিগকে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপন করেন। তবে একবারে ১ম বৎসর হইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথম

অব্দকে ৬০০ ছয় শত অব্দ বলিয়া গণনা আরম্ভ হয়। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে এই শকবিজয় হয়; তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই খৃঃ অব্দ হইতে সম্বৎ অব্দ ৫৭ বৎসর অগ্রগামী।

এই শেষোক্ত মত পণ্ডিতপ্রবর মাক্সমূলরের। তাঁহার মত সহজে উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধান ও প্রমাণ সকলের দ্বারা এই মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইয়াছে। ৫৪৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেও মালবাব্দ নামে সম্বৎ অব্দ প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৎসভট্টিরচিত মান্দালোরের প্রাচীন আলেখমালা প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। বৎসভট্টির এই রচনাতে মালবাব্দের উল্লেখ আছে। বৎসভট্টির লেখায় মেঘদূত ও ঋতুসংহারের আধিপত্য স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পরে বিবৃত হইবে। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা কালিদাসের আধিপত্য দেখিতে পাই তাহা হইলে কালিদাস বা বিক্রমাদিত্য যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিবুধমণ্ডলীতে দ্বিতীয় মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রোঃ মাক্‌ডোনেল এই মতের অধিনায়ক। তিনি কালিদাসকে বৎসভট্টির অন্তত এক শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়াছেন। কালিদাস হইতে বৎসভট্টি যদি এক শত বৎসর ধরা হয় তাহা হইলে আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে উপস্থিত হই। এই মত অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় স্বীকার করিতে হয়।

(১) কালিদাস ৩৭৩-৪১৩ খৃঃ অঃ মধ্যে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত।

(২) তিনি রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন বা হালরাজের ৩০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। এই শালিবাহন রাজার সময় সম্বন্ধে এখন আর কোনও মতভেদ নাই। তিনি ৭৮ খৃঃ অব্দে নূতন সমা বা বৎসর প্রচার করেন। তাহাই এখন শকাব্দ বলিয়া পরিচিত।

(৩) বুদ্ধচরিতের প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষের অনেক পরে কালিদাসের প্রাদুর্ভাব।

(ক্রমশঃ)

দান প্রাপ্তি ও প্রতিশ্রুতি।

আমরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, হুগলি নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবেহারী বড়াল মহাশয় তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজ-মেডিক্যাল মিশনে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য কন্যা সাজাহানপুরনিবাসী শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রের দেবনাগর অক্ষরের জন্য ৬০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উৎসবের প্রাণ। *

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

শ্রুতি বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" অর্থাৎ আনন্দ হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তে তাহারা আনন্দলোকে গমন করে। এই আনন্দের স্বরূপানুভূতিই উৎসব।

শ্রুতি, এই মহাবাক্য প্রচার করিতেছেন যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই লীলা শুধু আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু হায় আনন্দ কোথায়? রোগ-শোক-জরা-মরণ ব্যথিত এ সংসারে আনন্দের স্থান কোথায়? বুকে নিদারুণ ক্ষত, পদতলে তীক্ষ্ণ কণ্টক, মাথার উপর অদৃষ্টের উদ্যত বজ্র—এ সংসারে আনন্দ পাইব কেমন করিয়া? হতাশার তীব্র ক্রন্দনে, অসহায়ের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায়, ভাগ্যহীনের নীরব দীর্ঘ-শ্বাসে, পদদলিতের আকুল আর্ত্তনাদে ধরিত্রী পরিপূর্ণ—কেমন করিয়া মনকে প্রবোধ দিব—"এ-ধরণী আনন্দলোক"? যেখানে মানুষের রক্তের স্রোতে নিরন্তর হিংসাদেবীর পূজা চলিয়াছে—সেখানে আনন্দের আশা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়।

তবে কি শ্রুতির এই মিথ্যাবাণী দুঃখপ্রপীড়িত অন্তরাত্মাকে আরও গভীরতর দুঃখে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত স্তোকবাক্য মাত্র? মানুষ যদি আনন্দের অধিকারী নয়, তবে তাহার চারিদিকে বিপুল সৌন্দর্য্যের আয়োজন কেন রহিয়াছে—কেন আনন্দের লহরলীলা বিশ্বের হৃদ্‌পিণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে? প্রভাতারুণের গলিত স্বর্ণরশ্মি, বিহঙ্গের মৃদুমধুর কাকলী, পুষ্পিত কুসুমকুঞ্জ, নবীনবসন্তে মধুলিহের গুঞ্জন, শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না, প্রশান্ত নদীতীরে নিদাঘের সূর্য্যাস্ত—কেন এইসকলে প্রকৃতি আনন্দের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। যেখানে নবীন মেঘ অম্বর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকে সরস বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে, বর্ষার স্নেহস্পর্শে বসুন্ধরা দিগন্তে শ্যামশোভা বিস্তার করে, পাহাড়ের কঠোর হৃদয়ে স্রোতস্বিনীর জন্ম হয়, যে বিশ্ব আনন্দের নিত্য নিকেতন, সেখানে মানুষের এত দুঃখ কেন? এ আনন্দরসামৃতপানে কে তাহাকে বঞ্চিত করিল—এ দারুণ দুর্ভাগ্য কাহার ক্রুর অভিশাপে? সত্যই আনন্দ হইতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আনন্দলোকের সে অস্পষ্ট স্মৃতি বোধ হয় শৈশবেও আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু জীবনে যতই অগ্রসর হই ততই "ছিন্নতুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়—জীবনের তাপদগ্ধ ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে"! মানুষ তাহার জন্মগত অধিকার নিজের কর্ম্মদোষে নষ্ট করিয়াছে। ইহা আর কাহারও দোষ নয়—তাহার স্বখাত সলিলে আত্মনিমজ্জন। লোভের পরিচর্য্যায় তাহার সমাজের সামঞ্জস্য ভঙ্গ

* আদি ব্রাহ্মসমাজে ৮ই মাঘে বিবৃত।

হইয়াছে। অতিলোভী জগতের সমস্ত বিত্তকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দীনদরিদ্রকে পদদলিত করিয়াছে—হিংসা আসিয়া তাহার রাষ্ট্রনীতি কলুষিত করিল; অনাচার তাহার স্বাস্থ্যকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিল; ভ্রান্তধারণা কুসংস্কার তাহার ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত বিমলিন করিল। জানিনা কোথায় ছিল মানুষের আত্মকৃত অপরাধের বীজ, যাহা মানবের অজ্ঞাতে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নাশে অগ্রসর হইয়াছে।

কে মানুষকে তাহার এই দারুণ দুর্দ্দিনে আশার সঞ্জীবনী সুধা পান করাইবে? সেই আশার বাণী যদি সত্যই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহাতে যদি আত্মনির্ভরে সমর্থ হই তবেই ত উৎসব যথার্থ উৎসব বলিয়া উপলব্ধ হইবে; নচেৎ মিথ্যা আলোকমালা, মিথ্যা আনন্দের সঙ্গীত; মিথ্যা আমাদের মিলন, যদি এই মিলনে পরস্পরের ভগ্ন হৃদয়ে নব প্রাণের নূতনতর প্রেরণা না জাগিয়া উঠে—পূর্ব্বেরই মত ক্ষুধিত হৃদয়ের হাহাকার যদি হৃদয়ে থাকিয়া যায়। যাঁহার জন্য এই জীর্ণ জন্মতরী বাহিয়া এতকাল চলিয়াছি, তাঁহার আভাস যদি উৎসবগৃহে না পাই তবে ত উৎসব অবসাদেই পরিণত হইবে। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ অরণ্যের গম্ভীর নীরবতা বিদূরিত করিয়া একদিন এই আশার বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

জরামরণভয়ে মানবকুল যখন ব্যাকুল তখন সেই ব্রহ্মবাদী ঋষি শঙ্কিত নরনারীকে আহ্বান করিয়া প্রবোধ দিলেন—"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর"। এই সম্বোধনের মধ্যেই কত মধুরতা, মানবজাতির প্রতি তাঁহার কত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে! তিনি 'অমৃতের পুত্র' এই সম্বোধনের দ্বারা আমাদের সকল শঙ্কা বিতাড়িত করিতেছেন—মানব অমৃতের পুত্র অতএব জরামৃত্যুবর্জ্জিত; মানব দিব্যধামবাসী সুতরাং পৃথিবীর কলুষ মর্ত্ত্যের মলিনতা তাঁহার নিকট ভ্রান্তিমাত্র।

এমনই স্নেহময় স্বরে আশার অমৃতময় আলোকে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আলোকিত করিয়া সেই দেবর্ষি উৎসুক শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—যাহা কোনও মানব কাহাকে কখনও বলেন নাই। ঋষির উদাত্তস্বর আরও উচ্চে উঠিল—কৈলাসশিখরে ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত সেই গম্ভীরধ্বনি কৌতূহলী ঋষিগণের হৃদয় স্পর্শ করিল।

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
> মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। হে আধিব্যাধি দুঃখদৈন্য-কাতর সংসারবাসী মানবগণ মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আর ভয়ের কারণ নাই—দূর কর তোমাদের চির-আশঙ্কাসঙ্কুল হৃদয়ের স্পন্দন; তোমরা দিব্যধামবাসী, তোমরা অমৃতের পুত্র—সংসারের বিস্মৃতিবারি পান করিয়া তোমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ; তাই আজ সেই পরম সত্য তোমাদিগকে শুনাইতেছি—মিথ্যা মায়ার ছলনায় তোমরা আত্মতত্ত্ব পাশরিয়া মৃত্যুর অভ্রভেদী প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ মনে করিতেছ—একবার জ্ঞাননয়ন উন্মীলন করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষকে, মানবের মধ্যে যে চৈতন্যময় ভূমা বাস করিতেছেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর; তাঁহাকে জানিলে—সূর্য্যোদয়ে তিমিরনাশের ন্যায় তোমাদের জন্মার্জ্জিত অজ্ঞানতা নাশ হইবে, মৃত্যুর কঠোর লৌহশৃঙ্খল তোমার পদতলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে—আমি এই ভূমাকে উপলব্ধি করিয়াছি তিনি সত্যই আছেন—তিনি অস্তি, ভাতি, প্রিয়; সন্দেহের কোন কারণ নাই; তোমরাও উপলব্ধি কর—তোমাদের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইবে—সমস্ত সংশয়ের অবসান হইবে—মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

এই মহা অভয়বাণী যে দিন প্রথম উচ্চারিত হয়, সে দিন বনবিহঙ্গ কাকলী ত্যাগ করিয়া এই অমৃত পান করিয়াছিল—আকাশের গাঢ় নীলিমা আরও নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল—সামগান-মুখরিত তপোবনের হোমধেনুগণ যে অমৃত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিল, আর কোনও দিন তাহার আস্বাদন তেমন মধুর হয় নাই; রোগশোকমৃত্যুবহা, সর্ব্বংসহা, লক্ষ দুঃখক্লিষ্টা মানমুখী ধরণী সে দিন ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সেই দিন গিয়াছে মানবের যথার্থ উৎসবের দিন। তারপর কতদিন অতীত হইল—কত যুগ যুগান্ত অনন্ত কালের কোলে বিলয় প্রাপ্ত হইল—প্রতিদিন কত ঋষি সুরলহরীতে গগন কম্পিত করিয়া এই উৎসবের গান গাহিয়াছেন—তাঁহাদের হৃদয়ের উপলব্ধি ও নব প্রেরণার দ্বারা ঐ শ্লোকের প্রতি ছন্দ প্রতি যতি নিত্য সুমধুর হইয়া বিশ্ববাসীর বেদনাপ্লুত প্রাণে অমৃতের ধারা সিঞ্চন করিয়াছে। উৎসবের প্রারম্ভে আমরাও এই বলিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন প্রেরণা নব শক্তি অনুভব করিতে চাই যে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই—যে অশুভ যে অমঙ্গল যে বিপদ পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের বুকের উপর পাষাণ-ভার চাপাইয়াছে তাহা মিথ্যা; যে তিমির আমাদের জ্ঞানসূর্য্যকে গ্রাস করিয়াছে তাহার নাশ হইবে—কেননা তিমির মিথ্যা সূর্য্যই সত্য, মিথ্যার দ্বারা সত্যের চিরন্তন গ্রাস অসম্ভব।

উৎসবের দিনে এই সত্য আমাদের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের প্রতিদিবসের দুঃখ-দৈন্যের সঞ্চিত গ্লানি দূরে যাউক। হে অন্তর-যামিন তুমি অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি যে পুত্র কলত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয়তর, এ সত্য আজ আমাকে অনুভব করাইয়া দাও—আজ পড়ে থাক পশ্চাতে আমার মোহগ্রস্ত জীবনের যত পুঞ্জিত অবসাদভার, আমার সমস্ত ক্ষতি পথের ধুলায় লুণ্ঠিত হউক। তুমি আমার প্রাণে, আমার শিরায় শিরায় আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে তোমার আগমনের উদ্বেলিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত কর। তুচ্ছ হউক :আমার সমস্ত মর্ম্ম-বেদনা। আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হে হৃদয়নাথ আমার সকল চেতনা মন্থন করিয়া জলদগম্ভীর মন্ত্রে একবার নব উৎসাহের বাণী শুনাও। আমি আমার সমস্ত জীর্ণতা অমৃত করিয়া নবজীবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করি—আমায় [উদ্বোধনের অমোঘ মন্ত্র শুনাও—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত"।

জানি আমি, তোমাকে পাইবার পথ কুসুমাকীর্ণ নয়,—শাণিত, ক্ষুরধারের ন্যায় তাহা দুর্গম; পতন অভ্যুদয় হর্ষ অবসাদ রোগ শোক মৃত্যুর মধ্য দিয়াই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—সে পথ কখনও সূর্য্যকরোজ্জ্বল কখনও বা আবার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জানি মাঝে মাঝে বুকের উপর কঠোর অশনিপাত হইবে, কাল-বৈশাখের দুরন্ত ঝটিকা দিগন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া দিক্‌ভ্রান্ত করিবে—সেদিন হে মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, তুমি আমার প্রাণে প্রাণে বলিও—ভয় নাই, ভয় নাই। জানি হে ভৈরব, শ্মশান ও সংসার তোমার নিকট সমান প্রিয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই তোমার তুচ্ছ ক্রীড়নক। আমাকেও সেই বর দাও যেন আমি সমস্ত অবহেলা করিয়া আপনাকে তোমার পথে চালিত করিতে পারি—মানুষের মধ্যে তোমার যে বিরাট অবস্থিতি যে বিপুল অস্তিত্ব যে সত্য স্বপ্রকাশ আছে তাহা আমার জ্ঞাননয়নের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠুক। তুমি ভূমা, তুমি বৃহৎ, তুমি অনন্ত আনন্দ-রসের আকর। আমি নিজের ক্ষুদ্রত্বে নিজের হীনতায় লজ্জায় অবসাদগ্রস্ত। এস তুমি প্রভু—আমার হৃদয়-মন্দিরে—সকল বিরোধ শান্ত হউক—সর্ব্ব দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হউক। হে রাজরাজেশ্বর তুমি বীরবেশে অবতীর্ণ হও—তোমার উপস্থিতিতে আমার পাপ-তাপ-লজ্জা-ভয় মূর্চ্ছিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক—তোমার শাণিত কৃপাণ স্বীয় দীপ্ত আলোকে দিগন্তবিস্ফুরিত করিয়া ভীরুর ভীতিসঙ্কুচিত জড়ত্ব দূর করুক—সে রাজবেশের সম্মুখে আমার স্তম্ভিত রিপুগণ প্রণত হইয়া তোমার জয় ঘোষণা করুক।

উৎসবের উদ্বোধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে আমরা সকলে যে মিলে জুলে বিশ্বমাতার চরণবন্দনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। এই উপাসকমণ্ডলীকে আমি আর উদ্বোধিত করিব কি—আমি এই ভক্ত-মণ্ডলীকে বেশী আর কি জাগাইয়া তুলিব? উৎসবের বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তো সেই বিশ্বমাতা আমাদের সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। যে অবধি বোধনের বাঁশী আমাদের কানের ভিতর

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে ১১ই মাঘের প্রাতঃকালে বিবৃত।

প্রবেশ করিয়াছে, সেই অবধিই তো আমাদের সকলের প্রাণে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বমাতা আমাদিগকে যে ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা নূতন করিয়া আর কি প্রকারে সকলকে জাগাইয়া তুলিব, তাহা তো জানি না। ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের হৃদয়ে আজ অজস্রধারে নামিয়া আসিয়াছে, তাই আজ আমরা আপনারাই সজাগ হইয়া বিশ্বমাতার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি।

যিনি বিশ্বের মাতা, তিনি যে আমাদের প্রত্যেকেরও মাতা। যে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাগীরথী আমাদের প্রাণে নামিয়া আসিয়াছে, সেই ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়া প্রত্যক্ষভাবে সেই মাতার চরণবন্দনা করিতে হইবে, সেই মায়ের পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে এখনই এখানেই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ করিব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে তিনি ঈশ্বরকে কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে কেবলই ঈশ্বর ঈশ্বর করেন? তাহার উত্তরে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে সম্মুখের দেওয়াল অপেক্ষাও তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন। বাস্তবিক, প্রত্যেক সাধকেরই এই কথা। তাঁহারা যে বলেন যে, সাধনা করিলে ভগবানকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো দেখা যায়, ইহার অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। যে দেশের শতসহস্র লোক চকিতের মতোও তাঁহার দেখা পাইবার আশা পাইলে পাগল হইয়া উঠে, পদতলস্থ ধূলিকণার মত সমস্ত বিষয় বিভব আহ্লাদের সহিত পরিত্যাগ করিতে পারে, যে দেশের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্যই হইল তাঁহাকে লাভ করা, সে দেশের লোককে একথা বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া। ঐ যে শতসহস্র বর্ষের প্রাচীন সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি হিমালয়ের উন্নত শিখরদেশে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতবাসীর নাস্তিকতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি এই মহান পুরুষকে জানিয়াছি, আমাদেরও প্রত্যেককে মহানাস্তিকতার সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়া সেই অমিততেজা ঋষির সহিত একপ্রাণে বলিতে হইবে—আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সম্পদের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এক একটা উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভগবানের কৃপার কথা মুখে বলিলে চলিবে না; সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে, আমোদ আহ্লাদের মধ্যে এবং কশাঘাতের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, সকল অবস্থাতে, প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সত্যসত্য তাঁহাকে জাগ্রত মূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। হিন্দুজাতি এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসকেও হংসমন্ত্র জপ বলিয়াই স্থির করিয়া বসিলেন। আমাদের সেইটাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রাচীন ঋষিদের, ভারতের অগণিত সাধক ও সাধু পুরুষদিগের অমূল্য ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যত মূলধন পাইয়াছি, এত মূলধন অন্য কোন দেশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। সেই মূলধনকে অবহেলা না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সেই মূলধন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এই কার্য্যে আমাদের বিশেষ সহায় জানি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয়।

বর্ত্তমান যুগের যে একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, সে অবস্থায় আমাদের আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। এমন সুন্দর অবসরকে অবহেলা করিয়া হারাইলে চলিবে না। একদিকে গৃহে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে যত্নে পালন করিতে হইবে, আমাদের আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড় করাইতে হইবে; অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি লইয়া আসিতে হইবে। এমনটী করিতে হইবে, যেন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিশ্রদ্ধার কণাগুলি মিলিয়া মিলিয়া ভগবান ও আমাদের মধ্যে একটী ভক্তিস্তম্ভ রচিত হয়। সেই স্তম্ভ যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সমস্ত জনসমাজকে যেন ভাসাইয়া দিবার শক্তি ধারণ করে। এমনটী

করিতে হইবে, যেন ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিশ্রদ্ধার তড়িৎ-আধার হইয়া উঠে—যথা সময়ে উপযুক্ত ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী যখন তাহা স্পর্শ করিবে, তখনই তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিক অগ্নিময় করিয়া তুলিবে।

আজিকার এই উৎসবের মুখে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাণমনকে বিশ্বমাতার পূজার উপযুক্ত করিয়া, বিশ্বের আরতির সঙ্গে আমাদেরও আরতি যোগ দিয়া উৎসবকে সত্য-সত্যই সার্থক করি। আমাদের প্রত্যেকের মাতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও যেন প্রাণ ভরিয়া এই আশ্চর্য্য বার্ত্তা শুনাইয়া দেশবিদেশকে জাগাইয়া তুলি যে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং সেই তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি, আমাদের মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তোমরাও নির্ভয়ে এখানে এসো এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও।

ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্রাহ্মসমাজ।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া জনসমাজ উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। ছোট-খাট আঘাত তো দিবারাত্র চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে জনসমাজ বিচলিত হয় না। বিপুল বিদ্যাবত্তায় যাঁহারা তেজস্বী, চরিত্রবলে যাঁহারা গরীয়ান, অমিত উৎসাহ লইয়া যাহারা অবতীর্ণ, সর্ব্বতোমুখী যাঁহাদের প্রতিভা, তাঁহারা জনসমাজের অবস্থা বুঝিয়া উহার হিতকল্পে যে আঘাত দান করেন, তাহা ব্যর্থ হয় না। কিন্তু এই আঘাতদানে তাঁহাদের সবিশেষ নিপুণতা দেখিতে পাই। প্রতিঘাতের এমন সামর্থ্য হয় না, যাহাতে সে আঘাতের বেগকে প্রতিহত করিতে পারে। সেই গুরু আঘাতের ফলে জনসমাজের মোহনিদ্রা চির অপসারিত হইয়া যায়।

বৈদিক দেবতাবাহুল্যের মধ্যে একেশ্বরবাদ অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে বহমান থাকিলেও, যখন জনসমাজ কূল হারাইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন উপনিষদের গুরুগম্ভীর বাণী সমুত্থিত হইল। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া উঠিলেন, "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" এই যে বহুদেবতার কল্পনা, ইহা বহু দেবতার আরাধনা নহে, উহা একেরই পূজা। তাঁহারা আরও বলিলেন "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়ংঅগ্নিঃ, তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ অগ্নি আমাদের উপাস্য দেবতা নহে, তাহারা স্বয়ং-প্রভ নহে, কিন্তু সেই একেরই তেজে তাহারা তেজস্বী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। যখন যাগযজ্ঞ ধর্ম্মের প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছিল, তখন উপনিষদ্ নির্ভয়ে ঘোষণা করিলেন, "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" যজ্ঞরূপ অদৃঢ় ভেলার সাহায্যে ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়া অসম্ভব। উপনিষদের এই যে আঘাত, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। প্রতিঘাত উপনিষদের সমুচ্চ কণ্ঠকে ডুবাইতে পারে নাই।

যখন ক্রিয়াকাণ্ডের ফললাভকামনা বিপুল হইয়া জনসাধারণের চিত্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ভেরী ধ্বনিত হইয়া এক আঘাত প্রদান করিল। ফলকামনারাহিত্য, কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তব্যের সাধনা, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাধন, এই যে নিষ্কাম ধর্ম্মের বাণী, তাহা প্রতিঘাতের ক্ষীণকণ্ঠকে ডুবাইতে পারিয়াছিল।

যূপবদ্ধ পশুর ভীষণ আর্ত্তনাদ যখন দারুণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন যাজ্ঞিকগণ পশুহননের নিষ্ঠুরতা নিজে অনুভব করিয়া যজমানকে স্তোক দিবার জন্য "বধোঽবধঃ" যজ্ঞার্থ পশুবধ বধই নহে, কিন্তু অবধের প্রতিরূপ, এই বাক্যের সহায়তা লইয়াছিলেন, তখন দুইটী বিভিন্ন যুগে দুইটি বিভিন্ন আঘাত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। "সদয় দর্শিতপশুঘাত" বুদ্ধদেব ও বহুশতাব্দী পরে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব জনসমাজের চিন্তা ও সাধনার উপরে দুইটি স্বতন্ত্র আঘাত প্রদান করিয়াছিলেন। "জীবে দয়া" এই যে মহাসত্য তাঁহারা নির্ঘোষিত করিয়া গেলেন, তাহা মাংসলোলুপ জনগণের মধ্যে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। প্রতিঘাত তাঁহাদের যুক্তির উপরে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই।

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ সায়ংকালে বিবৃত।

এইরূপে আমাদের দেশের চিত্তের উপরে কত যে আঘাত-প্রতিঘাত তরঙ্গের মত চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা অতীতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যচরিত্র যে বিগঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা ঐ ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণাম মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজ কোন্ আঘাত লইয়া বঙ্গদেশে বলি কেন, সমগ্র ভারতে অবতীর্ণ, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব। আমাদের এই পুণ্যভূমি এইরূপ একটি আঘাত লাভ করিবার জন্য সত্য সত্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ৯০ বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের একটি জীবন্ত চিত্র কল্পনার মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হও। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার খরতর কিরণ এ দেশে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার আয়োজন করিতেছিল, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতে বসিয়াছিলাম; অন্যদিকে কালব্যাপী প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা কতকটা হারাইয়াছিলাম, দেবার্চ্চনার ভার কতক পরিমাণে গুরুপুরোহিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অন্ধ ধারণা লইয়া জীবন ক্ষেপণ করিতেছিলাম, আমরা ভাবে ও চিন্তায় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দুন্দুভিনিনাদে আমাদের লুপ্ত চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অমিত তেজে যে আঘাত প্রদান করিলেন, তাহার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিঘাতে সে আঘাত আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

রামমোহন রায়ের নিপুণতা ঠিক এইখানে। তিনি নূতন ধর্ম্মপ্রচারের ভাণ করিয়া প্রচারে অবতীর্ণ হন নাই। বেদ-বেদান্ত বলিতে গেলে যাহা বঙ্গদেশ হইতে একভাবে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ফিরাইয়া আনিলেন; সমাজের ধারার উপরে বিশেষ আঘাত প্রদান না করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন, শিক্ষিত ও পিপাসু মণ্ডলী যে অধিকার চান, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের সেই প্রকৃত অধিকারে অধিকারী করিয়া দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন এ দেশে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র যখন শাস্ত্রভাণ্ডার সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে, ব্রাহ্মণেতর জাতির কথা দূরে থাকুক, ইউরোপের সুধীগণ যখন অবাধে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ও প্রকাশকরূপে অবির্ভূত হইয়াছেন, তখন প্রাচীন ধারাকে শিথিল করিবার সময় উপস্থিত, প্রাচীন পদ্ধতির সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের গঠনকার্য্য ঠিক এইখানে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন জাতিগতভাবকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য উহার সহিত অকারণ বিবাদ ঘোষণা করেন নাই। এই জাতিগতভাব যাহা শত শত বিপ্লবের মধ্যে, বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে চূর্ণ হইতে দেয় নাই, যে জাতিগতভাবের প্রভাবে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠন, সাহিত্য শিল্প, আয়ুস্তত্ত্ব কলাবিদ্যা, সমরকৌশল, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নিয়ম-প্রণালী, কৃষিবিদ্যার সৌষ্ঠব অন্তর্ধান করে নাই, সাত্ত্বিকতা, ধর্ম্মভাব, সভ্যতা ও বিনয় সমস্তই রক্ষা পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে, আমরা চাই নব নব অধিকারদানে উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিতে, উদারতার উপরে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে।

আমাদের এই হিন্দুসমাজ, হিন্দুপ্রকৃতি পাষাণের কাঠিন্যে বিগঠিত নহে। স্থিতিস্থাপকতা ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিরাজমান। রামমোহন রায় যে কয়েকটি সংস্কার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেবল ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কেন, সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে তাহা বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতার একটি সীমা আছে। সময়েরও একটি ব্যবধান আছে। সেই সীমাকে এক নিঃশ্বাসেই অতিক্রম করিতে চাহিলে, সময়ের ব্যবধানকে একেবারেই সঙ্কোচ করিতে গেলে, সংস্কারের নামে হিন্দুজাতির মৌলিকতা, তাহার অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা, যাহা চিরদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারেই নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবকে অচিরে নির্ম্মূল করিয়া দিবে।

আমাদের স্পর্দ্ধা করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই চির-দরিদ্র ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, জনসাধারণের সরস চিত্তকে বিশুষ্ক করিয়া তুলিবে।

ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আমাদের সকলের ব্রত হইলেও, ধর্ম্মসংস্কারকে উপরিতন সমুচ্চ আসন প্রদান করিতে হইবে; উহারই কল্পে আমাদের অধিকাংশ চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ আমাদের সহিত নির্ভয়ে মিলিত পারেন, তাহার পথ প্রমুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। যাহাতে আগন্তুক দল আমাদের সহিত অসঙ্কোচে মিলিত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমাদের সহিত সমস্বরে ও অসঙ্কোচে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। নিষ্ঠার উপরে, পবিত্রতার উপরে, সাধনের উপরে সর্ব্বোপরি সত্যের উপরে, ত্যাগের উপরে, সংযমের উপরে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বন্ধু-বান্ধবকে তাহার বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। তাঁহাদের সহিত কোন বিষয়ে আমাদের সামান্য মতপার্থক্য থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কেহই হেয় বা পরিত্যাজ্য নহেন, সকলেই আমাদের বন্ধু, সখা, সুহৃদ্, সকলেই ব্রহ্মধামের যাত্রী। আমাদের জ্ঞানে তাঁহাদিগকে উদ্ভাসিত করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের নিষ্ঠায় আমাদের জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। ধর্ম্মজগতে অভিমান অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের কোন স্থান নাই, এ কথা সকল অবস্থায় আমাদের অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইবে। হইতে পারে সমাজসংস্কার লইয়া পরস্পরের মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কিন্তু আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে এই বিশাল হিন্দুসমাজ ঠিক এক অবস্থায় দাঁড়াইয়া নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ বিভক্ত হইলেও কত অবান্তর জাতির উৎপত্তিতে উহা আরও খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে,—কে তাহার গতিরোধ করিবে? বর্ত্তমান সমাজসংস্কার অনেকের চিরানুগত ও চির-ঘোষিত মতের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু তাহার দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবকে বিচার করিলে চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্তই সারবান। উহার সুশীতল ছায়ায় সকলেই শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন; জ্ঞান প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে; ভক্তি পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিবে; মিলনের ডোরে একসূত্রে সকলকে গাঁথিয়া তুলিবে।

আমাদের এই আদিব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারকে আপনার বিশেষ লক্ষ্যীভূত না করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্য পরিবেশন করিবার জন্য আবির্ভূত। মহাত্মা রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত ঠিক সেই এক উদ্দেশ্যে অমৃতধারা বরিষণে জনসাধারণের চিত্তকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন বৌদ্ধ-বহুল ভারতে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতার উপরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সত্যধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, যে সত্যের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার নয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমরা চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি। নানা নামে নানা ভাবে ইহার প্রভাব ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশার বাণী চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইতেছে। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের উপরে যদি এ দেশবাসীর শ্রদ্ধা থাকে, শ্রুতিপ্রমাণের উপরে যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রতি যদি সমাদর থাকে, তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলপ্রকার প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া জীবন্তভাবে আপনাকে প্রসারিত করিয়া তুলিবে।

আমরা অতীতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া, ভারতের সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া এই মহামহোৎসবে মিলিত হইয়াছি। সেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন।

এই পুণ্য মাসের পুণ্য তিথিতে শান্ত প্রাণে তাঁহার অশব্দ বাণী শ্রবণ কর। সংসারসংগ্রামের ভিতরে পড়িয়া যদি জীবনী শক্তি হারাইয়া থাক, তাঁহার নিকট নবজীবন ভিক্ষা কর, সন্দেহদোলায় পড়িয়া যদি জর্জ্জরিত হইয়া থাক, তাঁহার নিকট নব দীক্ষা প্রার্থনা কর। হৃদয় যদি বিশুষ্ক হইয়া থাকে, প্রার্থনা কর "সরস প্রেমের বরষা" তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে, তোমার দুঃখদুর্গতির অবসান হইবে।

ভগবন্! উৎসবের ভিতর দিয়া তুমি অন্তরে নব প্রেরণার সঞ্চার করিতেছ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তোমার আশীষ অন্তরে অবতীর্ণ হইতেছে, মন্ত্রের ভিতর দিয়া তোমার সত্যের আলোকে হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছ। তুমি আজ অন্তরে যে জাগরণ প্রেরণ করিলে, তাহা যেন আমাদের দোষে সুষুপ্তিতে পরিণত না হয়; চিরজীবন ধরিয়া জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে তোমার প্রেমে, তোমার আনন্দে—তোমার নাম গানে—তোমার মহিমা প্রচারে; জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে মিলনে সদ্ভাবে; জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে সত্যে ও ত্যাগে।

নূতন-ব্রহ্মসঙ্গীত।

রামকেলী—তেতালা।

মন জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগন ভরি জাগে সুন্দর,
জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর,
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—ঠুংরী।

নমি নমি চরণে নমি কলুষহরণে।
সুধারসনির্ঝর হে (নমি নমি চরণে)।
নমি চিরনির্ভর হে মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন গেল রাত্রি, (নমি নমি চরণে)
জাগিল অমৃতপথযাত্রী নমি চির পথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে
নমি জয়পরাজয়ে।
অসীম বিশ্বতলে (নমি নমি চরণে)
নমি চিত-কমলদলে নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * *

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে,
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয় মাঝে আসি লাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণ পাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি রহি মম মন মগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবি রাগে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী খট—তাল ঝাঁপতাল।

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে!
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলহে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে!
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তি রসপানে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—ঠুংরী।

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই,
তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে,
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার,
হারায় না সে আর।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা কাছে দাঁড়ান উর্দ্ধকরে
তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে রতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালিদাসের সময়নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় মত যদি মান্দালোর আলেখমালার দ্বারা মৃষাকৃত হয় এবং ২য় মতটি যদি উপরোক্ত তিনটী প্রতিজ্ঞার খণ্ডনের দ্বারা অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে ১ম মত ভিন্ন অন্য কোনও মত থাকে না। তাহা হইলে প্রথম মতটি স্বীকার করিবার বিশেষ কোনও বাধা থাকে না।—তথাপি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ না হইলে প্রথম মতও দাঁড়ায় না। এই সমস্ত মতামতের খণ্ডন বা মণ্ডনের পূর্ব্বে কয়েকটী অবশ্য স্বীকার্য্য বিষয়ে প্রণিধান প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস খৃং পূঃ অব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক অগ্নিমিত্র একজন ঐতিহাসিক নৃপতি। তিনি পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্রের পুত্র এবং বসুমিত্রের পিতা ; এই পুষ্পমিত্রই মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মৌর্য্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন। তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের কথা মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে দেখিতে গেলে কালিদাস রাজা হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার কোনও সংশয় নাই। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাং তাঁহার কথা লিখিয়াছেন—হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিরাজমান ছিলেন। বাণভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতের প্রারম্ভে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রধান প্রধান উজ্জ্বলমণির উল্লেখ করিয়াছেন—এই হর্ষবর্দ্ধনের ও পুষ্পমিত্রের ঐতিহাসিকতা এবং সময় সম্বন্ধে কোনওরূপ মতদ্বৈধ নাই। কাজেই কালিদাস খৃঃ পূঃ ২য় অব্দ এবং ৭ম খৃঃ অব্দ এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধ হইতেছে।

আমরা পরে দেখিব যে দ্বিতীয় মত অর্থাৎ প্রোফেসার ম্যাকডনালের মত কোনওরূপেই সমীচীন নহে। কালিদাসের গ্রন্থাবলী এই মতের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। অন্য গ্রন্থ হইতেও এই মত খণ্ডিত হয়। তজ্জন্যই বোধ হয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দ্বিতীয় মত খণ্ডন করিয়া তৃতীয় মতের ন্যায় আর একটি মত স্থাপনা করিতে চাহেন। তিনি মান্দালোর লেখমালা কৈফিয়ত দিয়া উড়াইতে চাহেন এবং কালিদাসকে যশোধর্ম্ম ধর্ম্মবর্দ্ধনরাজের সভাপণ্ডিত কল্পনা করেন। পরম্পরালব্ধ ইতিহাস বা কাহিনী তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একটা অর্থাপত্তিও তিনি দিতে রাজি নহেন—এ বিষয়েও আমরা পরে বিচার করিব। তবে মোটামুটি বুঝিলেও দেখা যায় যে এই মত অনুসারে বাণভট্ট ও কালিদাসের মধ্যে বেশী দিনের পার্থক্য নাই। কিন্তু বাণভট্টের সময় কালিদাস লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্ত (বা সূক্তি) ঋষিবাক্যের নাম। বাণভট্ট কালিদাসের রচনাকে সূক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন "কালিদাসস্য সূক্তিষু"। বাণভট্টের সময় তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। পূর্ব্বে ছাপা দ্বারা বহি চলিত না। কবি বড় না হইলে তাঁহার রচনা কে নকল করিবে? নিজদেশে বা নিজ সভায় কবি হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু অন্যত্র সমাদৃত হইতে এই নকল করিবার প্রথা দ্বারা অনেক সময়ের প্রয়োজন হইত। হর্ষচরিতের উপক্রমণিকায় আমরা ভবভূতির নাম পাই না। কালিদাস হইতে বাণভট্ট অনেক দূর একথা সহজেই প্রতীত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এইমতের আলোচনা আমরা পরে করিব। দ্বিতীয় মত খণ্ডনের সহিত এই মত খণ্ডিত হইবে।

এক্ষণে দ্বিতীয় মতের পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে কালিদাস মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাপণ্ডিত। ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা শালিবাহনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কবিগণ নিজ বংশাবলী দিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতা নৃপতির প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। উত্তরোত্তর আমরা দেখিতে পাই, নৃপতিপ্রশংসা প্রবল চাটুকারিতায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের প্রশংসাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালিদাসের লেখায় এরূপ কোনও লক্ষণ পাই না। কিন্তু স্পষ্টভাবে আশ্রয়দাতার কোনও বর্ণনা না থাকিলেও তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বা ব্যঞ্জনার দ্বারা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুবংশের ষষ্ঠসর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরপাঠে আমরা অবন্তিপতির বর্ণনা

দেখিতে পাই—এই ষষ্ঠসর্গ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন। অজরাজের সমসাময়িক বর্ণনা করাই মহাকবির উদ্দেশ্য কিন্তু এরূপ বর্ণনায় কালিদাসের সমসাময়িক ভাবের ছায়া পড়া অবশ্যম্ভাবী।

অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমিমুষ্ণতেজা ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি॥

এই বীরত্বের উজ্জ্বল বর্ণনা বড়ই সুন্দর। ইহা পড়িয়া বোধ হয় যে মহাকবি অবন্তির কোনও রাজার সভাসদ ছিলেন। ইন্দুমতীর আচরণও কিছু বিচিত্র হইয়াছে। অজ হইলেন স্বয়ম্বরের নায়ক। অবন্তিনাথকে ছাড়িয়া অজকে বরণ করা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কালিদাস নায়ককে ছোট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিশয় কোমলপ্রকৃতি ইন্দুমতীর এই উজ্জ্বল বীরত্ব বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্॥

ইহা দ্বারা কালিদাস বীরত্বহিসাবে অজকে অবন্তিনাথ অপেক্ষা ছোট করিতেছেন। কে এই অবন্তিনাথ? উপরোক্ত প্রথম শ্লোকই ইহার উত্তর দিতেছে,—প্রথম চরণে শারীরিক ক্ষমতা অর্থাৎ "বিক্রম", দ্বিতীয় চরণে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের মুর্ত্তির বর্ণনা অর্থাৎ "আদিত্য"; এই শ্লোক দ্বারা মহাকবি বিক্রমাদিত্যের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা করিতেছেন—দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ অংশটিরও একটু বিশেষত্ব আছে। পরম্পরালব্ধ কাহিনী বা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাপাঠে আমরা অবগত হই যে ভানুমতী বিক্রমাদিত্যের রাজ্ঞী (দেবী); শেষ অংশে একটি শ্লেষ অনুমিত হয়—এই বীরশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিতে ভানুমতী যে ভাব ধারণ করিয়াছেন সেই ভাব অতি সুকুমার ইন্দুমতী ধারণ করিতে পারিলেন না। কিম্বা 'ভানুমতি' অর্থাৎ সূর্য্যে বা সূর্য্যস্বরূপ এই নৃপতিতে ইন্দুমতী সেরূপ ভাব ধারণ করিতে পারিলেন না।

এই শ্লোকদ্বয় হইতে আমরা দুইটি কথা বেশ বুঝিতে পারি:—

(১) কালিদাসের সময় প্রকাশ্যভাবে আশ্রয়দাতার প্রশংসা করা শ্লিষ্টতার বিরুদ্ধ ছিল. নিজের প্রশংসাও অতিশয় গর্হিত ছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ খৃঃ শতাব্দী হইতে এই প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। সেই সময়ের লেখমালা ইত্যাদি পাঠে দেখা যায় কবিগণ নিজদের প্রশংসা ও বংশাবলী লইয়া ব্যস্ত—ভবভূতির মালতীমাধব এবং বাক্‌পতির "গৌড়বহো" এই প্রথা দ্বারা অভিভূত।

(২) এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যঞ্জনা ও শ্লেষ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর অশোক বা প্রিয়দর্শী হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্য্যরাজগণ ও অন্যান্য মহামান্য বৌদ্ধরাজগণ আত্মপ্রশংসা বা আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অনেক সময় তাঁহাদের আত্মকীর্ত্তিই তৎকালীন ইতিহাসের মূলভিত্তি। উচ্চ পর্ব্বতে শিলায় গুহায় এবং প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভসকলে এই আত্মকীর্ত্তি খোদিত। এখনও কতক বর্ত্তমান আছে। এই বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় এই আত্মকীর্ত্তি বড়ই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। আত্মপ্রশংসা মৃত্যুর সমান। পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণ ও কবিগণ এ কথা ভুলিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস মেঘদূতের এক শ্লোকে এই কথা বড় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

যে সমস্ত প্রদেশে মহাবীর অশোকের শিলাস্তম্ভসকল এখনও বিরাজমান আছে তখন তাহা বিজয়কীর্ত্তির প্রস্তরস্তম্ভে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল অশোক নহে, অন্যান্য নৃপতিগণও তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন। এই সকল স্তম্ভকে তিনি "স্থূলহস্তাবলেপান্" বলিয়াছেন। অহঙ্কার অর্থে "অবলেপ" শব্দের ব্যবহার কালিদাসের লেখায় আরও দেখা যায়। "মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাৎ" impertenince বা vanity এই উভয় অর্থও প্রতীয়মান হয়। বৌদ্ধগণ নিজদিগকে "নাগ" বলিতেন; দিগ্‌বিজয়ী নাগগণ "দিঙ্‌নাগ" শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য; "মোটা হাতের দেমাক" বলিলে বোধ হয় অনুবাদ অনেকটা ঠিক হয়।

ষষ্ঠসর্গে আমরা মগধরাজের বর্ণনা দেখিতে পাই। পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ এবং পুষ্পমিত্র স্বয়ং হিন্দু ছিলেন। প্রথম পুনরাগমনের মঙ্গলসূচনাস্বরূপ তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞ হিন্দুদিগের বড়ই প্রিয় হইয়াছিল। কালিদাস তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু ষষ্ঠসর্গে মগধরাজবর্ণনায় বৈচিত্র্য আছে। "রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ" "অজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ" ইত্যাদি বর্ণনায় অশোকচরিত্রের উপর বিশেষ কটাক্ষ দেখিতে পাই। অশোকের edict পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি প্রতি বৎসরে চর বা দূত পাঠাইতেন; তাঁহারা প্রজাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। উৎসবের মধ্যে, যজ্ঞের মধ্যে রাজপুরুষ যাইয়া এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার ফল কিরূপ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা রাজা ধর্ম্মের মালিক হইয়াছিলেন। কালিদাস বলেন রাজার তাহা কাজ নয়। প্রজাকে রঞ্জন করাই তাঁহার কাজ, তিনি দীক্ষাগুরু নহেন। অন্যত্র ৪র্থ সর্গেও কালিদাস বলিয়াছেন "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"। অশোক যজ্ঞ একেবার স্থগিত করিয়া দেন। কিন্তু এই হিন্দুমগধরাজ পরন্তপ রাজার আমলে যজ্ঞের এতই প্রাবল্য যে শচীর তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। অশোকের উপর এই কটাক্ষপাত আমরা রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—

গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীং॥

বৌদ্ধরাজ অশোক কলিঙ্গ (মহেন্দ্র) জয় করিয়া তাহা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কবির বর্ণনায় এইরূপ কার্য্যের উপর কটাক্ষপাত করিয়াই ধর্ম্মবিজয়ের লক্ষণা দিয়াছেন। অশোকের উপর এই কটাক্ষ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নূতন পুনরাবর্ত্তন যে কালিদাসের সময় হইয়াছিল তাহা অনুমিত হইতেছে। এই সকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়েরও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তখনও পুষ্প্যমিত্রের অশ্বমেধ সকলের মনে আছে। পূর্ব্বতন ধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তনসূচক পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ পরিবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে বড়ই পূজ্য ছিলেন তাহা বুঝা যায়; তাই কালিদাস কবি ইন্দুমতীকে দিয়া মগধরাজকে প্রণাম করাইয়াছেন। এই বংশধরগণ কালিদাসের সময় ভোগবিলাসে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের একটা মর্য্যাদা আছে— *

*কুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা,

আর একটি উদাহরণ বড়ই স্পষ্ট আছে—রঘুর দিগ্‌বিজয়। আমরা এই দিগ্বিজয় অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই—অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশ। মগধের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে অযোধ্যা হইতে বঙ্গাভিযান করিতে হইলে মগধবিজয় অবশ্যম্ভাবী। কেবল খাতিরে নাম দেওয়া হয় নাই। বঙ্গ হইতে উৎকল, তৎপর কলিঙ্গ তাহারপর সমুদ্রবেলা অনুসারে দক্ষিণমুখে যাইয়া পুনরায় উত্তর দিকে গমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ হয় নাই। তবে যানমার্গ (route) বুঝিতে কোনও কষ্ট নাই। এইরূপ উত্তর মার্গে আসিয়া সিন্ধুদেশে আগমন। সিন্ধুদেশ হইতে পারস্যদেশ—এখানেও ছোট ছোট প্রদেশের উল্লেখ নাই। পারস্য দেশ হইতে কাম্বোজ, তাহার পর হুন দেশ, তাহার পর হিমালয়পাদদেশস্থ রাজ্যসকল ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন; তাহার পর প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ (আসাম); তাহার পর অযোধ্যায় পুনরাবর্ত্তন। এইরূপ যানমার্গের বৈচিত্র্য বড়ই অভিনব। কিন্তু আসল কথা উজ্জয়িনী রাজ্য বাদ দেওয়া। এই যানমার্গের ভিতর বিক্রমাদিত্যের রাজ্য মালব ও ভোজ (বর্ত্তমান রাজপুতানা) পড়ে না। কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীবিজয় অমঙ্গলঘোষণার ন্যায় বর্জ্জনীয়। আশ্রয়দাতার রাজত্বের পরাজয় তিনি কল্পনায় আনিতেও দিবেন না বলিয়া এই বিচিত্র যানমার্গের সূচনা করিয়াছেন। অন্য কোনও কবি এরূপ দিগ্‌বিজয়ের বর্ণনা করেন নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইল কালিদাস অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার সময় সম্বন্ধে আরও দৃঢ় প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় মত অনুসারে রাজা শালিবাহনের অনেক দিন পরে কালিদাসের প্রাদুর্ভাব বলিতেই হইবে। প্রফেসর বুলার শালিবাহনের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। কবি গুণাঢ্য তাঁহার সভাপণ্ডিত। তাঁহার সময় খৃঃ প্রথম শতাব্দী। এই শালিবাহনের অন্য নাম সাতবাহন ও হালরাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন যে "মহাবীরের অন্তর্দ্ধানের ৪৭০ বৎসর পর বিক্রমাদিত্য রাজা আবি-

ভূর্ত হন। তাঁহার শতাধিক বৎসরের পর প্রতিষ্ঠান নগরে শালিবাহন রাজা হইয়াছিলেন।" প্রতিষ্ঠান শব্দের অর্থ দুর্গ বা Camp। আর্য্যক্ষমতার বিস্তৃতির সহিত আমরা দেখিতে পাই আয়ুর পিতা পুরুরবার সময় প্রতিষ্ঠান (পাঠান) আফগানি স্থানে—তৎপরে প্রয়াগের নাম প্রতিষ্ঠান। তৎপরে দাক্ষিণাত্যে রাজপুতানার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান—কামসূত্রের প্রণেতা বাৎস্যায়ন, কলাপ ব্যাকরণের রচয়িতা এবং বৃহৎকথালেখক গুণাঢ্য এই রাজার সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই শালিবাহনের নামে গাথাসপ্তশতী নামক একটি কোষগ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় সংগৃহীত হয়। বাণভট্ট এই গাথার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

যদি এই গাথায় আমরা কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের প্রভাব বা উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা হইলে ২য় ও ৩য় মত উভয় মতই খণ্ডিত হয়। আর যদি আমরা কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিভাব দেখিতে পাই তাহা হইলে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য খৃঃ প্রথম শতাব্দীর অধিক দিন পূর্ব্বের নহেন তাহাও বুঝিতে পারি। এই গাথার পঞ্চমশতকে একটি শ্লোক (৬৪) এইরূপ—

সংবাহণ সুহরস তোসিত্রণ দেন্তেন তুহ করে লক্‌খং।
চলণেণ বিক্কমাইত্ত চরিঅং অনুশিক্‌খিঅং তিস্সা॥

পুরাতন কাহিনী পাঠে বুঝা যায় বিক্রমাদিত্য রাজা অতিশয় দানশীল ছিলেন। তাঁহার এই দানশীলতাকে গাথা ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা উপহাস করিতেছেন—"লক্‌খং" এই কথার দুইটি অর্থ "লাক্ষাং" অর্থাৎ পায়ের আলতা কিম্বা "লক্ষং" অর্থাৎ লক্ষ মুদ্রা —সুন্দরীর পা টিপিলে যেমন সংবাহকের লাক্ষারস লাভ হয় সেইরূপ বিক্রমাদিত্যকে একটু চাটু করিলেই লক্ষ সুবর্ণের লাভ। কর্ম্মবীর বিক্রমাদিত্যের উপর এই কটাক্ষ স্পষ্ট প্রমাণিত করিতেছে যে বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

উক্ত পঞ্চমশতকে আবার আমরা দেখিতে পাই কবি—শালিবাহনের প্রশংসা করিতেছেন—

আবন্নাইং কুলাইং দোবিখ জাণন্তি উন্নইং নেউং।
গোরীঅ হিঅঅ দইত্তে অহবা শালাহন নরিন্দো॥

কিন্তু শালাহণ (শালিবাহন) রাজার দান প্রকৃত দান। বাস্তবিক বিপন্নকুলকে রক্ষা করিতে তিনি জানেন (অর্থাৎ কেবল চাটুকারে ভুলেন না)। এস্থলেও "আবন্নাইং" কথা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; নৃপতি পক্ষে "আপন্নানি" বিপদ্‌গ্রস্ত। শিবপক্ষে "আপর্ণানি" "অপর্ণা"সম্বন্ধীয়। কুমারসম্ভবের অপর্ণা এবং গৌরীর বিবাহ এই শ্লোক পাঠে স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়। এই শ্লোক লেখার সময় লেখক কুমারসম্ভবের কথাই ভাবিতেছিলেন। এই গাথাতে কালিদাসের প্রভাব অতি স্পষ্ট দেখা যায়। একটু আক্রোশও বেশ বুঝা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই বিক্রমসভার সাহিত্য সন্নিহিত দেশসকলকে মুগ্ধ করিতেছে। শালিবাহনের প্রথম অবস্থায় তিনি সংস্কৃতসাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। গুণাঢ্য প্রাকৃতভাষায় বৃহৎকথা লেখেন। তৎপরে শালিবাহন কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। এস্থলে আমরা কেবল দুইটী উদাহরণ দিব। কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন,—

"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি"॥

কুসুমের ন্যায় কোমলপ্রকৃতি নারীহৃদয় উৎকট বিরহে ঝরিয়া যাইত, কেবল আশারূপ বৃন্ত (আশাবন্ধ) এই পতনোন্মুখ পেলবহৃদয়কে রক্ষা করে। গাথা বলিতেছেন ঠিক কথা কিন্তু একটি অপবাদ Exception আছে—

বিরহাণলো বিসজ্জই আসাবন্ধেন বল্লহজণস্য।
একগ্গামপবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই॥

প্রথম শতক গাথা ৪৩—

একই গ্রামে থাকিয়া যদি বল্লভ না আসেন তাহা হইলে আর এ "আশাবন্ধ" খাটে না—এস্থলে গাথাকার মেঘদূতের আশাবন্ধকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস যে গাথার পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই রহিল না। যেখানে মহারাজ দুষ্মন্ত একবেণীধরা শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্র ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন সেই দৃশ্য সংস্কৃতজগতের কেন, সমস্ত সাহিত্যজগতের অমূল্যরত্ন। চরণপতিত পতির উপরে

শকুন্তলার উক্তি দেবত্বের উজ্জ্বল ছবি। এই স্থানকে উল্লেখ করিয়াই মহাকবি Goethe বলিয়াছেন "All by which the soul is charmed enraptured fed : the Heaven and Earth in one sole name combine I name thee O Sakuntala and all at-once is said." মহাকবি শেক্সপীয়ার তাঁহার "All is well that ends well" নাটকে একটি নায়িকার ক্ষমার দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা পার্থিব ক্ষমা— তাহাতে অনেক কটাক্ষ ও বাক্যবাণ আছে। তাহা সংসারের চিত্র; কালিদাসের এই দৃশ্য দেবত্বের চিত্র। গাথাকার এই উজ্জ্বল মহত্বের ছবিকে উপহাসের ছবি দ্বারা ছোট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,

"পাদপই অদ্‌স পইণো পুট্টি পুত্তে সমারুহতম্মি।
দঢ়ঢ় মন্নু দুম্মিণা এবি হাসে ঘরণীএ নেকখন্তো॥

ভাবটা এইরূপ যেন দুষ্ট বালক পাদপতিত পতির পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। তাহাতেই গৃহিণীর হাস্যরসের আবির্ভাব এবং সুতরাং ক্রোধের উপশম। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে গাথার পূর্ব্বে কালিদাসের আবির্ভাব।

মহাকবি গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বিলুপ্ত। প্রাকৃত ভাষার বিশালগ্রন্থ হারাইয়া যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তাঁহারই প্রাকৃত অবলম্বন করিয়া দুইটি সংস্কৃত সার হইয়াছে। একটি বৃহৎকথামঞ্জরী এবং আর একটি কথাসরিৎসাগর-সার। এই উভয় গ্রন্থেই কালিদাসের ভাব প্রচুরভাবে দেখা যায়। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের উপর ভরসা করিয়া বৃহৎকথা সম্বন্ধে কোনও অনুমান করা নিরাপদ নহে। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মূলভিত্তি রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার কথা। এই উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প নিশ্চয়ই বৃহৎকথায় ছিল। কারণ ইহারই উপর সমস্ত কথা স্থাপিত। কালিদাসের মেঘদূতে আমরা নিম্নলিখিত চরণ দেখিতে পাই;

সম্প্রাপ্যোনামুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্

কালিদাসের সময় এই উদয়নকথা লোকপরম্পরার কাহিনী ছিল। তখনও তাহা গ্রামবৃদ্ধগণের মুখে শুনা যাইত। অর্থাৎ তাহা তখনও ঠাকুরদাদার ঝুলির ভিতর ছিল। বহুদিবস পরে আমরা দেখি মহাকবি গুণাঢ্য এই কাহিনীকে তাঁহার বৃহৎকথার মূলভিত্তি করিয়াছেন। অন্যথা এই চরণের কোনও সঙ্গতিই থাকে না; এই বৃহৎকথা সম্বন্ধে বাণভট্ট বলিয়াছেন "হরলীলেব কস্য নো বিস্ময়ায় বৃহৎকথা"। উপরোক্ত শ্লোকসমষ্টি পর্য্যালোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় যে কালিদাস খৃঃ প্রথম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে। তখন কালিদাসের প্রতিপত্তি আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় মতের কোনও ভিত্তিই থাকে না। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু চিদ্রূপ ব্রহ্ম কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে কখন্ ও কেন প্রকাশিত হইলেন ইহার সন্ধান আমরা না পাইলেও এই মায়াত্মক কর্ম্মের পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাপারের নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। মূল প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ অনাদি মায়াত্মক কর্ম্ম হইতে জগতের নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অনুক্রমে উৎপন্ন হইল, অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে ইহার বিচার করা হইয়াছে; সেইখানেই আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তুলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্র প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভু বলিয়া মানে না সত্য; কিন্তু প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তারের সাংখ্যোক্ত ক্রম বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করি নাই। কর্ম্মাত্মক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির যে ক্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে মনুষ্যকে যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় তৎসংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাদির কোনই বিচার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই 'কর্ম্মবিপাক' বলে। এই কর্ম্মবিপাকের প্রথম নিয়ম এই যে, কর্ম্ম একবার সুরু হইলে তাহার ব্যাপার কিংবা চেষ্টা পরে অখণ্ডরূপে সমান চলিতে থাকে; এবং ব্রহ্মার দিন শেষ হইয়া জগতের সংহার হইলেও এই কর্ম্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনর্ব্বার জগতের আরম্ভ হইলে সেই কর্ম্মবীজ হইতেই পুনর্ব্বার অঙ্কুর পূর্ব্ববৎ উৎপন্ন হয়। মহাভারতে উক্ত আছে যে,—

যেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ "প্রত্যেক প্রাণী পূর্ব্বের সৃষ্টিতে যে যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই সেই কর্ম্ম (তাহার ইচ্ছা হউক বা না হউক) সে যথাপূর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (মভা. শাং. ২৩১. ৪৮, ৪৯ ও গী. ৮. ১৮ ও ১৯ দেখ)। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" (গী. ৪. ১১)—কর্ম্মের গতি কঠিন; শুধু তাহাই নহে, কর্ম্মের আসক্তিও অতীব কঠিন। কেহই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। কর্ম্ম বশতই বায়ু বহিতেছে, কর্ম্মবশতই সূর্য্যচন্দ্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে; এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আদি সগুণ দেবতারাও কর্ম্মবশতই কার্য্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্দ্রাদির কথা দূরে থাক্। সগুণ অর্থে নামরূপাত্মক, এবং নামরূপাত্মক অর্থে কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মের পরিণাম। মায়াত্মক কর্ম্ম মূলারম্ভে কোথা হইতে আসিল ইহা যখন বলা যায় না, তখন তদঙ্গভূত মনুষ্য এই কর্ম্মের ফেরে প্রথমে কিরূপে আবদ্ধ হইল তাহাও বলা যায় না। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক না, সেই কর্ম্মের ফেরে একবার আট্‌কা পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাশ হইলে কর্ম্মের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্মশক্তির কখনই নাশ হয় না; যে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখা যায় তাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়া থাকে। * এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয় তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরূপও মানিতে পারা যায় না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই নামরূপাত্মক পরম্পরাকেই জন্ম-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে; এবং এই নামরূপের আধারভূত শক্তির নাম সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিরূপে জীবাত্মা হইয়াছে। বস্তুত দেখিতে গেলে, এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; ইহা নিত্য ও চিরস্থায়ী। কিন্তু কর্ম্মের ফেরে আট্‌কা পড়ায় এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহা করিবে তাহার ভোগ কাল হইবে, কাল যাহা করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে;—শুধু তাহা নহে, এই জন্মে যাহা করিবে তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে,—এইরূপে এই ভবচক্র সর্ব্বদাই চলিতেছে। কেবল আমাদের নহে, কখন কখন আমাদের নামরূপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদেরও এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (মনু. ৪. ১৭৩; মভা. আ. ৮০. ৩)। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন;—

পাপং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিদ্‌যদি তস্মিন্ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি চ নপ্তৃষু॥

"হে রাজন্! কোন পাপকর্ম্মের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও সেই কর্ম্মফল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের ভুগিতে হয়" (শাং.১২৯.২১)। কোন কোন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার,কেহ জন্ম হইতেই কেন দরিদ্র এবং কেহ রাজকুলে কেন জন্মগ্রহণ করে, ইহার উপপত্তিও কর্ম্মবাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এবং কাহারো কাহারো মতে, ইহাই কর্ম্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ। কর্ম্মের এই চক্র 'বা চাকীকল' একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্ম্মফলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কে হইবে (বেসূ. ৩. ২. ৩৮; কৌ. ৩. ৮)? এবং সেই জন্য, "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (গী.৭.২২)—আমার নির্দ্দিষ্ট বাঞ্ছিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়—এইরূপ ভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভালমন্দ কর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তুত উদাসীন; মনুষ্যে মনুষ্যে ভালমন্দের ভেদ হইলেও পরমেশ্বর বৈষম্য (বিষম বুদ্ধি) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের পাত্র হন না, এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত (বেসূ. ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু" (গী. ৯. ২৯)—ঈশ্বর সকলের সম্বন্ধেই সমান; কিংবা—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ॥

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, কর্ম্ম কিংবা মায়ার স্বাভাবিক চক্র চলিতে

---

* পুনর্জন্মের এই কল্পনা কেবল হিন্দুধর্ম্মের কিংবা আস্তিকবাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ নহে। বৌদ্ধেরা আত্মা না মানিলেও বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত পুনর্জন্মের কল্পনা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আপন ধর্ম্মের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি শতাব্দীতে "পরমেশ্বর মরিয়াছেন" এইরূপ যিনি বলেন সেই পাকা নিরীশ্বরবাদী জর্ম্মণ পণ্ডিত নিৎসেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মশক্তির যে রূপান্তর নিরত হইয়া থাকে তাহা সীমাবিশিষ্ট এবং কাল অনন্ত হওয়া প্রযুক্ত, যে নামরূপ একবার হইয়াছে তাহা কখন না-কখন পরে উৎপন্ন হইবেই এবং সেই জন্য কর্ম্মের চক্র কিংবা ফের নিছক্ আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই সিদ্ধ হয়, এবংএইরূপ কল্পনা ও উপপত্তি আমাদের বুদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়—এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন! Nietzche's *Eternal Recurrence*. (Complete Works, Engl. Trans. Vol. XVI, PP. 235 256.)

থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫, ১৪, ১৫)। সারকথা, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জাগতিক কর্ম্মের কখন্ আরম্ভ হইয়াছে কিংবা তদঙ্গভূত মনুষ্য প্রথমে কর্ম্মের চক্রে কিরূপে পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্ম্মের পরবর্ত্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন জগতের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্মক অনাদি কর্ম্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' এই যে-বচন এই প্রকরণের আরম্ভেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থই এই।

এই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহের পর্য্যায়শব্দ অনেক, যথা, সংসার, প্রকৃতি, মায়া, দৃশ্য জগৎ, জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি। কারণ সৃষ্টিশাস্ত্রের নিয়ম নামরূপের মধ্যে অবস্থিত পরিবর্ত্তনেরই নিয়ম; এবং এই দৃষ্টিতে দেখিলে, সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্র নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন সুদৃঢ় ও সর্ব্বব্যাপী। তাই, এই নামরূপাত্মক মায়ার কিংবা দৃশ্যজগতের অতীত অথবা মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব নাই এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের ন্যায় নিছক্ আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞানী এই জগৎচক্র যে দিকে টানিবে মনুষ্যকে সেইদিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব কিংবা অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের যে ধারণা, তাহা নিছক্ ভ্রান্তি; আত্মা কিংবা পরমাত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এবং অমৃতত্ব মিথ্যা ও শুধু তাহাই নহে, এই জগতে কোন মনুষ্যই আপন ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না— তাহার সে স্বাতন্ত্র্য নাই। মনুষ্য আজ যে কাজ করে, তাহা পূর্ব্বে তাহার নিজের কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা কৃত কর্ম্মেরই পরিণাম; সুতরাং উক্ত কাজ করা কিংবা না করা, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ যথা—অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে উহা চুরি করিব এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও, উৎপন্ন হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে ঐ বস্তু চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, 'অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গী. ৩, ৩৬) ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে—এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র একইরূপ উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রম নাই, তাহা হইতে মুক্ত হইবারও পথ নাই, এইরূপ এই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। এই মতানুসারে দেখিলে, মনুষ্যের আজ যে বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা হইতেছে তাহা কল্যকার কর্ম্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কর্ম্মের ফল; এবং শেষে এই কারণপরম্পরার অন্ত না হওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে কখনই কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহা পূর্ব্বকর্ম্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল—কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মেরই লোকে 'দৈব' নাম দিয়া থাকে। এইরূপ, যদি কোন কাজ করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্যই মনুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন আচরণ অমুক প্রকারে সংশোধন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নদীর প্রবাহে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, মায়া, প্রকৃতি, সৃষ্টিক্রম, কিংবা কর্ম্মপ্রবাহ যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে—তাহাতে প্রগতিই হউক বা অধোগতিই হউক। এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী এইরূপ বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়; এই পরিবর্ত্তন কোন্ জাগতিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিয়া মনুষ্য আপনার লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্য জগৎকে বদ্‌লাইয়া লইবে; এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে এই নীতিসূত্র-অনুসারেই অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ-শক্তিকে মনুষ্য আপনার কাজে লাগাইয়া থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, চেষ্টার দ্বারা মনুষ্যস্বভাবও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও অনুভূতির বিষয় কিন্তু জগৎসৃষ্টির কার্য্যে কিংবা মনুষ্যের স্বভাবে পরিবর্ত্তন হয় বা হয় না, কিংবা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কি না— ইহা উপস্থিত প্রশ্ন নহে; এই পরিবর্ত্তন করিবার যে বুদ্ধি বা ইচ্ছা মনুষ্যের হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে কিনা ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে। এবং আধিভৌতিক শাস্ত্রদৃষ্টিতে, এই বুদ্ধি হওয়া বা না-হওয়াই যদি 'বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী' এই নীতি অনুসারে প্রকৃতির, কর্ম্মের, কিংবা জগতের নিয়মে যদি প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রানুসারে কোন কর্ম্ম করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্য মনুষ্যের নাই, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এই মতবাদকে 'বাসনা-স্বাতন্ত্র্য', 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য', কিংবা 'প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য' বলে। শুধু কর্ম্মবিপাকের কিংবা শুধু আধিভৌতিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই যদি বিচার করা যায় তবে কোন মনুষ্যেরই কোন প্রকার প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য নাই—কর্ম্মের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর চাকার মতো প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু

এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে অন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহে। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণ বলে যে, সূর্য্যকে পশ্চিমদিকে উদিত করিবার সামর্থ্য আমার না থাকিলেও আমার এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি, তাহার সারাসার বিচারপূর্ব্বক করা বা না করা, কিংবা যখন আমার সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের বা ধর্ম্ম অধর্ম্মের দুই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই দুই মার্গের মধ্যে ভালো কিংবা মন্দকে স্বীকার করা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ মনুষ্যের আয়ত্তের মধ্যে। এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। যদি মিথ্যা বলো, তবে এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়া হত্যা প্রভৃতি অপরাধকারীকে অপরাধ স্থির করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়; আর যদি সত্য বলিয়া মানো তবে কর্ম্মবাদ, কর্ম্মবিপাক, কিংবা দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল জড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেরই বিচার কর্ত্তব্য হওয়ায় এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না। কিন্তু যে কর্ম্মযোগ শাস্ত্রে জ্ঞানবান মনুষ্যকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যে বিচার করিতে হয়, তাহাতে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ায় তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ, মনুষ্যের কোনই প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্য নাই এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবে, কিংবা অমুক কার্য্য করিবে এবং অমুক কার্য্য করিবে না, অমুক ধর্ম্ম্য, অমুক অধর্ম্ম্য ইত্যাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের সমস্ত গোলযোগও স্বতই অন্তর্হিত হইবে (বেসূ. ২. ৩. ৩৩), * এবং পরম্পরাক্রমে কিংবা প্রত্যক্ষ রীতিতে মহামায়া প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুরুষার্থ হইবে। অথবা পুরুষার্থই কেন?—আপনার অধীনে থাকার কথা হয় তো পুরুষার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার বলিয়া তিলমাত্র সত্তা বা ইচ্ছা রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা কিংবা দাস্য ছাড়া আর অন্য কি হইতে পারে? লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির হুকুমে খাটিয়া মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন "পদার্থধর্ম্মের শৃঙ্খল নিত্য আমাদের পায়ে পরিতে হয়! আমাদের দেশে কর্ম্মবাদে কিংবা দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত ভবিতব্যতাবাদে এবং আধুনিককালে শুদ্ধ আধিভৌতিক শাস্ত্রের সৃষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; এখনও চলিতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত এইখানে বলা অসম্ভব বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি।

কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্ম্ম একবার সুরু হইলে কর্ম্মচক্রের উপর পরমেশ্বরও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না সত্য। তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, দৃশ্য-জগৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্ম্মমাত্র নহে; কিন্তু এই নামরূপাত্মক আবরণের নীচে আমারভূত এক আত্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্রহ্মজগৎ আছে এবং মনুষ্যের দেহান্তর্ভূত আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্রহ্মেরই অংশ। এই সিদ্ধান্তের সহায়তায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহা অনিবার্য্য বাধা বলিয়া মনে হয় সেই বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার বর্ণনা শেষ অংশের সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। যেরূপ কর্ম্ম করিবে সেইরূপ ভোগ হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় এরূপ নহে; পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র, এমন-কি সমস্ত জগতেরও ইহা উপযোগী। নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতেই হয়। এক পরিবারের মধ্যে, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্যের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মনুষ্যকে আপনার নিজের কর্ম্মফল শুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কর্ম্মের ফলও অংশতঃ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই বিচার করা হয় বলিয়া কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়াতে কর্ম্মবিভাগ প্রায় একটী মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই করা হয়। উদাহরণ যথা,—মনুষ্যকৃত অশুভ কর্ম্মের—কায়িক বাচিক ও মানসিক—মনু এই তিন ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে ব্যভিচার, হিংসা ও চৌর্য্য এই তিনটাকে কায়িক; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া বলা, প্রলাপ বকা এই চারিটাকে বাচিক এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, অন্যের মন্দ চিন্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা এই তিনটীকে মানসিক—সবশুদ্ধ দশ প্রকার অশুভ কিংবা পাপ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া (মনু. ১২. ৫-৭; মভা. অনু. ১৩), সেই সব কর্ম্মের ফলও বলিয়াছেন। তথাপি এই ভেদ চিরস্থির নহে। কারণ এই অধ্যায়েই পরে সমস্ত কর্ম্মের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভেদ করা হইয়াছে এবং প্রায় ভগবদ্গীতার বর্ণনানুসারেই এই তিন প্রকার গুণের কিংবা কর্ম্মের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৪. ১১-১৫; ১৮. ২৩-২৫; মনু. ১২. ৩১-৩৪)। কিন্তু কর্ম্মবিপাক প্রকরণে কর্ম্মের যে বিভাগ সাধারণত পাওয়া যায় তাহা এই দুই হইতেও

* বেদান্তসূত্রের এই অধিকরণকে 'জীবকর্ত্তৃত্বাধিকরণ' বলে। তাহার প্রথম সূত্রই "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ বিধিনিষেধশাস্ত্রে অর্থবত্ত হইবার জন্য জীবকে কর্ত্তা বলিয়া মানা আবশ্যক হয়। পাণিনির "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" সূত্রের (পা. ১. ৪. ৫৪) 'কর্ত্তা' শব্দেই আত্মস্বাতন্ত্র্য বুঝায়, এবং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই অধিকরণ ইহারই সংক্রান্ত।

ভিন্ন; তাহাতে কর্ম্মের সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ও ক্রিয়মাণ, এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে। কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করিয়াছে—তাহা এই জন্মেই করা হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক—সে সমস্তকে তাহার 'সঞ্চিত' কর্ম্ম বলে। এই 'সঞ্চিতের' অপর নাম 'অদৃষ্ট' এবং মীমাংসকদিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম 'অপূর্ব্ব'। এই নাম হইবার কারণ এই যে, কর্ম্ম কিংবা ক্রিয়া যে সময় করা হয়, শুধু সেই সময়েই তাহা দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়া গেলে পরে সেই কর্ম্ম স্বরূপত অবশিষ্ট না থাকায় তাহার সূক্ষ্ম সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপূর্ব্ব ও বিশিষ্ট পরিণামই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (বে, সূ. শাং ভা. ৩. ২. ৩৯, ৪০)। যাহাই বলনা কেন, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, 'সঞ্চিত', 'অদৃষ্ট' কিংবা 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি, এই সঞ্চিত কর্ম্ম সমস্ত একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে কিছু ভাল ও কিছু মন্দ অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ যথা—কোন সঞ্চিত কর্ম্ম স্বর্গপ্রদ এবং কোনটী নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না—একটার পর একটা ভোগ করিতে হয়। তাই 'সঞ্চিতের' মধ্যে যে কর্ম্মের ফল প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকেই 'প্রারব্ধ' অর্থাৎ সুরু-হওয়া 'সঞ্চিত' বলে। ব্যবহারে 'সঞ্চিতের' অর্থেই 'প্রারব্ধ' শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল; শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে, 'সঞ্চিতের' অর্থাৎ সমস্ত ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবান্তর ভেদই 'প্রারব্ধ' এইরূপ উপলব্ধি হয়। প্রারব্ধ কিছু সমস্ত সঞ্চিত নহে; সঞ্চিতের মধ্যে যে অংশের ফলের (কার্য্যের) ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই প্রারব্ধ; এবং সেইজন্য এই প্রারব্ধেরই আর এক নাম—আরব্ধ কার্য্য। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়মাণ বলিয়া তৃতীয় এক আর ভেদ আছে। "ক্রিয়মাণ"—ইহা বর্ত্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত হওয়ায় তাহার অর্থ—"যাহা এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহা এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।" কিন্তু এক্ষণে আমরা যাহা কিছু করিতেছি তাহা সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ প্রারব্ধেরই পরিণাম; তাই 'ক্রিয়মাণ', কর্ম্মের এই তৃতীয় ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারব্ধ কারণ এবং ক্রিয়মাণ তাহার ফল অর্থাৎ কার্য্য, এই দুয়ের মধ্যে এইরূপ ভেদ করা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায় এই ভেদের কোন উপযোগ হইতে পারে না। সঞ্চিতের মধ্যে প্রারব্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকে তাহা দেখাইবার জন্য ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদান্তসূত্রে প্রারব্ধকেই 'প্রারব্ধকার্য্য' এবং যাহা প্রারব্ধ নহে, তাহাকে অনারব্ধ কার্য্য বলা হইয়াছে (বেসূ. ৪. ১. ১৫)। আমার মতে, সঞ্চিত কর্ম্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাই, 'ক্রিয়মাণ'কে ধাতুসাধিত বর্ত্তমানকালবাচক মনে না করিয়া "বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্‌বা" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে (পা. ৩. ৩. ১৩১) ভবিষ্যদ্‌কালবাচক মনে করিলে তাহার অর্থ "যাহা শীঘ্রই পরে ভোগ করিতে হইবে" এইরূপ করিতে পারা যায়; এবং তখন "ক্রিয়মাণ" অর্থ এরই অনারব্ধ কার্য্য' এইরূপ হইবে; 'প্রারব্ধ' ও 'ক্রিয়মাণ' এই দুই শব্দ অনুক্রমে বেদান্তসূত্রের 'আরব্ধকার্য্য' ও 'অনারব্ধকার্য্য এই দুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে। কিন্তু ক্রিয়মাণ—ইহার সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করে না; ক্রিয়মাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ম্ম এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারব্ধের ফলকেই ক্রিয়মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম্ম অনারব্ধকার্য্য তাহা বুঝাইবার জন্য, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্দই পর্য্যাপ্ত হয় না, এই একটা বড় রকমের আপত্তি উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণ শব্দের রূঢ়ার্থ ছাড়াও ভালো নহে। তাই সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের এই লৌকিক ভেদ কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ায় স্বীকার না করিয়া, আরব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য এই দুই বর্গে আমি উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই শাস্ত্রদৃষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। 'ভোগ করা' এই ক্রিয়ার, ভুক্ত (অতীত), ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে (বর্ত্তমান) এবং পরে ভোগ করিতে হইবে (ভবিষ্য), এইরূপ কালের তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্ম্মবিপাকক্রিয়াতে এইরূপ কর্ম্মের তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়া ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্ব্বার সঞ্চিতের মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাই কর্ম্মভোগের বিচার করিবার সময় সঞ্চিতের (১) ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারব্ধ এবং ( ) আরম্ভ না হইলে অনারব্ধ—এই দুই ভেদ হইতে পারে; ইহার অধিক বর্গে "সঞ্চিত"কে বিভক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমস্ত কর্ম্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিবার পর, তাহার উপভোগ সম্বন্ধে কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়া এই বলে যে, সঞ্চিত সমস্তই ভোগ্য। তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়া এই দেহ কিংবা জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়াছে

তাহার ভোগ ব্যতীত অব্যাহতি নাই—"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ" হাত হইতে বাণ একবার মুক্ত হইলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই যায়; কিংবা কুম্ভকারের চাকা একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহা যেরূপ উক্ত গতির শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। যাহা সুরু হইয়াছে তাহার শেষ হওয়াই চাই; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারব্ধকার্য্য-কর্ম্মের বিষয় সেরূপ নহে। এই সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ নাশ করা যাইতে পারে। প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য ইহাদের মধ্যে এই যে গুরুতর ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হওয়া পর্য্যন্ত,—শান্তভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেইরূপ না করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করিলে—জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলেও—দেহারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (বে, সূ. ৪. ১. ১৩-১৫ সাং. কা. ৬৭)। ইহা ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা—এক নূতন কর্ম্ম উৎপন্ন হইবে এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য নব জন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে আত্মহত্যা করা নির্ব্বুদ্ধিতা।

কর্ম্মফলভোগদৃষ্টিতে কর্ম্মের কি কি ভেদ তাহা বলা হইল। এক্ষণে, কর্ম্মের বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিচার করিব। প্রথম যুক্তি কর্ম্মবাদীদিগেরই অনারব্ধকার্য্য অর্থে পরে ভোগার্থ সঞ্চিত কর্ম্ম, তাহা উপরে বলিয়াছি—তাহা এ জন্মেই ভোগ করিতে হউক কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক। কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন কোন মীমাংসক কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার মতে মোক্ষলাভের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে মীমাংসকদৃষ্টিতে সমস্ত কর্ম্মের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে। তাই, এই দুই কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপ মীমাংসকেরা বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই; এবং কাম্য কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহাও করিতে নাই। এই প্রকারে বিভিন্ন কর্ম্মের পরিণামের তারতম্য-বিচার করিয়া মনুষ্য কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে এবং কোন কর্ম্ম যথাশাস্ত্র করিতে থাকিলে সে আপনা-পনিই মুক্ত হইবে। কারণ, এই জন্মের ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান হয়; এবং এই জন্মে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকতা থাকে না। ইহলোক, নরক ও স্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইরূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে 'কর্ম্মমুক্তি' কিংবা 'নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি' বলে। কর্ম্ম করিলেও যাহা না করার সমান হয়, অর্থাৎ যখন কর্ম্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্ত্তার হয় না, সেই অবস্থাকে 'নৈষ্কর্ম্য' কিন্তু মীমাংসকদিগের উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্কর্ম্য পূর্ণরূপে সাধিত হয় না, ইহা বেদান্তশাস্ত্র স্থির করিয়াছেন (বেসূ. শাং ভা. ৪. ৩. ১৪) এবং গীতাতেও এই অভিপ্রায়েই "কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্য হয় না, এবং কর্ম্ম ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় না"—উক্ত হইয়াছে (গী· ৩. ৪)। গোড়ায় সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করা দুঃসাধ্য; এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিত হয় না, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তথাপি উক্ত বিষয় সম্ভব বলিয়া মানিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে কিংবা না করিলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের সমষ্টি শেষ হয় মীমাংসকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না। কারণ, দুই 'সঞ্চিত' কর্ম্মের ফল পরস্পরবিরোধী—উদাহরণ যথা, একের ফল স্বর্গসুখ এবং অন্যটির ফল নরকযাতনা হইলে, তাহা একই কালে ও একই স্থানে ভোগ করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারব্ধকর্ম্মের দ্বারা এবং এই জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। মহাভারতে পরাশর গীতায় আছে—

> কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
> মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥

"কখন কখন মনুষ্যের সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য (উহা নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়া) চুপ করিয়া বসিয়া থাকে" (মভা. শাং. ২৯০. ১৭); এবং এই নীতিসূত্রই সঞ্চিত পাপ কর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চিত কর্ম্মভোগ

বেলুরের দেব মন্দির।

সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর সভায় পারস্য রাজ-দূতের অভ্যর্থনা।

কর্ণাটের পূর্ব্ব-গৌরব।

এইরূপে এক জন্মেই শেষ না হইয়া এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে অনারব্ধকার্য্য বলিয়া এক অংশ সর্ব্বদাই অবশিষ্ট থাকে; এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম্ম উপরি-উক্ত যুক্তিতে সাধন করিলেও অবশিষ্ট অনারব্ধকার্য্যের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। তাই, মীমাংসকদিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এই পথের কথা বলা হয় নাই। কেবল তর্কের জোরে ইহাকে খাড়া করা হইয়াছে; ঐ তর্কও শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে না। সারকথা, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার আশা করা, অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়া পার করাইবার আশা করার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই উপায় স্বীকার না করিয়া, আগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া নিরুদ্যোগী হইয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিবে এইরূপ যদি বলো, তবে তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অনারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে, কর্ম্মত্যাগের আগ্রহ ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—এই দুই-ই তামসিক কর্ম্ম হইয়া যায়; এবং এই তামসিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতেই হয় (গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ)। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত শ্বাসোচ্ছ্বাস কিংবা শোওয়া, বসা ইত্যাদি কর্ম্ম চলিতে থাকায় সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আগ্রহও ব্যর্থই হয়,—এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না, গীতার অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১ দেখ)।

মাঘোৎসব।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আজি নব-উষাকালে সোনার অরুণ করে
উদ্ভাসিল ধরাতল চারিদিক গেল ভরে।
বনমাঝে বিহঙ্গম গাহিছে মধুর গান
পশিয়া শ্রবণে তাহা জুড়ায় সবার প্রাণ॥
সিঞ্চি সুধা ধারা হৃদে বহিছে মলয় বায়।
নানা নব ফুলবাসে ধরা আজি মধুময়॥

(২)

আজি এ প্রভাতকালে পবিত্র সবার প্রাণে
জাগিছে তাঁহার নাম অপূর্ব্ব নবীন তানে॥
একদিন যেই নাম হিমাচল শৃঙ্গ হ'তে
হয়েছিল বিঘোষিত পুণ্যভূমি এ ভারতে॥
জেনেছিল সেই দিন হ'য়ে সবে একপ্রাণ
অমৃতের পুত্র তারা,—তারা পূর্ণ শক্তিমান্॥

(৩)

আজি এ মধুর প্রাতে মিলি যত ভক্তগণ
শুনহ তাঁহার বাণী হয়ে সবে একমন॥
অমৃত-স্বরূপ তিনি,—তিনি আমাদের পিতা
পুণ্যময় রাজ্য তাঁর, ভেদাভেদ নাহি সেথা॥
হইলে তাঁহার জ্ঞান দূরে যায় সব ভয়।
চল সবে তাঁর পথে—তিনি যে আনন্দময়॥

(৪)

উঠ সবে ভক্তগণ ছাড়ি মোহ ক্ষুদ্র জ্ঞান
চলহ তাঁহার পথে হয়ে সবে একপ্রাণ।
দুর্গম তাঁহার পথ কদাপি সুগম নয়
তাঁহারে জানিলে আর রবে না শমন-ভয়।
তপনবরণ তিনি পূর্ণ-শক্তি জ্ঞানময়
পুণ্যময় রাজ্য তাঁর আঁধারের পারে রয়।

(৫)

তাঁহারে জানিলে ধন্য হবে আমাদের জ্ঞান,
শান্ত হবে ভারতের পবিত্র সবার প্রাণ।
ধন্য হবে ধর্ম্ম এই ধ্রুব সত্য পুণ্যময়
দূরে যাবে আমাদের শোকতাপ ভবভয়॥
ধন্য হবে ভারতের ঋষি-প্রচারিত গান
রবেনা হৃদয়ে আর ক্ষুদ্র মোহ অভিমান॥

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কন্নাড়-সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে (১৫০ খৃঃ অব্দে) Ptolemy তাঁহার গ্রন্থে বাদামি, ইণ্ডি, কলফেরি, পট্টদকল প্রভৃতি কন্নাড়-নামধারী নগরসকলের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কন্নাড় কবিগণের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে যে কন্নাড়ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার পূর্ব্বে পূর্বদ দলে কন্নাড় নামক প্রাচীন কন্নাড় ভাষা বর্ত্তমান ছিল। অনুমান করা যায় যে উক্ত পূর্ব্বদ কন্নাড় ভাষা পরিপুষ্ট হইতে অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীক ভাষার নাটকে কন্নাড়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে দ্বিতীয় শতাব্দীতেও কন্নাড় ভাষা কতক পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে আমরা দেখিতে পাই যে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ খৃঃ তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে কন্নাড় ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা এবং কদম্বাবংশীয়ের রাজত্বকালে সুমন্ত ভদ্র, কবি পরমেষ্টি, পুজ্যপাদ, দুর্বিনিতা প্রভৃতি কবিগণ কন্নাড় ভাষায় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। "কর্ণাটিক কবি চরিত্র" লেখকের মতে উক্ত সুমন্ত ভদ্র কবি খৃঃ ১৩৮ সালে বর্ত্তমান ছিলেন।

চালুক্যরাজগণের সময়ের সাহিত্যানুরাগী রাজার অভাব ছিল না। এই সময়েও কন্নাড়ভাষা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীবর্দ্ধ দেব, বিমল, উদয়, নাগার্জ্জুন, কবীশ্বর, পণ্ডিত, লোকপাল, রবিকীর্ত্তি, চন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বাদামি নগরে কন্নাড় ভাষায় লিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অদূরের কীর্ত্তিবর্গকৃত শিলালিপি প্রাচীনতম কন্নাড় শিলালিপি বলিয়া গণ্য হয়। ইহা খৃঃ ৫৬৭।৬৮ সালে খোদিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকুট রাজাদিগের সময়েও বিশেষরূপে সাহিত্যচর্চ্চা ছিল। রাষ্ট্রকুটবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি সাহিত্যিকগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং নিজেও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কন্নাড়ভাষায় সংগৃহীত পুস্তকাদির মধ্যে নৃপতুঙ্গ-বিরচিত কবিরাজমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। ইহা সম্ভবত ৭৩৭-৭৯৭ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। নৃপতুঙ্গের এই পুস্তকখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ। রাজা নৃপতুঙ্গ প্রশ্নোত্তররত্নমালা নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। জনৈক তিব্বতদেশীয় পর্য্যটকও নৃপতুঙ্গ-বিরচিত রত্নমালার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের বিজয়াঙ্কা নাম্নী একটি মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বেঙ্কেশ নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অকলঙ্ক, গুণনিধি, পন্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণও রাষ্ট্রকুট রাজ্য গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকুটরাজ কৃষ্ণ হলায়ুধলিখিত কবিরহস্য গ্রন্থের নায়ক ছিলেন। রাষ্ট্রকুট-রাজাদিগের দানপত্রসকল সংস্কৃতের ন্যায় কন্নাড় কবিতা-ছন্দে লিখিত হইত। প্রসিদ্ধ জৈন কবি জয়সেন এবং গুণবর্দ্ধও ইহাঁদের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। রাষ্ট্রকুট নৃপতিগণ কবিগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন।

তৎপরবর্ত্তী চালুক্যরাজগণের সময় কন্নাড়-সাহিত্য আরও অধিক পরিমাণে পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল। এই সময় কর্ণাট প্রদেশ যেমন রাজনীতিক্ষেত্রের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সাহিত্যসম্বন্ধেও তদনুরূপ শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটবংশের শেষ এবং চালুক্য বংশের প্রারম্ভকালে আর্য্যাবর্ত্তে কোন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন না। এদিকে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য সাহিত্যানুরাগী বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিলেন। এই জন্য উত্তরদেশীয় অনেক পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরিয়া কোন পৃষ্ঠপোষক না পাইয়া পরে বিক্রমাদিত্যের নিকট সম্মানিত এবং "বিদ্যাপতি"র পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছায় "বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আদিপম্মা, রন্ন, চন্দ্ররাজা, দুর্গসিংহ, কীর্ত্তিবর্ম্মা, নাগবর্ম্মা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি এবং সাহিত্যকগণ বিদ্যমান ছিলেন।

আদিপম্মা, পন্ন এবং রন্ন এই তিনজন কবি পরস্পরসমকক্ষ ছিলেন। ইহাঁদের তিন জনই কবিরত্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন নৃপতিগণ কবিদিগকে এতাদৃশ মান্য এবং শ্রদ্ধা করিতেন যে রাজা ত্রৈলোক্য রন্ন কবিকে তাঁহার মান্যের জন্য ছত্র ও চামর প্রদান করিয়াছিলেন। মিতাক্ষরা নামক হিন্দু আইন পুস্তক বিজ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কল্যাণ নগরে লিখিত হইয়াছিল।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র সোমেশ্বর মানসোল্লাস বা

অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে নানা বিষয় লিখিত আছে। যথা ঃ—

(ক) কি প্রকারে রাজ্যলাভ হয়।

(খ) রাজ্যলাভ করিয়া কি প্রকারে উহা রক্ষা করিতে হয়।

(গ) নৃপতিগণের কোন্ কোন্ বিলাসের বশীভূত হওয়া উচিত।

(ঘ) বিষয়ান্তর-চিন্তা-প্রণালী।

(ঙ) আমোদ এবং মৃগয়াদি।

এক কথায়—তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় এমন কোন পুস্তক ছিল না যাহার সার তত্ব এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রাজনীতি, নক্ষত্রবিদ্যা, দৈববিদ্যা, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, অশ্ব, হস্তি ও কুক্কুরাদি চিকিৎসা, বশীকরণ বিদ্যা, প্রভৃতি সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার এই অসাধারণ বিদ্যাগৌরবের জন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞভূপ নামে আখ্যাত হইতেন।

হোয়সালা বংশের রাজত্বকালে অভিনব পম্পা, কান্তি, রাজাদিত্য, সুমনোবল, মল্লিকার্জ্জুন, রুদ্রভট্ট, কেশরাজ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন।

বিজয়নগরবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকালে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্ব্বেদ, নীতি, যুদ্ধকলা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির লেখক প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য বিদ্যমান ছিলেন। ময়ূর, মঙ্গরস এবং কমারব্যাস, নিত্যাত্মসুখ, লক্ষনদন্তেশ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কন্নাড় কবিগণও এই সময়ের লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুরন্দর দাস, কুমার দাস প্রভৃতি সাধুগণও এই সময়ের লোক। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় অষ্টদিগ্গজ নামক পণ্ডিতাষ্টক বর্ত্তমান ছিলেন। অজয়দিক্ষিত নামক আলঙ্কারিক পণ্ডিতও ইহাঁদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

কর্ণাট প্রদেশে যত নৃপতি-কবি ছিলেন, বোধ হয় ভারতের আর কুত্রাপিও তত রাজকবি দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে কয়েক জন কবিভূপতির নাম উল্লেখ করিব।

খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় দ্বিতীয় মাধব দত্তক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে দুর্ব্বিনিতা নামক উক্তবংশীয় আর একজন নৃপতি ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাষ্য লেখেন। ইহাই কন্নাড়ভাষার প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীপুরুস নামক গঙ্গাবংশীয় রাজা গজশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখেন।

নবম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা নৃপতুঙ্গ তাঁহার কবিরাজমার্গ রচনা করেন।

খৃঃ ১১২৫ সালে চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা গোচিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই সোমেশ্বর তাঁহার মানসোল্লাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খৃঃ ১১৫০ সালে উদয় নামক চোলারাজ উদয়াদিত্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ লিখেন।

সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যেও কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। হোয়সালা রাজের চামুণ্ডরাম, এবং পোলব নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ কবিতা রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যতর হোয়সালা-সৈন্যাধ্যক্ষ সোম, ভারতীয় আটটি ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা কর্ণাটের বিদ্যামন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অমোঘবর্ষ রাজা নৃপতুঙ্গের রাজত্ব কালে ইণ্ডি তালুকের অন্তঃর্গত সালোতার্গি নামক স্থানে তথাকার অধিপতি চক্রায়ুধ কর্ত্তৃক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চক্রায়ুধ দুই শত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদী তীরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত দানপত্র উৎসর্গ করেন—আমরা একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে এই দানপত্রের অনুবাদ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

Rich, spacious and beautiful as by the creator who by his own will has established the threefold universe......this college full of intelligence is resplendent with Brahmins. Here there are scholars born in various districts. For the subsistence of them Chakrayudha gave land rentfree to the scholars of the college in this village known as Pahattige or Saralote the mine of virtues – rentfree land measures 500 Nivartanas and 12 Nivartanas, 27 rentfree dwellings and half as man more and a rentfree flower-

garden measuring 41 Nivartanas and 12 Nivartanas of lands., On the occasion of marriage the people being Brahmins shall give to the congregation of the scholars of the college five flowers of good money and at the time of thread ceremony as above and half at tonsure ceremoney. If for any cause a feast is given to Brahmins the people shall give according to their means a dinner to these members of the college. 50 Nivartanas of rentfree land and a rentfree house in the college quarters are given to the lecturer.

মহীশূরের অন্তঃর্গত মচ্ছঙ্গি নামক স্থানে হোয়সালা রাজ্যের মন্ত্রী পেরুমল কর্ত্তৃক খৃঃ ১২৯০ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা বে-সরকারী বিদ্যালয় ছিল। এখানে সমর-কলা (যুদ্ধনীতি), তহসিল (রাজ্য-নীতি), ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজা তৃতীয় জয়সিংহের ভগিনী অক্কা দেবী এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বেলুর নামক স্থানে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

ফোড়ের সন্নিকট অক্কালুর নামক স্থানে তত্রস্থ মঠে কুমার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভূমি দানের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

সেই দিন সন্ধ্যাকালে কাছারী হইতে বাড়ী আসিবার পর ওঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইল। একেবারেই নিদ্রা নাই। আমাদের হয়তো কোন ভুলচুক হইয়াছে এইরূপ একটা পরিতাপ মনে রহিয়া গেল। আবার রায় বাহাদুর চিন্তামন নারায়ণ ভট্ট—এই প্রাণের বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ আসায় ওঁর অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং মন এত উদ্বিগ্ন হইল যে, দুই চার দিন একটার পর একটা হওয়ায়, নিত্য কার্য্য করিতেও মন লাগিল না। কত সময় উনি লিখিতে বসিয়া লেখা বন্ধ করিয়া ভাবিতে বসিয়া যাইতেন। অনেকক্ষণ পরে, আমি এ কি করিতেছি ইহা মনে হওয়ায় আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। "চিন্তামন রাও আমার ছোট ভায়ের মত ছিলেন, আমার ডান হাত ছিলেন, আমার সমস্ত কাজ হাতে লইয়া, খুব দৃঢ়তার সহিত চালাইবেন এইরূপ আমার ভরসা ছিল। তিনি খুব দৃঢ়সঙ্কল্প ও কাজের লোক ছিলেন" এইরূপ তাঁর মুখ হইতে আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস বাক্য বাহির হইতে লাগিল, ব্যাকুল হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যিনি কাজ-ছাড়া কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না, সেই তিনি এখন কাজ করিতে করিতে ৫।১০ মিনিট সচিন্তভাবে বসিয়া আছেন দেখা যাইত। পূর্ব্বাপেক্ষা কথা কম কহিতেন। আহারে রুচি হইত না। উঁহার নিত্য-প্রিয় টাট্‌কা ফল ও বাদাম পেস্তা খাবার দিকেও মন নাই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। পর পর ৮।১০ দিন একেবারেই অন্ন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছু খাবার তৈরী করিয়া দিলে ভাল লাগিত না। যদি বা আহারে বসিতেন,—অতিশয় টক্ দই, ও সেই দধিতে ভিজিবার মত ততটা ভাত ও একহাতা-ভোর ছোলা সিদ্ধ—এই মাত্র তাঁর আহার ছিল। আর অন্য সমস্ত জিনিস থাকিলে, খাইতেন না। চাট্‌নী তাঁর নিত্য প্রিয় ছিল। ঝাল্ লোন্‌তা জিনিস যতই করনা ওঁর তাতে কখনই অরুচি ছিল না। দুই বেলাই কলাই-ডালের জিনিস কিংবা অন্য ডালের দুই একটা রান্না না থাকিলে তাঁহার খাওয়াই হইত না। অন্য শাকসব্জি, আচার চাট্‌নী যতই থাক্ না কেন, ডালের কোন জিনিস না থাকিলে সমস্ত রান্নাই ব্যর্থ, এবং উনি বলিতেন,—"কি রকম রান্না হয়েছে! একটা জিনিসও খাবার মত নেই"। এইরূপ যাঁর নিত্য অভ্যাস, তাঁর কি না আহার এখন একটু ছোলাসিদ্ধ ও ভাত! ইহার দরুন দুর্ব্বলতা ও মুখে ফ্যাকাসে রং স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল এবং আমার দিনরাত ভয় ও ভাবনা হইতে লাগিল। কি জিনিস রাঁধিলে ওঁর ভাল লাগিবে! কিছু একটা ভাল লাগিলে এক গ্রাস অন্নও যদি পেটে পড়ে, তাহা হইলে নিদ্রা আসিবে; পেটে অন্ন নাই বলিয়া নিদ্রা হয় না; আর তাহলে কি করা যাবে?" এইরূপ চিন্তা ও উদ্বেগে এবং কখন কখন, কি জিনিস করিব মনে মনে তাহার আলোচনায়, ওঁর কাছারী হইতে ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এ জিনিস কিংবা ও-জিনিস ভাল লাগিবে মনে করিয়া ৫।১০টা জিনিস প্রতিদিন তৈয়ারী করিতাম, কিন্তু উনি তাহার কিছুই খাইতেছেন না ভাল লাগিতেছেনা দেখিয়া আমার বড় খারাপ লাগিত ও দ্বিগুণ ভাবনা হইত। কোন কোন দিন ইহা লক্ষ্য করায় উনি আমাকে বলিতেন, "তুমি এত রকম জিনিস কর কিন্তু আমি তা খাই না, আমার তাহা পছন্দ হয় না এইরূপ মনে করে' তোমার খারাপ লাগতে পারে এ কথা ঠিক। কিন্তু আমি সত্যি বলচি, আমি কোন আস্বাদ

পাই না, আমি করব কি বল। একটু কিছু জিনিস মুখে দিলেই শুধু ছাই পাঁশ বলে মনে হয়। এর উপায় কি? তুমি এত মিহনৎ করে জিনিস তৈরী করেছ, আমি তা না খেলে তোমার খারাপ লাগবে মনে করে আমার ইচ্ছা না থাকলেও কেবল তোমার ভাল লাগবে বলেই আমি একটু মুখে দি, কিন্তু আস্বাদ পাইনে, এর উপায় কি? তখনি যদি বলি ও-সব কিছু কোরো না তাহলে তোমার ভাল লাগবে না এবং না করে'ও তুমি থাকতে পার না। এর এখন কি করব!" এক মাস সওয়া মাস এইভাবেই গেল এবং মার্চ্চ মাস হইতে মে মাসের ছুটি যোগ করিয়া ৪ হপ্তা ছুটি বেশী দিয়া মার্চ্চ মাস হইতে কোর্ট বন্ধ হইল। এতে আমাদের খুব সুবিধা হইল। এ বৎসর, মহাবলেশ্বরে যাব, ওঁর শরীর ভাল নেই, সেখানে না গেলে ওঁর শরীর শোধরাবে না। সেখানকার আবহাওয়া ভাল, একবৎসর শ্রম-পরিহার করিবেন এবং সেখানে প্লেগও নাই সব-চেয়ে সুবিধা এই, এ বৎসর আড়াই মাস পৌনে তিন মাস ছুটি আছে। এইজন্য যাই হোক না, এ বৎসর আমরা মহাবলেশ্বরে যাইব এইরূপ অত্যন্ত আগ্রহ আমার হইল। নিদ্রা নাই, অন্নে রুচি নাই। এ সম্বন্ধে বেশী দিন উপেক্ষা করিলে এই পীড়া ক্ষয়রোগে পরিণত হইবে এইরূপ আমার কল্পনা হওয়ায় আমার অত্যন্ত ভয় হইল এবং কোন রকম করিয়া যাহাতে মহাবলেশ্বরে যাওয়া স্থির হয় আমি সেই চেষ্টা করিতে সুরু করিয়াছিলাম। ৫।৬ দিন রোজ ঐ কথা পাড়িয়া, অনেক আলোচনার পরে আমাদের মহাবলেশ্বরে যাওয়া ঠিক হইল। বোম্বায়ের লোকদিগকে মহাবলেশ্বরে যাইবার পথে, পাঁচগণীর বাহিরে ১০ দিনের জন্য কোয়ারান্‌টিনে রাখা হইয়াছিল। মহাবলেশ্বরের যাত্রী ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে, আশ্রিত ও চাকর-বাকর কতজন যাইবে, তন্মধ্যে কত জন আগে যাইবে, কোন্ বাঙ্গালা ভাড়া করা হইয়াছে প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া মহাবলেশ্বরের বাজার-মাষ্টারের 'পাস' আনাইতে হইবে এবং যে সকল লোক আগে যাইবে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। "এখন কাহাকে কাহাকে মহাবলেশ্বরে আগে পাঠান যাইবে তাহা স্থির করিয়া তাহাদের সহিত জিনিস পত্র ও হাঁড়ি-কুঁড়ি যাহা দিতে হইবে তাহা প্রস্তুত রাখো। হাইকোর্ট বন্ধ হইতে এখন দশ এগার দিন আছে; অতএব কালই আমাদের লোক পাঠান উচিত, তাহলে আমরা যে সময়ে যাব, সেই সময়ে তারা সব গুছিয়ে রাখতে পারবে" এইরূপ উনি বলিলেন। মহাবলেশ্বরে একটা বাঙ্গালা ঠিক করে রাখবার জন্য সেখানকার হোস-এজেন্ট দত্তোপন্ত দীক্ষিতকে পত্র লেখা হইয়াছিল। তাহার উত্তর, তার পরদিন আসিল যে, আপনার লেখা অনুসারে বাঙ্গালা ঠিক হইয়া গিয়াছে। লোকজন শীঘ্র পাঠাইবেন। আমি এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছি। এই অনুসারে, তারপর দিন সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণ, চাকর ও কেরাণীর সঙ্গে আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিসপত্র দিয়া তাহাদিগকে ভাণ্ডুপা হইতে রওনা করা হইল। পরে তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া, সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ আট দশদিনের পর দীক্ষিত পত্র পাঠাইলেন। অনন্তর আমরা তারপর দিন মহাবলেশ্বরে যাওয়া স্থির করিয়া আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম,—"এই সময়ে কেবল ভাবনা চিন্তায় শরীর এতটা অবসন্ন হয়েছে, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, তাই এই দুই মাস লেখাপড়ার কাজ না করে' মহাবলেশ্বরের তাজা ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুই বেলা বেড়াইয়া শান্তমনে বিশ্রাম নিলে শরীরে নূতন রক্ত আসবে ও সমস্ত অসুখ সেরে গিয়ে অধিক বল হবে।" এই কথায় শুধু "হুঁ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই স্বীকার নিশ্চয় করিয়া করেন নাই বলিয়া আমি আবার বলিলাম;—"এ কথার কি হবে? আমাকে আশ্বাস দেবার মতো "হুঁ" বলে শুধু আমার বকবকানি থামাবে মনে করেছ। সত্যি হাঁ বলেছ এ রকম আমার মনে হচ্ছে না।" এই কথা শুনিয়া উনি খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ঠিক বলেছ; তুমি নিজেই কথাটা স্বীকার করেছ। ও রকম কোন শব্দ আমার মুখ থেকে বেরুলে তোমার ভাল লাগতো না। আমি কেমন করে মেয়েদের কথা বলাকে "বক্‌বকানি" বলব, তাই ঐ শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুই নি। বিশ্রাম নেবার অর্থ কি? এ কথা আমি বুঝতে পারি নে। আমি রোজ যে কাজ করি তাতে আমার কাজও হয় বিশ্রামও হয়। আমি ত এই বুঝি। তোমার বিশ্রাম সম্বন্ধে ধারণাটা কি আমাকে বল দেখি। আমরা পুরুষ মানুষ আমাদের বিশ্রামের ধারণা তোমাদের ধারণার সঙ্গে কতটা মেলে সেই বিষয়ে আমার সংশয় আছে। তোমরা স্ত্রীলোক তোমরা পুণ্যবতী, তাই ভগবান তোমাদের প্রকৃতিকে আমাদের উল্টা করেছেন কিন্তু ভাল করেছেন। সমস্ত ভাবনা চিন্তা সমস্ত কষ্ট সহ্য করবার জন্য ভগবান আমাদের পুরুষজাতকে সৃষ্টি করেছেন আর ঘরের ছায়াতে বসে আরাম ও সুখভোগ করবার জন্য তোমাদের স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা ওজন করে মেপেজুকে আহার করলে, পরিশ্রম বিনা তা হজম হয় না, আর সমস্ত দিনের মধ্যে নিদেন ছয় সাত ঘণ্টা একটা না একটা কাজে পর-পর ব্যাপৃত না থাকলে আমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয় না, সময় কাটে না। সেই রকম আবার তোমাদের দিক্‌টা দেখ, যতই খাওনা

যাই খাওনা, মেহনৎ না করেও, কেবল বসে থেকেও হজম হয়। বাড়ীর কোন কাজ কিংবা লেখাপড়া কিছুই নেই। তবু পাশা, দাবা ও তাস খেলে তোমাদের সময় কাটে ও আমোদ হয়। এতেই দেখা যাচ্চে, ভগবান তোমাদের একটা বড় অধিকার দিয়েছেন। সেই অধিকার এই যে তোমরা কিছু না করলেও চলে, কিন্তু পুরুষ আমাদের সঙ্গে তোমরা শুধু তর্ক করতেই পার; সে বিষয়ে তোমাদের খুব দক্ষতা আছে।" এই সকল কথা যদিও উনি হাসিতে হাসিতে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলেন তথাপি আমি এর ভিতর কোন কথা বলি নাই ও হাসি নাই। আমার এই কথা জানা ছিল, যে বিষয় ওঁর নিজের মনোগত অভিপ্রায় নহে, সেই সম্বন্ধে অন্যকে দুঃখ না দিয়া তর্কের দ্বারা কুণ্ঠিত করিয়া চুপ করাইয়া দেওয়া এবং শেষে নিজের যা অভিপ্রায় তাই অবাধে করিয়া যাওয়া এই যাঁর চিরকেলে স্বভাব সেই অনুসারেই এখনো চলিতেছেন। অতএব এই সময় বেশী কথা না বলাই ভাল; এই মনে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, তারপর দিন যাইবার তাড়া থাকায় আমি আপনার কাজে গেলাম। এ দিকে "উনি" 'এসিয়াটিক সোসাইটি'কে চিঠি লিখিয়া আপনার যত পুস্তক আবশ্যক তত পুস্তক আনাইয়া, "বেশ গুছিয়ে সঙ্গে নেও" এইরূপ ওঁকে যে ছেলে পুস্তক পড়িয়া শুনাইত তাহাকে বলিলেন। সেই অনুসারে সে সমস্ত বাঁধিয়া লইল, এ দিকে আমারও সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হওয়ায়, আমরা ভাগুপা ছাড়িয়া মহাবলেশ্বরে পৌঁছিলাম।

বাঙ্গলায় ঝরণা ও জলের সুবিধা বেশ ছিল। উহা দেখিবামাত্র আমাদের ভাল লাগিল। গত পাঁচ ছয় দিন হইতে, শুধু বালকোরার জ্বর ও কাসি চলিতেছে; সে একেবারেই উঠিতে পারে না; ডাক্তার আসিয়া তাহাকে রোজ দেখেন এবং ঔষধাদি দেন, আমাকে চাকর বলিল। তাহা শুনিয়া আমি নীরবে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া এবং সন্ধ্যাকাল হওয়ায় কাপড় ছাড়িয়া রান্না করিতে লাগিয়া গেলাম। এই ক্ষেপে, ছেলেদিগের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে বলিয়া দুই ছেলেকেই সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এই সময়ে তারা আমার খুব কাজে লাগিল। তাহাদিগকে হাঁড়িকুঁড়ি ও রান্নার মালমসলা বাহির করিয়া দিতে বলিয়া আমি রাঁধিতে লাগিলাম। এই সময়ে পুণায় প্লেগ ও রঙ্গশাহীর দেহপরীক্ষায় ভয়ে আমার খুড়া ও খুড়শ্বশুর বিঠুকাকা আমাদের সঙ্গে মহাবলেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ৭০। ৭২; তাঁহার দেহযষ্টি খুব উচ্চ ছিল এবং শরীরের বাঁধনও মজবুৎ ছিল। ইনি গত ২০। ২২ বৎসর কাল পুণার আমাদের কাছেই থাকিতেন। এঁর মেজাজ জেদী ও কড়া ছিল। তথাপি খুব প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীপাণ্ডুরঙ্গের উপাসক ছিলেন। রাত্রিদিন ঈশ্বরের ভজন চিন্তন ও মননে তাঁর সময় অতিবাহিত হইত। এই বৃত্তান্ত পরে বলিব। আমার রান্না হইয়া গেলে, আমি বলিয়া পাঠাইলাম, তখন সকলেই আহার করিতে আসিলেন। আহারান্তে বিঠুকাকা ও আর সকলেই আঁচাইয়া আপন আপন জায়গায় গেলেন। কেবল উনি মুখশুদ্ধি করিবার জন্য সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। আমি নিত্যানুসারে ঐ থালাই নিকটে আনিয়া আমার ভাত বাড়িয়া লইলাম এবং "এখন আমার কিছুই দরকার নেই, তোমরা খেতে বোসো" এইরূপ ঐ দুই ছেলেকে বলিয়া আমি খাইতে বসিলাম। বালকোরার পীড়াসম্বন্ধে আমার কথা শুনিয়া উনি বলিলেন, "আজ দুপুরে আমাদের কাকার খুব আমোদ হয়েছিল। আমাদের রাণাডে বংশের সমস্ত পুরুষই মজবুৎ ও সাহসী, কিন্তু তাঁহাদের বলবীর্য্য আমাদের মধ্যে এখন আর নেই; এবং আমাদের পরের বংশের ছেলেরা আরও দুর্ব্বল হবে জেনো"। প্রথমেই পুণায় শরীর-পরীক্ষার ভয়ে কাকা আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এবং এখানেও শরীর পরীক্ষা আছে দেখিয়া তাঁর ভাল লাগিল না। তাঁর একটু ভয় হইল। আমাদের গাড়ী শরীর-পরীক্ষার আড্ডায় দাঁড় করাইয়া ডাক্তার আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; আমাকে ও ছেলেদিগকে পরীক্ষা করিবার পর ডাক্তার কাকার দিকে ফিরিলেন এবং নাড়ী দেখিবার জন্য সম্মুখে আসিলেন। কাকা বলিলেন, "কি, আমার নাড়ী দেখ্‌বে? আমার নাড়ী দেখে তুমি কি বুঝবে? আমার আয়ু কত বল দেখি? তোমার হাতে কি আছে? তুমি পেটের জন্য চাকরী করচ। আমার জ্বর আছে কি নেই, এই টুকুই তোমার দেখা আবশ্যক। আচ্ছা আমার হাত দেখ।" এই কথা বলিয়া তিনি ডাক্তারের হাতের কব্জি খুব দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। ডাক্তার জাতিতে মুসলমান কিন্তু বেশ অভিজ্ঞ ও সুসভ্য ছিলেন। ডাক্তার কাকার মুখের দিকে চাহিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আমার হাত ছাড়ো বাবা। তোমার জ্বরটর কিছুই নেই। আমার চেয়ে তোমার জোর বেশী।" এই কথা শুনিয়া বিঠু কাকা তাঁর হাত ছাড়িয়া দিলেন; তাহার পর "উনি' বলিলেন, "আমাদের গাড়ী এখন চলতে আরম্ভ করেছে।" এই সময় ছোটবেলায় "উনি" বিঠু কাকার বলবীর্য্যের আরও দুই একটা ব্যাপার যা' দেখিয়াছিলেন তাহার গল্প করিলেন। যখন এই সব কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ইতিমধ্যে আমার খাওয়া হইয়া গেল এবং আমরা দুজনেই উঠিলাম। তার পর দিন হইতে বরাবর

৮ দিন দুই বেলায়ই রান্না আমাকেই করিতে হইয়াছিল। সেই সময়, উনি যে সব জিনিস খাইতে ভাল বাসিতেন আমি সেই সব জিনিস রাঁধিতাম। কিন্তু মহাবলেশ্বরে আসিবার ৫। ৭ দিন পরেও, যতটা হওয়া উচিত শরীর ততটা ওঁর ভাল মনে হইতেছিল না। নিদ্রা অল্পই হইত, ষ্ট্রবেরী ছাড়া মুখে আর কিছুই রুচিতো না। এইখানে আসা অবধি ষ্ট্রবেরী ফল তবু ৮। ১০ টা পেটে পড়িতে লাগিল এবং বোম্বাই অপেক্ষা অবসন্নতা কম হইয়া, চলা-বলায় অধিক স্ফূর্তি দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপ আরো ৫। ৭ দিনের পর, এক দিন রাত্রে মামা মহাশয় রাত্রে জলযোগ করিবেন না বলিয়া রান্না করিবার পর আমি ছেলেদের বলিলাম, তোমরা সকলে ভাত খাও আমি আজ এইখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিব।" তদনুসারে সবাই আসিলে ছেলেরা ভাত খাড়িল এবং আমি সেখানে উহাঁর নিকটে একটা পিঁড়ি লইয়া বসিলাম। প্রথম ভাতের ৫। ৭ গ্রাস খাইবার পর দুই তিনটা চাটুনী খাইয়া দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রান্না করেছে। জিনিসগুলি বেশ হয়েছে। আজ আমার মুখে একটু রুচি হয়েছে। আমি মনে করিলাম, যেমন সব সময়ে ঠাট্টা, করেন এও সেই রকম ঠাট্টা, এই মনে করিয়া আমি বলিলাম, রান্না যেই করুক না কেন, তা জেনে কি ফল! খেতে ভাল লাগে তবেই ত? যে কোন জিনিসই করা যায় তা মুখে যদি না রোচে তাহলে সে রান্নার মূল্য কি?" এইরূপ বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন উনি বলিলেন, "আমি সত্যই বল্‌চি, ঠাট্টা করচি নে। আমার রুচি যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্চে; আজকের সমস্ত জিনিসই আমার ভাল লাগচে;" এইরূপ বলিতে বলিতে, একটা জিনিসে হাত দিয়া খাইতেছেন ইতিমধ্যে অন্য তরকারী ও "আমটী" তৈয়ারী হওয়ায় পাতে দেওয়া হইল। তাহাও উনি খাইলেন। আমার মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। গত আড়াই মাস তিন মাস, হৃদ্‌রোগের মতো যে ভাবনা-চিন্তা মনে লাগিয়া ছিল তাহা এক্ষণে একটু দূর হইল। আজ আমার উপর ঈশ্বর কৃপা করিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া সেইখানেই ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া আমি মনে মনে কতই ধন্যবাদ করিলাম, প্রার্থনা করিলাম এবং "তোমার কৃপায় আমার এইরূপ সুখের দিন যেন স্থায়ী হয়" এইরূপ ভিক্ষা মাগিলাম। এই সময়ে আমার চোখে জল আসিল, কিন্তু তাহা অন্য কেহ লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই আমি আমার চোখ মুছিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। সেই রাত্রে দুই গ্রাস বেশী পেটে পড়ায় রাত্রে বেশ ঘুম হইয়াছিল, সকালে বেশ চাঙ্গা মনে হইতেছিল। যখন মুখ ধুইতেছিলেন সেই সময় বেড়াইতে যাইবার জন্য আবা সাহেব কাহবকে, শিবরাম-হরি-সাটে, শ্রীরামকান্ত জটার প্রভৃতি মিত্রমণ্ডলী নিত্যানুসারে আসিলেন; তখন 'উনি' তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"গত ৮।১০ দিনের পর, কাল রাত্রে আমার আহারে রুচি হয়েছে, ঘুমও বেশ হয়েছে, তাই আজ এখন বেড়াইতে যাইবার কোন বাধা নাই"। সেই দিন হইতে আহারে রুচি হইয়াছিল, পরিপাক বেশ হইতেছিল, নিদ্রাও বেশ হইতেছিল, এই জন্য আর ১৫ দিনের মধ্যে 'ওঁর' শরীর ভাল হইল ও পরমেশ্বরের কৃপায় এই সময়ে আমার উৎকট ভাবনা চিন্তা ও ভয় দূর হইল, আমরা আনন্দে বোম্বায়ে ফিরিয়া আসিলাম।

বিঠ্ঠল বাবাজী রাণাডে, ওর্ফে, আমাদের বিঠুকাকা।

ইনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন। ইনি আমাদের সাঙ্গলীবংশের চার ভায়ের মধ্যে এক ভাই ছিলেন। আমাদের শ্বশুরের মৃত্যুর দুই বৎসরের পর, ১৯৭০ অব্দে ইনি পুণায় আমাদের বাড়ী আসিয়া রহিলেন, এবং শেষ-পর্য্যন্ত আমাদের কাছেই ছিলেন। লোকে বলে, ইনি পূর্ব্ববয়সে স্বভাবত রাগী ও জেদী ছিলেন। সেইরূপ আবার খুব লম্বা চওড়া শরীর ছিল, বেশ বলবান ছিলেন; এই সমস্ত খুড়তুতো ভায়েরা ও তাঁহাদের ছেলেরা প্রায়ই আমার শ্বশুরের নিকটেই থাকিত। ভূদবগড়, পন্থালা, গড়হিংলজ, আল্‌তে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ছোট-খাটো চাকরী ছিল। তাঁরা চাকরীতে থাকিয়া, স্ত্রীপুত্রদিগকে আমাদের কোহ্লাপুরের বাড়ীতে রাখিয়া-ছিলেন, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমার শ্বশুর মহাশয়েরই করিতে হইত। ইহা-দের মধ্যে এই বিঠুকাকার ১৫।২০ টাকার একটা চাকরী ছিল। তাঁহার উপরিওয়ালা সাহেব কোন অপমানের কথা বলায় তিনি রাজীনামা দিয়া ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং সংসারবিরাগী হইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া, উপরে কথিতানুসারে ১৮৭৯ অব্দে পুণায় প্রত্যাগত হইয়া এক স্থানে থাকিতেন এবং শান্তচিত্তে দিবারাত্রি আপ-নার ভজনপূজনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৫। তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানে ১৫ বৎসর ধরিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ভ্রমণ ও প্রবাসের মধ্যে যে সব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল ও যে সব সাধুসন্তের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহার দরুন ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন এবং সেই মার্গের উপরেই তাঁর শ্রদ্ধা জন্মিল। এই নববিধ ভক্তিমার্গের উপ-দেশানুসারে তিনি অহোরাত্র দেবতার ধ্যান ভজন পূজন, গীতাপঠন ও নামদেব তুকারাম প্রভৃতির অভঙ্গের আবৃ-

ত্তিতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। পূজার আড়ম্বর বেশী ছিল না। তিনি কোন এক সময়ে আপনার ঘরেই পূজা করিতেন। একবার স্নান করিবার জন্য এবং দুই বেলা কেবল আহারের জন্য আপনার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেন। বাকী সময় দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে অভঙ্গ আবৃত্তি করিয়া ভজন করিতেন কিংবা তাহার পর, অন্যের সহিত কথা কহিবার মতো নিজেরই সহিত উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন। কখন রাগে, কখন লোভে, কখন "তুমি আমাকে মিথ্যা করে জানাচ্ছ" এইরূপ আশ্চর্য্যের উচ্ছ্বাসোক্তি বলিয়া, কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া দেবতার অসীম কর্তৃত্বে ও লীলাসম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, কখন কখন "দয়ালু বলিয়ে নিচ্ছ কিন্তু দেখা দেওনা কেন," এইরূপ যেন রোষের ভাবে বলিতেন, কখন কখন আবেগ-ভরে রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিয়াও উঠিতেন। এইরূপ তাঁহার অবস্থা ছিল। বাড়ীর লোক ও অন্য লোক অপেক্ষা এই সব দুই একবার শুনিবার আমার সুবিধা হওয়ায়, আমার শুনিবার জন্য খুব ঔৎসুক্য হইয়াছিল। সকালে কিংবা সন্ধ্যাকালের শান্ত সময়ে কখন কখন রাত্রিতেও তাঁর ঘরের রুদ্ধদ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তিনি এই সব কথা বলিতেছেন,—'ওঁর' কাছে গিয়া বলিতাম। তিনি "দেবতা সহ কহি কথা" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক কথা কহে, তাহারা দেবতার কথাও শুনিতে পান বলিয়া মনে হয়। কখন কখন তাঁর এই রকম কথা-কহা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার বিষয়ে মহাবলেশ্বরে সেই দিন, দুই এক বিষয় যাহা 'উনি' আমাকে বলিয়াছিলেন, সে তাঁর শক্তিসম্বন্ধে, ও তাঁর সাহস-সম্বন্ধে। যখন তাঁর চাকরী ছিল সেই সময়ে একবার তাঁর কাছারীর সাহেব, যে সকল মরাঠী কেরাণীর ২৫ বৎসর চাকরী হইয়াছে, তাহাদিগকে পেনশন দেওয়া হইবে বলিয়া হুকুম পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিলে পর, ২৫ বৎসর যাহাদের চাকরী হইয়াছিল সেই সব লোকদের একটা ফর্দ্দ তাঁহাকে দেওয়া হইল, এবং "তাঁহাকেও পেনশন দেওয়া হইবে" এইরূপ তিনি শুনিতে পাইলেন। এবং সেই ফর্দ্দ সাহেবের নিকট পাঠান হইল। বিঠুকাকা কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতগুলি লোকেদের সাহেব এরই মধ্যে পেন্‌শন কেন দিচ্ছেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"সাহেব এই কথা বলছেন, "২৫ বৎসর যাদের চাকরী হয়েছে তাদের বয়স হয়েছে। তারা অক্ষম, তারা কাজের যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়। এইজন্য এই সব লোকদের পেন্সন দিয়ে, নবীন তরুণ কার্য্যক্ষম কেরাণীদের কাজে ভর্ত্তি করা হবে।" বিঠুকাকা এই সমস্ত শুনিলেন এবং তারপর দিন সকালে উঠিয়াই সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৮টা ৮৷৹টার সময় সাহেব বেড়াইতে যাইবার জন্য বাঙ্গলার বাহিরে আসিলেন ও রাস্তায় আসিবামাত্র বিঠুকাকা তাঁকে "রাম রাম" অভিবাদন করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" বিঠুকাকা বলিলেন—"আমি বিঠ্ঠল বাবাজী রাণাডে, অমুক কাছারীর কেরাণী।" সাহেব বলিলেন—তুমি কি জন্য এসেছ? এই সময় আমি বাহিরে যাচ্ছি, অন্য কোন সময়ে এসে দেখা কোরো।" "আমি এখানে কোন কাজের জন্য আসিনি, আমার কিছু বলবারও নাই। আপনি দুই মিনিট ঐখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন, তাহলেই হইল।" এই কথা বলিয়া তিনি ধুতি কাছা মারিলেন এবং গায়ের জামা উপরে চড়াইয়া সেইখানেই, রাস্তার ও-ধারে চার গরুতে টানবার মত যে এক পাথরের রোলার পড়িয়াছিল তাহার নিকট গিয়া ও তাহার দাণ্ডা দুই হাতে ধরিয়া সেই রোলারটা—যেখানে সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই-খানে হড়হড় করিয়া টানিয়া আনিলেন। সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি করচ?" বিঠুকাকা উত্তর করিলেন, "সাহেব আমি আপনার কাছারীতে এইরূপ শুনিলাম যে, ২৫ বৎসর যে সব কেরাণী চাকরী করেছে, তাদের বয়স হয়েছে, তারা অশক্ত হয়েছে বলে আপনি তাদের পেন্সন দিতে চাচ্ছেন; দরখাস্ত করলে আমার মত গরীবের নালিস কি আপনি শুনবেন? লিখিত দরখাস্তের গোলযোগের মধ্যে যাওয়া অপেক্ষা, আমি সাক্ষাতে এই দরখাস্ত করলুম। অসামর্থ্যের জন্য যদি পেন্সন দেবেন মনে করে থাকেন, তাহা হলে ইচ্ছা হয়ত এই রোলারটা একবার টেনে দেখুন, তাহলে আপনার বিশ্বাস হবে।" এই কথা বলিয়া "রাম রাম" করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দিন পেন্সনের ফর্দ্দ হইতে বিঠ্ঠল বাবাজী রাণাডের নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁকে কাজে বাহাল রাখা হয় এইরূপ সাহেব সেই কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীর নামে পত্র পাঠাইলেন। সকলের পেন্সনের হুকুম হইলেও তোমাকে বাহাল রাখার হুকুম কি করে হল?"—এই কথা আমার শ্বশুর মশায় বিঠুকাকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বিঠুকাকা পূর্ব্বদিনের সকলের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। "ওঁর" তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন আমার খাশুড়ীঠাকরুণ নিফডা হইতে আম্বেগাঁয়ে গরুর গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন পথে গাড়ী হইতে "উনি" নীচে পড়িয়া গেলে মার গাড়ী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। "উনি" গল্প করেন:—"কিন্তু পিছনে বিঠুকাকা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন, তাঁকে উচ্চৈস্বরে হাঁক দিয়া

ডাকিয়া বলিলাম "আমি পড়ে গেলুম" এবং তিনি আমাকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া লইলেন"—এই সেই বিঠুকাকা। এইটুকু বলিলেই পাঠক চিনিতে পারিবেন।

ইতি ২০শ অধ্যায় সমাপ্ত।

১৮৪১ শকের ৪ঠা মাঘের কার্য্য বিবরণ।

গত ৩রা মাঘ শনিবার দিবসের শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় গণের লিখিত অনুরোধে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বান অনুসারে মাঘোৎসবের কার্য্য নির্দ্ধারণ জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৪ঠা মাঘ রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় অধ্যক্ষ-সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক।
শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক।
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১। মন্দিরে উৎসবের প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—বাড়ী পুরাতন বলিয়া কোনরূপ দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রাতের উৎসব মহর্ষিদেবের বাটীতে হইবে। উহার পূর্ব্বে মন্দিরে কেবল ব্রহ্মের অর্চ্চনা ও "তুমি আমাদের পিতা" সঙ্গীতটী গীত হইবে।

২। উৎসবের কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইল। স্থির হইল ৬ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে উপাসনা হইবে।

৬ই মাঘ মঙ্গলবার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
৭ই মাঘ বুধবার	" "
৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।
৯ই মাঘ শুক্রবার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
১০ই মাঘ শনিবার	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

১১ই মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১ই মাঘ রবিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। আবশ্যক হইলে উপরোক্ত প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অধ্যক্ষ সভা হইবার প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—ভবিষ্যতে অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশন বিশেষ অসুবিধা না হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে হইবে।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদিব্রাহ্মসমাজে একটী লাইব্রেরী করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল। স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী লাইব্রেরী করা হউক এবং তাহার সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর প্রদত্ত হউক।

৫। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে ১৭৲ বেতনে একজন সাময়িক কর্ম্মচারী লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে মাসিক ৮৲ টাকা দিয়া আপাততঃ মাঘ মাস হইতে ৬ মাসের ছুটী মঞ্জুর করা হউক। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে এই ৬ মাসের জন্য ১৭৲ বেতনে নিযুক্ত করা হউক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সম্পাদক	সভাপতি
২৩, ১. ২০	২৩. ১. ২০

সংবাদ।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। চট্টগ্রামবাসী আমাদের হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন—"নিজ বাসাতে মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মোৎসব সপরিবারে ও সবান্ধবে সম্পন্ন করিবার জন্য একটু ব্যস্ত আছি সেইজন্য পত্রখানির উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল। মার্জ্জনা করিবেন। মধ্যে একদিন পাতাড়তলীতে ডাঃ কুঞ্জবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ ও ব্যাখ্যান হতে কিছু কিছু পড়িয়া ব্রহ্মোপাসনা করা যায়; প্রায় ৩০ জন স্থানীয় লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আগ্রহসহকারে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ফলে আমাকে এখন সর্ব্বদা সেখানে নিয়ে যাবার জন্য সকলকার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার সেখানে উপাসনা করবার কথা আছে।" আমরা চাহি যে যেখানে যেখানে আমাদের হিতৈষী বন্ধুগণ আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যোগেন্দ্রবাবুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের এক-একটী জ্বলন্ত কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করুন।

গ্রন্থ-পরিচয়।

পল্লী-ছায়া। শ্রীরোহিণীকুমার গণ প্রণীত। কলিকাতা ৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেটকাফ্ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

"পল্লীছায়া" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। লেখক ইহাতে পল্লীর অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে তাহার বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দিনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাগুলি মন্দ হয় নাই; স্থানে স্থানে কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য শুভ; তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"সমাজের দোষ-ত্রুটীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আয়ুক্ত ব্যাধির প্রতীকার করিয়া সমাজকে সুস্থ সবল হইতে ইঙ্গিত করিয়াছি"।

গায়ত্রী। সঙ্কলয়িতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, বি, এল্, পাবনা। ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

এখানি বৈদিক মহামন্ত্র গায়ত্রীর ব্যাখ্যা-পুস্তিকা। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই গায়ত্রীর অনেকগুলি ব্যাখ্যা-পুস্তিকার প্রচলন দেখা যায় বটে কিন্তু এখানির মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আর একখানিও দেখি নাই। ইহাতে সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যের গায়ত্রীভাষ্য ও তাহার সরল মর্ম্মানুবাদ এবং সুবিস্তৃত তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। গায়ত্রীর শাঙ্করভাষ্য যাহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য না হয়, তাহার জন্য লেখক ভূমিকায় সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকায় তিনি ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অর্থ না জানিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফল হয় না। নব্যবঙ্গের বর্ত্তমান যুগে আদিব্রাহ্মসমাজই এই মন্ত্রের আদিম প্রচারক। অর্থজ্ঞানের সহিত গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করিবার আবশ্যকতা আদিব্রাহ্মসমাজই প্রথম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তখন এই সত্যতত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; গতানুগতিকতার মোহ হইতে আপনাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতাও তখন সকলের ছিল না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; সমাজ এখন গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া তাহার শ্রেয়ের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহার এই সচেতনতা, এই সক্রিয়তার জন্য সে পরোক্ষভাবে অনেকপরিমাণে আদিব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। যুগোচিত শিক্ষা ও দীক্ষাও তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, আদিব্রাহ্মসমাজের সেই আদিম সাধনাই বর্ত্তমান যুগের সফলতার পথে দ্রুতপদে চলিয়াছে এবং নব নব উদ্যমে নিত্য নবীনভাবে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হউক।

সুনীতিবিকাশ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। "সাধনা-কুঞ্জ" চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তি স্থান, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫০।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট প্রভৃতি। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ।৴১০ আনা।

কবিবর জীবেন্দ্রকুমারের এই শিশু-পাঠ্য পুস্তক দুইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানি পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের বালকদিগের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির বিষয়নির্ব্বাচনবিষয়ে গ্রন্থকার তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্বপ্রেমিকতা, মহাপ্রাণতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি নীতি ও ধর্ম্মের সাধারণ শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্তের সহিত স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সরল ও সুমধুর ভাষায় বালকদিগের সুকোমল হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ধ্যানলোক ও তপোবনের কবি যে আজ বালকদিগের তুষ্টি, প্রীতি ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই পুস্তক দুইখানি বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইবার বিশেষ উপযোগী।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই শুভ প্রাতঃকালে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে মায়ের আহ্বানে তাঁহারই পূজা দিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। সরল প্রাণে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে, শিশুর মতো সরল প্রাণে তাঁহার চরণবন্দনা করিতে হইবে, হৃদয়মনের সমুদায় ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। সরল প্রাণে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি যে অসাধ্যসাধনও করা যায়, যে ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আজ সকলে মিলিয়া মায়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছি, সেই ব্রহ্মমন্দিরই তাহার সাক্ষী। তাঁহাকে সত্য সত্য ভাল বাসিলে, তাঁহার উপর প্রাণের সহিত একান্ত নির্ভর করিলে আমাদের সমস্ত বাধাবিঘ্নই কাটিয়া যায়। যাঁহার ইচ্ছাতে এই মহান ব্রহ্মচক্র নিয়মিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সংযুক্ত হইলে যে বল আসে, সে বলের নিকট কোন বাধাবিঘ্নই দাঁড়াইতে পারে না। বর্ত্তমানকালে নানা কারণে নূতন ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপনে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসের কর্ম্ম বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সংস্থাপকগণের প্রাণে সেই বিশ্বমাতার উপর একান্ত নির্ভর ছিল বলিয়াই তাঁহারা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে যিনি বিশ্বমাতা, যিনি জগতের মাতা তিনি আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ মাতা। সেই মাতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধান কিছুই নাই। মায়ের কাছে যাইবার জন্য, তাঁহার কোলে পৌঁছিবার জন্য আমাদের দূরে যাইতে হইবে না। তিনি আমাদের রক্ষাকবচ হইয়া নিত্যই ঘিরিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয়।

ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের সত্যসত্য প্রিয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ যদি সত্যসত্য আমাদের প্রাণের বস্তু হয়, তবে আমরা সকলে যখন একই মায়ের সন্তান তখন আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে হিংসাদ্বন্দ্ব দূর হোক, দূর হইয়া যাক ছোটখাটো কথা লইয়া মান অভিমান। এ সমস্ত সংসারের ছোটখাটো বিষয় যেন আজ এই মহাপূজার কালে আমাদের হৃদয়ে এতটুকুও স্থান না পায়। মায়ের পূজার কাছে সংসারের পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণা, সংসারের ছোটখাটো আমোদ আহ্লাদ, বৃথা হাসিখুসি, সকলই বড়ই তুচ্ছ। সংসারের এই সমস্ত ছোটখাটো বিষয়ই আমাদের চক্ষের সম্মুখে এত বড় হইয়া দাঁড়ায় যে আমাদের মাতা আমাদের নিত্য সঙ্গী থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে বিবৃত।

আজ এই মাতৃপূজার দিনে আমাদের সে সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক জানিতে হইবে যে বিশ্বমাতা আমাদেরও মাতা এবং তিনি আমাদের নিত্যসাথী। তাঁহাকে মাতা বলিয়া জানিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃবিবাদ দূর করিতে হইবে। প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমরা পরস্পরের হৃদয়ে আনন্দ আনিতে পারি।

যাঁহার শক্তিতে আমরা শক্তিমান হইয়াছি, যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কণামাত্র পাইয়া আমরা মানুষ হইতে পারিয়াছি, তাঁহার সন্তান হইয়া সংসারের বাধা যেন আমাদের প্রতিপদে না মানিতে হয়। যখন তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্নকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিব। তখন আমাদের সেই ইচ্ছার সম্মুখে বাস্তবিকই সেই সমস্ত বাধা তুচ্ছ হইয়া পড়িবে।

মাকে যদি আমরা সত্যসত্যই ভালবাসি, তবে তাঁহার কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাঁহার নাম প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের প্রচার করিতে হইবে। যে নামের বলে আমরা শতবার বিপথে পড়িয়াও, পাপেতাপে জর্জ্জরিত হইয়াও তাঁহার কোলে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি, সেই নাম সকল ভাইভগ্নীকেই শুনাইতে হইবে; যে কোন ভাইভগ্নীর হৃদয় পাপতাপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে দেখিব, তাঁহারই চক্ষের জল মুছাইতে ছুটিয়া যাইব; তাঁহাকেই প্রাণের ভাই বলিয়া প্রাণের ভিতরে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইব। সংসারের অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাঁহার দেহমন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারই কর্ণে ব্রহ্মনামের মধুর মন্ত্র প্রদান করিয়া মাতা ও সন্তানের মধ্যে প্রেমের ধারা বহাইয়া দিব।

এইভাবে যদি আমরা কার্য্য করিতে পারি, তবেই ব্রাহ্মসমাজের জয়জয়কার হইবে। আমি জানি, যাঁহারা আজ এই উপাসনামণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের হৃদয় হইতে ভক্তিশ্রদ্ধার স্রোত নামিয়া এক প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়া দেশবিদেশকে ভাসাইয়া দিক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি। আমরা সকলে কাতর প্রাণে জগন্মাতার নিকট এই প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা সফল করিবেন। নামেমাত্র ব্রহ্মোপাসক না হইয়া আমাদের কার্য্যে আচারে ও ব্যবহারেও ব্রহ্মোপাসকের উপযুক্ত হইলেই তিনি আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকেও নিশ্চয়ই জয়যুক্ত করিবেন।

মৈত্রী-সাধন।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুং॥

হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের অপরাধসকল সহ্য করেন, সখা যেমন সখার এবং প্রিয়জন যেমন প্রিয়জনের, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর।

ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখিলেন, অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে যখন এই বিরাট-বিশাল বিশ্বচক্রের নিয়ম ও কৌশলসকল উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, এবং যখন অর্জ্জুন সেই বিশ্বপরিচালক নিয়ম ও কৌশলেরই একাঙ্গস্বরূপে ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতি মহা-মহা বীরপুরুষদিগকেও স্বীয় স্বীয় কর্ম্মবশে নিহত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তখন তিনি সেই সমস্ত সত্যনিয়মের মহান অলৌকিক ভাবের গুরুত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভগবানেরই নিকট তাহা সহ্য করিবার শক্তিলাভের জন্য শরণাগত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিলেন যে, রাশি-রাশি বেদবেদান্তই পড়, আর রাশিরাশি দানধ্যানই কর, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরভাব অবলম্বন না করিলে, এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন ও তাঁহাতে একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত ভগবানের বিশ্বরূপের তত্ত্ব তলাইয়া বুঝিতে পারিবে না; ভগবান যে কি প্রকারে বিশ্বচক্রের প্রতি অণু পরমাণুর ভিতরে ওতপ্রোত থাকিয়া জগতের প্রত্যেক নিমেষটী পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, নির্ব্বৈরভাবের সাধন ব্যতীত কোন প্রকারে সে তত্ত্ব কাহারও উপলব্ধিতে আসিতে পারিবে না। মৈত্রী-

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে বিবৃত।

ভাবের সম্যক্‌সাধন করিতে পারিলেই, তোমার আত্মা সকলের আত্মার ভিতরে প্রবেশলাভে সক্ষম হইবে, এবং তখনই তুমি ভগবানের বিশ্বরূপের প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তাই গীতা আমাদিগকে পদে পদে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদের অতীত হইতে হইবে; বিপদ-সম্পদ সমস্তই তুল্যচক্ষে দেখিয়া শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নির্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, মহামৃত্যুর ভিতরে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ সেই কুরুক্ষেত্র-সমরের পরবর্ত্তী আর এক ভীষণতম সমরের অবসানেও সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে— সর্ব্বভূতের প্রতি, দুর্ব্বল ও সবল সকল জাতির প্রতি নির্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ জগতের শান্তি সুদূরপরাহত। এই নবতিতম ব্রহ্মোৎসবের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমরাও আজ সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, জীবন লাভ করিতে চাহিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহিলে, সমুদায় প্রাণমন দিয়া ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে হইবে, এবং নির্বৈরভাব অবলম্বন করিতে হইবে; পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি যে, মৈত্রীকেই আমাদের ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ যখন মহাসমরের ফলে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর করালমূর্ত্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে লাগিল, শোকের করুণ আর্ত্তনাদ যখন প্রতীচ্যভূমির প্রত্যেক গৃহের কর্ণ বধির করিয়া তুলিল, তখনই সেখানে নির্বৈরভাব অবলম্বন করিবার মন্ত্র আবির্ভূত হইল বটে; কিন্তু ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রতীচ্যবাসীর প্রাণের ভিতর এই মন্ত্র সত্যসত্য গৃহীত হইবার পক্ষে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য আবশ্যক বলিয়াই ইউরোপীয়গণ এই মন্ত্রের কথা উঠাইয়াছেন, কিন্তু প্রাণের সহিত তাঁহারা এই মন্ত্র সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সম্মত আছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নির্বৈরমন্ত্র এই মৈত্রীভাব কেবল ভারতের নহে, ইহা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেরও প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচ্য ভূখণ্ড বহুবর্ষব্যাপী পরাধীনতার কঠোর নিষ্পেষণ মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াও এই নির্বৈরভাবকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই ভাব হইতেই প্রাচ্য ভূখণ্ডে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ, নামে রুচি জীবে দয়া প্রভৃতি মহাবাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভাব লইয়াই বৌদ্ধপন্থী, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি মৈত্রীপ্রাণ বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ভারতে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে যখন প্রাচ্য-ভূখণ্ডের মুখপাত্র এই প্রাচীন ভারতভূমির শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংগঠিত মৈত্রীপ্রাণ প্রাচীন সভ্যতাকে একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ বিচ্ছেদপ্রিয় নবোত্থিত ভাবসমূহ, অপরদিকে বাহির হইতে সমাগত আত্মসুখপরিপোষক পাশ্চাত্য সভ্যতা আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, সেই মহাসঙ্কটকালে ভারতের এক সুদূর প্রান্তের অধিবাসী ঐ নির্বৈরভাবের ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভারতের প্রাচীনতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের আবিষ্কার করিলেন; এবং সেই সত্যধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মসমাজকে দাঁড় করাইয়া চতুর্দ্দিকের ভীষণ আক্রমণ হইতে ঐ নির্বৈরভাবের উদ্ধার সাধন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বন্দ্ববিবাদ যে কি মহাভ্রমাত্মক ক্ষুদ্র প্রাণের কার্য্য, তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বৃথা কলহ হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন; এবং অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— "দাঁড়াও; প্রাচ্যভূমির প্রাচীনতম সভ্যতার বক্ষে অন্যায় অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃথা রক্তারক্তি করিও না; কেবল সমস্ত প্রাচ্য ভূমির নহে, সমস্ত জগতের ইহাতে অকল্যাণ আসিবে—এরূপ কাজ করিও না; তোমরা যে বিজ্ঞান-সাহিত্য, যে ব্যবসায়-বাণিজ্য, যে রাজনীতি ও ধর্ম্মমত আমাদিগকে দিতে উদ্যত হইয়াছ, সে সমস্তের মধ্যে বাহিরে বাহিরে জীবনের

একটা চাঞ্চল্য দেখা গেলেও তাহার মধ্য হইতে মৃত্যুর করাল ছায়া সর্ব্বদাই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; কিন্তু আমরা যে প্রাচীনতম ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাহাকে আপাতত মৃতবৎ দেখা গেলেও তাহার মধ্য হইতে জীবনের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিতেছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।" নব্বই বৎসর পরে আজ আমরাও সেই মহাপুরুষের সহিত একপ্রাণে বলিতেছি—ছোটখাটো মতামত লইয়া দ্বন্দ্ববিবাদ, ছোটখাটো মান-অভিমান লইয়া বিবাদবিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া নির্বৈরসাধনে নিরত হইতে হইবে, মৈত্রীসাধনেই সিদ্ধ হইতে হইবে।

সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধক এই নির্বৈরভাব প্রাচ্যভূমির প্রাণ বলিয়াই, মৈত্রীই মূলে প্রাচ্যবাসীর ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়াই এখানেই বেদ-উপনিষদ সকল প্রকাশিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রাণে জাগ্রত থাকিতে পারিয়াছে; একদিকে তান্ত্রিকধর্ম্ম অপরদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই ভারতের বক্ষে বিচরণ করিতে পারিতেছে। নির্বৈরভাব প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণ বলিয়াই মহাত্মা কবীর রাম ও রহিমের অভিন্নতা প্রচার পূর্ব্বক শত সহস্র ভক্তিপিপাসু ব্যক্তির প্রাণমন স্বীয় বচনসুধায় সিক্ত করিতে পারিয়াছেন। এই নির্বৈরভাব প্রাচ্যভূমির প্রাণ বলিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডেই বেদ-উপনিষদের ঋষিগণ, এখানেই জরথুস্ত্রা ও বুদ্ধ, এখানেই ঈশা, মূসা, ও কনফুসিয়স, এখানেই মহম্মদ, চৈতন্যদেব ও বাবা নানক, এখানেই রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, এবং এখানেই পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকগণ জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

নির্বৈরভাবের মৈত্রীর মূলোচ্ছেদক হইতেছে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী। সর্ব্বভুক অগ্নির ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা গণ্ডীবদ্ধ সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থই হইল অপরের নিজত্বকে আমার নিজের ক্ষুদ্রতার পদে বলিদান করিতে চাওয়া। বাহিরের জগতে কি একটা বিশাল ভাব, বিরাট অনন্তপুরুষের কি একটা বিরাট অনন্তভাব নিত্য খেলা করিতেছে, সাম্প্রদায়িকতা তাহা উপলব্ধি করিতে দেয় না; কূপমণ্ডূকের মতো বাহিরের আলোককে ভীতির চক্ষে দেখে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিই হইল অজ্ঞান, অসত্য। কিন্তু মানুষ চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র অজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের ভিতরে এমন একটা স্বাধীনতার ভাব আছে, বিরাট বিশাল অনন্তের ভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিবার তাহার এমন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে যে, তাহাকে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিলে তাহার নির্বৈরভাব চলিয়া যায়, সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়।

প্রকৃতিকেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী দেখিতে পাই। প্রকৃতি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়াই আমরা প্রকৃতিতে এত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। প্রকৃতির কোন একটী পদার্থ যদি অন্য সকল পদার্থকেই নিজের ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিত, তবে জগতে এত বৈচিত্র্য আসিত কি প্রকারে? প্রকৃতির নিয়মই হইল বৈচিত্র্য। একেরই বিকাশ কতশত প্রকারে হইতে দেখা যায়। এক বীজ হইতে ডালপালা ফুলফল কতই না বিকশিত হইতে দেখা যায়। একমাত্র যদি বীজই জগতে থাকিত, তবে কোথায় বা গাছের ছায়া পাইতাম, কোথায় বা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিতাম, আর কোথায় বা ক্ষুৎপিপাসানিবারক রাশি রাশি ফলের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকিত! মানুষও তো প্রকৃতির এক অঙ্গ। যদি সকল মানুষ এক ও অভিন্ন একটা মানুষে পরিণত হইত, তবে কোথায় রহিত এই মানুষের বিচিত্র লীলা? সকল বিষয়ে নিজত্ব ছাড়িয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যাওয়াকে তো আত্মার মৃত্যু বলা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে অথবা মানুষের সমাজের মধ্যে জীবনী শক্তি থাকিলেই তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবেই। তাই সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে বলিয়া আমরা কাহাকেও নিজের বিশেষত্ব মুছিয়া দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে বলি না। আমরা বলিতে চাহি যে, বাহিরের সূর্য্যালোক আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দাও—ঘন অন্ধকার দূর হইয়া যাক। যে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম নির্বৈর মন্ত্রের প্রদীপ জ্বালাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের আজ এই

উৎসবের দিনে আমাদের যেন এই প্রতিজ্ঞা হয় যে, নির্ব্বৈরমন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রচারভূমি এই ভারতভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যুনিশ্বাস স্পর্শ করিতে দিব না।

এই ভারতভূমিকে কেন্দ্র করিয়া, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, যে দেশে বা যে কালে যে কেহ ব্রহ্মোপাসক আছেন বা ছিলেন, সকলেরই নিকট আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া দিতেছি, সকলকেই আজ আমরা আমাদের বিরাট আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছি ; শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল সমাজের প্রতি আমাদের সহায়তার বিশাল বাহু প্রসারিত হৌক। পাপীতাপী সাধু অসাধু কাহাকেও ভগবান প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; আমাদেরও কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার নাই। যে সাম্প্রদায়িকতা সকল প্রকার হিংসাদ্বেষ বিবাদকলহের মূল, দূর হৌক সেই সাম্প্রদায়িকতা ; যে আভিজাত্য সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মূল, চূর্ণ হৌক সেই আভিজাত্যের বৃথা গর্ব। ভাইয়ে ভাইয়ে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে বিচ্ছেদ-বিরহ আনিলে আর চলিবে না। এই সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী চূর্ণ করিতে না পারিলে মুক্তির কথা আর বলিতে যাইব না, ভগবদ্ভক্তির কথা বলিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না।

বিজ্ঞানপ্রকাশিত প্রত্যেক নিয়মই সর্বত্র একই ভাবে কার্য্য করে—সে কার্য্যে দেশের ভেদ নাই, কালের ভেদ নাই, অবস্থার ভেদ নাই। উত্তাপের শতবিধ বিকাশপ্রকাশের ভিতরেও উত্তাপের দাহিকতার বিরাম হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এক একটী নিয়ম কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিতি করে—সেই কেন্দ্রের অভিব্যক্তিতেই ঐ সকল কার্য্য, ঐ সকল ঘটনা প্রকাশ পায়। পাঁচটী সুরের সম্মিলনের ফলে যে সঙ্গীত উত্থিত হইয়া আমাদের প্রাণের ভিতর ভাবলহরী তুলিতে থাকে, তাহার মধ্যে একটী সুরই কেন্দ্রস্বরূপে ঝঙ্কার দিতে থাকে। সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, যত কিছু ধর্ম্মসমাজ উঠিতেছে পড়িতেছে, সকলেরই কেন্দ্রস্বরূপে একই নিত্য সত্য পরব্রহ্ম বিদ্যমান। তাঁহারই জ্ঞানের বিকাশে, তাঁহারই শক্তির বিকাশে সমস্ত ঘটনা অভিব্যক্ত হইয়া এক বিশাল পরিধি রচনা করিতেছে। যতই আমরা পরিধির দিকে অগ্রসর হইব, ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে বৈচিত্র্য বিভিন্নতা দেখিতে পাইবই। আবার যতই আমরা তলাইয়া দেখিতে যাই, কেন্দ্রের অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি যে, সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত বিভিন্নতা ভেদ করিয়া সকল মানুষের ভিতরে, সকল সমাজের ভিতরে একটী সুস্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু, প্রত্যেক জীবজন্তু, প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক সমাজ সেই মহান বিশ্বসঙ্গীতকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, শত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড়জগতের সমস্ত ঘটনার ভিতর নিয়মকেন্দ্র আবিষ্কার করা যেমন জড়বিজ্ঞানের কার্য্য, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যের মূলভিত্তি অখণ্ড মহাসত্যকে আবিষ্কার করাও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান যাঁহারা কিছুমাত্র চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের কোন ঘটনাই অন্ধদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। সেইরূপ ধর্ম্মের পথে অধ্যাত্মপথে যাঁহারা একপদও অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা রাশি-রাশি ধর্ম্মমতের ভিতরে ভগবানকে সারসত্য ভিত্তিরূপে উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

নির্ব্বৈরসাধনের মন্ত্রই হইল এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যদর্শন, ভগবৎকেন্দ্রকে উপলব্ধি করা। সুখের মোহে মানুষ অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া যায় বলিয়া কেন্দ্রমুখী দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে। দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেই মানুষের দৃষ্টি স্বভাবতই কেন্দ্রমুখী হয়, স্বভাবতই প্রাণের ভিতর বললাভের জন্য ঐক্যের সন্ধানে ধাবিত হয়। বর্ত্তমান যুগে ৯০ বৎসর পূর্ব্বে যখন দুঃখের কঠোর কশাঘাতে দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজ নির্ব্বৈরমন্ত্রের পতাকা উড্ডীন করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি ভগবানের অভিমুখীন করিয়াছিলেন। সকল বিভিন্নতার মূলভিত্তি একের সন্ধানে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ আবার সমস্ত দেশ এক মহা হাহাকারের ভিতর

দিয়া চলিতেছে, তাই আমরা আজ আবার সেই প্রাচীন মন্ত্রের কথা দেশের সম্মুখে ধারণ করিতেছি। কেবল আমরা কেন, সমগ্র দেশের ভিতরেই ভগবৎকেন্দ্রক ঐক্য সাধনের একটা যেন বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বলপূর্ব্বক কেহ কাহারও মত বদলাইতে পারে না। তাই সকলেরই মনে যেন এই রকমের একটা ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে অনন্ত পুরুষের অনন্ত ভাব যখন অনন্ত পথে বিকাশ লাভ করিতেছে, তখন সেই অনন্ত বিচিত্রতা লইয়া মারামারি করিয়া কোনই লাভ নাই। সেই সমস্তের মধ্যে একে উপলব্ধি করিতে হইবে; তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া সকলের মিলিতভাবে তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

এই যে ভাব আজ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহা সংক্ষেপে একটী বীজে প্রকাশ করিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই মন্ত্রকেই আমি ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া মনে করি। আমাকে ধন দাও, যশ দাও, মান দাও, এ প্রকার প্রার্থনাকে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত উপাসনা বলেন না। ব্রাহ্মসমাজ বলেন, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে এবং অকুতোভয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে—এক কথায় ভগবানকে আমাদের সকল কার্য্যের কেন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ জানিয়া তাঁহার সহিত অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ইহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলেন। সকল উন্নত ধর্ম্মসমাজেরই এই কথা, ব্রাহ্মসমাজেরও এই কথা।

এই অধ্যাত্মযোগের উপর দাঁড়াইলে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী আপনিই কাটিয়া যাইবে, নির্ব্বৈরমন্ত্র স্বতই সিদ্ধ হইবে। তখন আর কাহাকেও উচ্চ, আর কাহাকেও নীচ বলিয়া ভাবিতে পারিব না। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, একটী ধূলিকণারও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যাহা আমা দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না; আবার আমারও একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যাহা ধূলিকণা দ্বারা সংসাধিত হইবে না। এখন আমরা ভগবানকে আমাদের পিতা বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু অধ্যাত্মযোগের উপর দাঁড়াইলে তাঁহাকে সত্যসত্যই প্রাণের ভিতর পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিব। তখন সত্যসত্য মানুষকে নিজের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব, সমস্ত জীবজন্তুই আমার প্রাণের বস্তু হইয়া পড়িবে। তখনই বুঝিতে পারিব যে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করে কেন। তখন আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সহায় হইতে হইবেই। যেমন পরিবারের পাঁচটী লোকের পরস্পরের অবিরোধে স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে পরিবারত্ব পরিস্ফুট হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে, বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাক না কেন শত বৈচিত্র্য, শত বিভিন্নতা—সকলের মধ্যে প্রাণের একটা একতা থাকিলেই, মৈত্রীর উপর দাঁড়াইয়া পরস্পরের সহায়রূপে কার্য্য করিতে পারিলেই ভগবানের যে ইচ্ছার অভিব্যক্তিতে, যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতে যে নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, মহাসমরের অবসানে যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার মূলমন্ত্র হইল মৈত্রীসাধন। আজ সেই নবজাগরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই উৎসবের দিনে আসুন, আমরাও সকলে, যে দেবতা এই বিশাল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া জীবনকে ধন্য করি এবং মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৮—মহাবলেশ্বরে যাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

১৮৯৮ অব্দে আমরা মহাবলেশ্বরে যাইবার আগে, এপ্রিল মাসে য়ুনিভার্সিটির দুই তিন বৈঠক হইয়া গেল;

সেই বৈঠকে য়ুনিভার্সিটির উচ্চ পরীক্ষায় মরাঠী সাহিত্যের প্রবেশ হইবে কি না, এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছিল। তখন কোন প্রকারে সময় করিয়া এই সম্বন্ধে যতটা লিখিতে পারা যায় ততটা লিখিতে হইবে এবং এই প্রশ্নটা বহুমতে পাস করিয়া লইতে হইবে, এই উদ্দেশে উনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা উহাঁরই কাজ, এবং "সুগার বাউন্টি" প্রশ্ন সম্বন্ধেও ওঁকে লিখিবার জন্য অন্য লোকে অনুরোধ করিয়াছিল। তখন মহাবলেশ্বরের যাইবার সময় কতকগুলি পুস্তক সঙ্গে লইবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে পুস্তকতালিকা আনাইয়া এবং তাহার উপর চিহ্ন দিয়া তাহা আনিয়া এবং পার্শেল করিয়া যাহাতে মহাবলেশ্বরে আমার নিকট শীঘ্র পৌঁছোয় এইরূপে পাঠাইয়া দিবার জন্য কেরাণীকে বলিলেন এবং আমরা মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিলাম। সমস্ত বৎসর কাজ করিয়া যে মন শ্রান্ত হইয়াছে সেই মনকে বিশ্রাম দিবার জন্য, মিত্রমণ্ডলীর সহবাসলাভের জন্য, এবং শরীর-মনের সামর্থ্য ও পুষ্টিপ্রদ আব্‌হাওয়া, টাট্‌কা ফল, শাক্‌-সব্‌জি প্রভৃতি উপভোগ করিবার জন্য মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি উহাঁর বিশেষ-প্রিয় সৃষ্টিসৌন্দর্য্য দর্শনে সকাল সন্ধ্যার শান্ত সময় ক্ষেপণ করিবেন,—এইরূপ মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল। মরাঠী সাহিত্য ও "সুগার বৌন্টি" এই দুই কাজ ত ছিলই। তদনুসারে সকালে ও সন্ধ্যাকালে ২ ঘণ্টা ২৷৷০ ঘণ্টা নিয়মিতরূপে বেড়াইতে যাইতেন, ইহাই তাঁর নিত্য নিয়ম ছিল। যাহা কিছু অবহেলা ও অনিয়মিততা সে কেবল আহার ও বিশ্রাম সম্বন্ধেই হইত। কোন দিন খাইতে উঠিতে বেশী বিলম্ব হইলে আমি কাছে গিয়া বলিতাম, "আজ কত দেরী হয়ে গেল! বাহির থেকে ফেরবার আগেই দশটা বাজে। তার পর অন্য কাজ কি করে করা যাবে। দেরী হয়ে গেলে খাওয়া যায় না, খাবার জিনিস জল হয়ে যায়। তা ছাড়া ছেলেপিলে 'খিদে খিদে' করে' অস্থির হয়।" এইরূপ আমি বলিতাম, এবং কাজ শেষ হইয়া আসিলে উঠিতে উঠিতে উনি বলিতেন; "এই আমি উঠ্‌লেম! বেলা হলে—মেয়ের জাত সুকুমার, তাদের পিত্তি পড়ে, আমরা তা লক্ষ্যই করি না!" কাজ শেষ না হইলে এবং উঠিতে দেরী হইলে বলিতেন—"এই দেখ, আমরা কাজ-ওয়ালা মানুষ! কোন একটা কাজে মন লাগ্‌লে ত লেগে গেল। আমাদের কাজে তোমাদের মন লাগ্‌বে কি করে! তোমরা খেয়ে নেও না। নিত্য আমি কি তোমাদের আগে খাইনে? কোনো দিন, তোমরাই নয় আগে খেলে, তাতে কি এল গেল। এতটা স্বাতন্ত্র্য না থাক্‌লে, "রাণীর রাজ্য" কিসে? এই কথা ঠাট্টা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেও, তার পর কাহারও কথা বলিবার কি সাহস হইত? ছেলেরাও যে-যার জায়গায় চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিত।

এই ভাবেই প্রথম দুই সপ্তাহ চলিল। তাহার পর, একদিন সকালে খুব কড়া গরম পড়িয়াছিল এবং বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ১১টা বাজিয়া গেল, তাই আমার ভাবনা হইল। এবং দুই তিন জানাশুনা স্থানে খোঁজ করিতে পাঠাইলাম। এই সময় মহাবলেশ্বরে সাঠে, —কাথবটে, জটার প্রভৃতি পুণার ও অন্য স্থানের মিত্র-মণ্ডলী অনেকেই ছিলেন। এই সমস্ত মণ্ডলী প্রতিদিন সকালে প্রথমেই আমাদের বাড়ী আসিয়া এবং ওঁকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। কথা কহিতে কহিতে, চলিতে চলিতে কত বেলা হইল, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্য না হওয়ায়, বাড়ীতে শীঘ্র আসিবেন মনে করিলেও, সহজেই ১০৷৷০টা হইয়া যাইত। আজ অন্য দিনের অপেক্ষাও বেশী বিলম্ব হওয়ায় আমার ভাবনা হইল। যাহাদিগকে খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে বলিল যে,—সমস্ত মণ্ডলী এখনই ফিরিয়া আসিয়া কাথবটের বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিতে বসিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তাহার আধ ঘণ্টা পরে উনি বাড়ী আসিলেন। বন্ধকরা-ছাতা হাতেই রহিয়াছে, কপালে ও মুখে ঘাম হইয়াছে; গরমে ওর মুখ প্রায় লাল হইত। কিন্তু আজ সেই লালের উপর খুব কালিমা পড়িয়াছে। বাড়ী আসিবামাত্র রোজকার মতো কাপড় ছাড়িবার জন্য আমি সামনে আসিলাম। অনেক কাপড় খুলিয়া ফেলিবার পর, ভিতরকার জামা একেবারে মোচড়াইয়া জল বাহির করিবার মতো ভিজিয়া গিয়াছে, উপরকার ফ্ল্যানেলের জামাও ভিজিয়া জব্‌জবে হইয়া গিয়াছে। ভিজা গায়ের উপর বাতাস লাগিবে বলিয়া আমি সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং সমস্ত কাপড় ছাড়াইয়া শুক্‌নো ও পরিষ্কার তোয়ালে দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক করিয়া দিলাম এবং অন্য পঞ্জাবী পরাইয়া দিলাম। এইরূপ কাপড় ছাড়াইবার সময় "আজ না জানি কি হয়েছে? আজ এত শ্রান্ত দেখছি কেন"?—এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে দুই তিন বার ওঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ এত ঘাম হয়েছে কেন? অনেক দূর যেতে হয়েছিল কি? কিংবা বেশী গরম পড়ায় এতটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছ? অন্য দিনের মত আজও ছাতা খোলা হয়নি বুঝি"? এই কথা শুনিয়া উনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিলেন। উত্তর দিলেন না। মনে হইল, কি উত্তর দিবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না,

এবং মন যেন ঘুলাইয়া গিয়াছে। চোখ্ খোলা ছিল। আমার দিকে এবং এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কখনই যা হয় না আজ এরূপ কেন হইল? এই প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হইয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। তথাপি আমি বাহিরে কিছুই না দেখাইয়া বজাবাকে ডাকিয়া, "দুধ জাল দিয়া শীঘ্র নিয়ে আয়" এইরূপ বলিয়া সেইখানেই কৌচের উপর ওঁর পা আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাড়ীতে প্রায় দশ মিনিট হইল আসিয়াছেন, তবু মন প্রকৃতিস্থ হয় নাই। কিন্তু নিত্য অভ্যাসানুসারেই হউক কিংবা কেন বলিতে পারি না—"ডাক নিয়ে আয়" বলিয়া রোজকার মতো ছেলেদিগকে ডাকিলেন। ছেলেরা ডাক লইয়া আসিল এবং ব্রাহ্মণ দুধ আনিল তাহা ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিলাম। ভাউজি ডাকের চিঠির মধ্যে একটা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া শুনাইল। এই পত্র পুণা হইতে কনস্বন্তের নিকট হইতে আসিয়াছিল। পুণার বাড়ীতে যে সকল ছাত্র থাকিত তার মধ্যে রাম-নাতু নামে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল। ভাউজি পত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে রামনাতুর নাম ও পীড়ার বৃত্তান্ত আছে লক্ষ্য করিয়া, "সমস্ত পত্র পোড়ো না" বলিয়া দুই তিনবার ইসারা করিলাম, কিন্তু সে তখন খুব উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়িতে থাকায় ওদিকে তাহার লক্ষ্য গেল না। সে সমস্ত পত্রখানই পড়িল। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই, পত্রের বৃত্তান্ত কিছুই ওঁর মনে প্রবেশ করিল না। কারণ উনি একটু রাগিয়া বলিলেন, "বাবা তুই কি পড়চিস? স্পষ্ট করে পড়, আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। ভাউজী তখনি পত্র আবার পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অর্দ্ধেক পড়া হইয়া গেলে, উনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোর আজ হয়েছে কি? এ রকম করে পড়চিস কেন? তোর পড়া একটা শব্দও আমি বুঝ্‌তে পারচিনে", আজিকার কড়া রদ্দুরে মাথার কোন একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে শুধু এইমাত্র স্পষ্ট আমার মনে আসিল এবং আমি ভাউজীর উপর রাগ করিবার মতো স্বরে বলিলাম, "তুমি কি পড়ছ? একটা শব্দও ঠিক্ করে পড়তে পারচ না; তাই জন্য তোমার গোলযোগ হচ্চে, যে শুনচে তারও কষ্ট হচ্চে। ওদিকে গিয়ে ভাল করে পত্র পড়ে আয়, এবং তার পর পড়ে শোনা। যা, ওঠ্।" এইরূপ আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া, ওঁর হাঁ-না বলিবার পূর্ব্বেই "শীঘ্রই উঠিয়া যা", এইভাবে হাতের ইসারা করিলাম। তাহা দেখিয়াই সে উঠিয়া গেল এবং নিদেন ১০।১৫ মিনিট কৌচের উপর চুপ করিয়া বিশ্রাম লওয়া হোক্—আমি ওঁকে অনুরোধ করিলাম। আমি কি বলিতেছি তাহার অক্ষর-অর্থ মনে না আসিলেও, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রাম করিতেই হইল; তাই ইতস্তত না করিয়া সেইখানেই কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন। তখন এক সাফ্ হাল্‌কা আচ্ছাদন-কাপড় ওঁর গায়ের উপর দিয়া, ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত আমি আস্তে আস্তে গা টিপিতে লাগিলাম। সেই টেপার দরুন বেশ ঘুম আসিল। গা গরম হয় নাই। ঘুম আসিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিল। কেবল মাথাটাই খুব গরম হইয়াছিল এবং মুখের রক্তবর্ণ কমে নাই। ঘাম হইলে আমি আস্তে আস্তে মুছিয়া দিলাম, তবু ঘুম ভাঙ্গিল না। আরও দশ বারো মিনিট ঘুমের পর আলস ও হাই তুলিয়া চোখ খুলিলেন। তার দরুন হয় ত চোখে বেদনা হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন আগেকার চেয়ে দৃষ্টি ভাল হইয়াছে আমার মনে হইল। এখন আহার করিতে উঠিতে হইবে নাকি, ১২॥ টা হইয়াছে,—এই কথা বলিবামাত্র উনি চট্ করিয়া উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন। আমি আবার বলিলাম। "আজ স্নান না করলেই ভাল হয়। আজ হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছাড়লেই কি চলবে না? আমি ভিজে গামছা দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলায় উনি বলিলেন—"আরে না, আজ রদ্দুর লেগে ঘাম হচ্চে, আজ স্নান করতেই হবে।" আমি আর বেশী কিছু বলিলাম না। স্নানের জল প্রস্তুতই ছিল। পাছে ঠাণ্ডা লাগে বলিয়া শীঘ্র স্নান সারিয়া লইলেন। স্নানের পর পাতের নিকট বসিয়া প্রথম ডাল-ভাতের তিন চার গ্রাস মাত্র নিয়েছেন কি, অমনি গায়ে খুব কাঁপুনী হয়ে শীত করিতে লাগিল; তখন "আমি খাব না, আমার শীত করচে;" এইরূপ বলিয়া হাত গুটাইলেন; তখনি ব্রাহ্মণ গাড়ু সমুখে ধরিয়া আঁচাইবার জন্য জল দিলেন এবং আমি এদিকে আসিয়া চাকরকে দিয়া বিছানা প্রস্তুত করাইলাম ও জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। উনি বিছানায় আসিয়া শুইলে ওঁর গায়ের উপর আচ্ছাদন কাপড় চাপাইয়া দিলাম, তখনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। গায়ে তেমন বেশী তাপ ছিল না; কিন্তু শুধু মাথা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গরম হইয়াছিল; এবং এতক্ষণ যা মনে করিতেছিলাম সেই সংশয় দৃঢ় হইল। আজ রোদ লাগিয়া মাথার কোন প্রকার পীড়া হইয়াছে নিশ্চয়। জর হওয়া, গা ব্যথা করা ও মাথা গরম হওয়া এই সমস্ত লক্ষণ উহারই অঙ্গীভূত। মহাবলেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বে বোম্বায়ে কোর্টের সময় ছাড়া, আপনার বিশ্রামের অনেকটা সময় এই নতুন-হাতে-লওয়া দুই কাজে ক্ষেপণ করিতেন, সেইজন্য ততটা বিশ্রাম পান নাই। সেইরূপ আবার এইখানে আসা অবধি আজ ১৫ দিন প্রতিদিন সকালে ২।৩ ঘণ্টা রোদ লাগিয়া

ছিল, এইটে আমার মনে ঠিক ধারণা হওয়ায় ডাক্তার পাটণকংকে ডাকিতে পাঠাইলাম এবং এইবারকার পীড়া সম্বন্ধে আমার ধারণা কি—সমস্তই তাঁকে বলিলাম। ডাক্তার বিছানার নিকট গিয়া ওঁর শরীর পরীক্ষা করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার ধারণাই ঠিক, আমারও তাই মনে হয়, এই পীড়ায় খুব ব্রোমাইড প্রয়োগ করা দরকার এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা চাই।" আমি বলিলাম—"এই বিষয়ে আমার খুব ভাবনা হয়েছে। যা'ই হোক না, আসল পীড়াটা কি, সেটা যেন ওঁকে জানিতে দেওয়া না হয়। "ঠাণ্ডা বাতাস ও হিম লেগে জ্বর হয়েছে, আমি ডায়োফ্রেটিক পাঠাচ্ছি, ৩।৩ ঘণ্টা অন্তর লইবেন ও যতটা পারেন শুইয়া থাকিবেন। দুই একদিন ওঠবার শ্রম করবেন না এইরূপ ওঁকে আপনি বলুন এবং ডায়ফ্রেটিকের মধ্যে ব্রোমাইড দিন। দুয়েরই আস্বাদ কাছাকাছি হওয়ায় উহা তাহার মধ্যে দেওয়া যেতে পারবে। তাছাড়া, শুধু ব্রোমাইড দিলে খোঁজ পড়বে, এবং ওঁর মাথার কোন পীড়া হয়েছে কি?—এইরূপ সন্দেহ মনে আসিলেও মনের উপর তাহার ফল হইবে—এই সন্দেহ যেন হইতে দেওয়া না হয়'' আমি ডাক্তারকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। তিনি 'আচ্ছা' বলিয়া 'ওঁর' কাছে গেলেন ও বলিলেন যে, "তাপ কিছুই নাই, গা ঠাণ্ডা আছে, 'ডায়ফ্রেটিক' পাঠাচ্ছি, তা খেলে ভাল বোধ করবেন; দুই একদিন বিছানায় শুয়ে থাকবেন। ঘামের উপর হাওয়া লাগা ভাল না;'' এইরূপ বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। প্রতিদিন ৪৫ হইতে ৫০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্রোমাইড দিতে দিতে ৫।৬ দিনের পর একটু কমিয়া আসিল এবং শরীরও একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। পীড়া হওয়া পর্য্যন্ত, আগেকার মত ভাল স্মরণশক্তি আসিতে ও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইতে প্রায় ১৫ দিন লাগিল। সেই পর্য্যন্ত নিত্য অভ্যাসানুযায়ী, যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই কর্ম্মগুলি পর-পর করিতেন। কেবলমাত্র লিখিবার সময় লিখিবার বিষয় মুখে যখন বলিতেন, তখন তাহাতে অসঙ্গতি এখনো রহিয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারিতাম। কাহারও নামে পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু যা লিখিতে বলিতেছেন তাহা নিরর্থক, ইহা দেখিয়া, যে সকল ছেলে নিত্য পত্র লিখিত তাহারা আশ্চর্য্য হইত। এইরূপ যখন হইতে লাগিল, তখন আমি সেই ছেলেদিগকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া স্পষ্ট বলিলাম যে, "তোমরা যখন পত্র লিখিতে বসিবে, যে সব কথা উনি লিখিতে বলিবেন তাহা অক্ষরশ লিখিয়া যাইবে। 'এ-কেন?' এইরূপ ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরো না, কিংবা লিখবার সময় কিছু ছেড়ে দিও না। পত্র লেখা হলে আমার কাছে নিয়ে আসবে,—কাহার নামে পত্র লিখিতে হইবে, ও কি লিখিতে হইবে তা আমি বলে দেব।'' কারণ, 'উনি' পত্র লিখিতে বলিবার সময় ছেলেরা কোন উল্টা কথা জিজ্ঞাসা করিলে এবং ওঁর কি চুক হইয়াছে তাহা ওঁর গোচরে আসিলে, একেবারে মনের উপর ধাক্কা লাগিবে ও তাহার ফল খারাপ হইবে, এই ভয়ে সব দিকেই আমার খুব সাবধান হইতে হইত। এইরূপ ৭।৮ দিন অতীত হইলে, একদিন রাত্রে প্রায় ১০॥০ টার সময় ওঁর বেশ নিদ্রা হইয়াছিল। আমি ওঁর কাছে প্রায়ই জাগিয়া থাকিতাম। কিন্তু সেইদিন খুব শ্রান্ত হওয়ায়, 'ওঁর' পায়ে "আজ তুই ঘি মালিশ কর্" এই কথা গনু চাকরকে বলিয়া আমি পাশের ছেলের খাটে শুইলাম এবং তখনি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার পর, খুব একটা হাসির আওয়াজ আমার কাণে আসিল, আমি ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। পীড়ার সম্বন্ধে ভয় সেত মনে আছেই; কিন্তু চোখে খুব ঘুমের ঘোর থাকায়, ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে আর একবার সজোরে হাসির শব্দ হইল। কাহার হাসি তাহা চিনিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম এবং আমি একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তবু সেই অবস্থাতেই ওঁর খাটের কাছে গিয়া, "কি হয়েছে? কি হয়েছে" এইরূপ বলিয়া ভীতিসূচক অর্দ্ধস্ফুট শব্দে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন উনি বলিলেন, "ওগো ভয় পেয়ো না, আমি জেগে আছি, কিন্তু প্রদীপটা এনে তোমার বুদ্ধিমান চাকর কি করচেন, একবার দেখে যাও।'' চাকর ঘি মালিশ করিতেছে আমি জানিতাম। তাই আমি বলিলাম, 'এ কেন? চাকর কি করবে? সে ঘি মালিস করচে।'' তখন উনি বলিলেন, "আগে তুমি প্রদীপটা এনেই দেখনা! তারপর হাসবার কারণটা তোমাকে বলব। আমি বাহিরে গিয়া প্রদীপ আনিলাম—এবং আনিয়া দেখি কিনা, চাকর ওঁর এক পা আপনার কোলে লইয়া ঘি মালিশ করিতেছে এবং ওঁর পায়ের-শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত মাথা ঢুলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ওই পায়েরই মোজা যেমন-তেমনিই আছে, এবং মোজার উপরেই ঘি মালিস করিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমারও হাসি পাইল এবং চাকরের এই বোকামির দরুণ আমি হাঁক দিয়া উহাকে জাগাইয়া দিলাম। তারপর দিন, সকাল হইতে যে স্মরণশক্তি ১৫ দিন পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছিল, সেই স্মরণশক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে আমার বিশ্বাস হইল। কারণ, তারপর দিন সকালে চায়ের মজলিসে সমস্ত মণ্ডলী জমিলে পর, রাত্রে সংঘটিত গনু চাকরের বুদ্ধিমত্তার কথাটা উনি হাসিয়া ভাউজীর কাছে বলিলেন

এবং সেইদিন হইতে দিন দিন ক্রমশঃ উনি শরীর ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তখন আরও দুই তিনদিনের পর বোম্বায়ের এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ওঁর পুস্তকের বাক্স পার্শেল ডাকে ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল এবং এই পীড়ার জন্যই যাহা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা আজ বাহির করিয়া দিলাম। পীড়ার সময়ে বাক্সর কথা মনে পড়ায় "এখনো কেন বাক্স এল না" বলিয়া ৫।৭ বার খোঁজ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাউজীকে সিপাইকে, "বাক্স আসার কথা ওঁকে বলিও না," এইরূপ উঁহাদিগকে হুকুম দিয়াছিলাম, তাই ও কথা কেহই বলে নাই। এই সম্বন্ধে ভাউজীকে দিয়া বোম্বায়ে পুস্তক শীঘ্র পাঠাইবে এই মর্ম্মে দুই এক পত্রও লিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্র উহারা আমাকে দিয়াছিল। এইরূপ সব দিক হইতেই বন্দোবস্ত থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই পীড়া ভাল হইল এবং আমার ভাগ্যে ছিল বলিয়া আরও কিছুদিন ওঁর সহবাস সুখ লাভ করিলাম।

এই বৎসরে প্রায় সাংসারিক সকল বিষয় সম্বন্ধেই উনি অধিক উদাসীনতা দেখাইতে লাগিলেন। অভ্যাসানুসারে একটার পর-একটা কাজ হইতে থাকিলেও তাহাতে ওঁর মন শুধু বসিত না শুধু নহে, সেদিকে যথোচিত লক্ষ্যই করিতেন না। যাহারা শুধু উপর উপর দেখিত তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাহারা দেখিত তাহারা ইহা না লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিত না। এই বৎসরে ওঁর শরীর একটু নরমই ছিল। তাছাড়া কোন পারমার্থিক চিন্তায় ওঁর মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া মনে হইত। কারণ, শারীরিক অসুস্থতার দরুণ ব্যবহারে কিছুই জানা যাইত না; কিন্তু তাঁর যে সকল প্রিয় বিষয়—যথা রাজকীয়, সামাজিক, ঔদ্যোগিক,—সেই সব বিষয়ে সংবাদপত্রে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইত, আজকাল সেই সকল প্রবন্ধের দিকেও তাঁর লক্ষ্য নাই এইরূপ দেখা যাইত। পুস্তক কিংবা সংবাদ পত্র পড়িবার জন্য হাতে লইয়াছেন, কতবার তাহা হাতেই রহিয়া যাইত—অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় মন নিমগ্ন আছে দেখা যাইত। খাইতে বসিয়া প্রায়ই আমোদ করিয়া অনেক কথা বলিতেন, ঠাট্টা করিতেন। আমি যে জিনিস করিতাম তাহার খুব নিন্দা করিয়া হাসিতেন এবং আমাকে বলিতেন,—"উঃ, সকাল থেকে সময় কাটিয়েও এরকম জিনিস কেন করলে? আমরা পুরুষ মানুষ হলেও, এ-রকম জিনিস কখন্ করে ফেলতুম।" কোন মিষ্ট জিনিসের চেয়ে ছোলার ডালের ঝাল-নোন্তা জিনিস ওঁর খুব প্রিয় ছিল; উহার মধ্যে কোন জিনিস ভাল হইলে সেইদিন শেষের খাবার ভাত শেষ হইয়া গেলেও আবার সেই জিনিস একটু চাহিয়া খাইতেন। কিন্তু এটা আজকাল কম হইয়া গিয়াছে। সকল বিষয়েই উনি মনে মনে নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন এইরূপ আমার উপলব্ধি হইতে লাগিল, এই সম্বন্ধে কখন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, শুনেও যেন শুনিতেন না, পারতপক্ষে উত্তর দিতেন না। ভোজন, মুখশুদ্ধি, চা-পান, জলযোগ প্রভৃতি এই সমস্ত কি পরিমাণে করিবেন—এই সম্বন্ধে মনে মনে যেন একটা স্থির করিয়াছিলেন। এইজন্য, যে সব ফল ভালবাসিতেন, তাহাও বেশী খাইতেন না। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

দশম প্রকরণ।

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্ম ভালোই হউক মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-না-কোন জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে; কর্ম্ম অনাদি, তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না; সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব; এবং মীমাংসকের কথা অনুসারে কোন কর্ম্ম করিলে এবং কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না—এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্মাত্মক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মূলে যে অমৃত ও অবিনাশী তত্ত্ব আছে তাহাতে মিলিত হইবার জন্য মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত হইবার কোন্ পথ এই প্রথম প্রশ্নটী পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। বেদের মধ্যে কিংবা স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, যাগযজ্ঞাদি পারলৌকিক কল্যাণের বহুবিধ সাধন বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রদৃষ্টিতে সে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইলে, দীর্ঘকালে হউক না কেন—কখন-না-কখন পুনর্ব্বার ফিরিয়া নীচের কর্ম্মভূমিতে আসিতেই হয় (মভা, বন, ২৫৯, ২৬০; গী. ৮. ২৫ ও ৯. ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মের কাঁইচী হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়া অমৃততত্ত্বে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্চাট চিরকালের জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে; ইহা দূর করিবার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানই একমাত্র পন্থা। 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরূপাত্মক সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে; এখানে

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকেই 'বিদ্যা' ও বলে; এবং "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে"—মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়—এই প্রকরণের আরম্ভে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে "বিদ্যা" শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতাতে—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

"জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হয়" (গী. ৪. ৩৭), এইরূপ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; মহাভারতেও—

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।

"দগ্ধ বীজ যেরূপ গজায় না সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা (কর্ম্মের) ক্লেশ দগ্ধ হইলে তাহা আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ দুই স্থানে উক্ত হইয়াছে (মভা. বন. ১৯৯. ১০৬, ১০৭; শা. ২১১. ১৭)। উপনিষদেও এইরূপ "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (বৃ. ১. ৪. ১০),—আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত ব্রহ্ম হয়; যেরূপ পদ্মপত্রে জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ যাহার এই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কর্ম্ম দূষিত করিতে পারে না (ছাং. ৪. ১৪. ৩); ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে লাভ করে (তৈ. ২. ১)—সমস্তই আত্মময় ইহা যে জানিয়াছে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না (বৃ. ৪. ৪. ২৩); "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বে. ৫. ১৩; ৬. ১৩) পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে" (মুং. ২. ২. ৮)—পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে পর তাহার সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়; 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' (ঈশা. ১১. মৈত্র্য. ৭. ৯) বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়; 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (শ্বে. ৩. ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই;—এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিবার অনেক বচন আছে। এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎ সমস্ত কর্ম্মময় হইলেও এই জগতের আধারভূত যে পরব্রহ্ম তাঁহারই এই সমস্ত লীলা হওয়া প্রযুক্ত কোন কর্ম্মই পরব্রহ্মকে যে বন্ধন করিতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট; অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও পরব্রহ্ম অলিপ্তই থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কর্ম্ম (মায়া) এবং ব্রহ্ম এই দুই বর্গে বিভক্ত, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বলা হইয়াছে। তাই, এই দুই বর্গের মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে হইবে—এই এক মার্গই তাহার নিকট উন্মুক্ত। কারণ, মূলে সমস্ত বিষয়ের কেবল দুই বর্গ হওয়ায় কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ কি, আগে তাহা ঠিক্ জানা আবশ্যক; নচেৎ এক করিতে গিয়া আর-এক হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে! "বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণো রচয়ামাস বানরম্"—অর্থাৎ "গণেশ করিতে বানর" হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্মশাস্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যের ও ব্রহ্মের অলিপ্ততার জ্ঞান পাইয়া তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখাই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত সাধন। "কর্ম্মে আমার আসক্তি নাই; তাই কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না—এবং ইহা যে জানিয়াছে সে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়" এইরূপ ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন (গী. ৪. ১৪; ১৩. ২৩) তাহার তাৎপর্য্যও এই। এই স্থানে 'জ্ঞান' অর্থে শুধু শাব্দিক জ্ঞান কিংবা শুধু মানসিক ক্রিয়া নহে; বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্ভেই কথিত-অনুসারে 'জ্ঞান' অর্থে "মানসিক জ্ঞান প্রথমে হইলে এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে পর ব্রহ্মীভূত হইবার অবস্থা কিংবা ব্রাহ্মী স্থিতি"—এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইবে না। পূর্ব্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান-সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়া হইয়াছে; মহাভারতেও "জ্ঞানেন কুরুতে যত্নং যত্নেন প্রাপ্যতে মহৎ"—জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে পর মনুষ্য যত্ন করে এবং এই যত্নের দ্বারাই মহৎতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জনক সুলভাকে বলিয়াছেন (শাং. ৩২০. ৩০)। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে—ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্ত্র কথনই বেশী বলিতে পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্গে কোন কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপসারিত করিয়া পথ পরিষ্কার করা এবং সেই পথে ধ্যেয় বস্তুকে লাভ করা—এই কার্য্য প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রযত্নও পাতঞ্জল যোগ, অধ্যাত্মবিচার, ভক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক প্রকারে হইতে পারে (গী. ১২. ৮-১২), এবং সেই জন্য, অনেক সময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া যায়। তাই গীতায় প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মুখ্য মার্গ বলিবার পর, তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধিরূপ অঙ্গভূত সাধনাদিরও বর্ণন করা হইয়াছে; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্ম্মযোগ আচরণ করিয়াই অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা কিংবা তাহা

অপেক্ষা সহজ উপায় ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ১৮. ৫৬)।

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্ম্মত্যাগ নহে; ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকিলেই শেষে মোক্ষলাভ হয়; কর্ম্মত্যাগ করা ভ্রম; কারণ কর্ম্ম হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না;—ইত্যাদি বিষয় নির্ব্বিবাদ নির্দ্ধারিত হইলেও এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য আবশ্যক জ্ঞানলাভের জন্য যে চেষ্টা আবশ্যক সেই চেষ্টা কি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত? কিংবা নামরূপ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতি যে দিকে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? এই প্রথমকার প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয়। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" (গী. ৩. ৩৩)—নিগ্রহ কি করিবে? প্রাণিমাত্রই আপন আপন প্রকৃতির গতিপথেই চলিয়া থাকে; "মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি"—তোমার প্রতিজ্ঞা নিরর্থক; তোমার যেদিকে যাওয়া উচিত নহে সেইদিকে প্রকৃতি তোমাকে টানিবে;—এইরূপ ভগবান গীতাতে (গী. ১৮. ৫৯ ও ২.৬০) বলিয়াছেন; আবার মনুও—"বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" (মনু. ২. ২১৫)—বিদ্বান্‌কেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে—এইরূপ বলিয়াছেন। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তও তাহাই। কারণ, মনুষ্যের মনের সমস্ত প্রেরণা পূর্ব্বকর্ম্মবশতই উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিলে, এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে, এইরূপে সর্ব্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, এইরূপ অনুমান না করিলে চলে না। অধিক কি, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও কর্ম্ম ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলেও চলে। এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহই স্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে। অধ্যাত্মশাস্ত্র এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত যে তত্ত্ব তাহাই মনুষ্যের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মনুষ্যের কার্য্যের যে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই দুই দিক হইতেই করা আবশ্যক। তন্মধ্যে, আত্মস্বরূপী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র অদ্বিতীয় হওয়া প্রযুক্ত কখনই পরতন্ত্র হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে হইলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থায়ী হওয়া চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্মক কর্ম্মই সেই অন্য পদার্থ। কিন্তু এই কর্ম্ম অনিত্য ও মূলে পরব্রহ্মেরই লীলা হওয়ায়, পরব্রহ্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলেও তাহা পরব্রহ্মকে কখনই দাস করিতে পারে না, ইহা নির্ব্বিবাদ। তাছাড়া, যে আত্মা কর্ম্মজগতের ব্যাপারাদির একীকরণ করিয়া জগৎ-জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কর্ম্মজগৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই হওয়া চাই ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাই পরব্রহ্ম ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই দুই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতি-সত্তার বাহিরের বস্তু, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত, ইহার বাহিরে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই পরমাত্মারই অংশ জীবাত্মা মূলে শুদ্ধ মুক্তস্বভাব, নির্গুণ ও অকর্ত্তা হইলেও দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়গণের গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া পড়ায় তাহা মনুষ্যের মনে যে স্ফুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভবরূপী জ্ঞান আমাদের হইতে পারে। মুক্ত বাষ্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও তাহা কোন ভাণ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেরূপ সেই চাপ পড়ে, সেই নিয়মেই অনাদি-পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরমাত্মারই অংশভূত জীব (গী. ১৫. ৭) আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই গণ্ডী হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার মতো অর্থাৎ মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্দ্রিয়াদিগের হয়; এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 'আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি' বলে। 'ব্যবহার দৃষ্টিতে' বলিবার কারণ এই যে, শুদ্ধ মুক্তাবস্থায় কিংবা 'তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে' আত্মা ইচ্ছারহিত ও অকর্ত্তা, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই (গী. ১৩. ২৯; বেসূ. শাংভা. ২. ৩. ৪০)। কিন্তু এই প্রকৃতি আপনা হইতে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করে, সাংখ্যের ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানিলে, জড়প্রকৃতি অন্ধভাবে অজ্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে হয়। এবং মূলে যে আত্মা অকর্ত্তা সে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপনার স্বাভাবিকগুণেই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয়, ইহাও বলিতে পাওয়া যায় না। তাই, আত্মা মূলে অকর্ত্তা হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হউক একবার এইরূপ আগন্তুক প্রবর্ত্তকতা তাহাতে আসিলে, তাহা কর্ম্মের নিয়ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, বেদান্তশাস্ত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্যের উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র অর্থে নির্নিমিত্তক নহে এবং আত্মা আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্ত্তাও হয় না। কিন্তু বারম্বার এই লম্বা চৌড়া কর্ম্মকথা বলিতে না বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে আত্মার স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তি কিংবা প্রেরণা এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে। আত্মা বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গৃহীত স্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্যজগতের পদার্থসমূহের সংযোগে ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই দুই একেবারে ভিন্ন। 'খাও, পিয়ো মজা লুটো'—ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা; এবং আত্মার প্রেরণা মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার

জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মজগতের; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের; এবং এই দুই প্রেরণা প্রায় পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়। ইহাদের ঝগড়ার সময় যখন মনে সন্দেহ হয় তখন কর্ম্মজগতের প্রেরণাকে স্বীকার না করিয়া (ভাগ· ১১· ১০· ৪), যদি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার স্বতন্ত্র প্রেরণা অনুসারে কাজ করে—এবং ইহাকেই প্রকৃত অত্মজ্ঞান কিংবা আত্মনিষ্ঠা বলে—তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষানুকূলই হইবে; শেষে—

> বিশুদ্ধধর্ম্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্।
> বিমলাত্মা চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মনা।
> স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে ॥

"মূলে স্বতন্ত্র শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ম্মল ও স্বতন্ত্র পরমাত্মাতে মিলিত হয় (মভা. শাং. ৩০৮. ২৭-৩০)। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহার অর্থই এই। কিন্তু উল্টাপক্ষে, জড় ইন্দ্রিয়গণের প্রাকৃত ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ শারীর আত্মার ইন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করাইতে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের এই যে স্বতন্ত্র শক্তি তাহা মনে করিয়াই ভগবান—

> উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

"মনুষ্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি আপনাকে অবসন্ন করিবেক না; কারণ (প্রত্যেকেই) আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী) এবং আপনিই আপনার শত্রু (অনিষ্টকারী)" (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতন্ত্র্যের অর্থাৎ স্বাবলম্বনের তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্ঠে দৈবের নিরাকরণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে (যো. ২. সর্গ ৪-৮)। সর্ব্বভূতে একই আত্মা, এই তত্ত্বটি বুঝিয়া এই অনুসারে যে মনুষ্য আচরণ করে তাহারই আচরণকে সদাচরণ কিংবা মোক্ষানুকূল আচরণ বলে; এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বদ্ধ জীবাত্মারও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হওয়ায় দুরাচারী মনুষ্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিজ কর্ম্মের জন্য দুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে। আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদ্‌বিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার স্বতন্ত্র স্ফুরণ বলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় জড়প্রকৃতিরই বিকার হওয়ায় উহা আপনারই প্রেরণা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা কর্ম্মজগতের বাহিরের আত্মা হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' শব্দও বেদান্ত-দৃষ্টিতে ঠিক্ নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে অষ্টম প্রকরণে বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্ম্মাত্মক জড়প্রকৃতির অসম্বেদ্য বিকার হওয়া-প্রযুক্ত এই দুই আপনা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা আত্মারই—এই-রূপ বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আত্মার এই স্বাতন্ত্র্য কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্মার অংশরূপ জীবাত্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া পড়িলেসে আপনা হইতেই স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত-অনুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়া থাকে। অন্তঃকরণের এইপ্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ কাজ করে তাহা হইলে—

> যে যেঁ কোণাচেঁ কায় বা গেলে।
> জ্যাচে ত্যানেঁ অনহিত কেলেঁ ॥

'সে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তুত' এইরূপ তুকারামবাবার মতো বলিতে হয় (গা. ৪৪৪৮)। ভগবদ্‌গীতায় 'ন হিনস্ত্যাত্মনাঽঽত্মানং'—যে আপনাকে আপনি হনন করে না তাহার উত্তম গতি লাভ হয়, এই তত্ত্বের উল্লেখ পরে করা হইয়াছে (গী. ১৩. ২৮); "দাসবোধে"ও ইহার স্পষ্ট অনুবাদ করা হইয়াছে (দাস. ১৭. ৭. ৭-১০ দেখ)। যদিও দেখা যায় যে, মনুষ্য কর্ম্মজগতের অভেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মনুষ্য স্বভাবতই মনে করে যে, আমি যে কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারি। অনুভবের এই তত্ত্বের উপপত্তি উপরি-উক্ত-অনুসারে জড় জগৎ হইতে ব্রহ্মজগৎ ভিন্ন বলিয়া না মানিলে অন্য কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যাত্মশাস্ত্র মানে না তাহাকে এই বিষয়ে মনুষ্যের নিত্য দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথবা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্যের কিংবা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের এই উপপত্তি,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একরূপ অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া দিয়াছি (বেসূ. শাং ভা, ২. ৩. ৪০)। কিন্তু এই অদ্বৈত মত যিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি দ্বৈত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাত্মার এই সামর্থ্য তাহার নিজের নহে, উহা পরমেশ্বর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি কখনও "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋ. ৪. ৩৩. ১১)—শ্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত প্রযত্নকারী মনুষ্য ছাড়া অন্যকে দেবতারা সাহায্য করেন না—ঋগ্বেদের এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, এই সামর্থ্য লাভের জন্য জবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই প্রযত্ন করা আব-

শ্যক অর্থাৎ আত্মপ্রযত্নের এবং পর্য্যায়ক্রমে আত্মস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব পুনরূপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেসূ. ২. ৩. ৪১, ৪২; গী. ১০. ৫ ও ১০)। আর কত বলিব? বৌদ্ধেরা আত্মার কিংবা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব মানে না; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান তাহারা না মানিলেও তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেই "অত্তনা (আত্মনা) চোদয়ত্তানং"—আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত করিতে হইবে—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বলা হইয়াছে—

অত্তা (আত্মা) হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সঞ্ঞময়ত্তানং অস্সং (অশ্বং) ভদ্দং ব বাণিজো॥

আপনিই আপনার কর্ত্তা, আপনার আত্মা ছাড়া অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই; অতএব কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংযত করে সেইরূপ আপনিই আপনাকে সংযমন করিবে"; (ধর্ম্মপদ ৩৮০) গীতার ন্যায় আত্মস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে (মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত ২. ৩৩-৩৫ দেখ)। আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কোঁৎ-এর নির্দ্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ কোন অধ্যাত্মবাদকেই তিনি না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিনা প্রযত্নের দ্বারা মনুষ্য নিজের আচরণ ও কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া, পরিস্থিতি সংশোধন করিতে পারে এই বিষয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই একমাত্র মহৌষধ, এবং এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের আয়ত্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই স্বতন্ত্র আত্মাও আপনার বক্ষস্থিত প্রকৃতির বোঝাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে ফেলিয়া দিতে পারে না। কোন কারিগরের নিজের দক্ষতা থাকিলেও যন্ত্র না হইলে যেমন তাহার চলে না এবং যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামৎ করিতে তাহার সময় লাগে, জীবাত্মারও সেইরূপ অবস্থা। জ্ঞানলাভের প্রেরণা করিবার সময় জীবাত্মা স্বতন্ত্র একথা সত্য, কিন্তু জীবাত্মা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নির্গুণ ও কেবল, কিংবা পূর্ব্বে সপ্তম প্রকরণে উক্ত-অনুসারে চক্ষুষ্মান্ কিন্তু খঞ্জ হওয়া প্রযুক্ত (মৈত্র্য· ৩. ২, ৩; গী. ১৩. ২০), উক্ত প্রেরণা অনুসারে পরে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংবা যে সাধন আবশ্যক হয় (যথা কুম্ভকারের চাকা ইত্যাদি) তাহা এই আত্মার নিজের নিকট থাকে না—যে সাধন উপলব্ধ হয় যথা দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত মায়াত্মক প্রকৃতির বিকার। তাই, নিজের মুক্তির কার্য্যও জীবাত্মাকে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সাধন বা উপাধির দ্বারাই করিয়া লইতে হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় মুখ্য হওয়ায় কোন কার্য্য করিতে হইলে, আত্মা বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে এবং প্রকৃতি-স্বভাব-বশতঃ এই বুদ্ধি যে সর্ব্বদা শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকই থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই, প্রথমে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া এই বুদ্ধি অন্তর্ম্মুখ, সাত্ত্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে; অর্থাৎ এই বুদ্ধি এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ হয় এইরূপ কর্ম্ম করিবে। ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভ্যাস করা আবশ্যক। এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম এবং যে সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ত যায়ই না। তাই, বন্ধন-উপাধি বদ্ধ জীবাত্মার দেহেন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রেরণা করিবার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কার্য্য করাই হয় বলিয়া সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের ন্যায় সেই আত্মা পরাবলম্বী হইয়া যায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র প্রথমে সাফ্ করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে (বেসূ. ২. ৩. ৪০)। এই কার্য্য একেবারেই হইতে পারে না; ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে; নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল খানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত হইবে। এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ ধৈর্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬. ২৫); এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধির ন্যায় ধৃতির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্গিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে (গী. ১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক পৈঠাকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হয়; তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্দ্রিয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত স্থান আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতার উক্ত হইয়াছে যে, 'শনৈঃ শনৈঃ' (গী. ৬. ২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত স্থির হইয়া ইন্দ্রিয়গণ আয়ত্তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একেবারে নহে) ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া, "আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়"—সেই জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন মোচন হয় (গী. ৪. ৩৮-৪১)। কিন্তু ভগবান একান্তে যোগাভ্যাস করিতে বলিতেছেন বলিয়া (গী. ৬. ১০) জগতের সমস্ত ব্যবহার ছাড়িয়া যোগাভ্যাসেই সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাৎপর্য্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কোন ব্যবসায়ী যেরূপ নিজের অল্পবল্প যাহা কিছু থাকে তাহা

লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আস্তে আস্তে সুরু করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পত্তি লাভ করে, সেইরূপই গীতার কর্ম্ম-যোগেরও কথা। আপনার যতটা সাধ্য ততটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া প্রথমে কর্ম্মযোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই শেষে অধিকাধিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহসামর্থ্য লাভ করা যায়। তথাপি একেবারে হাত গুটাইয়া বসিয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। তাই, যাহাতে কর্ম্মযোগ বরাবর সমান চালাইতে পারা যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিয়মিত কিংবা মাঝে মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী. ১৩. ১০)। তাহার জন্য জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান্ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক ব্যবহার নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগও যথাশক্তি প্রত্যেকের করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ। মৈত্র্যুপনিষদে এবং মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাসে ছয় মাসের মধ্যে সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে; (মৈত্র্য. ৬. ২৮; মভা. শাং. ২৩৯. ৩২; অশ্ব. অনুগীতা. ১৮. ৬৬)। কিন্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্ত্বিক, সম কিংবা আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয় বৎসরেও প্রাপ্ত হয় না; এবং এই অভ্যাস অপূর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না শুধু নহে, পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুরু করিতে হইবে বলিয়া, পরজন্মের যোগাভ্যাসও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে; তাই এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, এইপ্রকার পুরুষ পূর্ণসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না; ফলতঃ এইরূপ মনে করাও সম্ভব যে, কর্ম্মযোগের আচরণ করিবার পূর্ব্বে পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধির শিক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক। অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষ্যের কি করা উচিত এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (গী. ৬. ৩৭-৩৯) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়ায় তাহার উপর লিঙ্গশরীর দ্বারা এই জন্মে যে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই পরে দৃঢ়স্থায়ী হয় এবং এই 'যোগভ্রষ্ট' ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সম্পূর্ণ সাধন না করিয়া তাহা হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি পরজন্মে আপন প্রযত্নে সেখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্"—(গী. ৬. ৪৫)—অনেক জন্মের পর, শেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গী. ২. ৪০) এই ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়—এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সারকথা, মনুষ্যের আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রকৃতি-স্বভাববশতঃ একজন্মেই মনুষ্যের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও "নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ" (মনু. ৪-১৩৭)—কেহ যেন নিরাশ না হয়; একজন্মেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবার দুরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিছক্ কসরৎ-কার্য্যেই সমস্ত জীবন যেন অনর্থক কাটিয়া না যায়। আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহা সাধ্য ততটা যোগ-বলই আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি অধিকাধিক সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া কর্ম্মযোগের এই স্বল্পাচরণ কেন, জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত,—চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে ঠেলিতে শেষে,—আজ নয় তো কাল, এ জন্মে নয় তো পরজন্মে, তাহার আত্মাকে পূর্ণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দেয়। সেইজন্য কর্ম্মযোগমার্গের অত্যল্প স্বল্পাচরণ কিংবা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিশেষ গুণ—এইরূপ গীতাতেই ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী. ৬. ১৫ সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ)। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্য্যত্যাগ না করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ স্বাতন্ত্র্যসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি আমাদের করা কর্ত্তব্য। প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রকৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ মোচন হইবার নহে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধমান কর্ম্মযোগের অভ্যাসে কাল কিংবা পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যায় এবং এইরূপ হইতে হইতে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (গী. ৭. ১৯)—কখন না কখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন কিংবা পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা অবশেষে আপন মূল পূর্ণ নিগুর্ণ মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কি না করিতে পারে? "নর করণী করে তো নরসে নারায়ণ হোয়"—নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়—এই যে চলিত কথা আছে তাহা এই বেদান্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্ঠকার এই কারণেই মুমুক্ষু-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ বিধান করিয়াছেন (যো. ২. ৪. ১০-১৮)।

যায়। জ্ঞানলাভার্থ প্রযত্ন করিবার জন্য জীবাত্মা মূলে স্বতন্ত্র এবং স্বাবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে কখন-না-কখন প্রাক্তন কর্ম্মের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয়, ইহা সিদ্ধ হইলেও কর্ম্মক্ষয় কি, ও কখন্ কর্ম্মক্ষয় হয় এবিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কর্ম্মক্ষয় অর্থে সমস্ত কর্ম্মের বন্ধন হইতে পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া। কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতদিন দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে তৃষ্ণা, ক্ষুধা, শোয়া, বসা ইত্যাদি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না এবং প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্ব্বক দেহত্যাগাদি করিতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কৃতকর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন জ্ঞানোত্তরকালেও ন্যূনাধিক কর্ম্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম্ম হইতে তাহার মুক্তি কি করিয়া হইবে? এবং মুক্ত না হইলে, পূর্ব্বকর্ম্মক্ষয় কিংবা পরে মোক্ষও হয় না, এই সংশয় উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বেদান্তশাস্ত্র এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামরূপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলেও, আত্মার সেই কর্ম্ম আপনাতে গ্রহণ করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা থাকায়, ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়া, কর্ম্মে প্রাণীমাত্রের যে আসক্তি থাকে তাহাকে যদি ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম্ম করিলেও তাহার অঙ্কুর বিনষ্টপ্রায় হয়। কর্ম্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত। কর্ম্ম আপনা হইতে কাহাকে ধরে না এবং ছাড়েও না; উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে। মনুষ্য আপনাকে এই কর্ম্মে আবদ্ধ রাখিয়া নিজ আসক্তির দ্বারা উহাকে ভালো কিংবা মন্দ, শুভ কিংবা অশুভ প্রস্তুত করিয়া লয়। তাই, এই মমত্বযুক্ত আসক্তি হইতে মুক্ত হইলে, কর্ম্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বলা যায়;—তার পর সেই কর্ম্ম থাকুক বা চলিয়া যাক্। গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে—প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য ইহাতেই, কর্ম্মত্যাগে নহে (গী. ৩·৪); কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফল লাভ করা বা না করা তোমার অধিকারের বিষয় নহে (গী. ২·৪৭); "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ" (গী. ৩. ৭)—ফলের আশা না রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে কর্ম্ম করিতে দেও; "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" (গী. ৪. ২০.)—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" (গী. ৫. ৭)—সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না; "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু" (গী. ১২· ১১)—সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর; "কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে" (গী. ১৮· ৯)—কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে সাত্ত্বিক; "চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য" (গী. ১৮· ৫৭)—সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া কাজ কর। উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ। জ্ঞানী মনুষ্য সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তৎসম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা যাইবে। এখন কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি; এবং উপরি-প্রদত্ত বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত হয়। ব্যবহারেও এই নীতিসূত্রই আমরা প্রয়োগ করি। উদাহরণ যথা—অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক্কা মারে তাহা হইলে আমরা সেই ব্যক্তিকে গুণ্ডা বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও নিছক্ অপঘাতঘটিত হত্যাকে হত্যা বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পুড়িয়া গেলে, কিংবা বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়া গেলে, আগুনকে কিংবা বৃষ্টিকে কি কেহ অপরাধী মনে করে? শুধু কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্ম্মে মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু ত্রুটি দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে,—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ" (গী. ১৮· ৪৮)। কিন্তু গীতা যে-দোষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহা নহে। মনুষ্যের কোন কর্ম্মকে আমরা যে শুভাশুভ বলি, তাহার ভালমন্দত্ব কর্ম্মে থাকে না, তাহা সেই কর্ম্মের কর্ত্তার বুদ্ধিতে থাকে। ইহা মনে রাখিয়া গীতায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কর্ম্মের মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্ত্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, (গী. ২· ৪৯-৫১); এবং উপনিষদেও—

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

"মনুষ্যের (কর্ম্মের) বন্ধন কিংবা মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে, বন্ধন এবং নির্ব্বিষয় অর্থাৎ নিষ্কাম কিংবা নিঃসঙ্গ হইলে মোক্ষ"—এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে (মৈত্র্য. ৬· ৩৪; অমৃত বিন্দু· ২)। ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধির এই সাম্যাবস্থা কিরূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ভগবদ্গীতায় মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। নিরগ্নি হইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিংবা অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না (গী. ৬. ১)। মনুষ্যের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, প্রকৃতির চক্র সর্ব্বদা চলিতে থাকায়

মনুষ্যকেও সেই সঙ্গে ঘুরিতে হয় (গী. ৩. ৩৩; ১৮. ৬০)। কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থার প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি সৃষ্টিক্রমানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শান্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত পুরুষ (গী. ৩. ৭; ৪. ২১; ৫. ৭-৯; ১৮. ১১)। জ্ঞানী পুরুষ কোন ব্যবহারিক কর্ম্ম না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি কদাচিৎ বনে গমন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কর্ম্ম ত্যাগ করায় তাহার কর্ম্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে করা ভুল (গী. ৩. ৪)। সে কর্ম্ম করুক বা না করুক, তাহার কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে বলিয়াই হয় কর্ম্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা না করিবার দরুন নহে, এই তত্ত্বটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে—অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ করিয়া অথবা আসক্তি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম্ম লেপিয়া ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং. ৪. ১৪. ৩; গী. ৫. ১০) কর্ম্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী। কর্ম্ম স্বরূপত কখনই দগ্ধ হয় না, দগ্ধ করেও না। কর্ম্ম নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহা যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং কচিৎ কখন দগ্ধ হইলেও সৎকার্য্যবাদ অনুসারে বড় জোর তাহার নামরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, এইটুকুই তফাৎ। নামরূপাত্মক কর্ম্ম কিংবা মায়া নিত্য বদলায় বলিয়া, এই নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে মনুষ্য যদি বদলাইয়া লয়, তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক না কেন, এই নামরূপাত্মক কর্ম্মের সমূলে নাশ করিতে পারে না; তাহা কেবল পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই (বেসূ. ৪. ৪. ১৭ দেখ)। কিন্তু মূলে এই জড় কর্ম্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ অবস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমত্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকে উৎপাদন করিয়া থাকে তাহার নাশ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, এবং তাহার দ্বারা যাহা দগ্ধ করা যাইতে পারে তাহা ইহাই। সমস্ত ভূতে সমত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া আপনার সমস্ত কর্ম্মের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, কৃতকৃত্য ও মুক্ত; সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ উক্ত হয় (গী. ৪. ১৯; ১৮. ৫৭)। এই প্রকারে কর্ম্ম দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে মনের নির্ব্বিষয়তার উপর এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরূপ তাহার দহন করিবার ধর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান যখনই হউক না কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কর্ম্মক্ষয়রূপ পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। জ্ঞান হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মৃত্যুই আয়ুর চরম কাল; এবং তাহার পূর্ব্বে কোন এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া অনারব্ধ সঞ্চিতের ক্ষয় হইলেও প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। তাই, এই ব্রহ্মজ্ঞান যদি শেষ পর্য্যন্ত বরাবর সমানভাবে স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে মরণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ কর্ম্ম যাহা ঘটিবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হইয়াছে তাহার এই ভয় থাকে না, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এই বিষয়ের শাস্ত্রদৃষ্টিতে যখন বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও বা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়েরও বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বের কাল অপেক্ষা শাস্ত্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরূপে গুরুতর কাল বলিয়া মনে করেন; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অনুভূতি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। এই অভিপ্রায়েই "অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য মুক্ত হয়" এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৫)। এই সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয় যে, যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যু সময়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত হয়। অনেকের মতে এরূপ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইরূপ প্রতীতি হইবে। যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই সুবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয়ের ন্যায় মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস করা চাই; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহা একেবারে পাওয়া পরম দুর্ঘট, এমন কি, অসম্ভব। তাই, এই সম্বন্ধে গীতায় আর একটা বড় কথা আছে (গী. ৮. ৬, ৭ ও ২. ৭২)। প্রত্যেকেই মনকে নির্ব্বিষয় করিবার অভ্যাস নিত্যকাল রাখিবে, যাহার ফলে

অন্তকালেও সেই অবস্থাটাই বজায় রাখিবার পক্ষে কোন বাধা না ঘটে, এবং মনুষ্য শেষে মুক্ত হয়। কিন্তু শাস্ত্র ছাঁকিয়া সত্য নির্ব্বাচনের জন্য স্বীকার করা যাউক যে, পূর্ব্বসংস্কারাদি কারণবশতঃ কাহারও কেবল মৃত্যুকালেই সহসা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইল। লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কত দুর্লভ বা দুর্ঘট তাহার বিচার একপাশে রাখিয়া দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্ না কেন, তাহা দ্বারা মনুষ্যের অনারব্ধ-সঞ্চিতের ক্ষয় হইবেই; এবং আরব্ধকার্য্য-সঞ্চিতের ক্ষয় এই জন্মের ভোগের দ্বারা মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কর্ম্ম ভোগেরই অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অগত্যা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মুক্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদি (গী. ৯·৩০)—খুব দুরাচারী মনুষ্যও পরমেশ্বরকে অনন্যভাবে ভজনা করিলে মুক্ত হইই হয়—ইহা গীতাবাক্যে উক্ত হইয়াছে; এবং এই সিদ্ধান্ত জগতের অন্য ধর্ম্মেও গ্রাহ্য হইয়াছে। 'অনন্যভাব' অর্থে পরমেশ্বরে যাহার চিত্তবৃত্তি পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় এইরূপ মনুষ্য; চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে রাখিয়া মুখে "রাম রাম" বিড়্ বিড়্ করা নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে রাখা চাই। মোট কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত অনারব্ধসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা যখনই প্রাপ্ত হই না কেন, সর্ব্বদা ইষ্ট তো বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, কিংবা পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অন্তকালে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা মৃত্যুকালে কিছু বাসনা অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জ্জন্ম এড়ানো যাইবে না, এবং পুনর্জ্জন্ম এড়াইতে না পারিলে মোক্ষও পিছাইয়া পড়িবে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন।

জননী-আমার।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

তুমি যদি ঘৃণাভরে দলি বারবার
দূর করি দিতে মোরে; যদি দিবানিশি
মোর সব আশা সাধ বজ্র-করে নাশি
লুটাইতে ধূলি মাঝে; যদি কেড়ে নিতে
যাহা কিছু প্রিয়তম আছে এ মহীতে
কহিবারে আপনার; যদি ভেঙ্গে দিতে
আমার প্রাণের খেলা তীব্র পদাঘাতে
পাষাণীর মত সদা; যদি পলে পলে
জ্বলন্ত কণ্টকরাজি মোর মর্ম্ম স্থলে
প্রদানিতে সকৌতুকে; যদি অবরত
বক্ষোপরি বসি মোর রাক্ষসীর মত
শুষিতে হৃদয় রক্ত—তবু তোমা আমি
মা বলিয়া ডাকিতাম সুখে দিন-যামি।

কৈকেয়ী-মন্থরা-শূর্পনখা।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রামায়ণ গ্রন্থের মূলে আমরা দুইটী নারীচরিত্র দেখিতে পাই। এই দুই জনের দুইটী কার্য্যের ফলেই যেন রামায়ণের সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এ দুইটী নারীচরিত্র,—মন্থরা ও শূর্পনখা। দশরথের সংসারে বিরোধ-ঘটনার মূল মন্থরা, আর রাবণকে সবংশে নিধন করাইবার মূল শূর্পনখা। যে সংসারের ভিতরে এরূপ দুর্জ্জন থাকে সেই স্থানেই বিপৎপাত হয়। দুর্জ্জনের মন্ত্রণা শুনিলেই অকল্যাণ ঘটে। শকুনির মন্ত্রণা শুনিয়া দুর্য্যোধন কতই না অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহারা উপকারীর ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে চেনা বড়ই কঠিন। রাম-নির্ব্বাসনের মন্ত্রণাকারিণী মন্থরা কত হিতৈষিণীর মত কৈকেয়ীকে কহিল—

> তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ
> ত্বদ্বৃদ্ধৌমমবৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ।

মন্থরার মুখে রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া কৈকেয়ী প্রথমতঃই ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া উঠেন নাই। যখন মন্থরা কহিল—

> অক্ষয্যং সুমহদ্দেবী প্রবৃত্তং ত্বদ্বিনাশনম্
> রামং দশরথোরাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী—

> উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী।
> অতীব সাতু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা
> দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্
> দত্ত্বাত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা
> কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্
> ইদন্তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্
> এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বাভূয়ঃ করোমি তে
> রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে
> তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজারামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী। কৈকেয়ী উচ্চবংশসম্ভূতা, দশরথের প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং মহানুভব ভরতের জননী। তাই তিনি প্রথমতঃ রামাভিষেকের কথা শুনিয়া মন্থরাকে দিব্যাভরণ পুরস্কার প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।

ইহাতে কৈকেয়ীর বংশগত এবং পদোচিত মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক পাঠকই কৈকেয়ীর সম্বন্ধে অবিচার করিয়া থাকেন। কৈকেয়ী অপরাধিনী সত্য; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যতখানি অপরাধিনী মনে হয় প্রকৃত পক্ষে অপরাধ তাঁহার তত নহে। কৈকেয়ীর অপরাধের জন্য দশরথই বেশী দায়ী।

রামায়ণ গ্রন্থে যে কয়টী নারী-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে কৈকেয়ীচরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মাত্র কাব্যহিসাবে রামায়ণের বিচার করিতে গেলে কৈকেয়ীচরিত্রেই কবির অধিকতর কৃতিত্ব। ঘটনাবৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তোলাতেই কবির উচ্চতম কলা-কৌশলের অভিব্যক্তি।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—কৈকেয়ী স্বামীসেবাপরায়ণা। অসুরযুদ্ধকালীন পতিশুশ্রূষাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার সেবায় পতি তুষ্ট হইয়া দশরথ তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন সেই বর দুটী গ্রহণ না করিয়া, দশরথের নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। সেই প্রতিশ্রুত বর দুইটী দ্বারা কোনো অসদভিপ্রায় সাধন করিবেন, এরূপ কোনো অভিসন্ধি তখন তাঁহার ছিল না।

কিন্তু কৈকেয়ী বড় অভিমানিনী। দশরথ রাজার অত্যধিক আদরেই এরূপ হইয়াছে। কারণ তিনি "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"। কোনো প্রকার পরাভব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোক সকল সহিতে পারে কিন্তু সপত্নীত্ব সহিতে প্রায়শঃ অক্ষম। যে কৈকেয়ী প্রাণপণ করিয়াও স্বামী-সেবাপরায়ণা, যে কৈকেয়ী রামচন্দ্র এবং ভরতকে একরূপ দেখিতেন তাঁহার ভিতরেও সপত্নীবিদ্বেষ ছিল। এই সপত্নীবিদ্বেষের সুযোগই মন্থরার-কার্য্য-সাধনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। কৈকেয়ীর সপত্নীবিদ্বেষ সম্বন্ধে কৌশল্যার কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। রাম-নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া কৌশল্যা কহিতেছেন—

নিত্যং ক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনীম্
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুংপুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা।

এই সপত্নী-বিদ্বেষ-সম্ভাবনাই বহুপত্নীত্বপ্রথার একতম দোষ। তাই দশরথ বহুবিবাহজনিত অপরাধে অপরাধী।

কৈকেয়ী দিব্যাভরণ পুরস্কার দিলেন বটে, কিন্তু মন্থরা অমনি—

মন্থরাত্বভ্যসূয্যৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ
উবাচেদং ততোবাক্যং কোপদুঃখসমন্বিতা
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে।

মন্থরা দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেই আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়াবশতঃ কৈকেয়ীকে কত রকম ভেদসূচক কথা কহিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকার অনাহূত পরমন্দকারিগণ অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়া জানিয়া শুনিয়া নিজেদের স্বার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। এই জাতীয় লোকগুলি বড়ই ভয়ানক প্রকৃতির। মন্থরা রামের মন্দ করিতে গিয়া রত্নাভরণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল না! কৌশল্যাকে কাঁদাইলে, অথবা রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে মন্থরার কোনোই স্বার্থ নাই। আবার কৈকেয়ীর স্বার্থরক্ষার জন্যই যে মন্থরা এই পরামর্শ দিতে আসিয়াছে তাহাও নহে। কি যে উদ্দেশ্য তাহা মন্থরা বুঝি নিজেও বুঝিতে পারে নাই। ইহাদের উদ্দেশ্যই যেন পরের মন্দ করা।

কি অপূর্ব্ব বাক্‌কৌশলে যে মন্থরা ধীরে ধীরে কৈকেয়ীর মতপরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রকার লোকের অনিষ্টকারিণী বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা।

ক্রমেই মন্থরার কথা কৈকেয়ীর যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই দুর্জ্জনসংসর্গেই কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রম ঘটিল। এবং মন্থরা হইতেই অযোধ্যার সোনার সংসারে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়াই কৈকেয়ীর প্রাণে বেশী আঘাত লাগিয়াছিল। একটি সপত্নীর নিকটে ভবিষ্যৎ-পরাভব-চিত্র। অপরটী ভরতের অসাক্ষাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। ভরতের অসাক্ষাতে রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিয়া প্রকৃত পক্ষেই দশরথ কৈকেয়ী এবং ভরতকে অবমানিত করিয়াছিলেন। দশরথচরিত্র সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে ইহা তাঁহার অতিরিক্ত সাবধানতা-জনিত রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা। কিন্তু শত্রুঘ্নও তো অনুপস্থিত। সুমিত্রার কেন অভিমান হইল না? ইহার কারণ এই যে সুমিত্রা তো আদরিণী নহেন। এবং মন্থরার মত পরামর্শদাত্রী তাঁহার কাছে কেহ উপস্থিত হয় নাই। এবং তিনি কৈকেয়ীর মত ততদূর অভিমানিনীও নহেন।

রাম-নির্ব্বাসন-সঙ্কল্পের প্রাক্কালে মন্থরার বাক্-চাতুর্য্যমুগ্ধা কৈকেয়ীর হৃদয়ে কবি যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব।

অবশেষে দেখিব যে কৈকেয়ী-চরিত্রের সর্ব্ব-প্রধান দুর্ব্বলতা কোথায়।

নিতান্ত আত্মীয় হইলেও উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় দুর্জ্জনকে পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৈকেয়ী অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে মন্থরার পরামর্শ নীচ হৃদয়সঞ্জাত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। কিন্তু চক্ষু-লজ্জায় মন্থরাকে একটীও শাসনবাক্য কহিয়া নিরস্ত করিতে পারিলেন না। কারণ মন্থরা কৈকেয়ীর হিতৈষিণীর বেশে আসিয়াছিল। এই জাতীয় চক্ষুলজ্জাই মানবচরিত্রের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা। যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া তখনই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। এ সময়ে বেশী দেরী করিলেই অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ—

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
> সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয়ে কি এই অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রই ছিল না? থাকিতে পারে, কিন্তু তত ছিল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই বিশেষভাবে তাঁহাকে অন্যরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

রামনির্ব্বাসনের জন্য তিন জনই দায়ী। মন্থরা, কৈকেয়ী এবং দশরথ। কিন্তু দশরথই সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী; তৎপর কৈকেয়ী, তারপরে মন্থরা। মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী—কৈকেয়ী তাহার কথা শুনিলেন কেন? আবার হাজার হোক, কৈকেয়ী নারী মাত্র; ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি দশরথ কৈকেয়ীর কথা শুনিলেন কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুইটী নারীচরিত্রের প্রভাবেই যেন রামায়ণ গ্রন্থোক্ত সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মন্থরাচরিত্র আমরা দেখিলাম। অতঃপর শূর্পনখা চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমাংশের মূল মন্থরা; দ্বিতীয়াংশের মূল শূর্পনখা। কিন্তু শূর্পনখা ও মন্থরার বিস্তর প্রভেদ আছে। এতদুভয়ের তুলনায় মন্থরাই অধিকতর ক্রূরপ্রকৃতি বিশিষ্টা। একজনের প্রকৃতির মূলে পরের অনিষ্ট সাধন; অপরের প্রকৃতির মূলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। প্রথমা নিঃস্বার্থভাবে পরানিষ্টকারিণী আর দ্বিতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টা, প্রতিহিংসাপরায়ণা।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে রামচন্দ্র-শূর্পনখা সংবাদে রামচন্দ্রই বেশী অপরাধী। বাস্তবিকই শূর্পনখা অবমানিতা হইয়াছিলেন। নারীর অপমান করা সভ্য সমাজরীতিবিরুদ্ধ। শূর্পনখাকে মূল ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অত্যাচারী রাবণের অপরাধের ভার—আপাত দৃষ্টিতে যাহা অনুমান হয়—তদপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া পড়ে। শূর্পনখা-চরিত্র সমালোচনায় অতঃপর ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

শূর্পনখা।

কালকেয় দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধের সময়ে রাবণ শূর্পনখার স্বামীকে বধ করিয়াছিলেন। শূর্পনখা রাবণের নিকটে বিলাপ করিলে, তিনি আদেশ করিলেন যে, "তুমি বন্ধুবান্ধব কাঁহাকেও ভয় না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রমণ কর।" তদবধি শূর্পনখা খরের সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। অনার্য্যদের ভিতরে বিধবাদের এরূপ স্বৈরাচার তৎকালে নিন্দনীয় ছিল না। বিধবাগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতেও পারিতেন। শূর্পনখা রামচন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কামরূপিণী রাক্ষসী মায়াবশে সুন্দরীর রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রণয়-ভিক্ষা করিলেন। শূর্পনখা কহিলেন—

অহং শূর্পনখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী
অরণ্যং বিরোমীদমেকা সর্ব্বভয়ঙ্করা।

* * *

প্রখ্যাতবীর্য্যৌ চরণে ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ।
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্ব্বদর্শনাৎ
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্ত্তারং পুরুষোত্তমম্।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন—

কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম
ত্বদ্বিধানান্তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা

* * *

এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরংমম
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভাযথা

আমি বিবাহ করিয়াছি ; ইনি আমার প্রেয়সী পত্নী। তোমার ন্যায় রমণীদিগের সপত্নী থাকা ক্লেশকর। হে বিশালাক্ষি সূর্য্যকিরণ যেমন মেরুপর্ব্বতকে ভজনা করে তুমি সেইরূপ সপত্নীশূন্যা হইয়া স্বামীরূপে আমার ভ্রাতাকে ভজনা কর।

তখন শূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

ময়া সহ সুখং সর্ব্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি।

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্যা ভবিতুমিচ্ছসি
সোঽহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনী
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থ মুদিতামল বর্ণিনী
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী॥

আমি আর্য্য রামের অধীন দাস, অতএব তুমি আমার স্ত্রী হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া প্রীতা হও।

তখন পরিহাসানভিজ্ঞা শূর্পনখা রামচন্দ্রকে কহিলেন, যে "তুমি এই কুরূপা বৃদ্ধা স্ত্রী সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াই আমাকে গ্রহণ করিতেছ না। অতএব তোমারি সমক্ষে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব। ইহা বলিয়াই রাক্ষসী শূর্পনখা সীতার দিকে ধাবিতা হইলেন। তখন রামচন্দ্র লক্ষণকে কহিলেন—

ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।

ক্রূরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কখনই পরিহাস করা উচিত নহে।

রাক্ষসীং পুরুষং ব্যাঘ্র বিরূপায়িতুমর্হসি।

তুমি এই রাক্ষসীকে বিরূপা কর। অতঃপর লক্ষ্মণ খড়গ দ্বারা শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়া দিলেন।

শূর্পনখা অপরাধিনী। তিনি অন্যায়ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন সত্য। রামচন্দ্রকে দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? স্বৈরচারিণী শূর্পনখা যে তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রামচন্দ্রের তাঁহাকে লইয়া প্রথমতঃ এরূপ পরিহাস করা উচিত হয় নাই। রামচন্দ্র বলিলেন লক্ষ্মণের নিকটে যাও, আবার লক্ষ্মণ বলিতেছেন রামচন্দ্রের কাছে যাও, এবং সীতা উপস্থিত থাকিয়া এই সকল শুনিতেছেন। শূর্পনখা না হয় অনার্য্যা, কিন্তু রামচন্দ্র তো আর্য্য জাতি। তাঁহার কি একবার শূর্পনখাকে সদুপদেশ দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল না? রামচন্দ্রের মত ব্যক্তির সদুপদেশে হয় তো শূর্পনখার আন্তরিক গতির পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রথম হইতেই পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। নারীর সম্মুখে নারী যদি প্রত্যাখ্যাতা হয়, তাহা বড়ই লজ্জার বিষয়। তাই শূর্পনখা ক্রুদ্ধা হইয়া সীতাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শূর্পনখা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই অনার্য্যার মতই, কিন্তু রামলক্ষ্মণের পরিহাস কখনই আর্য্যোচিত হয় নাই।

নিজ ভগ্নীর এরূপ অবমাননা কোন্ বীর ব্যক্তি সহ্য করে? রাবণের প্রথম ক্রোধের কারণই হইল শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ। অতঃপর রামচন্দ্রের যাহা কিছু বিপৎপাত, তাহা এই শূর্পনখার অবমাননারই ফলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল—এরূপ ভাবা যায় না কি?

সীতার মত স্ত্রী থাকিতে শূর্পনখাকে প্রত্যাখ্যান করাতে রামচন্দ্রের এস্থলে বিশেষ কোন মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নাই। আর লক্ষ্মণ, তিনি তো একান্তভাবেই রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ভাল, কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পাতেই বেশী মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

———

কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ।

(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমরা অশ্বঘোষের কথা বলিব। অশ্বঘোষ একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং বুদ্ধচরিত নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার বুদ্ধচরিতে কতক শ্লোকের সহিত কালিদাসরচিত কতক শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য আছে। অশ্বঘোষ খৃঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। তিনি যদি কালিদাস হইতে এই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কালিদাসের সময় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়। পক্ষান্তরে কালিদাস যদি তাঁহার নিকট হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কালিদাস খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক কে কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অজ ও ইন্দুমতী যাত্রা করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য কুলাঙ্গনাগণের ঔৎসুক্য ও ব্যস্ততার দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে—

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি॥
রঘু ৭ম সর্গ ৫ম-১২ শ।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে উমামহেশ-দর্শনোৎকণ্ঠা ঠিক একই প্রকার শ্লোক সকলের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে; কেবল প্রথম শ্লোকে ও শেষ শ্লোকে বাক্যবিন্যাসের কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি একরূপ। প্রোঃ সারদারঞ্জন রায় মহাশয় Asiatic R. Societyর পত্রিকায় এ বিষয়ে সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত যে অশ্বঘোষ কালিদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমষ্টি অকাট্য। তথাপি কতকগুলি কথা প্রয়োজনীয় বুলিয়া বোধ হয়।

(ক) একই শ্লোকসমষ্টি কুমার ও রঘু উভয়ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পুনরাবৃত্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যের কিছু হানি হয় নাই। delicate humour কালিদাসের নিজস্ব। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে রাজন্যমণ্ডলীর বিভিন্ন বিভিন্ন হাব-ভাবের উদয় কালীন আমরা এই কৌতুকরস প্রস্ফুট দেখি। রঘুবংশে সিংহের বর্ণনায় "দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি (কুর্ব্বন্)"; ২য় সর্গ রঘু কুমারে শিববৃষের বর্ণনায় "অসোঢ় সিংহ ধ্বনিরুন্ননাদ"; পাণ্ড্যরাজের বর্ণনায় "সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ" (রঘু ষষ্ঠ সর্গ); শকুন্তলার শকারের উক্তিতে এবং অন্যান্য বহু স্থলে আমরা ইহার বিকাশ দেখিতে পাই। এই প্রকার ইঙ্গিতে আমরা একটু বিশেষত্ব দেখি। কালিদাস ছবির আভাসটি চোখের কাছে ধরিয়া দেন। বিশিষ্ট অংশগুলি (details) পাঠক বা শ্রোতার মনে আপনি উদয় হয়। ইহাই কালিদাসপ্রতিভার বিশেষত্ব। বাণভট্ট বা ভবভূতির মত তিনি সেগুলি অতিরিক্ত পল্লবিত করেন না। সে কার্য্য পাঠকের। এই অদ্ভুত ছবি তুলিবার এবং ছবির পর ছবি, কেবল কয়েকটি তুলির চিহ্ন দ্বারা সমুদ্ভাসিত করার অদ্ভুত ক্ষমতার—ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এই কুলস্ত্রীগণের চপলতা হাস্যরসের ইঙ্গিতে (suggestion of pictures). পরিপূর্ণ। নকলকারিগণ যদি দুই স্থানেই নকল করিয়া থাকেন তাহা কি আশ্চর্য্য নয়? স্পষ্ট বা বাচ্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনা বা suggestion এর আধিক্যই কালিদাসের নিজস্ব।

(খ) একই ভাব কিম্বা একই রকমের ভাব ভিন্ন ভিন্ন কবির হৃদয়ে উদ্ভূত হইতে পারে। তাহাতে পরস্পর আদান প্রদান অনুমিত হয় না। শেক্সপীয়ারের সিম্বেলীন নাটকে আইমোজেন সুন্দরীর চক্ষুর ভিতর উঁকি মারিবার জন্য আগুণের ইচ্ছা—এবং ইন্দুমতীর কানের দুল হইয়া ঝুলিবার জন্য অগ্নির অভিলাষ একই ভাবে অনুপ্রাণিত, কিন্তু এস্থলে আদান প্রদানের কোনও কথাই নাই। কিন্তু এক কবি যদি অন্য কবির বর্ণনার উপর কটাক্ষ করেন এবং তাঁহার লেখার কল্পিত বা প্রকৃত দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে প্রথম কবি যে অনুকরণ করিয়াছেন তদ্‌বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। কালিদাস লিখিয়াছেন

"তা রাঘবং দৃষ্টি ভিরাপিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মু বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥

বৌদ্ধযোগী অশ্বঘোষের হৃদয়ে ইহা বড় বিসদৃশ বোধ হয়। তাহা হইলে নারীগণের মনে কি কুভাবের উদয় হইয়াছিল? তাই তিনি বর্ণনার প্রথমেই তাঁহার নিজবর্ণিত কুলাঙ্গনাগণকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমেই ভূমিকা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল ছিল। এই অল্পরেখাসমন্বিত ছবিগুলিকে তিনি বর্ণসমাবেশে ভর্ত্তি করিয়াছেন। এমন কি অধিক কথা বলিবার প্রয়াসে এক স্থলে অশ্লীলতা অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তিনি যে অনুকরণ করিয়াছেন তদ্‌বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

(গ) "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ" কুমারে এইরূপ বর্ণনা আছে। অশ্বঘোষ এই কলার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নন। তাঁহার বিবেচনায় বুদ্ধদেবের মারজয় বা মদনজয় আরও সুন্দর। মারের উক্তিতে তিনি এই কথা প্রস্ফুট করিয়াছেন। কবি ভারবি আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট

হয় নাই। অর্জ্জুনের মদনজয় আরও বিচিত্র। তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু প্রলোভিনীগণই প্রলুব্ধা হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তিন কবিগণের মধ্যে কে আগে কে পরে, তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈনগণ পালি ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের শাস্ত্রাদি লিখিতেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তনের সময় তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। কিন্তু হঠাৎ কলার বিকাশে এক সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধচরিত লিখিলেন। কোন্ শক্তি এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিল? কালিদাস ও তৎকালীন সাহিত্যকে অশ্বঘোষের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে না ধরিলে এই শক্তির কোনও কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় না।

(ঙ) পুরাণ, অলঙ্কার, কাব্য সর্ব্বত্রই কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। শিবপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে কালিদাসের শ্লোক অনেক স্থলে বিশেষতঃ উমার রূপ বর্ণনায় একবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক রাখিয়া বসান হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলার গল্প মহাভারতের শকুন্তলা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদ্মপুরাণ কালিদাসের গল্পকেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন—দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কালিদাসের একটি ভাব "চন্দ্রংগতা পদ্মগুণান্ন ভুংক্তে" (কুমার ১ম সর্গ) লইয়া কতরকমে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কতরকমে বলিয়াছেন; তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। দর্পণকার শকুন্তলার সর্ব্বদমনের চাপল্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাৎসল্য রস বলিয়া একটি নূতন রসের অবতারণা করিয়াছেন। শূদ্রক কবি এই সর্ব্বদমনের বালকতার ভাব লইয়া অতি-প্রাকৃত অংশ বাদ দিয়া মৃচ্ছ-কটিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "ন যযৌ ন তস্থৌ", সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের নিকটও প্রচলিত কথা হইয়া গিয়াছে। মেঘদূতের পর হইতে আর দূতকাব্যের অভাব নাই। এরূপ স্থলে কোনও সুন্দর ভাব দেখিলে কালিদাস অনুকরণ করিয়াছেন, এ কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। অশ্বঘোষের লেখা কখনও বৌদ্ধ গণ্ডী ছাড়াইয়া অধিক দূর যায় নাই। কিন্তু এই বিলোলনেত্র দিগের বাতায়ন পথে উঁকি ঝুঁকি অনেক ভারতীয় কবিকেই অভিভূত করিয়াছে। কথা বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় আসিয়া নারীগণের পতিনিন্দায় পরিণত হইয়া কলা বিষয়ে অনেক সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে। এত প্রভাব মহাকবি কালিদাসের সম্ভব, অশ্বঘোষের নহে।

অতএব অশ্বঘোষ কালিদাসের শ্লোকগুলিকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কালিদাসের পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় মতের তিনটি কথাই সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডিত হইল। অধিকন্তু উপরোক্ত প্রমাণ সকলের দ্বারা আমরা তিনটি কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

(১) কালিদাস মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাপতি নহেন। তিনি অবন্তিনাথ বিক্রমাদিত্যের সভাপতি ছিলেন।

(২) শালিবাহনের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ প্রথম শতাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব।

(৩) প্রথম শতাব্দীর অশ্বঘোষ তঁহোর বর্ণনা অবলম্বন করিয়াছেন—

ইহা দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় মতই নিরস্ত হইল এবং প্রথম মতের কাছাকাছি একটি সময় পাওয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মহর্ষির অভিষেক।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত)

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

একটী মুমুক্ষু আত্মা তৃষিত হৃদয়
চেয়েছিল ঊর্দ্ধপানে, বুঝি জ্যোতির্ম্ময়
মধুময় লোক হতে অজ্ঞাতে কখন্
এসেছিল আবাহন;—তটিনী যেমন
সিন্ধুর মিলন মাগে! রুদ্ধ স্বর্গ-দ্বার
খুলে গেল অকস্মাৎ, মুক্ত সুধা ধার
নেমে এল "ব্রহ্মময় সকল সংসার"*
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ! বিশ্ব-বিধাতার
বিশ্বমাঝে আত্ম-দান! "সকলি ত্যজিয়া
প্রশান্ত নির্ম্মলচিত্তে আপনা ভুলিয়া
তাঁর দানে—সে পরম হৃদয়-রতনে
কর শুধু উপভোগ!" পুলক-প্লাবনে
ভাসিল বিশুদ্ধ প্রাণ, জন্ম-জন্মান্তের
অন্তরের ক্ষুধা হায়, নিভৃত মর্ম্মের
ব্যাকুল সাধনা-সাধ-আশা আকিঞ্চন
তৃপ্ত হ'ল মুহূর্ত্তেকে, বুঝি সংগোপন
মধুকোষে প্রসূনের পিপাসু ভ্রমর
লভিল সন্ধান চির! মুগ্ধ চরাচর
নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হয়ে বিস্মিত-নয়নে
হেরিল অমৃতধামে মহা-শুভক্ষণে
জগতের ঋষিদলে বিমুক্ত আত্মার
সুশাশ্বত অভিষেক;—দেব-করুণার
কি অচিন্ত্য অভিনয়!

স্বদেশ আমার!

* মহর্ষির "আত্মজীবনী" ও "ঈশোপনিষৎ" দ্রষ্টব্য—জীঃ

প্রাণের তপস্যা তব বুঝিবা আবার
যুগ-যুগান্তের পরে হয়ে মূর্ত্তিমান
উঠেছিল উদ্ভাসিয়া আনন্দে মহান্

অদ্বিতীয় দেবতার বিজয় নিশান
প্রতিষ্ঠিতে বসুধায়! কর অর্ঘ্যদান
ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধাভরে! অভিষেক করি
লহ আজি অন্তরের সিংহাসন পরি
প্রণম্য বরেণ্য পূজ্য মহর্ষি-আত্মায়—
কেবলি হইতে যোগ্য তাঁহারি পূজায়!!

প্রাচীন রাজগৃহে বৌদ্ধচিহ্ন।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

প্রাচীন রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অতিপবিত্র তীর্থস্থান। তথাগত এই পুণ্যক্ষেত্রে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজগৃহের প্রত্যেক পাহাড়, প্রত্যেক গুহা, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত বৌদ্ধযুগের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে তথাগত ভক্ত শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'আনন্দ, রাজগৃহ বড়ই মনোরম।। রাজগৃহের গৃহ্যকূট পর্ব্বত, গৌতম-নিগ্রোধ, চোর-পপাত, মধ্যপর্ণী গুহা কত না মনোরম। ইসিগিলির পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণপাহাড় কত মনোরম। সীতাবনের সপ্পশণ্ডিকা পাহাড় কত মনোরম। তপোদারম, বেণুবনের কালন্দক নিভাপ, জীবকবন ও মদকুচ্চি কতনা মনোরম'।* তথাগত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। এই কারণে তিনি পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে রাজগৃহের প্রিয়-স্থানগুলির নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। পালি গ্রন্থে এই গিরিব্রজ 'মগধানাং গিরিব্রজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত গিরিব্রজ ও মগধের গিরিব্রজের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ পালি গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে লিখিত আছে, কেকয় রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গিরিব্রজ। রামায়ণে গিরিব্রজের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান শতদ্রু নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা নদীর পূর্ব্ব পারে উহা অবস্থিত ছিল ধরিয়া লওয়া যায়। রামায়ণের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কতকাংশ প্রাচীন কালে কেকয় রাজ্য ছিল এবং গিরিব্রজ সেই প্রদেশের রাজধানী ছিল। ভরতের গিরিব্রজ পরিত্যাগ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন প্রসঙ্গে বাল্মীকি (অযো-৭১ সর্গ-১।২ শ্লোক) লিখিয়াছেন—

> স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্য্যায় বীর্য্যবান্।
> ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্যতাং নদীম্॥
> হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্ স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
> শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥

কানিংহাম সাহেবের মতে বিতস্তা (ঝিলাম) নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জালালপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি কেকয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগলশাসনকালে সেই প্রাচীন নগরী জালালপুর নামে পরিচিত হয়। জালালপুরের নিকটবর্ত্তী 'গির্ণাক' পর্ব্বত রামায়ণবর্ণিত গিরিব্রজ নগরের শেষ চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। উহা জালালপুর হইতে একশত ফিট উচ্চ। বর্ত্তমান জালালপুর পঞ্জাবের ঝিলম জেলায় বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কেকয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'সামান্য ফল সুত্ত অদ্যকথা' গ্রন্থে আছে যে রাজগৃহের বত্রিশটী বড় সিংহদ্বার ও চৌষট্টিটি ক্ষুদ্র সিংহদ্বার ছিল।* রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে রাজগৃহ সমৃদ্ধশালিনী নগরী ছিল। এই জনপদের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা ছিল এবং এখানে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না। 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থেও ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়ান সিয়াং এই স্থানে সুগন্ধ কনক বৃক্ষরাজি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সব বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

'সম্মাউত্ত নিকায়' গ্রন্থে সুমাগধ পোকরনীর বর্ণনা আছে। ইহা রাজগৃহের প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত ছিল। সেই প্রাচীন কালে এখানে যে একটী হ্রদ ছিল তাহার সবিশেষ প্রমাণ আজিও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান 'অথারাই' ইহার শেষ চিহ্ন।

প্রাচীন ভারতে প্রাচীরবেষ্টিত জনপদের চারিটী অংশ ছিল। রাজপ্রাসাদের ভিতর ও বাহিরের দুই অংশ এবং নগরের ভিতরের ও বাহি-রের দুই অংশ। 'রাজোভাদ জাতকে' আছে বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিজের কোন দোষ আছে কি না জানিবার জন্য তিনি প্রথমে রাজপ্রাসাদের ভিতরে অনুসন্ধান করিলেন। সেখানে কাহারও মুখে তাঁহার দোষের সংবাদ না পাইয়া রাজপ্রাসাদের বাহিরে অনুসন্ধান করেন। তারপর জনপদের ভিতর ও বাহিরেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে খুব সম্ভবতঃ রাজগৃহের

---

* মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত—পৃঃ ৮৭।

* 'রাজগহ কির দ্বাত্রিংশ মহাদ্বারানি চতুষষ্ঠী খুদ্দ দ্বারানি।'

এই চারিটী অংশ ছিল। রাজা বিম্বিসারকেও একদা সন্ধ্যাকালে ভিতরের দ্বার বন্ধ ছিল বলিয়া বাহিরের দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। 'বিমানবত্থু' গ্রন্থে আছে 'জনপদের বাহিরে ধান ও শস্যের ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতেও রাজগৃহ জনপদের চারিটী অংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

পালিগ্রন্থ 'রাজগহের' বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া নগরবাসীরা প্রস্তরের গৃহ যে নির্ম্মাণ করিত না এমত নহে। 'ধর্ম্মপদের' ব্যাখ্যার এক স্থানে আছে, 'হায়, আমার পিতা রাজা বিম্বিসর শিশুর ন্যায় বুদ্ধিহীন ছিলেন। নগরবাসী বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, আর আমার পিতা দেশের রাজা হইয়াও কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজগৃহে বাস করেন। শেঠী জ্যোতিক প্রস্তরনির্ম্মিত সপ্ততল গৃহে বাস করিতেন। তথাগতের সময়ে রাজগৃহে বহু প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ এবং আঠারটী বৃহৎ বিহার ছিল।

পাটনা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জ্যাকসন্ তাঁহার 'প্রাচীন রাজগৃহ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই নগরের দক্ষিণাংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভগ্ন স্তূপ বিদ্যমান আছে। এই স্তূপগুলি উচ্চভূমির উপর এবং চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। অতি প্রাচীন একটী চতুর্ভুজ দুর্গবিশেষের ভগ্নাংশ বলিয়া মিঃ জ্যাকসন্ এই স্তূপগুলিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুর্গটী জ্যাকসন্ সাহেবের উদ্যমে ও ব্যয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। এই দুর্গ সম্বন্ধে মিঃ জ্যাকসন্ লিখিয়াছেন, 'ইহা বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন রাজগৃহের অতি সীমাবদ্ধ অংশে ইহা স্থাপিত; এই দুর্গ হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, অজাতশত্রু যখন তাঁহার পিতা রাজা বিম্বিসরকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই দুর্গে বসিয়া তথাগতকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের উপর দেখিতে পাইতেন। সামান্য ফলসুত্তের টীকায় আছে অজাতশত্রু তাঁহার পিতা বিম্বিসরকে একটী ধূমগৃহে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে অজাতশত্রু একমাত্র তাঁহার মাতাকেই সেই কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই কারাগৃহ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল এবং এখান হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যাইত। এই প্রমাণ রাশি হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গের চতুর্দ্দিকে উচ্চ ভূমিই চীন পরিব্রাজকদের বর্ণিত রাজগৃহের রাজপ্রাসাদ। পরিব্রাজকদের বর্ণিত রাজপ্রাসাদ হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত দূরত্ব আলোচনা করিলে এই স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা যখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতের কথাই বলিয়াছেন, চূড়ার কথা বলেন নাই, তখন এই সমস্যা নিরাকরণে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। হিউয়েন সিয়াং বলিয়াছেন নগরের দক্ষিণাংশে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দালান ইমারৎ ছিল এবং এই ইমারতগুলির সন্নিকটে একখানি গ্রামে বিখ্যাত ধনী শেঠী জ্যোতিকের ইষ্টক-নির্ম্মিত বসতবাড়ী ছিল। এই জনপদের দক্ষিণ দিকই যে সেই প্রাচীনকালে বিখ্যাত ছিল তাহার আরও কারণ আছে। বিগানডেট (Bigandet) তাঁহার লিখিত "ব্রহ্ম দেশীয় বুদ্ধের কাহিনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'তথাগত প্রথমবারে নদী পার হইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীর গৃহের পার্শ্ব দিয়া চলিতে চলিতে তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসর নগরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে দেখিতে পান এবং তাঁহার অনুসন্ধানে পাণ্ডব গিরি (বর্ত্তমান রত্নগিরি) পর্য্যন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। এই পাহাড়ে তখন তথাগত আহার করিতে বসিয়াছিলেন।' সম্ভবতঃ তথাগত গিরিয়েক উপত্যকার ভিতর দিয়া নগরের পূর্ব্বদ্বারে প্রথম প্রবেশ করেন। এই পূর্ব্ব দিকেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। তিনি উত্তর দিক দিয়া নগরে প্রবেশ করেন নাই, কারণ ঐ উত্তর দিকের সন্নিকটে সীতাবন ছিল এবং এখানেই রাজগৃহপুরবাসীরা মৃতব্যক্তির সৎকার করিতেন। সাধারণতঃ জনসাধারণ এই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দ্বার দিয়াই রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। বৌদ্ধসাহিত্যে আছে বর্ত্তমান রত্নগিরিই প্রাচীন পাণ্ডব শৈল; জনশ্রুতি এই যে পাণ্ডবেরা স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে জরাসন্ধের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। সামান্য ফলসুত্তের টীকায় আছে, রাজগৃহের রাজবৈদ্য জীবক প্রতিদিন দুই তিনবার তথাগতকে দেখিতে যাইতেন। বেণুবন ও গৃধ্রকূটের এতটা ব্যবধান দেখিয়া তিনি আম্রবনে তথাগতের অবস্থিতির জন্য একটী বিহার প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এই সময়ে জীবক রাজপুত্র অভয়ের গৃহে বাস করিতেন। বেণুবন ও গৃধ্রকূট রাজপ্রাসাদ হইতে বহুদূরে ছিল। এই কারণে তিনি আম্রবনে বিহার প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে যে দুর্গ ছিল ইহাও তাহার একটী প্রমাণ।

পাণ্ডব শৈল।

বুদ্ধঘোষ তাঁহার ধর্ম্মপদের টীকায় * লিখিয়া-

* ধর্ম্মপদ গ্রন্থ সুত্তপিটকের অন্তর্গত। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। বৌদ্ধগণ বলেন, তথাগতের পরিনির্ব্বাণের তিনমাস পরে, রাজগৃহ

ছেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাণ্ডব শৈলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে মগধাধিপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেব পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং এই দিক দিয়াই বাহির হইয়া পাণ্ডবশৈলে ফিরিয়া যান। বর্ত্তমানে এই পাহাড়ের নাম রত্নগিরি।

লঠ্ঠিবন।

উরুবেল কাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, তথাগত গয়াশীর্ষ পাহাড়ে তাঁহার বিখ্যাত উপদেশবাণী প্রচার করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজগৃহাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসংখ্য শিষ্য তাঁহার অনুগমন করে, তিনি পথিমধ্যে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে করিতে রাজগৃহে লঠ্ঠিবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত যষ্ঠিবনকে পালিভাষায় লঠ্ঠিবন বলে। এখানে তথাগত সুপ্পতীল্য চৈত্যে বাস করিতেন। বিম্বিসর তথাগতের এই আগমন সংবাদ পাইয়া সমস্ত পুরবাসীকে মহাপুরুষ দর্শনের জন্য ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। সেই সময়ে রাজগৃহ নগরী সাজাইবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। অসংখ্য লোকজন সঙ্গে লইয়া রাজা বিম্বিসর নগরের বাহিরে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহার পর তথাগত রাজার বিশেষ অনুরোধে রাজগৃহে প্রবেশ করেন। 'মহাবস্তু' গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বেণুবনে কলন্দক নিভাব।

এখানে তথাগত শিষ্যগণসহ বাস করিতেন। 'কলন্দক' অর্থে কাঠবিড়াল ও 'নিভাব' অর্থে শস্য বুঝায়। যেখানে কাঠবিড়াল শস্য খাইতে আসে। রাজবাটীতে আহারাদির পর রাজা বিম্বিসর স্বর্ণ ঘটে জল পুরিয়া তথাগতকে বেণুবন দান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাত্মন, আমি এই বেণু আপনাকে ও ভিক্ষু সম্প্রদায়কে দান করিলাম। তথাগত 'তথাস্তু' বলিয়া উহা গ্রহণ করেন।

বেণুবন তথাগতের অত্যন্ত প্রিয়স্থান ছিল। এখানে বসিয়া তিনি অনেক উপদেশ দিতেন এবং এই মঠে বিনয়সূত্র রচিত হয়। পালিগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে এই বিহার রাজগৃহের উত্তর দ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়ানের বর্ণনায় আছে ইহা রাজগৃহের উত্তর দ্বার হইতে তিনশত পদ দূরে অবস্থিত ছিল।

নগরে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশনকালে ধর্ম্মপদ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ধর্ম্মপদের টীকা বিরচন করেন।

তপোদারম।

'সম্যুত্ত (সংযুক্ত) নিকায়' গ্রন্থে আছে, 'কোন সময়ে রাজগৃহের অন্তর্গত তপোদারামে তথাগত বাস করিতেছিলেন। একদিন প্রত্যুষে মহর্ষি সমিধি তপোদার জলে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই 'আরাম' বা বাগান তপোদার তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাকে 'তপোদারম' বলিত। তপোদা নদী যে বেণুবনের অতি নিকটে ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। 'বিনয়' গ্রন্থে আছে, 'ভগবান্ তথাগত ভেলুবনের কলন্দক নিবাপ মঠে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন মগধের রাজা বিম্বিসর তপোদার জলে অবগাহন করিতে গিয়াছিলেন। আর্য্য বা ভিক্ষুরা যতক্ষণ স্নান করিতেছিলেন ততক্ষণ তিনি ঘাটের এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর স্নানশেষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন নগর প্রবেশের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি নগরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলে তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।' ইহা হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে তপোদা নদী রাজগৃহের প্রবেশদ্বারের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং ভেলুবনও এই নদীর সন্নিকটে ছিল।

মহামৌদগল্যায়নও * তপোদা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, 'হে বন্ধুগণ, প্রবাহিনী তপোদার জল গভীর, স্বচ্ছ, শান্ত শীতল ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। ইহাতে সুন্দর সুন্দর ঘাট আছে, জলে অসংখ্য মৎস্য ও কচ্ছপ এবং চক্রাকার প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার স্রোত কুণ্ঠিতভাবে প্রবাহিত হয়।' মৌদগল্যায়নের প্রকৃতি রহস্যপূর্ণ ছিল, তাঁহার বাক্য ভিক্ষুরা অনেক সময় ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতেন না, এই কারণে সময়ে সময়ে ভিক্ষুগণ তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন। 'তপোদার স্রোত কুণ্ঠিতভাবে প্রবাহিত হয়' এই বাক্যে মৌদগল্যায়নের ভুল আছে, ইহা মনে করিয়া তথাগতের নিকট ভিক্ষুগণ অভিযোগ করিলেন। বুদ্ধদেব ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন যে তপোদা যখন দুইটী 'মহানরকের' ভিতর দিয়া প্রবাহিতা তখন মৌদগল্যায়ন যথার্থই বলিয়াছে 'তপোদার স্রোত অতি কষ্টে প্রবাহিত হয়।' এই দুইটী 'মহানরকের' একটা গূঢ় অর্থ আছে। বর্ত্তমান সরস্বতী নদীর দুই তীরে দুইটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। অনোতত্ত হ্রদের সহিত

* ইনি তথাগতের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন।

উক্ত প্রস্রবণের সম্বন্ধ আছে এবং জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে স্রোত মাটীর নীচ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় নরকাগ্নির সংস্পর্শেই উষ্ণ হইত। প্রাচীন তপোদাই বর্ত্তমান সরস্বতী এবং ইহা বৈভার ও বিপুল এই দুইটী পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তপোদার উত্তর তীরে আজিও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইহা সেই প্রাচীনকালের বিহারের ভগ্নস্তূপ হইবে। (ক্রমশঃ)

নানা-কথা।

ধারওয়ারের পত্র :— [আমাদের পরম হিতৈষী ধারওয়ার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম। তং বোং সং]

"আসিবার সময় বহরাম পুরে (গঞ্জাম) কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিয়াছিলাম। তথায় ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী অনরেবল এ, পি, পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উক্তদিন রবিবার থাকায় সমাজেও গিয়াছিলাম। পাত্র মহাশয় এই সামান্য গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই সমাজের নাম "প্রার্থনা" সমাজ ছিল সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ করা হইয়াছে। এজন্য কয়েকজন অনুষ্ঠানিক সভ্য সমাজে আসা বন্ধ করিয়াছেন। নামের জন্য এত!

"সম্প্রতি আমি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য লিখিয়াছি। উক্ত মন্তব্য সম্বলিত একখানি পত্র সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি। যদি প্রকাশিত হয় অবশ্য আপনি দেখিতে পাইবেন। আমার বোধ হয় চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে উহা সঞ্জীবনী হইতে লইয়া মুদ্রিত করিলে বড়ই ভাল হয়। উক্ত মন্তব্যের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিয়া অদ্য বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেছি। সুবোধ পত্রিকা আপনার নিকট যায়। যাইলে আপনি অবশ্য দেখিতে পাইবেন।

"উপাসনাপ্রণালীর দেবনাগরী শ্লোক, ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করিবার কি হইল? ইহা যে কতদূর আবশ্যক তাহা বারম্বার বলিবার আবশ্যক নাই।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসারের বিশেষ ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ইহার উপরেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ না করিলে এবং এজন্য স্বার্থত্যাগ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হওয়া সুকঠিন। আপনাকে আমি অনেকবার এ বিষয়ে বুঝাইয়া বলিয়াছি। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাবটি উঠিয়াওছিল কিন্তু চাপা পড়িয়া আছে। এক্ষণে দেখা যাউক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আমি এখন কতদূর কি করিতে পারি।"

মধ্যভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ— গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি হইতে ইন্দোর নগরে মধ্যভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ৩৭তম ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই উৎসবে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি—একটী সাধুচরিত কথন এবং দ্বিতীয়, ধর্ম্মপরিষৎ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদিগের চরিত্র সদ্ভাবে আলোচিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাব আমাদিগকেও স্পর্শ করিবে। সুগন্ধি পুষ্প হস্তে রাখিলে তাহার সুবাস আমাদের হাস্ত সংলগ্ন হইতে বিলম্ব হয় না। সেইরূপ আবার প্রত্যেক উৎসবউপলক্ষে ধর্ম্মপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাগণ আপনাপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাব সকল বর্ণন করিতে থাকিলে ক্রমে বিভিন্ন ধর্ম্মের খোঁচগুলি কাটিয়া গিয়া অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের যে সুপ্রতিষ্ঠা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার :— [আমাদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামে যেভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি। তাঁহার উৎসাহঅনুকরণীয়। আমাদের কোন বন্ধু কি একটা বক্স হারমোনিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন না? তং বোং সং]

"গত ১১ মাঘ আমার বাসায় প্রাতঃকালে আমরা সস্ত্রীক ও সন্ধ্যাকালে পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে অপর ৭জন একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করি। উপাসনা অবশ্যই আদিসমাজের প্রণালীতে হইয়াছিল। আচার্য্যের কাজ আমিই করি। প্রাতঃকালীন উপাসনাতে বিবৃতি ও সায়ংকালের উপাসনার ব্যাখ্যান হইতে পাঠ করি। যে কয়টি লোক যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে এ প্রকার ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহাদের যোগদান করিতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং তাঁহারা আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। উপস্থিত প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৩টায় পাড়ার যুবকদিগকে লইয়া আমার বাসার সামনের খোলা যায়গায় বা কোন পাহাড়ের উপর বা অন্য কোন মনোরম স্থানে ঘণ্টাখানেক ব্রহ্মোপাসনা ও ব্যাখ্যান বা বিবৃতি হইতে পাঠ করিব স্থির করিয়াছি। ইতিমধ্যে দুটী রবিবার ঐ রকম কাজও করিয়াছি—একটি রবিবার আমার বাসার সামনের যায়গায়, অপরটি দেব-পাহাড়ের উপর। প্রথম রবিবারে ১১টী যুবক উপস্থিত ছিল, পর রবিবার ১৪টি উপস্থিত ছিল। আগামী কাল দোলযাত্রা উপলক্ষে ছুটী আছে; ইচ্ছা করিতে উহাদিগকে লইয়া পাহাড়তলিতে যাইব। দেখি কতদূর কি হয়।

"দুটি বিষয়ের বড় অভাব বোধ করিতেছি—প্রথমটি ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকের ও দ্বিতীয়টি একটি সুরের যন্ত্র (অর্থাৎ বক্স হারমোনিয়ম)। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম (পকেট এডিসন্ যাহার প্রুফ আমাকে গত জুলাই মাসে দেখাইয়াছিলেন) প্রকাশিত হইয়া থাকে, কয়েক খানি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে সেইগুলি ঐ যুবকদিগকে দিলে খুবই প্রচারের পক্ষে সুবিধা হয়। অবশ্য উহার মূল্য তাহারা দিবে কিন্তু কিছু কম। যদি পারেন ত কয়েক খণ্ড পাঠাইবেন। বক্স হারমোনিয়ম বা অল্প দামের একটি

* * *

হারমোনিয়ম পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।

* * *

"এ রকম প্রচারটা আমার বড় ভাল বলে মনে হয়। কারণ এতে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া আর কোন খরচ

নাই। আর চাঁদার জন্য কাহারও কাছে মুখাপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকে না।"

বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য বিগত ১৩ই জানুয়ারি কলিকাতায় বিক্রমপুরবাসীগণ কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হইয়াছিল। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিগঠিত হইয়াছে। অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিক্রমপুরে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্ত এক বৎসরের জন্য প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়ও টাকার সচ্ছলতা হইলে দ্বিতীয় প্রচারক নিযুক্ত হইবেন স্থির হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও কেদার বাবুর উৎসাহ অদম্য। আমরা আশা করি বিক্রমপুর ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক সভা সহজে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। অনেকেই সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মাসিক ১০৲ দশ টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এই সভার উদ্যোগী তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সমালোচনা।

দেবালয় রিভিউএর তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী ১৯২০) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দিন দিন এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি বিষয় আছে তন্মধ্যে 'বাহাইসম' নামক সন্দর্ভটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। "হ্যাপি নিউইয়ার" নামক প্রবন্ধে "ক্রিস্‌মাসকার্ড" এর উৎপত্তিকথা আলোচিত হইয়াছে। বার্লিনের একটী জার্ম্মাণ মহিলা উহার প্রথম উদ্ভাবিকা। মোটের উপর পত্রিকাটি ভালই চলিতেছে। আমরা ইহার আরও উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করি। শ্রীক্ষেঃ

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১শে চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।